নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে

পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বিন্দেশ্বর টুডু

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1301016

বর্ষ: ২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the thesis entitled

'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি' Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Gopa Datta, Department of Bengali, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Gopa Datta

Supervisor:

Dated: 24.7.23

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate: Bindeswar Tudu

Dated: 24.7.2023

প্রাক্কথন

ভারতবর্ষের রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস বহু প্রাচীন। রাঢ় অঞ্চল বলতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ ও তার পার্শ্ববর্তীর কিছু অংশকে বোঝানো হয়। রাঢ় অঞ্চলের মাটি বিশেষত রুক্ষ ও পাথুরে হওয়ায় কৃষিকাজে অনুপযোগী। এখানকার অধিকাংশ মানুষ বনজ ফলমূল আহরণ ও শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পরেও রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ও নানান অসংগতি দেখা যায়। এ সব নানান অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশের প্রতীক্ষায় আছে। আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে সামাজিক অন্যায়ের চিত্র ও বিশ্লেষণী বার্তাগুলি জীবন সংকটের প্রতিরূপ গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভ হল 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। গবেষণা শিরোনামে উল্লেখিত ছোটগল্পকাররা তাদের ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী অসহায় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব ইতিহাসের ছবি এঁকেছেন। যে সমাজে রয়েছে অনাচার, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, বেঁচে থাকার নানান সমস্যা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। আমাদের সমাজে দারিদ্র সীমার নীচে বাসকরা অসহায় নিঃস্ব মানুষগুলির বিশ্বাস, ভাষা, বৃত্তি ও সংস্কৃতি আলাদা হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দু-মুঠো ভাতের চাহিদা সবার এক ছিল। এইসব অসহায় মানুষদের সামাজিক অবস্থিতিকে এড়িয়ে বৃহত্তর মানবসমাজ গতিশীল থাকতে পারে না। আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে স্পষ্টত অনুভূত হয় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন চলমান সমাজজীবন থেকে নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অনালোকিত ও অনালোচিত অংশের অভাবী মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ও বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম অধিকারের কথা সাহিত্যিকরা শিল্পসম্মতভাবে গল্পের অবয়বে তুলে ধরেছেন। আমার গবেষণা কর্মে নির্বাচিত গল্পকারদের নির্বাচিত গল্পগুলি পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবনের এক জীবন্ত দলিল হবে এই বিনম্র আশা রয়েছে।

আমার এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. গোপা দত্ত মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। তিনি আমার গবেষণা কর্মে নিরন্তর উৎসাহ ও সহযোগিতায় সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ও তাঁকে প্রণাম জানাই।

এ প্রসঙ্গে বিষেশভাবে বলতে হয় একজনের কথা, যাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ আমাকে প্রাণিত করেছে। তিনি হলেন অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল মহাশয়, তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ও প্রণাম জানাই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমনা দাস সুর ও অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু গবেষণার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা

জানাই। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপকরা আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শদানে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজের সময় গোমস্তা প্রসাদ সরেন, মহাদেব হাঁসদা, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি ও সারদা প্রসাদ কিস্কু প্রভৃতি আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। শত ব্যস্ততার মধ্যেও এঁরা সময় বের করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আদিবাসী সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত নানান মতামতে আমি ঋদ্ধ হয়েছি এবং তা আমার গবেষণা কাজে বিষেশভাবে সহায়ক হয়েছে। সেই সব সাঁওতাল সাহিত্যিকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাবা-মায়ের অক্লান্ত শ্রম ও নিরন্তর উৎসাহ আমার গবেষণা কাজের মূল চালিকাশক্তি। বাবা-মায়ের প্রতি প্রণাম জানাই। তাছাড়া এই গবেষণা কর্মে নিজেদের পড়াশুনার কাজ সামলে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে আমার দাদা বুদ্ধেশ্বর টুডু, বোন সানিয়া টুডু, ভাই সিদ্ধেশ্বর টুডু ও চিত্তরঞ্জন টুডু। তাদের প্রতি আমার অনিঃশেষ শুভেচ্ছা রইল।

এবারে আসি তাদের কথায় যাদের উৎসাহ ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় দীর্ঘ সময় প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে থেকেছে, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদীপ ধীবর, সাহেব হেমব্রম, সুশীল মালিক, হরিপ্রসন্ন মুর্মু, অমিয় মুর্মু ও উপেন্দ্রনাথ হাঁসদা এদের প্রত্যককে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সম্ভার আহরণে সোশ্যাল মিডিয়াতে সাহায্য করেছেন বহু পরিচিত মানুষ তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা সম্পূর্ণকরণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও বইপত্র সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন গ্রন্থাগার ইন্টারনেট মাধ্যম থেকে যে গ্রন্থাগারগুলির সহায়তা পেয়েছি সেগুলি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পিএইচ.ডি. সেলে'র আধিকারিক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাগত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রুপ সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ ও বানানে ভুল থেকে যায় তার জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার এই গবেষণা কর্মটি দীর্ঘ কয়েক বছরের নিরলস পঠন-পাঠন ও তথ্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতি।

শুস্‌নিড়ি, পুরুলিয়া (প.ব) বিনীত

তারিখ: বিন্দেশ্বর টুডু

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রাক্ গবেষণায় বাংলা ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১-৩

পদ্ধতিবিজ্ঞান ৪

ভূমিকা ৫-৮

প্রথম অধ্যায়:

রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান ৯-৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়:

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি ৭৮-১১৩

তৃতীয় অধ্যায়:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ ১১৪-১৩২

চতুর্থ অধ্যায়:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি ১৩৩-১৫৯

পঞ্চম অধ্যায়:

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি ১৬০-২২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি ২২৯-২৫৭

সপ্তম অধ্যায়:

নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি ২৫৮-২৮২

অষ্টম অধ্যায়:

পশ্চিম রাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক ২৮৩-৩২৪

উপসংহার ৩২৫-৩২৭

গ্রন্থপঞ্জি ৩২৮-৩৪৬

প্রাক্ গবেষণায় বাংলা ছোটগল্পে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলের অবস্থান। এই রাঢ় অঞ্চলের সীমানা হল- ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ ভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকে ছোটনাগপুরের বিস্তৃত উচ্চভূমিকে রাঢ় অঞ্চল বলা হয়। রাঢ় অঞ্চল জৈন, বৌদ্ধ, পৌরাণিক গ্রন্থ, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই অঞ্চল বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এখানকার মাটি রুক্ষ, কঠিন ও প্রস্তরময়। এই অঞ্চলের অরণ্যচারী আদিবাসী মানুষজন শিকার, বনজ ফল-মূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সারাজীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সংস্কৃতিতেও তাদের নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যায়। বংশ পরম্পরায় তারা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম এই উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন। তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। সাহিত্যে এই সব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে গল্প ও উপন্যাসের বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই রাঢ় অঞ্চলকেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাসে উল্লেখিত ব্রাত্য চরিত্রগুলির সমাজ, সংস্কৃতি প্রশাসনিক অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শোষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল-

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. সুরোজ কুমার পান মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অমর আদিকারী ‘বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন(১৯৫০-২০০০): নির্বাচিত গল্পকার’ নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। নির্বাচিত গল্পকাররা হলেন– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), গুণময় মান্না(১৯২৫-২০১০), মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬), ভগীরথ মিশ্র(১৯৪৭), অমর মিত্র(১৯৫১), মানব চক্রবর্তী, নলিনী বেরা(১৯৫২), রামকুমার মুখোপাধ্যায়(১৯৫৬), সৈকত রক্ষিত ও অনিল ঘড়াই(১৯৫৭-২০১৪)। এই দশজন বাংলা ছোটগল্পকাদের গল্পে রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র অসহায় আদিবাসীদের সমাজে অন্যায়, অত্যাচার, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মত বাস্তব জীবনের নানান সমস্যা জীবনতিহাসের ছবি গল্পের পাতায় এঁকেছেন। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করা মানুষগুলির বিশ্বাস, বৃত্তি, ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা হলেও দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য দু-মুঠো ভাতের চাহিদা সবার একই ছিল। গবেষণায় তিনি নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিতে উল্লেখিত রাঢ় অঞ্চলের অসহায় আদিবাসী মানুষদের সেই সব সামাজিক অবস্থিতিকে বর্ণনা করেছেন।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. মোনালিসা দাস মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে শিখা হালদার ‘নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে রাঢ় অঞ্চলের

কয়লা-খনির জীবন’ নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। উনিশ শতক থেকে কয়লাখনি অঞ্চলকে ঘিরে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। খনি আবিষ্কারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা একটি বিশিষ্ট ধারায় বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে বয়ে চলেছে। কিন্তু কয়লাখনি কেন্দ্রিক সাহিত্যের পরিচিতি বেশি নয়, তাই আজও খনি সাহিত্যে শিক্ষিত জনমানসে অধরায় রয়ে গেছে। কয়লা অঞ্চলকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর সাহিত্যের সংযোগ নির্ণয় ও বিশ্লেষণের সম্ভাব্য অবকাশ থেকে যায়। গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারাগুলিতে তিনি খনি অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক ছবিকে বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলনকে তুলে ধরেছেন।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বৈশাখী কুণ্ডু ‘স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০)’ নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। গবেষণায় ভারতের আদিবাসীদের পরিচয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মিথ-বিশ্বাস-প্রথা-ট্যাবু প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তার উপর নেমে আসা নানারকম অভিঘাত বাংলা উপন্যাসে একটা বিস্তৃত সময়পর্বে আদিবাসী জীবনের এই দিকগুলির বাস্তবনিষ্ঠ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. সুদিত কৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রী প্রদীপ কুমার দাস ‘দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সাঁওতাল সমাজ(১৯৭৪-২০০১)’ নামক শীর্ষক গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষকরা বহু গবেষণা করেছেন। অধিকাংশ গবেষণাপত্রগুলি আদিবাসী সাঁওতালদের বিদ্রোহ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় আদিবাসী সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সাঁওতালদের বিদ্রোহ নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

আমার গবেষণার শিরোনাম হল ‘নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি’। নির্বাচিত গল্পকাররা হলেন– শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র ও নলিনী বেরা এবং পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। উল্লেখিত সাহিত্যিকদের ছোটগল্পগুলিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষদের প্রাত্যহিকতায় ছড়া, গান, লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা লোকায়ত সংস্কৃতিকে এক নতুন দিশার পথ দেখিয়েছে। আদিবাসী মানুষগুলির বিশ্বাস, বৃত্তি, জীবনচর্যা, ভাষা ও

সংস্কৃতি সবই পৃথক। আমার আলোচিত অধ্যায়গুলিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অবস্থান, রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস এবং গল্পে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি তাদের দৈনন্দিন জীবনকথা, অর্থনৈতিক অবস্থান, শ্রেণিগত বৈষম্য, লৌকিক উপাদান(লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি) বিষয় বর্ণিত হয়েছে। লেখকের নিজস্ব ভাষা শৈলীর সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার পরিচয় এবং কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকারে তাদের নিজস্ব মতামতকে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস, সীমানা, ভাষা, গল্প রচনার সমকালীন প্রেক্ষিত, বাস্তবতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় জানা যায়। অতএব পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সমাজজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার এই গবেষণায় উঠে এসেছে।

পদ্ধতিবিজ্ঞান

এই অভিসন্দর্ভটিকে রূপ দিতে ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি এই কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative Method) অনুসরণ করা হয়েছে। কালপুরুষ ১৪ ফ্রন্টে অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ১২ ফ্রন্ট ও ইনডেন্ট রাখা হয়েছে, তাই কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্ধৃতি ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির *আকাদেমি বানান অভিধান* নির্দেশিত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। MLA হ্যাণ্ডবুক এর পদ্ধতি মেনে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে।

ভূমিকা

রাঢ় এক অতি প্রাচীন দেশ, সভ্যতার আদিভূমি। রাঢ় অঞ্চল বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণভাগের এক অখন্ড জনপদকে রাঢ়দেশ বললেও এই রাঢ় অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান ও তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজকের আধুনিকতায় উপস্থিত। রাঢ় অঞ্চলের বিশাল আয়তন, উত্তরে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সীমা, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, পূর্বে বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ থেকে পশ্চিমে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়- ১. পূর্বরাঢ় ২. পশ্চিমরাঢ়। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হল- 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। পশ্চিমরাঢ় হল রাঢ়ের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলা। এই পশ্চিমরাঢ় নানা জাতি, উপজাতি এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়দের সংখ্যা বেশি। সাঁওতাল, কোল, কোড়া, বিরহড়, মাহালি, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, কর্মকার, বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, করগা ও খয়রা প্রভৃতি তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিরা বসবাস করে। এরা প্রকৃতিগতভাবে স্বভাব-সরল, অনাবিল, অকপট, সৎ ও পরিশ্রমী হয়। এখানকার আদিবাসীদের সংস্কৃতিতেও নানারকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমরাঢ়ের ভূ-প্রকৃতি আবহ পরিবেশের মতোই নানারকম বৈচিত্র্য ভরা রয়েছে। কৃপণ প্রকৃতির দাক্ষিণ্যবর্জিত পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির বহিরাবরণ রুক্ষ, অনুর্বর ও কঙ্করময়। জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সারাজীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবুও মানুষগুলির হৃদয় সরসতায় পূর্ণ থাকে। শত দুঃখ কষ্টেও তারা উৎসবে নৃত্য মেতে ওঠে। তাদের আবেগ-উল্লাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় শ্রুতি-সুখকর সুর-মুর্ছনায় আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তোলে। বনজঙ্গল, ডুংরি-দাড়াং-এ, ছোটো ছোটো পর্ণ কুটিরে, শিলাবতী-কংসাবতী-কুমারী-দ্বারকেশ্বর-দুয়ারসিনীর কিনারে কিনারে, অসংখ্য মানুষের আবাসমূলে কান পাতলে লোকসংগীতের মনমাতানো সুর শোনা যায়। এছাড়াও বিভিন্নরকম পালা-পার্বণে, উৎসব অনুষ্ঠানে ধাঁধা-প্রবাদ-উপকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা-উপধারা শোনা যায়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সীমানা যেমন বদলেছে তেমনি এই অঞ্চলের মানুষেরা বংশ পরম্পরায় বৃহত্তর জনসমাজ থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিংবা দীর্ঘকাল ধরে তারা বহু ভাবে শোষণ, অত্যাচার ও অবহেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। এমনকি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা টুকুও তারা পায় না। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের এই সব মানুষরা আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতীয় ইতিহাসে এদেরকে আদিবাসী বলা হয়।

এদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্র রয়েছে, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের আঙিনাতে, ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন সংস্কৃতিতে এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে আদিবাসী সমাজ জীবনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। চর্যাকাররা সমাজের বিভিন্ন জাতির জীবনকে তুলে ধরে তাদের সাধনার গূঢ়ার্থ সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর উনিশ শতকে নবজাগরণের সময় আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, কিছু জায়গায় তাদের আংশিক পরিচয় মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা বলতে, আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করার ফলে আদিবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সাহিত্যের বিষয় করেন নি। তবে তিনি আদিবাসী অঞ্চলকে পল্লীউন্নয়নের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে রচনার বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করে। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম সাহিত্যে এই উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন। তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনীর বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। সাহিত্যে এই সব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে ছোটগল্প, উপন্যাসে বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের বুকে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যা সমকালীন সাহিত্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

ভারতবর্ষে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), আজাদ-হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৩) ও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৪৬) ঘটেছিল। এরপর দেশবাসীকে এক এক করে দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট, শ্রেণি সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভূমি বন্টন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য ভারতবর্ষের মানুষকে ধীরে ধীরে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তে আলাদা করে। বৃহত্তর শ্রেণির মানুষ সত্তা খুইয়ে নিম্নবিত্তে পরিণত হয়। এইসব সর্বহারা, নিঃস্ব, নিরন্ন অসহায় আদিবাসী মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিকে সাহিত্যিকরা গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রভাবে ক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষগুলির জীবন ইতিহাসকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যে সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই সমকালীন পরিস্থিতিতে

লেখকরা তাদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছিল। সাধারণত দেশের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর সামাজিক অন্যায়ের চিত্র তাঁদের রচনায় উঠে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত ভূখন্ড পশ্চিমরাঢ়ের নিজস্বতায় লোকায়ত সমাজ ও মানুষের এক অন্তর্লীন পরিচয়ের হদিস পাওয়া যায়। তাদের প্রাত্যহিকতায় ছড়া, গান, লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ– প্রবচন, আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা লোকায়ত সংস্কৃতিতে এক নতুন দিশার নির্দেশক। পশ্চিমরাঢ়ের প্রতিটি অঞ্চলে দরিদ্র সীমার নীচে বাস করা অভাবী মানব গোষ্ঠীরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষগুলির অবয়ব, বিশ্বাস, বৃত্তি, জীবনচর্যা, ভাষা ও সংস্কৃতি সবই পৃথক। কেবলমাত্র মানব সমাজে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনে দু-মুঠো ভাত চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একরকম ছিল। সেই সব দরিদ্র অসহায় মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি পূরণের জন্য নিজেদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। প্রগতিশীল সমাজের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষদের যোগাযোগ ছিল না। তৎকালীন প্রশাসনও তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। এইসব কারণে পশ্চিমরাঢ়ের মানুষদের নানান অসংগতি ও অপ্রাপ্তি রয়ে গেছে।

কয়েকজন বাংলা কথাসাহিত্যিকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব, স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাজন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি মানুষের আত্মিক মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয়, অবদমন, সুস্থ মানবিক পরিবেশের বিকৃত নগ্ন রূপকে দেখেছেন এবং অসহায়, দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর ও বোকা মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কলম ধরেছিলেন। আমার গবেষণা কর্মে নির্বাচিত কয়েকজন গল্পকাররা হলেন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬), ভগীরথ মিশ্র(১৯৪৭), নলিনী বেরা (১৯৫২)। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজন স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে জন্মেছেন। ভারত স্বাধীনতা হওয়ার পর নলিনী বেরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র ও নলিনী বেরা সাহিত্যিকরা সত্তর দশকের সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিল। যা বাংলা কথাসাহিত্যে সৃজনে এক নতুন গতি সঞ্চার করেছিল। সমকালীন পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলন ও সত্তর দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব এঁদের রচনায় লক্ষ করা যায়। একজন আদর্শ সাহিত্যসেবকের মতো তারা নিরলসভাবে সাহিত্যে চর্চায় গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। উল্লিখিত সাহিত্যিকরা এক নতুন জীবনবোধ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনকে যেমন বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছেন তেমনি এনেছেন আখ্যানের নতুনত্ব। এখানেই তাদের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাই

ষাট পূর্ববর্তী দশকগুলির ছোটগল্প ও উপন্যাস থেকে এঁদের সাহিত্যে চর্চায় বিষয় ভাবনা নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যর দাবি রাখে।

‘নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক আমার গবেষণা কর্মটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়: রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান। দ্বিতীয় অধ্যায়: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। তৃতীয় অধ্যায়: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ। চতুর্থ অধ্যায়: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। পঞ্চম অধ্যায়: মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। ষষ্ঠ অধ্যায়: ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। সপ্তম অধ্যায়: নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি। অষ্টম অধ্যায়: পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক।

আলোচিত অধ্যায়গুলিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের স্থানিক অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবনকথা, অর্থনৈতিক অবস্থান, শ্রেণিগত বৈষম্য, লৌকিক উপাদান (লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি) বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও লেখকের নিজস্ব ভাষা শৈলীর সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার পরিচয় এবং কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার (গোমস্তা প্রসাদ কিস্কু, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, মহাদেব হাঁসদা ও সারদা প্রসাদ কিস্কু) এ তাদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস, সীমানা, ভাষা, গল্প রচনার সমকালীন প্রেক্ষিত, বাস্তবতা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় জানা যায়। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সমাজজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার এই গবেষণায় উঠে আসবে এই বিনম্র আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায়:

রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটোগল্পে তাদের অবস্থান

রাঢ় শব্দের তাৎপর্য:

রাঢ় একটি প্রাচীন শব্দ। অতি প্রাচীন কাল থেকে 'রাঢ়' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অর্থের দিক থেকে আলাদা হলেও ভারতীয় বহু প্রাচীন ভাষাতে 'রাঢ়' শব্দটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সুকুমার সেনের মতে, সংস্কৃত অভিধানে 'রাঢ়' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য বা বৈভব, সম্ভবত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দটি 'রাজ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত রাজ্+ত রাষ্ট্র অথবা রাজ্+এ রাষ্ট্র। সাঁওতালি ভাষায় 'রাঢ়ো' শব্দের অর্থ নদী গর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরে লাল মাটি। আবার অঞ্চল ভিত্তিক সাঁওতালি ভাষাতে 'রাঢ়' শব্দের ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। রাঢ়-সুর, লাড় (ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন সঞ্জাত র>ল, ল>র) অর্থ সাপ। ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণা 'লাড়' শব্দটি মূলত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে এসেছে। হিন্দিতে 'রাঢ়' অর্থ নীচ। মারাঠিতেও একই অর্থ Rough savage. মৈথিল ভাষায় শব্দটির অর্থ নিম্নজাতীয় লোক। এক সময় বৃহৎ ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমে বিভাজিত সমাজের নিচুতলার প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী শূদ্রদেরকে রাঢ় বলা হত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বার বার 'রাঢ়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যগুলোতে 'রাঢ়' শব্দটি বিশেষ করে জাতি ও দেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শ শতকের কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর *চৈতন্য ভাগবত* কাব্যে রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়–

> কেহ রাঢ় ওড্রদেশ শ্রীহট্টে পশ্চিমে।
> ....
> রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।।[১]

অপরদিকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য রাঢ় শব্দটি নীচ বা নিন্দা অর্থে ব্যবহার করেছেন।

> অতি নীচ-কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।
> কেহো না পরশে জন্ম লোকে বলে রাঢ়।।[২]

তিনি কালকেতু ব্যাধকে হিংসক রাঢ় বলে পরিচয় দিয়েছেন অর্থাৎ রাঢ় শব্দটি জাতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনারাম চক্রবর্তী তাঁর *ধর্মঙ্গল* কাব্যে রাঢ় শব্দটি নিন্দা অর্থে ব্যবহার করেছেন- 'জাতি রাঢ় আমি রে করমে রাঢ় তু'। শিবায়ন কাব্যে এ রামেশ্বর ভট্টাচার্য হিংস্র অর্থে রাঢ় শব্দটি ব্যবহার করেছেন– 'বাঘা বড় রাঢ়'।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের একটা নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। ইতিহাসের সেই প্রকৃত স্বরূপ

উদ্‌ঘাটনের জন্য আগ্রহী গবেষক ও পন্ডিতগণ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা এগিয়ে আসেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানব সভ্যতার সম্পর্ক কিরকম তা উদ্‌ঘাটন করায় তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। তাই রাঢ় বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনার প্রাক্ মুহূর্তে ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয় একান্ত দরকার।

বৃহত্তর রাঢ়ের পরিচিতি:

'রাঢ়' এক অতি প্রাচীন দেশের নাম। পূর্ব ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম নামে যে অঞ্চলগুলি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বঙ্গভূমির বৃহত্তম রাঢ়ের অবস্থান। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদ-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী, বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে পশ্চিমবঙ্গের যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ গড়ে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করার বিষয়টি খুবই জটিল ও বিতর্কমূলক। কারণ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতার উত্থান ও পতনের ফলে রাষ্ট্রীয় সীমা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রাকৃতিক কারণেও (নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য) রাষ্ট্রীয় সীমা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বঙ্গের নাম, তার শিল্প-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় সীমা বার বার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

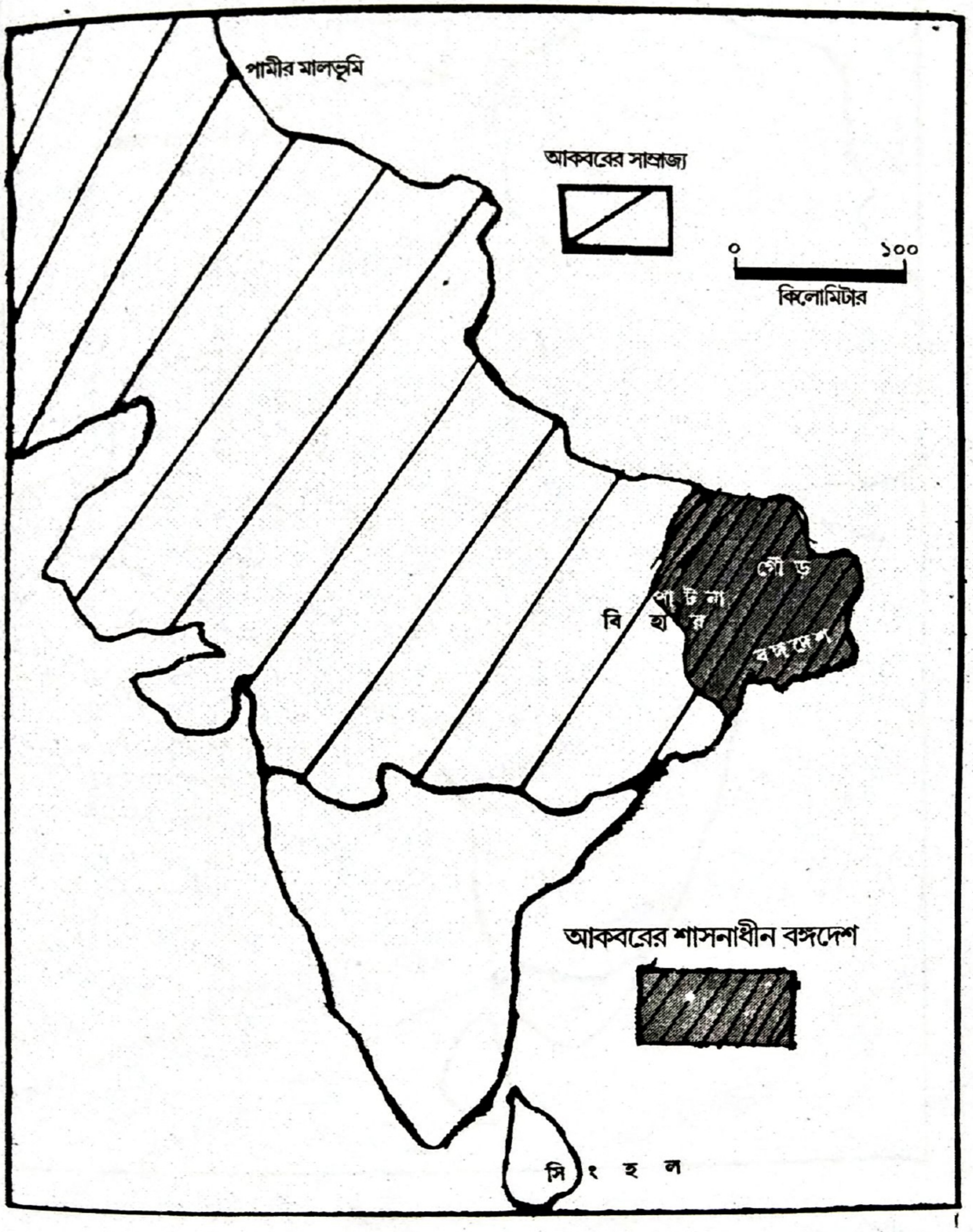

আকবরের সময় বাংলা তথা রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমারেখা মানচিত্র-১

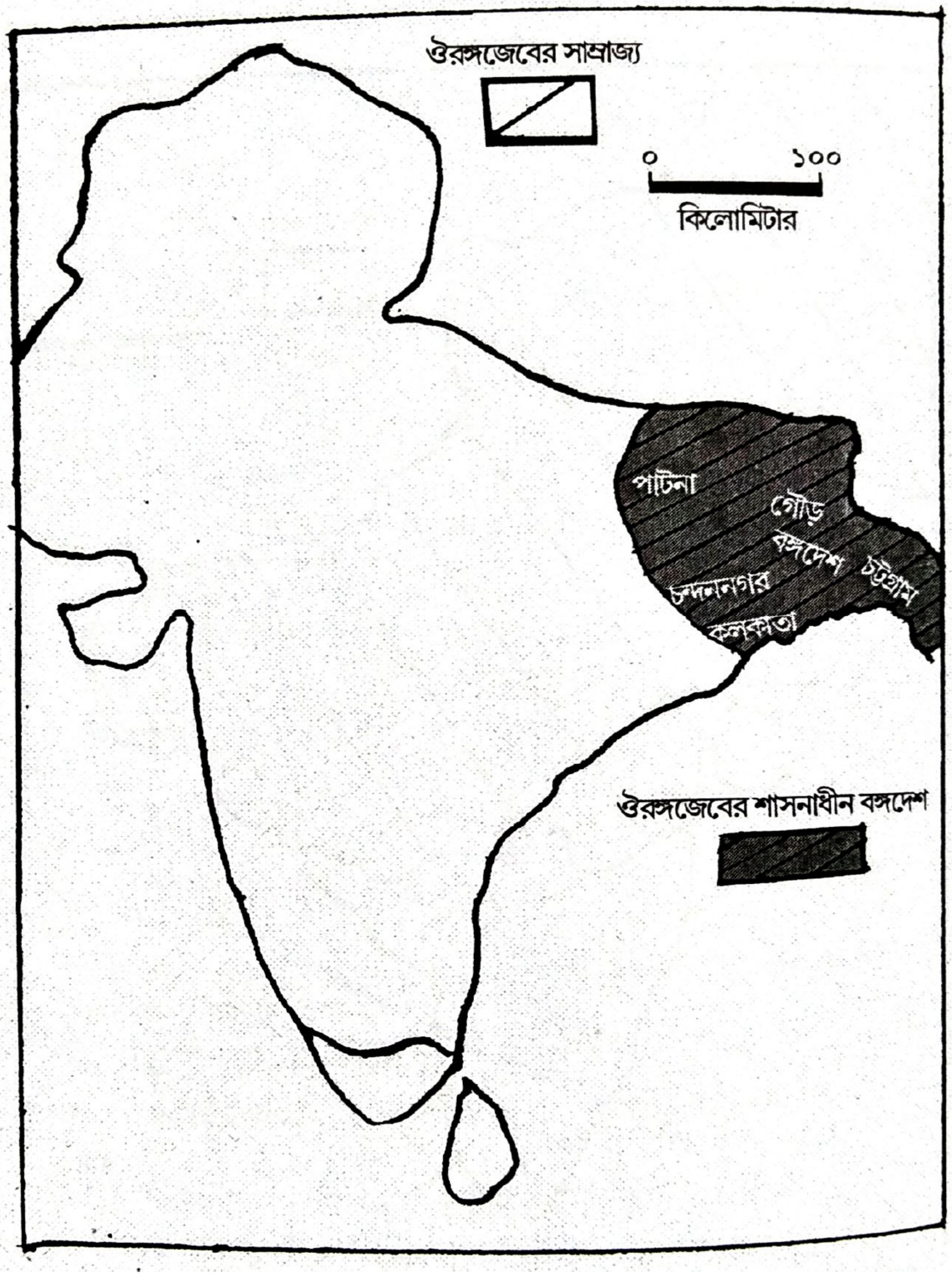

ঔরঙ্গজেবের সময় বাংলা তথা রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমারেখা মানচিত্র-২

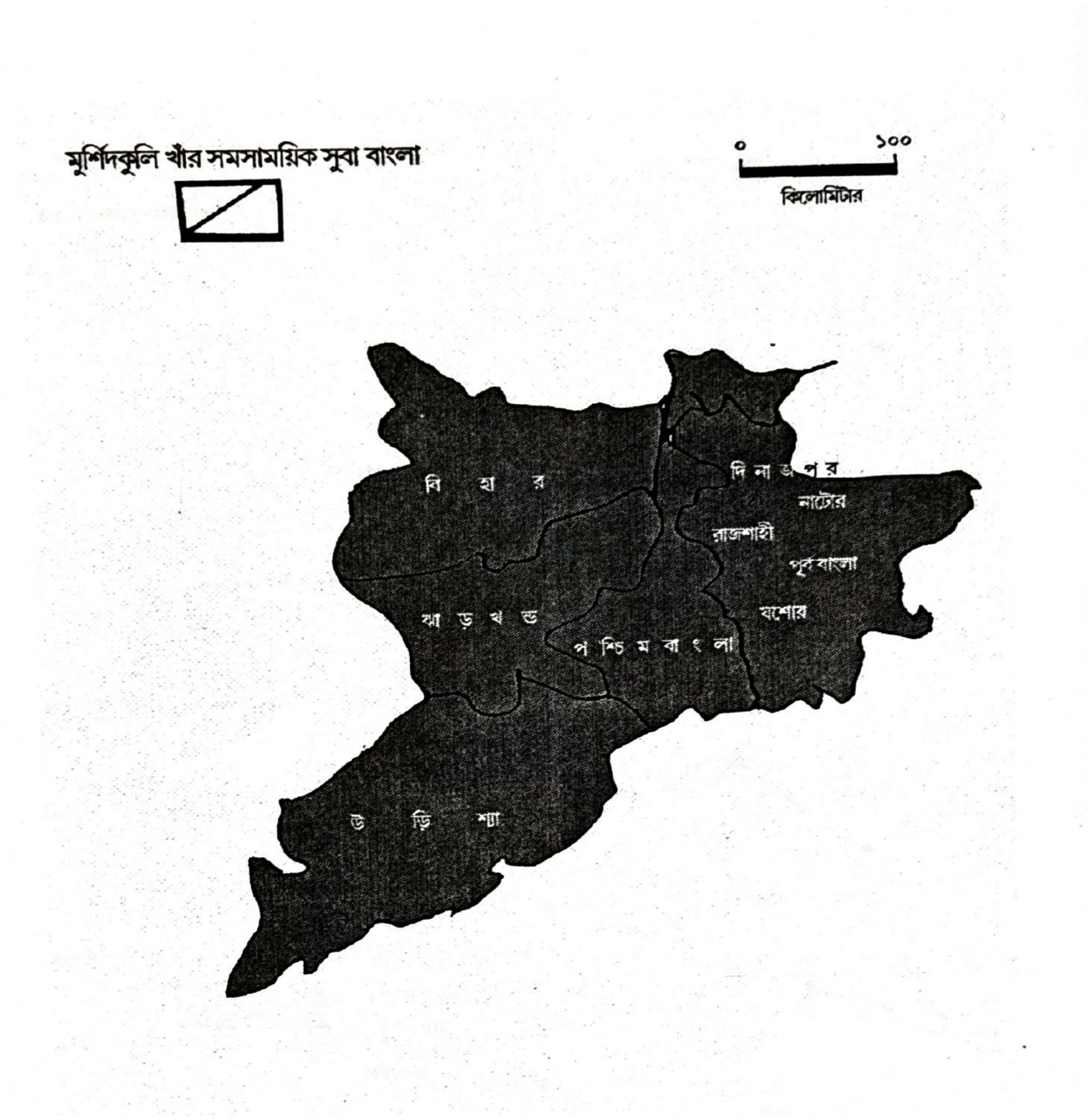

মুর্শিদকুলি খাঁর সমসাময়িক সুবা বাংলা

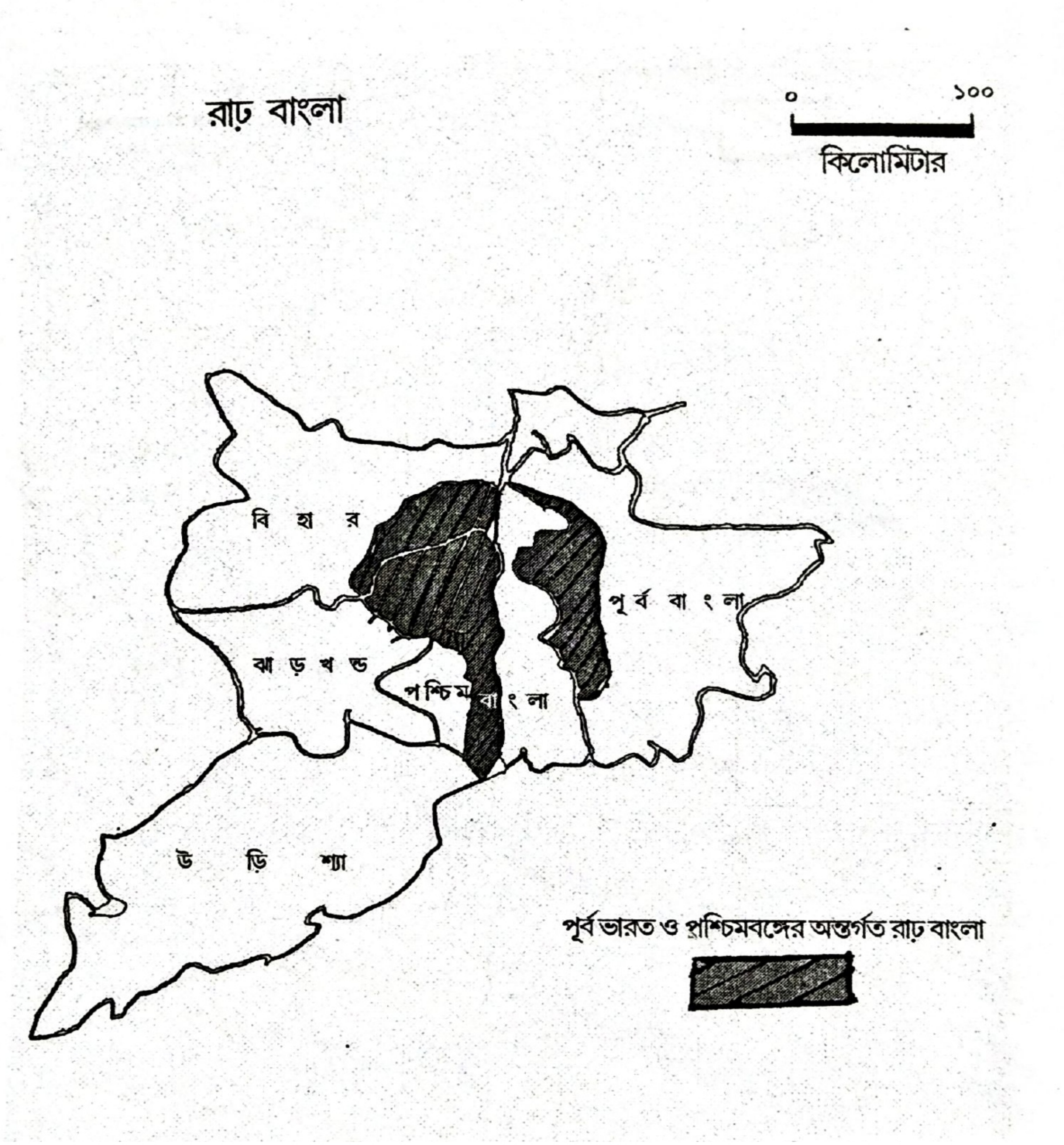

পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত রাঢ় বাংলা মানচিত্র-৩

‘বঙ্গ’ শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন লিপি, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও ঐতিহাসিকদের দেওয়া গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য ও কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। নীহাররঞ্জন রায়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে বাঙলা বা বাঙ্গলা নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

> ‘বঙ্গ’ শব্দের সঙ্গে আল (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ... আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়, আল ছোট বড় বাঁধও বটে। এই নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে বৃষ্টি বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাইবার জন্য ছোট বড় বাঁধ বাঁধা ছিল কৃষি ও বাস্তু ভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য।....বঙ্গদেশ আল্ বা আলিবহুল, যে বঙ্গদেশের উপরি ভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্ সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাঙলাদেশ।[৩]

আবার সুকুমার সেনের মতে-

> ‘বঙ্গ’ শব্দটির আসল অর্থ হল কাপাস। .....রাখাল, গোয়াল, ঘোষাল, সাঁওতাল ইত্যাদির মতো ‘বঙ্গাল’ শব্দ সমাস নিষ্পন্ন পদ (অথবা তদ্ধিতান্ত শব্দ)। অর্থাৎ যাহারা কাপাস চাষ করে (কিংবা যে দেশে ভাল কাপাস উৎপন্ন হয়)।[৪]

ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ বহিরাগতদের মিলন-মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এখানে কোন আদিম জাতির উৎপত্তি ঘটেনি। আনুমানিক প্রাগৈতিহাসিক যুগে সুদূর আফ্রিকা থেকে স্থলপথে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতীয় মানুষ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। এরপর এক এক করে প্রটো-অস্ট্রালয়েড, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির আগমন ঘটে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-

> অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন, এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একই ভাষা সূত্রে এবং একই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিল বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্য ভাষা।[৫]

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর একটি অংশ ইরান বা পারস্য দেশে প্রবেশ করে, অপরটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ মধ্যে দিয়ে তাদের এদেশে আগমন অব্যাহত ছিল। প্রথমদিকে এরা পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বেশ কয়েকটি প্রদেশে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে তারা অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। পূর্ব পাঞ্জাব, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, কৌশল এমনকি বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত তারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। অপরদিকে পূর্বভারত অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ- কলিঙ্গতেও আর্যরা প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম থেকেই আর্যরা পূর্ব ভারতের আদিবাসী জনজাতিকে ঘৃণা করত। পূর্বাঞ্চলে এলে তারা ফিরে গিয়ে বাড়িতে প্রায়শ্চিত্ত করত। ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, যজুর্বেদে পূর্বদেশের আদিবাসীদের অসুর বা দানব গোষ্ঠী বলে গালিগালাজ করত। আর্যরা ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আর অপরদিকে অনার্যরা নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে হারিয়ে বৃহত্তর আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে

যেতে শুরু করেছিল। ঋগ্বেদের অন্তর্গত *ঐতেরেয় আরণ্য'ক* গ্রন্থে 'বঙ্গ', 'বগধ', ও 'চেরাপাদ'এ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থে তাদেরকে পাখি বলা হত, এবং প্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন-

> আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, অধিকাংশ দেশনাম জাতিনাম হইতে আগত।...সুতরাং বঙ্গজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল 'বঙ্গ' দেশ। অথবা বঙ্গে-জলময় দেশে-যাহারা পূর্বাপর বাস করিত তাহারা 'বঙ্গ', এবং পরে তাহাদের নিবাস ভূমি 'বঙ্গ' দেশ। 'বগধ' নামটি পরবর্তীকালের 'মগধ' নামের পূর্বরূপ বলিয়া নেওয়া হয়। "চেরাপাদ"-এর (বা "ইরাপাদ"-এর) কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।[৬]

অন্যদিকে *রামায়ণ, মহাভারত* এ 'পুন্ড্র', 'বঙ্গ', 'সুহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'মগধ' ও 'অঙ্গ' প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলির নামের পিছনে কোমের(Tribe অর্থে) অবদান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন-

> বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুন্ড্রাঃ, গৌড়া, অর্থাৎ বঙ্গ জনাঃ, পুন্ড্র জনাঃ, রাঢ়া জনাঃ, বংগ-পুন্ড্রা-গৌড় কোম(Tribe অর্থে)। এইসব জনাঃ বা কোম যে সব অঞ্চলে বাস করিত, পরে তাহাদের অর্থাৎ সেই অঞ্চলের নাম হইল বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র ইত্যাদি।[৭]

অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন রাজাদের উত্থান পতনের ফলে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে, (নদ-নদীগুলির গতি) পরিবর্তনে তাদের রাজ্যের সীমা বার বার পরিবর্তন ঘটেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মত অনুসারে, 'অঙ্গ', 'বঙ্গ', 'বঙ্গাল', 'রাঢ়', 'পুন্ড্র'(পৌন্ড্র), 'তাম্রলিপ্ত', 'দন্ডভুক্তি', 'সমতট', 'কলিঙ্গ', 'মগধ', 'সুহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'গৌড়' ও 'কজাঙ্গল' প্রাচীনকালে এগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। জনপদগুলি একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান ছিল। ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, মহাভারতের যুগে বঙ্গ ছিল তাম্রলিপ্ত, পুন্ড্র ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ এবং প্রতিটি রাষ্ট্র ছিল স্বতন্ত্র। আনুমানিক চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্ত ছিল বঙ্গের ও সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত। *দশকুমারচরিত* এ (আনুমানিক সপ্তম শতক) দামলিপ্ত(তাম্রলিপ্ত) সুহ্মের অন্তর্গত। তাম্রলিপ্ত সুহ্মের বা দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পাল ও সেন যুগে মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১২০২ শতাব্দীতে বঙ্গ পুন্ডবর্ধনভূমির অন্তগর্ত হয়। আবার একাদশ শতকে 'বঙ্গাল' নামে এক নতুন জনপদের সন্ধান পাওয়া যায় যা 'বঙ্গ' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন-

> দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গাল দেশ। এবং এই দুই দেশের মধ্য সীমা ছিল বোধ হয় গঙ্গা-ভাগীরথী।..... একাদশ শতকে বঙ্গাল দেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র তটশায়ী সমস্ত দেশ খণ্ডকে বুঝাইত। ইহার সম্পূর্ণ না হউক কতক অংশকে সমতট বলা হইত।[৮]

সেই সময় বঙ্গালদেশ বলতে একমাত্র পূর্ববঙ্গকে বোঝনো হত। আর পুন্ড্র বা পৌন্ড্রবর্ধন সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্তগর্ত। বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক জনপদ ছিল। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র,* বাৎসায়াণের *কামসূত্র,* দন্ডীর *কাব্যাদর্শন* এবং রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা* প্রভৃতি গ্রন্থে 'গৌড়' দেশ ও গৌড়ীয় ভাষারীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও কলহ্নের *রাজতরঙ্গিনী* ও অন্যান্য গ্রন্থসূত্রে বলা হয় যে, পঞ্চগৌড় হল 'গৌড়', 'সারস্বত' 'কান্যকুজ', 'মিথিলা' ও 'উৎকল'। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-

> সপ্তম শতকে সমগ্র গৌড়কে পৌন্ড্রবর্ধন বলা হত। অষ্টম শতকে সেটা স্বতন্ত্র স্থানরূপে চিহ্নিত।... ষোড়শ ও সপ্তম শতকে রাঢ় দেশের নাম ছিল গৌড়। অষ্টম শতকে রাঢ়ের রাজধানী বর্ধমানের চম্পাই নগরী।[৯]

পৌন্ড্র ও পুন্ড্র দুটি স্বতন্ত্র জনপদ। পুন্ড্র গঙ্গার উত্তরে বর্তমানে উত্তরবঙ্গে এবং পৌন্ড্র গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমানে বীরভূম। এই সময় থেকে জনপদগুলির স্বতন্ত্রতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পাল ও সেন যুগে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু লিপিতে 'গৌড়', ও 'বঙ্গ'কে আলাদা জনপদ রূপে উল্লেখ থাকলেও, পাল বা সেন রাজারা নিজেদেরকে 'রাঢ়েশ্বর', 'বঙ্গেশ্বর', বা 'বঙ্গাধিপতি' উপাধি অপেক্ষা 'গৌড়েশ্বর' বা 'গৌড়পতি' উপাধিকে বেশি প্রাধান্য দিত। কিন্তু বাঙলার নিজস্ব সত্তা তখনও গৌড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়নি। গৌড়বাসীকে আনন্দ দানের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন দত্ত কাব্য রচনা করেন-

> ...রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে অনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।[১০]

গৌড়জন বলতে সমগ্র বাঙলাদেশের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। বঙ্গ ও তার সংলগ্ন স্বতন্ত্র জনপদগুলি হল– 'রাঢ়া', 'পৌন্ড্র', 'তাম্রলিপ্ত' ও 'দন্ডভুক্তি' রাজারা নিজদের খেয়াল, খুশি ও অর্থের অহঙ্কারে একে অপরের কাছাকাছি আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত আপন সত্তা বিসর্জন দিয়ে 'গৌড়' বা 'বঙ্গ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে-

> মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই, বাঙলাদেশের তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাঙলাদেশের সমার্থক হয়ে উঠে- পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ,....রাঢ়ের মতন প্রচীন জনপদ যেন ক্রমশ গৌড় নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। ... পাল এবং সেন রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হওয়া। .... কিন্তু গৌড় নাম লইয়া বাঙলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। গৌড় নামের ললাটে সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটিল বঙ্গ নামের।[১১]

উপরিউক্ত দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে সেন যুগে 'বাঙলা' নামক একটি সুনির্দিষ্ট দেশবাচক নামের পরিচয় পাওয়া গেল, যার অধিগত বহু জনপদ গোষ্ঠী। এই জনপদ

গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতির বিনিময় ও পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বাঙালা ভাষাভাষী এক বাঙালি জাতি গড়ে উঠল।

ব্রিটিশ সরকার **১৯১২** সালে বাংলা থেকে আলাদা করে বিহার ও উড়িষ্যাকে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করেছিল। ফলস্বরূপ মানভূম, সিংভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ ও পালামৌ- এই পাঁচটি জেলা নিয়ে ছোটনাগপুর বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক সময় বাঙালীর সংস্কৃতি ও ভাষার পীঠস্থানরূপে যে বঙ্গদেশ গড়ে উঠেছিল, তা আদি যুগ থেকে ঝাড়খন্ড বৃহত্তর সীমানার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থ ও বহু লিপিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- কৃষ্ণদাস কবিরাজ'র *চৈতন্য-চরিতামৃত* (আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) গ্রন্থে দেখা যায় মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাত্রাকালে ঝাড়খণ্ড বনজঙ্গলের অতি দুর্গম পথকে ব্যবহার করেছিলেন-

> প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
> কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা
> ....
> ঝারিখন্ডস্থাবর জঙ্গল আছে যত।
> কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।
> সেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
> সেই সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি।।
> মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ডে।
> ঝিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষন্ড।।[১২]

প্রাচীনকালে ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক সীমা ও ঝাড়খন্ড (ঝারিখণ্ড), রাঢ়খন্ড (রাঢ়িখণ্ড) একই শব্দের সমার্থক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের একটা ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ করা যায় -

> সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, রাঁচি, মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, থেকে দক্ষিণে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত, পূর্বদিকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বনবিষ্ণুপুর অঞ্চল এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ। ওদিকে বীরভূমের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে আরণ্যক পরিবেশ, যার নাম ঝাড়খণ্ড... ।[১৩]

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে একেবারে ছোটনাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা হল ঝাড়খণ্ড। এই বৃহত্তর অরণ্য প্রধান অঞ্চলকে নীহাররঞ্জন রায় পুরাভূমি (Old alluvium) বলেছেন। এই পুরাভূমি হল রাঢ়ভূমি বা ঝাড়ভূমি। অবশ্য তা বর্তমান ঝাড়খন্ড নয়।

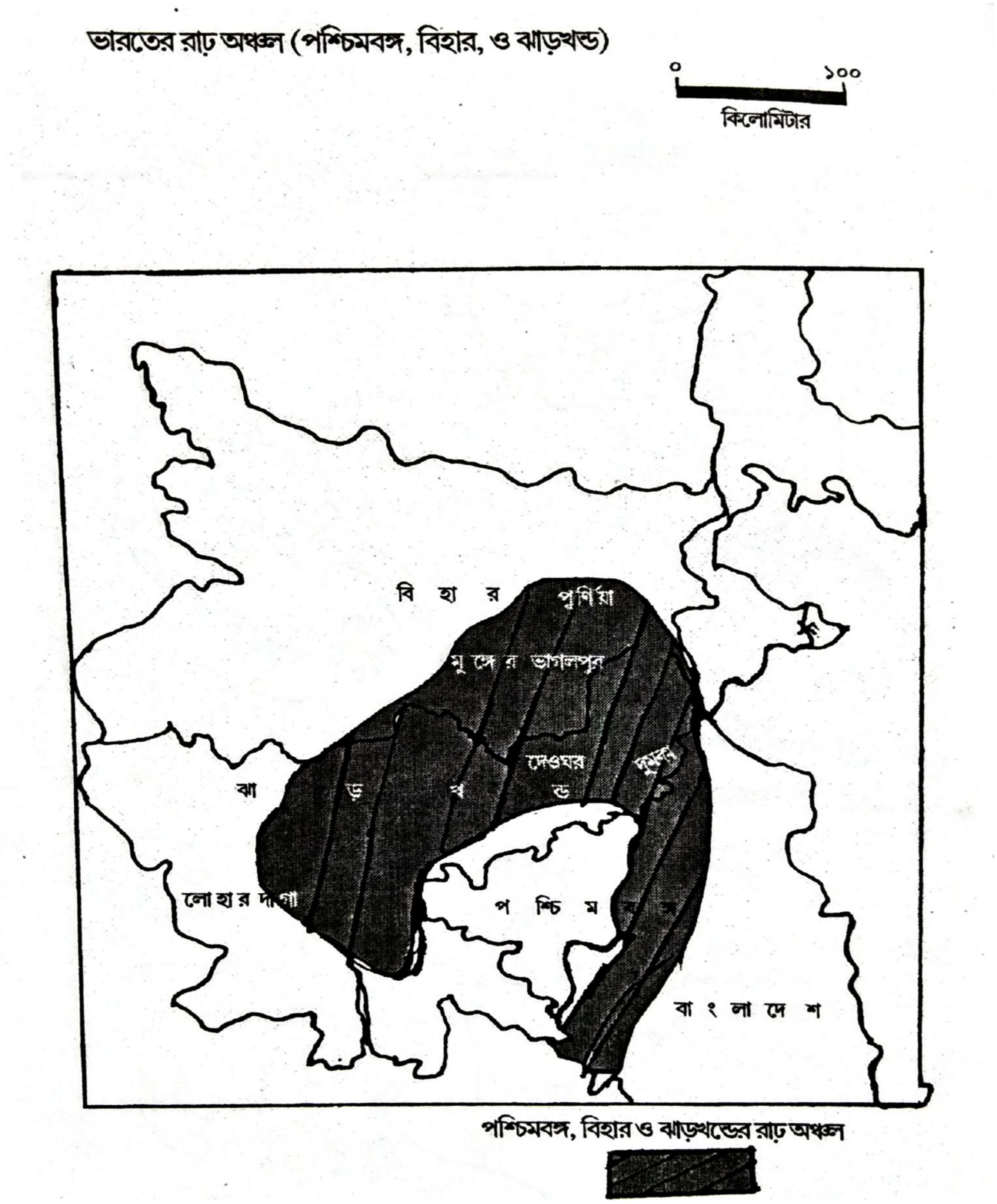

ভারতের রাঢ় অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড) মানচিত্র- ৪

বর্তমানে রাঢ়ভূমি বলতে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ও পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কিছু অংশকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি হল দক্ষিণাংশের মধ্যভাগ। ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল।

রাঢ় বাংলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তথা ভৌগোলিক বিবর্তনের কালগত রেখাচিত্র (১৭৬৫)

ভারতবর্ষ (১৭৬৫)

বাংলা প্রেসিডেন্সী (অবিভক্ত বাংলা) (১৮২৬-১৮৭৪) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম | মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী | বোম্বাই প্রেসিডেন্সী

বঙ্গভঙ্গের প্রথম ধাপ (১৮৭৪)

বাংলা প্রেসিডেন্সী (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) | আসাম(যুক্ত হল শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া)

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৩-১৯০৫)

বাংলা (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, রাজধানী – কলকাতা) | 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (যুক্ত হল আসাম, ঢাকা রাজধানী রাজশাহী, চট্টগ্রাম

১৯১১

'বাংলা' (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা) | বাংলা দুই অংশ অর্থাৎ (পঃ ও পূঃ) পুনরায় যুক্ত হল, যার রাজধানী হল কলকাতা | 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (আসাম, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম)

১৯১২

'বাংলা' (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) | বিহার (মানভূমি, সিংভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ, পালামৌ-এই ৫টি জেলা নিয়ে ছোটনাগপুর বিহারে অন্তর্ভুক্ত হয়) | উড়িষ্যা

ভারতবর্ষ

বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ

বাংলা (বাংলা প্রেসিডেন্সী/বাংলা/ পশ্চিমবঙ্গ)

বিহার

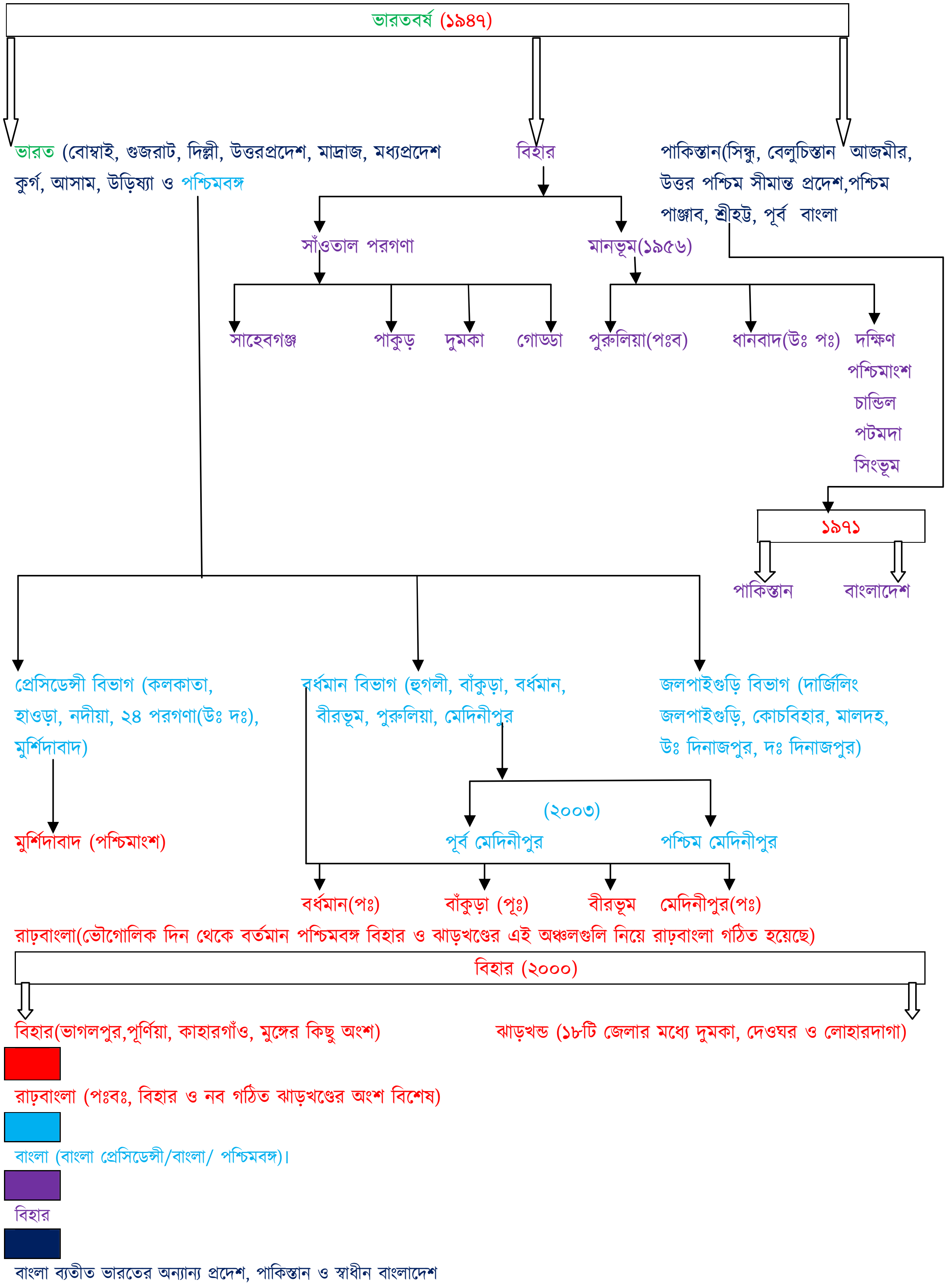
ভারতবর্ষ (১৯৪৭)
ভারত (বোম্বাই, গুজরাট, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ কুর্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ
বিহার
পাকিস্তান(সিন্ধু, বেলুচিস্তান আজমীর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ,পশ্চিম পাঞ্জাব, শ্রীহট্ট, পূর্ব বাংলা
সাঁওতাল পরগণা
মানভূম(১৯৫৬)
সাহেবগঞ্জ
পাকুড়
দুমকা
গোড্ডা
পুরুলিয়া(পঃব)
ধানবাদ(উঃ পঃ)
দক্ষিণ পশ্চিমাংশ চান্ডিল পটমদা সিংভূম
১৯৭১
পাকিস্তান
বাংলাদেশ
প্রেসিডেন্সী বিভাগ (কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া, ২৪ পরগণা(উঃ দঃ), মুর্শিদাবাদ)
বর্ধমান বিভাগ (হুগলী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর
জলপাইগুড়ি বিভাগ (দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উঃ দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর)
মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমাংশ)
(২০০৩)
পূর্ব মেদিনীপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর
বর্ধমান(পঃ)
বাঁকুড়া (পূঃ)
বীরভূম
মেদিনীপুর(পঃ)
রাঢ়বাংলা(ভৌগোলিক দিন থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চলগুলি নিয়ে রাঢ়বাংলা গঠিত হয়েছে)
বিহার (২০০০)
বিহার(ভাগলপুর,পূর্ণিয়া, কাহারগাঁও, মুঙ্গের কিছু অংশ)
ঝাড়খন্ড (১৮টি জেলার মধ্যে দুমকা, দেওঘর ও লোহারদাগা)
রাঢ়বাংলা (পঃবঃ, বিহার ও নব গঠিত ঝাড়খণ্ডের অংশ বিশেষ)
বাংলা (বাংলা প্রেসিডেন্সী/বাংলা/ পশ্চিমবঙ্গ)।
বিহার
বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ

পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি বিভাগের (প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি) মধ্যে বর্ধমান বিভাগের বেশীর ভাগ জেলাগুলি নিয়ে রাঢ়বাংলা বা রাঢ়ভূমি গড়ে উঠেছে। সেগুলি হল- পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের প্রায় সমগ্রাংশ। এছাড়াও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন ও নবগঠিত বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের কিছু অংশ এই রাঢ়ভূমির অন্তর্গত। বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, লোহারদাগা, কাহালগাঁও, মুঙ্গেরের কিছু অংশ এবং ঝাড়খণ্ডের দুমকা, দেওঘর ও মানভূম প্রভৃতি জেলাগুলি নিয়ে বর্তমান রাঢ়ভূমি গড়ে উঠেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির নিম্নাংশই রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়ভূমির আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ কি.মি। নবম-দশম শতকে এই রাঢ় বাংলাকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল- উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়, প্রাচীনকালে যা যথাক্রমে বজ্জভূমি ও সুহ্মভূমি নামে পরিচিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীনকালে দুই রাঢ়ের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন-

> বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভূমিসহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।[১৪]

সুকুমার সেনের মতে, 'রাঢ়' শব্দটির দুটি অর্থ- রক্ত মৃত্তিকার দেশ এবং সে দেশের অধিবাসী, অপরটি হল দুধর্ষ জাতি। রাঢ়ের ক্ষেত্রে দুই অর্থই সমান গুরুত্ব রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার পাথুরে লাল মাটির ভূখন্ডকে রাঢ় নামে অভিহিত করা হত। আবার এই সিদ্ধান্তেও আসা যায় যে, এই অঞ্চলের দুধর্ষ জাতি আদি-অস্ত্রাল কিংবা তাদের বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত গোষ্ঠীর লোকেরা রাজ্যে ও রাজত্ব কায়েম করার স্বার্থে প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, কোনোদিন মাটিতে রক্তের দাগ শুকোবার সময় পেত না। তাই যুদ্ধ পারদর্শী অধিবাসীদের এই ভূখন্ডকে রক্ত মৃত্তিকার দেশ 'রাঢ়' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে রাঢ় অঞ্চলের প্রসঙ্গ থাকলেও তাতে সুস্পষ্টভাবে সীমানার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পন্ডিত, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, প্রাচীন রাঢ়দেশ সাধারণত গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন রাঢ়ের সীমানা হল- উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, পূর্বে হাওড়া কলকাতা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুকুমার সেনের মতে, একদা রাঢ়দেশ বলতে গঙ্গার ওপারের কিছু অংশ এবং এপারে দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা বল্লুকা (বেহুলা) পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে রাঢ়ী উপভাষার দেশ বলতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলী প্রভৃতি জেলা গুলোকে বোঝায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি পর্যন্ত বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ

রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অতএব দেশ বা রাষ্ট্রের সীমা কোনো চিরন্তন সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে কিংবা প্রশাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভে (কখনো প্রাকৃতিক কারণে) রাষ্ট্রের সীমা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমারেখা যে সুনির্দিষ্ট আছে তা বলা যায় না। আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্ণধারদের ক্ষমতা ও কর্মনীতির উপর রাষ্ট্রের সংকোচন প্রসারণ (উত্থান পতন) নির্ভর করে। এক কথায় বলতে গেলে রাঢ়ের বিশাল আয়তন। উত্তরে রয়েছে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, পূর্ব দিকে বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব মেদিনীপুর বাদে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সংলগ্ন কিছু অংশ নিয়ে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশাল ভূখন্ডের অধিবাসীদের তাদের আঞ্চলিকগত আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিগত নানারকম পার্থক্য থাকার জন্য এই রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. পূর্বরাঢ় ২. পশ্চিমরাঢ়। আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে পশ্চিমরাঢ়ের আয়তন বড়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম হল পশ্চিমরাঢ়। বাকি অংশ পূর্বরাঢ়।

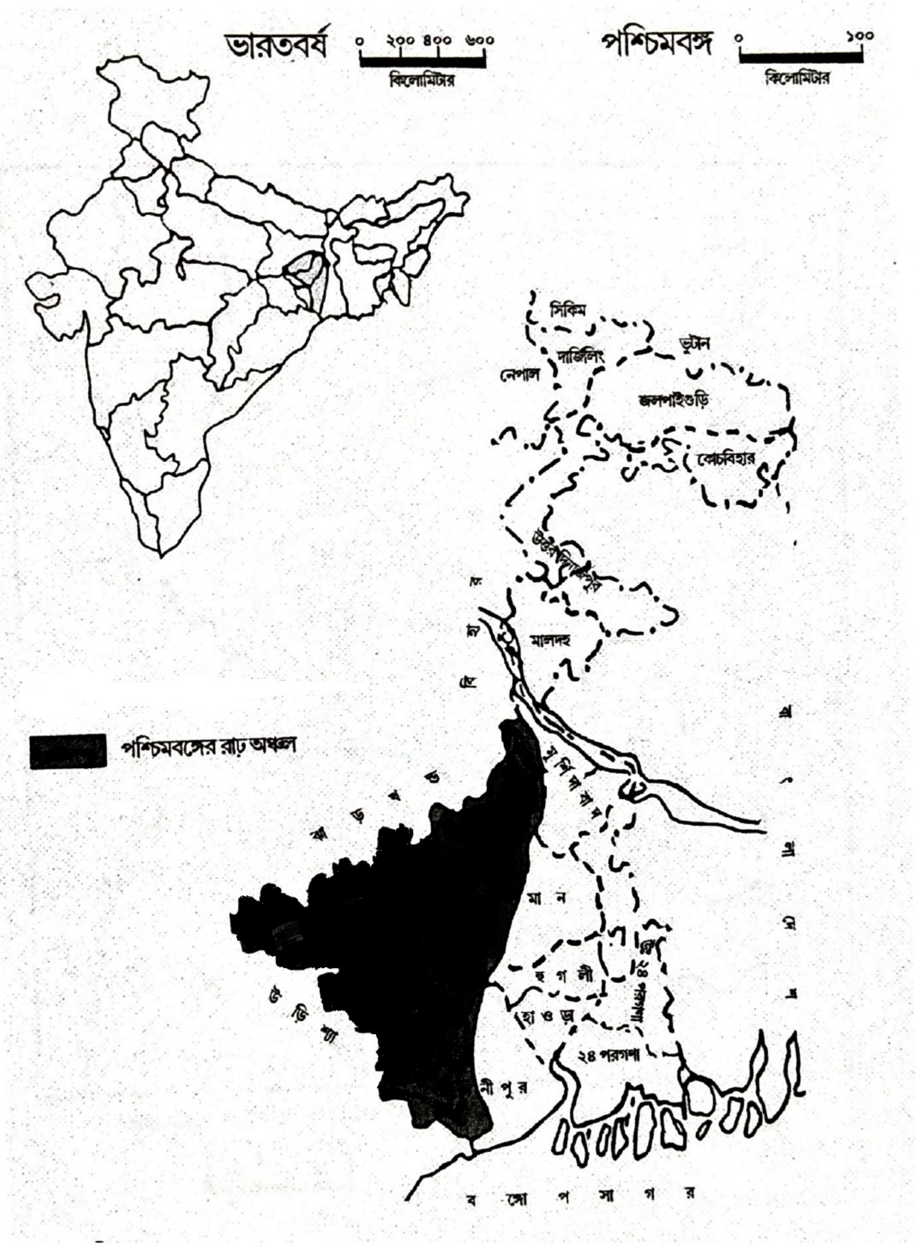

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল মানচিত্র-৬

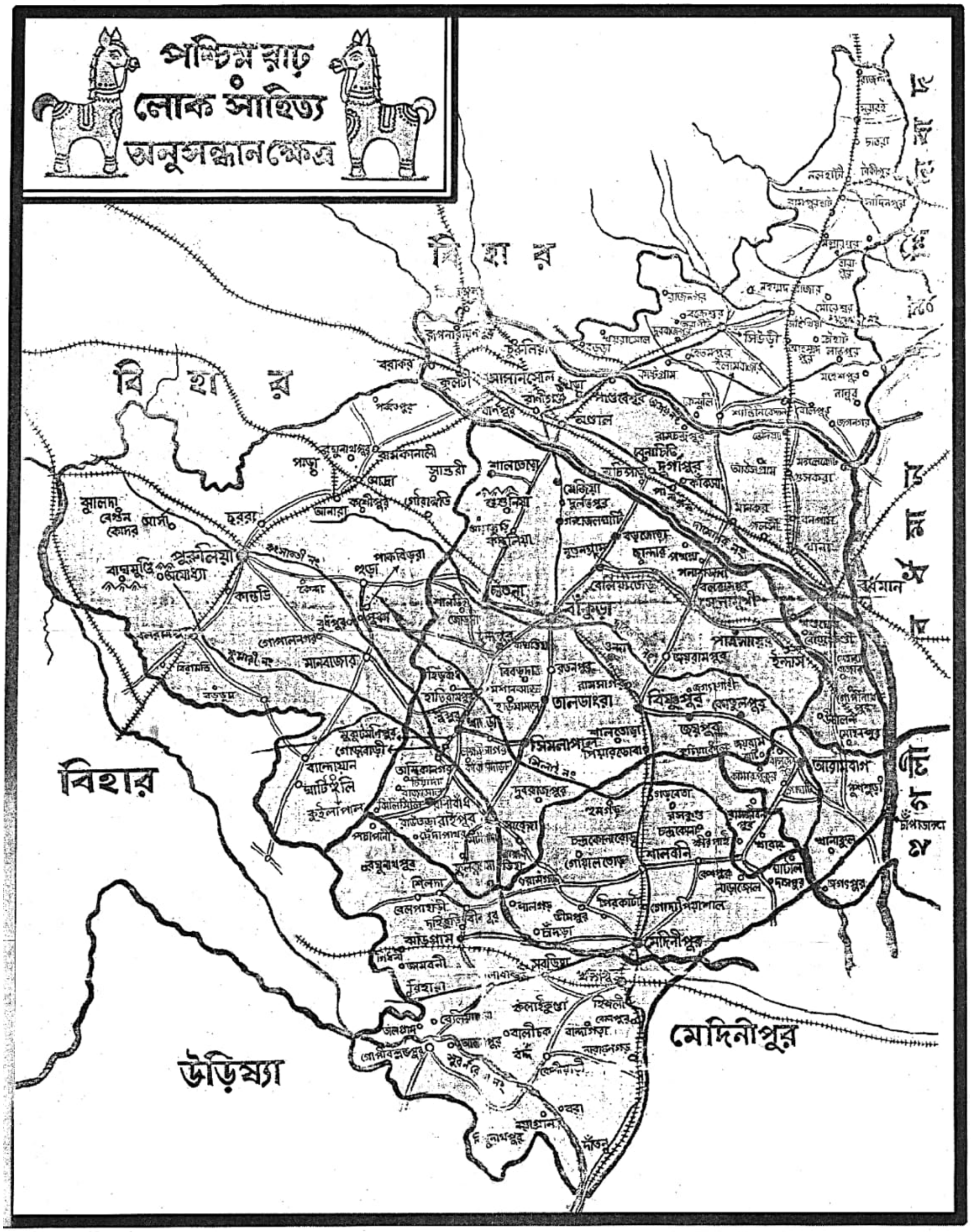

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল মানচিত্র-৭

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে অনার্যরা বসবাস করছিল। অনার্যরা ছিল আদি-অস্ত্রাল(প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) জাতি। এই আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠী পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। এদের ভাষা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। আজও রাঢ়ভূমির আনাচে কানাচে এমন বহু সংখ্যক ভাষা প্রচলিত, যে ভাষাগুলির মূল উৎস অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষরা ভারতের আদি-অধিবাসী। এদের উত্তর পুরুষরা হল সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, খেড়িয়া, লোধা, হো, ভূমিজ, বিরহড়, কোড়া, মাহলি ও অসুর প্রভৃতি জনজাতি। এই উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা পশ্চিমরাঢ়ের আদি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পূর্বে সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমরাঢ়ে অনার্য জাতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও গড়ে তুলেছিল।

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয়:

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলটি ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত হওয়ায় ভূ-প্রকৃতি তরঙ্গায়িত। সমগ্র অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে এবং যার উপরিভাগ ল্যাটেরাইট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত। সমতলভূমি নেই বললেই চলে। এখানকার পাথুরে মাটির রঙ লাল, রুক্ষ ও অনুর্বর ঢেউ খেলানো উঁচু-নিচু ভূমিতলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে অনুচ্চ শৈলশ্রেণি ছড়িয়ে রয়েছে। ভূখন্ডের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমি প্রস্তরময়। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোটো বড় টিলা বা ডুংরি ছড়িয়ে রয়েছে। এই ছোটো বড় টিলা বা ডুংরিগুলো শাল, পিয়ালের জঙ্গল, মহুয়া, আম, জাম, বাবলা, শিরীষ, ঝাঁটি কুটুসের ঝোপঝাড় ও আগাছার সবুজ আস্তারণে ঢাকা রয়েছে। এক সময় পশ্চিমরাঢ়ের সমগ্র ভূখন্ড জঙ্গলময় ছিল। পশ্চিমরাঢ়ের অধিকাংশ নদ-নদীগুলির প্রধান উৎসস্থল হল ছোটনাগপুর মালভূমি। এছাড়াও ডুংরি-দাড়াং পাহাড় ভেদ করে অনেক ছোট ছোট নদীর উৎপত্তি ঘটেছে। এই পশ্চিমরাঢ়ের প্রস্তরময় কঠিন শিলাস্তরের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা নদ-নদীগুলো যেন প্রকৃতির অযাতিত দান। এখাকার বেশিরভাগ নদ-নদী বর্ষা ও ঝর্ণার জলে পুষ্ট। এখানকার উল্লেখযোগ্য নদ-নদীগুলি হল- ময়ূরাক্ষী, অজয়, বক্রেশ্বর, কোপাই, দামদর, দ্বারকেশ্বর, জয়পণ্ডা, আরকষা, কংসাবতী, কুমারী, সুবর্ণেরেখা, শিলাই, গন্ধেশ্বরী ও দুয়ারসিনী প্রভৃতি।

রাঢ়ের পশ্চিমাংশে মালভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। মে মাসে ৪৫ সেন্টিগ্রেড এবং ডিসেম্বর- জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা ৩-৪ সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০-১২৫ সেন্টিমিটার। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমাংশে তাপমাত্রার চরমতার জন্য যে গরম বাতাস প্রবাহিত হয় তা ‘লু’ নামে পরিচিত। বিকালের সময় ‘কালবৈশাখী’ ঝড় হয়।

পশ্চিমরাঢ়ের অর্থনৈতিক পরিবেশ:

জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি গুণাগুণের উপর কৃষিকাজ নির্ভর করে। পশ্চিমরাঢ়ের জমি অনুর্বর এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। তাই এই অঞ্চলে বিশেষ করে দানা জাতীয় শস্য ও তৈলবীজ বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়। দানা জাতীয় শস্যর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- গম, সরিষা, তিল, তিসি ইত্যাদি। কৃষিকাজে অনুপযুক্ত হওয়ার কারণে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর একটি অন্যতম উপজীবিকা হল পশুপালন। কিছু কিছু অন্ত্যজ শ্রেণির আদিবাসীরা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। রাঢ় ভূমির পশ্চিমাংশে উষ্ণতা বেশি এবং ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর হওয়ায় প্রধানত আবহাওয়ার রুক্ষতা সহ্যকারী উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন- বাবলা, খয়ের, অর্জুন, মহুয়া, পলাশ, শিমূল প্রভৃতি। গাছগুলি থেকে কাঠ, খয়ের, বহেরা, হরিতকী ও আমলকী জাতীয় ফল, প্রভৃতি বনজ সম্পদ আহরণের দ্বারা আদিবাসী সম্প্রদায়রা জীবিকা নির্বাহ করে।

পশ্চিমরাঢ়ের আবহ-পরিবেশ মানুষ বসবাসের পক্ষে অকরুণ। ভূ-প্রকৃতি যেমন শুষ্ক রুক্ষ তেমনই আবহাওয়া বড় বেশি রুক্ষ ও কঠিন। কেবলমাত্র বর্ষা এবং শীতকাল বাদ দিয়ে বাকি সব সময় গরম বাতাস বইতে থাকে। গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে বন-বাদাড় মাইলের পর মাইল জ্বলতে থাকে। এখানকার মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করতে হয়। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ ভূমি অসমতল ও কঙ্করময় বলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। কৃষিকাজের জন্য তাদেরকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তবুও তারা এ মাটির বুক চিরে ফসল ফলানোর আশায় প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। চাষ আবাদের জন্য তাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আজও ডাহি, ডুংরি ও জঙ্গলে ঘেরা বন্ধুর ভূ-ভাগ অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষরা বসবাস করছে। দরিদ্রতা তাদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমানে ছোট-বড়ো বেশ কয়েকটি জলাধার নির্মিত হওয়ায় সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে যেমন নদীর বন্যার তান্ডব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, ঠিক তেমনই অন্যদিকে কিছু জায়গায় চাষ করার ব্যাপক সুযোগ লাভ করেছে।

পশ্চিমরাঢ় বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাচীন আবাসস্থল ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে এদেরকে আদিবাসী বলা হয়। সংবিধান সূত্রে আদিবাসী বলতে তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীদেরকে বোঝায়। এদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্র রয়েছে, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের আঙিনাতে, ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন সংস্কৃতিতে এক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর *আরণ্যক* উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ করেছেন–

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বাহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।[১৫]

আরণ্যক উপন্যাসের মানুষ আজ বিশ্বায়নের প্রভাবে খুব বেশি দূরে নেই। বর্তমানে তারা অন্যান্য স্বাধীন নাগরিকদের মতো জীবনযাপন করছে। কিন্তু দূরত্বের দিকটা ঘুচলেও তাদেরকে আমরা কোনোদিন আপন করে নিতে পারিনি। ভারতবর্ষে আর্য আগমনের বহুকাল পূর্বে থেকে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে। আর্যদের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়ায় তারা সভ্যতার অগ্রগতির পথে পিছিয়ে পড়েছে। আর্যরাও তাদেরকে আভিজাত্য সুলভ সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের সমাজে তারা এক প্রকার ব্রাত্য। তাই আদিবাসীদের বাসভূমি ছিল নগরের বাইরে, আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব আদিবাসীরা সমপ্রকৃতির নয়।

আদিবাসী কথাটির অর্থ 'আদিম যে বাসিন্দা'। আদিবাসী বলতে সাধারণত ভারতবর্ষে মানব সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে জাতি বিরাজমান সেই জাতি আদিবাসী নামে পরিচিত। সাধারণত যাদেরকে আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা সকলে আদিযুগ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করে। কারণ আদিযুগের মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে কিংবা খাদ্যের সন্ধানে তারা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। আবার কখনো নানান প্রকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে হত। আদিকাল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই জায়গায় বসবাস করা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে সমাজে আদিবাসী বলতে সেই সব জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজস্ব জীবন ধারণের মাধ্যমে প্রাচীন পদ্ধতিকে অনেকটা অপরিবর্তিত রেখেছে। এর ফলে বিবর্তমান সমাজ জীবনের চলার পথে তারা পিছিয়ে রয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এরা আদিবাসী। আদিবাসী শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়- এটির ব্যবহার উপজাতি, জনগোষ্ঠী, কিংবা ইংরাজি শব্দ 'Tribe' অর্থে। ভারতবর্ষের সংবিধানে এদের তপশিলী উপজাতি বা সিডিউল্ড ট্রাইব নামে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। Joshep Troisi আদিবাসী সম্পর্কে বলেছেন-

> Since pre-historic times, India has been the homeland of a large number of ethnic groups and cultures. These communities, believed to be the earliest inhabitants of the country, are known by various names, the most extensively known term being 'Adivasi.[১৬]

উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। আদিবাসী বা 'tribe' নিয়ে অনেক মতপার্থক্য দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে ইংরাজি 'tribe' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আদিবাসী বোঝাতে 'উপজাতি', 'আদিমজাতি', 'খন্ডজাতি', 'গিরিজন' ও 'জনজাতি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ

নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। যেহেতু তারা সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করে আসছে, তাই আদিবাসী বলাই যথার্থ হবে। ভারতবর্ষের সমাজজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসীরা আর্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে তাদের উত্থান পতনের কাহিনি মুখ্য বিষয় ছিল, আদিবাসীরা যে এদেশের বাসিন্দা তা তারা স্বীকার করেনি। কিন্তু আর্যরা তাদের গুরুত্ব না দিলেও এইসব জনজাতি যে ভারতের আদিম আধিবাসী নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে পারা যায়। আর্য আগমনের বহুকাল পূর্ব থেকে তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। নিম্নে আদিবাসী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি হল-

সময়	জনগোষ্ঠী (আদিবাসী) চিহ্নায়ন
১৮৭২ খ্রি.	আদিবাসী অধিবাসী (Aboriginal).
১৮৯১ খ্রি.	জঙ্গলের উপজাতি বা বনবাসী (Forest Tribes).
১৯০১ খ্রি.	জড়োপাসক (Animists).
১৯১১ খ্রি.	উপজাতি ধর্মের মানুষ (Tribal Animists or People Following Tribal Religion).
১৯২১ খ্রি.	পাহাড়ি ও জঙ্গলের আদিবাসী (Hill and Forest Tribe).
১৯৩১ খ্রি.	আদিম জনজাতি (Primitive Tribe).
১৯৩৫ খ্রি.	পশ্চাৎপদ জনজাতি।
১৯৪১ খ্রি.	আদিবাসী (Tribes).
১৯৫১, ১৯৬১,১৯৭১খ্রি.	তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribes).

ছক-১

ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে বসবাসকারী আদিম আদিবাসীদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আদিবাসীরা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। আদিবাসীদের দৈহিক গঠন, ভাষা, পোশাক ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও ভিন্ন প্রকৃতির হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত কিছু মিল থাকলেও পার্থক্যর ভাগটা বেশি থাকে।

ভারতের আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়:

নৃতাত্ত্বিকরা মানবদেহের যে সব বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেন। সেগুলি হল-

১। মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ।

২। গায়ের রঙ।

৩। চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য।

৪। দেহের দীর্ঘতা।

৫। মাথার আকার।

৬। মুখের গঠন।

৭। নাকের গঠন।

৮। শৌণিত বর্গ বা (Blood Group)

ভারতের আদিবাসীদের প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। দৈহিক গঠন ও মুখাকৃতি অনুযায়ী।

২। ভাষা অনুযায়ী।

১। দৈহিক গঠন ও মুখাকৃতি অনুযায়ী:

ভারতবর্ষ বিরাজমান আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক দৃষ্ঠিভঙ্গিতে নিরীক্ষণ করলে তারা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

ক. নেগ্রিটো/নিগ্রোবটু (Negroid):

নৃবিজ্ঞানীদের মতে নেগ্রিটো মানুষরা ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। এই বংশের মানুষেরা সারা পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকা, আমেরিকা, নিউগিনি, ফিলিপাইন, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবং মালয় উপদ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলে নেগ্রিটোরা ছড়িয়ে আছে। এদের দৈহিক গড়ন হল খর্বকার, দেহের রঙ শ্যামবর্ণ, ঘন কালো এবং কোঁকড়ানো চুল, উলটানো পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাক, মাথার আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় লম্বা, গোল ও চওড়া। দক্ষিণ ভারতের কাদার ইরুলার ও আন্দামানের জারোয়ারা এই সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোকেরা অন্যান্য গোষ্ঠীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদেরকে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে নেগ্রিটোদের নিজস্ব সত্তার প্রমাণ পাওয়া খুবই দুষ্কর।

খ. প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto Australoid):

প্রোটো-অস্ট্রলয়েডরা দেখতে অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মতো হয়। শুধুমাত্র দৈহিক গড়ন নয় এদের রক্তেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড আদিবাসীদের দৈহিক বিবরণ হল, উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া, চুল ঢেউ খেলানো এবং চুলের রঙ তামাটে। নৃ-তত্ত্বের ভাষায় এদেরকে প্রাক্-দ্রাবিড়, আদি-অস্ট্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রেলিয় বলা হয়। ভারতের মধ্যভাগ থেকে পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতেও এদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে ‘সাঁওতাল’, ‘লোধা’, ‘মাহালি’, ‘মুণ্ডা’, ‘শবর’, ‘খাড়িয়া’, ‘হো’, ‘ওঁরাও’, ‘বিরহড়’, ‘ভিল’, ‘কোল’, ‘চেঞ্চু’ ও ‘কুরুম্বা’ ভূমিজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

গ. দ্রাবিড় (Mediterranean):

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় জাতি সমূহের অনেকটা মিল রয়েছে তাই এদেরকে ভূমধ্যসাগরীয় বা মেডিটেরিনিয়ান বলা হয়। নৃ-তাত্ত্বিকদের মতে দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। দ্রাবিড়দের দৈহিক আকৃতি মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও গায়ের রঙ কালো। আদি মিশরীয়দের সঙ্গে এই জাতির অনেকটা মিল রয়েছে।

ঘ. মঙ্গোলীয় (Mongoloid):

মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষদের দৈহিক গঠন হল- উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রঙ হলুদ, চ্যাপ্টা মুখমন্ডল, এবং মাথার চুল সোজা, দেহে লোম থাকে না। এরা মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার তিব্বত ও সাইবেরিয়া হয়ে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে প্রবশ করে। এই শ্রেণির মানুষ হল– 'মণিপুরী', 'তিব্বতী', 'লেপ্চা', 'বোড়ো', 'গুরুং', 'গারো', 'টোটো' 'ডুকপা', 'মেচ' ও 'রাভা' ইত্যাদি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

নৃ-তত্ত্বকে দুভাগে ভাগ করা যায়- শারীরিক নৃ-তত্ত্ব (Physical Anthropology) এবং সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্ব(Cultural Anthropology)। উপরে উল্লিখিত আদিবাসী সমন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা মূলত শারীরিক নৃ-তত্ত্বের বিষয়। যা একান্তই নৃ-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কারণ, আলোচনার প্রসঙ্গে এসেছে নাকের গড়ন, মুখের গড়ন, মাথার আকৃতি, চুলের রঙ ইত্যাদি। যার সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগসূত্র নেই। আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির নৃতত্ত্বের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারি তা হল, সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্ব। নৃ-তত্ত্ব বলতে বোঝায় মানবজীবন সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা। মানুষের সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনার জন্য 'সংস্কৃতি' বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্ব মানে কোনো একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের অতীতে ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকরা গোষ্ঠীজীবনের প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য, বিশ্বাস-সংস্কার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের জীবনাচরণকে ফুটিয়ে তোলায় একমাত্র লক্ষ্য। তাই অনেকে লোকসংস্কৃতিকে, সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বের অন্যতম শাখা বলে মনে করেছেন।

২. ভাষা অনুযায়ী:

ভাষা গোষ্ঠীর ভিত্তি অনুসারে আদিবাসীদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক. অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী:

এই ভাষার মানুষ মূলত হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারত, ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা মূলত 'অস্ট্রিক' ভাষা নামে পরিচিত। ভারতে বর্তমানে যে সব ভাষা বংশের তালিকা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অস্ট্রিক ভাষা বংশকে প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছেন 'নিষাদ' ভাষাবংশ। ভারতে এই ভাষার প্রধান ভাষা হল মুণ্ডারী। মুণ্ডারী ভাষা থেকেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, মাহালি প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়-

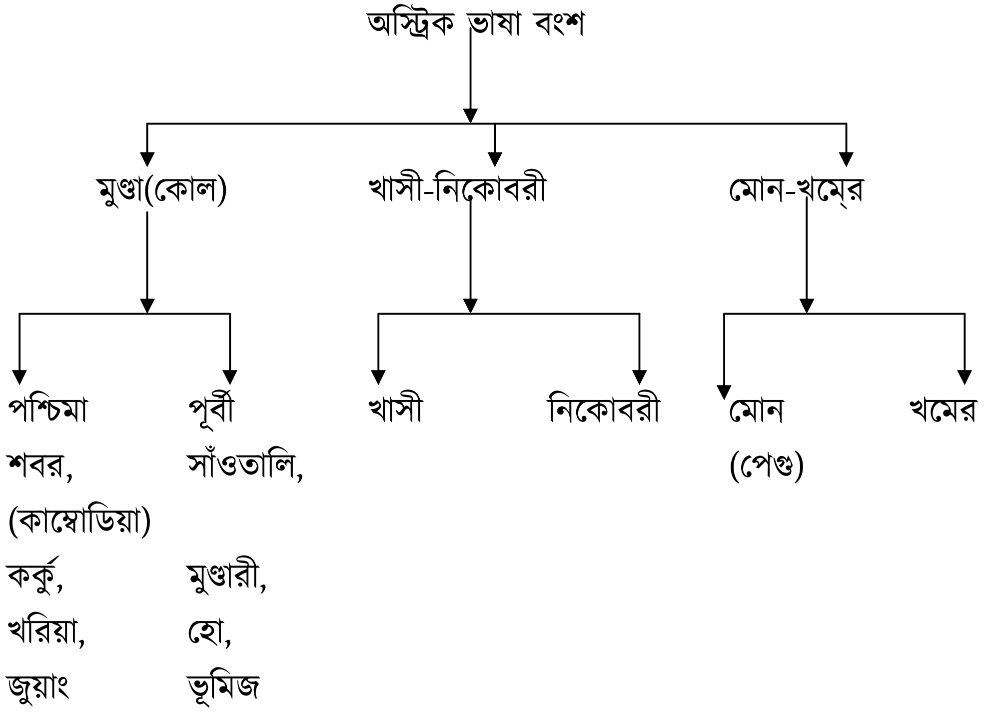

ছক-২, অস্ট্রিক ভাষা বংশ

খ. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী:

দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ মূলত দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতে দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এরা হলেন দ্রামিড় বা দ্রাবিড় ভাষা বংশজাত। এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের উদাহারণ - ইরুলা, টোডো, ওঁরাও ও খোন্দ প্রভৃতি।

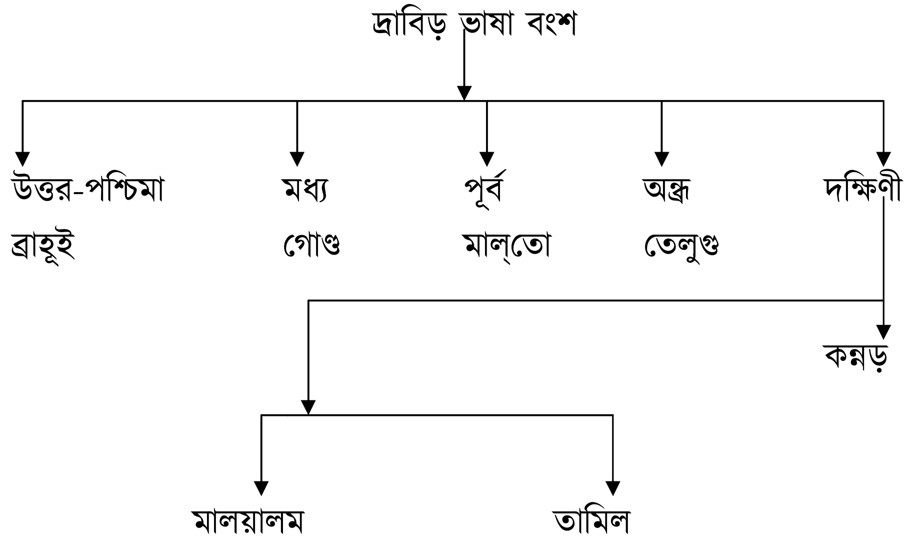

ছক-৩, দ্রাবিড় ভাষা বংশ

গ. তিব্বতী-চিনা-ভাষাগোষ্ঠী:

এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে, এর প্রধান দুটি শাখা হল- তিব্বতী বার্মা ও সাইয়ামীজ-চিনা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাবংশকে 'কিরাত' বলেছেন। তিব্বতী বার্মার উদাহারণ হল- লেপচা, টোটো, মিরি, গারো ইত্যাদি। সাইয়ামীজ চিনার উদাহারণ হল- লুসাই, থাড ইত্যাদি।

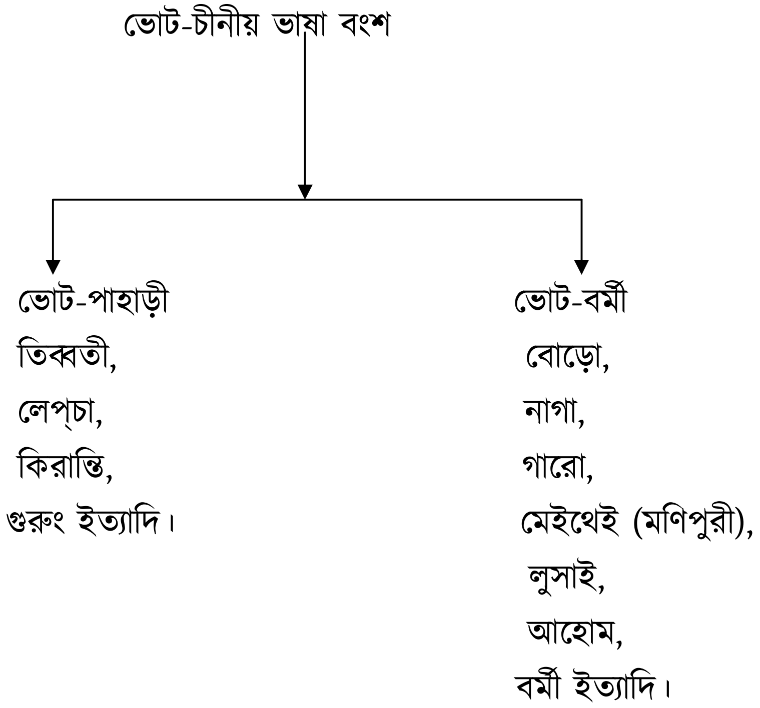

ছক-৪, ভোট-চীনীয় ভাষা বংশ

ঘ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী:

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজে নেই।

উপরে উল্লিখিত ভাষাগোষ্ঠী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি তালিকা হল-

ক. অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী- 'সাঁওতাল', 'ভূমিজ', 'লোধা', 'শবর', 'বিরহড়', 'কোড়া', 'মুণ্ডা', 'হো', 'মাহালি', 'অসুর', 'কিসান', 'করওয়া', 'করমালি', 'চেরো' ও 'নাগেশিয়া' প্রভৃতি।

খ. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী- 'ওঁরাও', 'মালপাহাড়িয়া', 'শাওরিয়া পাহাড়িয়া', 'গোণ্ড', 'খোন্দ', প্রভৃতি।

গ. তিব্বতী-চিনা-ভাষাগোষ্ঠী- 'গারো', 'চাকমা', 'টোটো', 'ডুকপা', 'শেরপা', 'মেচ', 'রাভা', 'লেপচা', 'মগ', 'হাজং' ও 'ম্রু' প্রভৃতি।

ঘ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজে নেই।

নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে উল্লিখিত আদিবাসী জনজীবনের সমাজ ও সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়

সাঁওতাল জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি:

'সাঁওতাল' কথাটির উৎপত্তি নিয়ে গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। যেমন H.H Risley তাঁর *Tribes And Castes of Bengal* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড বাংলার আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন-

> A large Dravidian tribe classed on linguistic grounds as kolarian, which is found in western Bengal, northern Orissa, Bhagalpur and the santal parganas.[১৭]

আবার J.Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Among The santal* গ্রন্থে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন –

> The name santal, according to skrefsrud(1968), is a corruption of saontar. This was adopted by the santals when they lived in the area around saont now identified with silda pargana in Midnapore district of West Bengal. W.B oldham was of the opinion that 'santal' is an abbreviation of 'samantawala'. According to this author 'samanta' is another name given to the country around saont. According to O Malley(1910:99) 'santal' is an English form adopted from Hindi which corresponds with the form "saontar" used by the Bengali speaking peoples.[১৮]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সাঁওতাল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সামন্তপাল' থেকে এসেছে। 'সামন্তপাল' শব্দটির অর্থ সামন্তভূমির 'সীমান্তরক্ষক'। মধ্যযুগের এই 'সামন্তপাল' শব্দটি 'সমান্তআল' থেকে সাওন্তালঃ ও পরে 'সাঁওতাল'-এ পরিণত হয়েছে। সামন্তভূমিতে শুধু সাঁওতালরা বসবাস করত না অন্যান্য জাতিরও বাসভূমি ছিল এবং তারাই কেবলমাত্র সাঁওতাল নামে পরিচিত হল কেন? ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সাঁওতালরা সীমান্তরক্ষক ছিল,

অন্যদিকে দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সাঁওতাল শব্দটি 'সাঁওতে' থেকে উৎপত্তি হতে পারে। 'সাঁওতে' শব্দটির সাঁওতালি ভাষায় অর্থ একত্র বা গোষ্ঠীবদ্ধ। সাঁওতালরা একত্র কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। তাই সাঁওতে থেকে সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি।

বাসস্থান:

ভারতে অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় 'সাঁওতাল' একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। সাঁওতালরা বনজঙ্গল ও নদীর কাছাকাছি এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বেশি পছন্দ করত। ভারতের পূর্বাঞ্চল বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় তাদের বাসভূমি। ভারতবর্ষের বাইরে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে কমবেশি তাদের বসতি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। নিজেদেরকে 'হড় হপন'(মানুষ) বলে দাবি করে। এদের বাসস্থান নিপুণভাবে সাজানো থাকে, মাটি দিয়ে মোটা দেওয়াল তৈরী করে ও বাড়ি ছাউনির জন্য খড়, খাপ্রা বা টালি ব্যবহার করে। মাটি দিয়ে মোটা দেওয়াল তৈরী করার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ভেঙ্গে না যায়। তাছাড়া ছোটনাগপুর মালভূমিতে প্রাচীনকাল থেকে হাতির উপদ্রব ছিল। হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেওয়ালগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বাড়ি পরিষ্কারের জন্য তারা মাটির বিভিন্ন রং ব্যবহার করত। বাড়ির দেওয়ালের উপরের অংশে খড়ি মাটি, এঁটেল মাটি ও দেওয়ালের নিচের দিকের অংশে লাল মাটি দেয়। বাড়ির দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের আলপনা বা দেওয়াল চিত্র তারা নির্মাণ করে। গ্রামের মধ্যে 'মাঝিথান' ও গ্রামের একপ্রান্তে 'জাহেরথান' দেখা যায়। বছরের বিভিন্ন সময় এই দুটি স্থানকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

গৃহস্থালি দ্রব্য:

গ্রামে বসবাসকারী সাঁওতালদের বাড়িতে বেশি আসবাবপত্র দেখা যায় না। বাড়ির আসবাবপত্র বা জিনিসের মধ্যে মাটির হাঁড়ি, কাঁসার থালা বাসন ব্যবহার করতে দেখা যায়। পানীয় জলের জন্য মাটির কলস ব্যবহার করে। মাটির ঘরের এককোণে ঢেঁকি থাকে, ঢেঁকির সাহায্য তারা ধান, গম, ছোলা ও ডাল ভাঙে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল না হওয়ায় তাদের জিনিসপত্রে বিশেষ প্রাচুর্য দেখা যায় না। কৃষিকাজ ও শিকারে ব্যবহৃত যাবতীয় সরঞ্জাম নিজেরা তৈরি করে।

পোশাক পরিচ্ছদ:

সাঁওতালদের পোশাক পরিচ্ছদে আড়ম্বর দেখা যায় না। প্রথমদিকে পুরুষ ও নারী উভয়েই তাঁতে বোনা কাপড়ের পোশাক পরত। পুরুষেরা ৪-৫ হাতা তাঁতে বোনা গামছা পরত। মেয়েরা দেহের আবরণের জন্য দু টুকরো কাপড়ের এক খন্ড কোমরে জড়াতো এবং আরেক

খন্ড কাপড় বুকের উপর দিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে রাখত, এটি ‘পাঞ্চি’ নামে পরিচিত। বর্তমানে ‘পাঞ্চি’র ব্যবহার হয় না। বর্তমানে পুরুষেরা প্যান্ট, শার্ট, ও নারীরা বিভিন্ন প্রকারের শাড়ি সায়া, ব্লাউজ ব্যবহার করে। শরীরকে সাজানোর জন্য কমবেশি অলঙ্কারের ব্যবহার করে। রুপোর অলঙ্কারের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। রূপোর অলঙ্কার গুলি হল বালা, বাজু, হাঁসুলি, কানের রিং ইত্যাদি ব্যবহার করে। এছাড়া তারা বনের নানা ধরনের ফুল দিয়েও সাজতে ভালোবাসে। এখনও তারা রূপচর্চায় দুটি সংস্কারকে মান্যতা দেয়– উলকি ও সিকা। বারো থেকে চোদ্দ বছরের মেয়েরা দেহে উলকি আর ছেলেরা হাতে চামড়া পুড়িয়ে সিকা তৈরী করে। শরীরে সিকা বা উলকি থাকলে পরজন্মের জীবন সুখী হবে নতুবা যমরাজ শাস্তি দেবে। বর্তমানে এইসব সংস্কার শিথিল হতে দেখা গেছে।

জীবিকা:

প্রাচীনকালে সাঁওতালদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপাখি শিকার করা। পরবর্তীকালে এরা কৃষিকাজকে প্রধান জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। কৃষিকাজে স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে জমিতে কাজ করে। সাঁওতাল সমাজে নারীরা নিজ হাতে লাঙল চালানোর ক্ষেত্রে ‘ট্যাবুর’ প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে কৃষিকাজ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ তাদের প্রধান জীবিকা। বন জঙ্গল থেকে কাঠ, মধু, শাল পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাজারে কিংবা হাটে বিক্রি করে। সাধারণত বনের বিভিন্ন ধরনের পাতা, শেকড়, ফল-মূল, কাঠ ও মধু প্রভৃতি আহরণ করে সংসার চালায়। হাটে যেমন বনজ দ্রব্যকে বিক্রি করে, ঠিক তেমনি তারা হাট থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে। কৃষিকে কেন্দ্র করে এদের মধ্যে আবার দুটি দল দেখা যায়। একদল যাদের নিজস্ব জমি আছে, আর একদল ভাগচাষি অন্যর জমিতে চাষ করে। সাঁওতালদের ওপর দলটি যাযাবরের মতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই প্রথাকে তাদের ভাষায় ‘নালহাঃ’ বা ‘নামাল’ নামে পরিচিত। বিশেষত ফসল কাটার সময় এই সাঁওতালদের দেখা যায়। এছাড়াও পাথর খাদান বা কয়লাখনি অঞ্চলে প্রচুর সাঁওতালরা কাজ করে। আজকাল অনেকে এদের মধ্যে সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উচ্চপদে নিজেদেরকে বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

গোত্র:

সাঁওতাল লোক-কথা অনুসারে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি (পিলচু বুড়ো-বুড়ি) প্রথমে সাত পুত্র ও সাত কন্যা জন্ম দিয়েছিল। বংশবিস্তারের প্রয়োজনে তাদের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয় এবং সেই দিন থেকে বিধান দেওয়া হয় যে সমগোত্রীয় আর বিবাহ হবে না। এই সাতটি পরিবার পরবর্তীকালে বর্ধিত হয়ে ১২টি গোত্রে পরিণত হয়। যথা- ১.কিস্কু ২.হাঁসদা ৩. মুর্মু ৪.

হেমব্রম ৫. মার্ডি বা মান্ডি ৬. সরেন ৭. টুডু ৮. বাস্কে ৯. বেসরা ১০. চঁড়ে ১১. পাউরিয়া ১২. বেদেয়া। সমাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য গোত্র অনুযায়ী প্রত্যেককে কাজ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে J.Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Among The santal'* গ্রন্থে বলেছেন-

> The Kiskus become the royal tribe under the cognomen of Kisku Raj. The Murmu become the princely tribe and were named Murmu Thakur. Hembrom was ennobled and known as Hembrom Kuar. The soren become to soldier tribe and were named Soren Sipahi. The Marandis were Appointed the king's treasurers and stewards and named Marandi Kipisar. The Tudus took to music and received the title of Tudu Mandariya.[১৯]

কিস্কু গোত্রের লোকজনদের কাজ হল রাজ কার্য পরিচালনা করা। হাঁসদা গোত্রের লোকজনদের কাজ হল লোহার জিনিস তৈরী করা এবং উৎসবগুলোতে বাদ্যযন্ত্র বাজানো ইত্যাদি। মুর্মু গোত্রের লোকজনদের কাজ হল সমাজের পূজার্চনা করা। হেমব্রম গোত্রের লোকজনদের কাজ হল দেওয়ানের কাজ সামলানো। মার্ডি বা মান্ডি গোত্রের লোকজনদের কাজ হল কৃষিকাজ করা। সরেন গোত্রের লোকজনদের কাজ হল যুদ্ধ করা অর্থাৎ সৈনিক। বাস্কে গোত্রের লোকজনদের কাজ হল ব্যবসা বাণিজ্য করা। বেসরা ও চঁড়ে গোত্রের লোকজনদের সমাজে নিচ জাতি হিসেবে পরিচয় ছিল। তাই সমাজে তাদের কিছু কাজ ছিল না। সাঁওতালদের প্রতিটি গোত্রের মানুষের পৃথক পৃথক ধর্মীয় প্রতীক ও টোটেম বা বাধা নিষেধ দেখা যায়। যেমন-

গোত্রের নাম	গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক
হাঁসদা	হাঁস
কিস্কু	শঙ্খচিল
মুর্মু	নীলগাই
মার্ডি বা মাণ্ডি	মেরদা নামক ঘাস
হেমব্রম	সুপারি
সরেন	সপ্তর্ষি
টুডু	পেঁচা
বাস্কে	পান্তাভাত
বেস্‌রা	বাজপাখি
চঁড়ে	গিরগিটি
পাঁউরিয়া	পায়রা

ছক-৫

প্রত্যেক গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক আলাদা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে তাদের পৃথক গোত্রগুলি বোঝা যায়। বর্তমানে সাঁওতালরা গোত্রের ধর্মীয় প্রতীকগুলি ব্যবহার করে না।

গ্রাম সংগঠন :

সাঁওতালরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিল। সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম তারা একত্রে করে। সংগঠিত জীবনযাপনকে তারা কখনও অমান্য করে না। গ্রামের কোন অসমাজিক ঘটনা ঘটলে সবাই মিলে সংশোধন করে। সমাজের কোন ব্যক্তি বা পরিবার যদি অসামাজিক কাজে সহায়তা করে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে একঘরে করা হয়। এই নিয়মকে ‘বিটলাহা’ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে J. Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Among The santal* গ্রন্থে বলেছেন-

> The village council of pangro is a full-fledged one consisting of seven officials; a headman(Manjhi), a deputy headman (Paranik); an over seer of village morals(jogmanjhi); his assistant (jog paranik); a messenger(godet); and two religious functionaries namely the naeke(village priest) and his assistant the kudam naeke.[২০]

সাঁওতালদের প্রতিটি গ্রামে একটি করে সমাজ ব্যবস্থা আছে। সেই সমাজ ব্যবস্থায় পদাধিকারী ব্যক্তিরা হলেন-

১. মাঝি (গ্রামের প্রধান)
২. পারাণিক (মাঝির সহকারী)
৩. জগমাঝি (যুবক-যুবতিদের পরিচালক)
৪. জগ-পারাণিক (জগ-মাঝির সহকারী)
৫. গোডেত (মাঝির বার্তা বাহক)
৬. নায়কে (গ্রামের পূজারী)
৭. কুডাম নায়কে (বনজঙ্গল ও প্রকৃতি পূজারী)

এই পদাধিকারী ব্যক্তিগণ বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারী সূত্রে নিযুক্ত হয়। ১০-১২ টি গ্রাম মিলিয়ে একটি পরগণা ধরা হয়। পদাধিকারীরা গ্রামের সমস্যা সমাধান করতে না পারলে, পরগণাকে আহ্বান করা হয়। সাঁওতালদের সর্বোচ্চ বিচারালয় ‘শিকার বৈঠক’ বা ‘ল-বির বাইসি’। এই বৈঠকের বিচারককে ‘দিহরি’ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে J. Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Among The santal’* গ্রন্থে তাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন-

> The santals have a still higher court of appeal called Lo Bir or Hunt council which meets once a year during the annual hunt or Disom Sendra.[২১]

মাঝি কিংবা পরগণার বিচার মনঃপুত না হলে ‘ল-বির বাইসি’ বৈঠকে জানানো হয়। সাম্প্রতিককালে সাঁওতাল সমাজে যে সমাজ ব্যবস্থার নিয়মগুলি দেখা যায় তা তাদের মধ্যে বহু কাল থেকে প্রচলিত।

জন্ম সংস্কার:

সাঁওতাল নারী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সময় থেকে নানাবিধ নিয়ম পালন করতে হয়। প্রথমে তাকে লোহার চুড়ি পরানো হয়। কোন অপদেবতা তাকে আক্রমণ করতে পারে না, তাদের বিশ্বাস লোহাকে অপদেবতারা ভয় পায়। লোহার চুড়ি পরানো ছাড়াও অন্তঃসত্ত্বা নারীকে অনেকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন- পাতা সেলাই করতে নেই, উনুন বানাতে নেই, নদী, ঝরনা, বন প্রভৃতি স্থানে একা ভ্রমণ করতে নিষেধ করে। এছাড়াও সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ ইত্যাদি। শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে ঠাকুরদা বা ঠাকুরমার নাম অনুসারে নাম দেওয়া হয়। এছাড়াও বিশেষ বার বা বিশেষ দিনে জন্মালে সেই দিন অনুসারেও নবজাতক শিশুটির নাম রাখা হয়। এদের সমাজে মুখে ভাতের সামান্য অনুষ্ঠান হয়। ছেলের বেলায় ৬ মাস এবং মেয়ের ৭ মাস পার হলে মুখে ভাত দেওয়া হয়।

বিবাহ:

সাঁওতাল সমাজে ছেলে-মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হলে বিবাহ দেওয়া হয়। এদের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নেই। পাত্র-পাত্রী মনোনয়নের সময় তাদের বংশ পরিচয় দেখা হয়। প্রাচীন কাল থেকে এই প্রথা তারা পালন করে। তারা বিভিন্ন রীতিতে বিবাহ করে, আর্থিক সঙ্গতি ও পরিস্থিতি বুঝে অভিভাবকরা কিংবা পাত্র-পাত্রী ঠিক করে।

রাইবার বা কিরিঞ বৌহ্ বাপলা:

ছেলে বিবাহের উপযুক্ত হলে অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ঘটক তার জন্য বিবাহযোগ্য কন্যা সন্ধান করে। পাত্র পক্ষের লোকজনদের পাত্রী পছন্দ হলে, পাত্রীপক্ষরা পাত্রের বাড়িঘর দেখতে যায়। সাঁওতাল সমাজে মেয়ের বাবা কখনও বর খুঁজতে যায় না। সর্বশেষে গ্রামের মাঝি, জগমাঝি, পারাণিক, গোডেত ও নায়কে ডেকে বিবাহের দিন ধার্য করা হয়। সাঁওতালদের বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষকে পণ দিতে হয়। কন্যার পিতা-মাতা লালন পালনের জন্য যা ব্যয় করেছে তা পণের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়।

টুংকি দিপিল বাপলা:

এ বিবাহে শুধু কন্যা পণ লাগে। বিবাহের কথাবার্তা সব ঠিক থাকলে, ঘটক এবং বরপক্ষের কয়েকজন কনেকে বরের বাড়িতে এনে জগমাঁঝি বিবাহ সম্পাদন করে। বিয়ের আচারগুলি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে পালন করা হয়।

ঞির বল বাপলা:

ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রণয় থাকলে, পাত্রের অভিভাবক যদি মেয়েকে পুত্রবধূ রূপে মানতে অস্বীকার করলে মেয়েটি জগমাঁঝিকে জানিয়ে ছেলের বাড়িতে যায়। একে 'ঞির বল বাপলা' বলে। জগমাঝি ও পাড়ার কয়েকজন এসে পাত্রপক্ষকে মেয়েটিকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে আবেদন করে। এক্ষেত্রে বিবাহের সমস্ত খরচ বরপক্ষকে গ্রহণ করতে হয়।

সাঙ্গা বাপলা:

স্বামী পরিত্যক্ত কিংবা বিধবা মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে 'সাঙ্গা বাপলা' বিবাহ রীতি প্রচলন আছে। এর জন্য কন্যাপণ লাগে না। ছেলেটি মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুরও পরায় না। সাদা ফুলে সিঁদুর লেপন করে মেয়ের খোঁপায় গুঁজে দেওয়া হয়।

অর আদের বাপলা:

সাঁওতাল সমাজের ছেলে যখন জোর পূর্বক কোন মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন তাকে 'অর আদের বাপলা' বলে। এই প্রথায় মেয়েটি মেনে নিলে, মেয়েটির বাবা জগমাঁঝিকে জানায়, জগমাঝি তখন ছেলের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করে। মেয়েটি রাজি থাকলে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।

ইতুৎ সিন্দুর বাপলা:

ছেলে-মেয়ে একে অপরকে ভালবাসার পর, মেয়ের বাড়ির লোকজন কিংবা ছেলের বাড়ির লোকজন মানতে নারাজ হলে, ছেলেটি জোরপূর্বক মেয়েটির মাথায় সিঁন্দুর পরিয়ে দেয়। সাঁওতাল সমাজে এই বিবাহের মর্যাদা খুব কম।

কিরিঞ জাওয়ায় বাপলা:

এই বিবাহের নিয়ম অনুসারে জামাইকে টাকা দিয়ে কেনা হয়। অবিবাহিতা কোন মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে, তার সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের প্রয়োজনে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, তা কন্যা পক্ষকে বহন করতে হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ:

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি তৈরি হলে, স্বামী-স্ত্রী দুজনকে দু পক্ষের মাঁঝি, জগমাঁঝি, পারাণিক ও গ্রামের পাঁচজনকে জানিয়ে দেয়। তারা সম্মতি দিলে নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং তাদের মাঝখানে একটি কাঁসার ঘটিতে জল রাখা হয়। ছেলের গ্রামের মাঝি উপস্থিত সকলের হয়ে জানায়, সংঘটিত বিবাহ বিচ্ছেদ উভয়ের ইচ্ছা। বিবাহ বিচ্ছেদে গ্রামের লোকদের দোষ নেই। ছেলে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে তিনটি শালপাতা ছিঁড়ে ফেলে এবং ডান পা দিয়ে ঘটির জল উলটে দেয়। মেয়েটিও একই পদ্ধতিতে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। বিবাহ বন্ধন ছেদ করে উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদে উপস্থিত সকলকে প্রণাম করে।

মৃত্যু সংস্কার:

হিন্দু সমাজের ন্যায় সাঁওতালরাও মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে। তবে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের কিংবা শিশুদেরকে কবর দেওয়া হয়। স্বাভাবিক মৃত্যুতে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তেল-হলুদ মাখিয়ে দেয়। এরপর খাটে করে রাস্তার চৌমাথায় নিয়ে গিয়ে শবদেহটি কিছুক্ষণের জন্য রেখে খই ছড়ায়। তাদের বিশ্বাস, এতে কোন অশরীরী আত্মা মৃতদেহকে সৎকারের ক্ষেত্রে কোনো রূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। শ্মশানে পুনরায় মৃত ব্যক্তির হাত-পা মুখ ধোওয়া হয় আর তেল হলুদ মাখানো হয়। সধবার ক্ষেত্রে শেষবারের মতো সিঁন্দুর পরিয়ে দেওয়া হয়। মৃতের বড় ছেলে মুখাগ্নি করে, মৃত দেহ দাহ হলে অস্থি গুলি একটি মাটির ভাঁড়ে সংগ্রহ করে গাছের নিচে পুঁতে রাখা হয়। দশদিন পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধের পর সেই পুঁতে রাখা অস্থি ভাঁড় দামোদর নদীতে বিসর্জন দেয়।

ধর্ম বিশ্বাস ও দেবদেবী:

সাঁওতালদের ধর্ম সম্পর্কে বিবাদ আজও অব্যাহত। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের কথা জানা যায়। যেমন-

১. সারি ধর্ম বা সারি ধরম- সাঁওতালদের আদি ধর্ম হল ‘সারি ধরম’। এই ধর্ম মতে প্রকৃতি দেবতাই প্রধান।

২. হিন্দু ধর্ম- সাঁওতালদের একটি বড় অংশ বর্তমানে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে। তারা হিন্দুদের বিভিন্ন দেবতাকে পূজা করে, এগুলি তাদের ভাষায় ‘দিশম বুঙ্গা’ নামে পরিচিত।

৩. খ্রিস্ট ধর্ম- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিকের আগমনের সময় থেকে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারিত হতে দেখা যায়। আদিবাসীদেরকে তারা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করেছিল। ব্রিটিশ বণিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক লাভ ও পাদ্রীদের লক্ষ্য ছিল এদেশের সাধারণ

মানুষদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। ঝাড়খন্ড রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্মালম্বী সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। খ্রিস্ট ধর্মের সাঁওতালরা একটু নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। এ প্রসঙ্গে J. Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Among The Santal* গ্রন্থে বলেছেন-

> According to them, the supernatural world is peopled with a large number of supernatural spirits called bongas and with a large number of impersonal supernatural powers. The are blived to shape the course of nature and of human events.[২২]

সাঁওতালরা প্রকৃতির পূজারি। গাছপালায় ঘেরা 'জাহের থান' হল তাদের উপাসনাস্থল। আদিবাসীদের আরাধনার স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অরণ্যস্মৃতি। সাঁওতালদের উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। অসংখ্য দেবতা বা 'বুঙ্গাবুরু'কে পূজা করে। তাদের পুরাণ অনুসারে প্রধান দেবতা হল 'ঠাকুর জীউ'। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। এ প্রসঙ্গে Joseph Troisi তাঁর *Tribal Religion Religious Beliefs and Practices Santal* গ্রন্থে বলেছেন –

> Then Thakur, the supreme Being, created the beings that live in water, after which he decided to create man. He made two people of mud but the Day-horse came and trampled them to pieces.[২৩]

আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত এক সংগীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়-

হায় হায় জালাপুরিরে- হায় হায় মানমি জানামলেন
হায় হায় মানমি জালাপুরি।
তকারেদো হোঞ দহ কিনতিঞ, হায় হায় জালাপুরিরে
হায় হায় মানমি জালাপুরিরে।.......
হায় হায়! মারাং ঠাকুর জীউ...[২৪]

গানটির বাংলা অনুবাদ

হায় হায় মহাসমুদ্রে হায় হায় এই মানুষ দুটি জন্মলাভ করেছে
হায় হায় মানব মহাসমুদ্রে।
এ দুটিকে কোথায় রাখব, হায় হায় মহাসমুদ্রে
হায় হায় মানব মহাসমুদ্রে।
হায় হায়! ঠাকুর জীউ।

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সাঁওতালদের ঠাকুর বা বোঙ্গাবুরুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বোঙ্গাবুরুর ভীড়ে 'ঠাকুর জীউ' হারিয়ে যান। প্রধানত বৃদ্ধরা একমাত্র তাকে 'চান্দো বোঙ্গা' বলে স্মরণ করে। পরবর্তীকালে এই জীউ ঠাকুরের পরিবর্তে 'মারাং বুরু' প্রধান দেবতা হয়ে ওঠে। এছাড়াও তাদের আরো অনেক দেবতা রয়েছে। সাঁওতালদের পূজার স্থান হল 'জাহের থান'। জাহের থানের প্রধান দেবতা হলেন 'জাহের এরা'। 'জাহের এরা'র গ্রামের মঙ্গলার্থে পূজা করা

হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন অনিয়ম ঘটলে 'সিঞ বোঙ্গা'র নামে তারা পুজো করে। গ্রামের মধ্যে রোগ ব্যাধি বা অনাবৃষ্টি খরা দেখা দিলে 'মড়েকো-তুরুইকো বোঙ্গা'র নামে তারা পুজো করে। সীমাবোঙ্গা- রক্ষণশীল দেবতা। উড়াঃ বোঙ্গা- গৃহ দেবতা। বুরু বোঙ্গা- পাহাড় পর্বতের দেবতা। ডাডি বোঙ্গা- ঝরণার দেবতা। বিরবোঙ্গা- বন দেবতা।

অর্থনৈতিক জীবন:

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আসার আগে সাঁওতালদের জীবন খুব স্বাভাবিক ছিল। সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। দৈনন্দিন জীবনে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বনজঙ্গল কিংবা চাষবাসের মাধ্যমে সংগ্রহ করত। বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হওয়ার পর থেকে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে শুরু হল। ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা লাভের পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের উপর প্রবলভাবে শোষণ করতে শুরু করে। পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে তারা বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি মসনদ পায়। এর অর্থ এই তিন প্রদেশ থেকে রাজস্ব আদায় করা। মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকে ভারতে জমিদারি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর থেকে জমিদারের জমিদারিত্ব বিনষ্ট হয় এবং এদের জায়গায় নতুন এদেশীয় ধনী বণিক শ্রেণির জমিদার রূপে আগমন ঘটে। জমি থেকে চড়া হারে রাজস্ব আদায় করা তাদের লক্ষ্য ছিল। এই জমিদারি পত্তনের পর সাঁওতালরা সেই জমিদারি আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মহাজন শ্রেণির মানুষ। সাঁওতালরা সহজ সরল হওয়ার কারণে জমিদাররা প্রবলভাবে শোষণ করতে শুরু করে। এই শোষণ পীড়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিলকা মাঝি প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ সরকারের কাছে হেরে যায়, এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়। এই বিদ্রোহের পরও তাদের উপর অত্যাচার কমেনি। তাই তারা বৃহৎ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে সিধু ও কানু ছিল। দুর্ভাগ্যবশত প্রথমবারের মতো এবারও তারা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হল। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পর্যন্ত সাঁওতালরা বিভিন্নভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার অরণ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। মাইলের পর মাইল নিজের স্বার্থে গাছপালা কেটে শেষ করেছে। স্বাধীনতার পর সংবিধানে তাদের উন্নয়নের জন্য অনেক বিষয় লিখিত হল। কিন্তু বাস্তবে তা কাজ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাই আজও আদিবাসীদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে আন্দোলন করতে হয়।

শবর জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি:

শবর জনজাতি অতি প্রচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করছে। বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন- *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* গ্রন্থে আছে যে, শবরেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্রের বংশধর। বিশ্বামিত্র ঋষি এক ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করায় ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন তিনি ছেলেদের অভিশাপ দেন যে, তাদের বংশধরেরা সমাজে পতিত বলে গণ্য হবে। প্রাচীনতম বাংলা পুঁথি *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* এ শবরদের জীবনাচরণের উল্লেখ রয়েছে-

উঁঞ্চা উঁঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত্ত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
নিঅ ঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী।।[২৫]

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা, শবরীর পরিধানে ময়ুরপুচ্ছের পোশাক, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর চিনতে ভুল করো না, দোহাই তোমার- আমি তোমারই গৃহিণী নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হল, গগন স্পর্শ করল ডাল, কর্ণকুন্ডল ব্রজধারী একেলা শবর এ বনে ঘুরে বেড়ায়। শবরদের এ বর্ণনা থেকে তাদের জীবনযাত্রার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। H.H Risley তাঁর *Tribes And Castes of Bengal* (1891) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বাংলার আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। শবর জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন-

> A Dravidian cultivating and servile tribe of Orissa, Chota Nagpur, Western Bengal, Madras, and the central provinces.[২৬]

এছাড়া একটা লোকশ্রুতি কাহিনি আছে, পুরীর বিরাট মন্দিরের পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং জগন্নাথের রথ টানার জন্য শবরদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের রথ টানার পরিশ্রমসাধ্য কাজ আজও শবররা নিষ্ঠার সহিত করে।

বাসস্থান:

শবর জনজাতিরা অতি দরিদ্র। মাটির দেওয়াল লতা-পাতা কিংবা খড়ের ছাউনি, ঘরে জানালা ও দরজার সুবন্দোবস্ত থাকে না। শুধুমাত্র বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি দরজা থাকে। ঘর তাদের সাধারণত এককক্ষ বিশিষ্ট হয়। প্রত্যেক কুঁড়ে ঘরের মধ্যে কুলঙ্গি বানানো থাকে। এই কুলঙ্গিতে তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতে শবর জনজাতি দেখা যায়।

গৃহস্থালি দ্রব্য:

শবরদের ঘরে আসবাবপত্র কিছু থাকে না। মাটির কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি এবং শিকারের জন্য ব্যবহৃত নানা রকমের সরঞ্জাম। যেমন – তীর-ধনুক, কুঁড়াল ইত্যাদি।

পোশাক পরিচ্ছদ:

শবর ছেলেরা ধুতি বা গামছা আর মেয়েরা শাড়ী পরে। সোনা, রূপা গয়না ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলেও তাদের কেনার সামর্থ্য নেই। বাজারে বিভিন্ন ধরনের জার্মান সিলভার কিংবা পুঁতির মালা ব্যবহার করে। এছাড়াও বনজঙ্গল থেকে বিভিন্ন ফুলের মালা ব্যবহার করে।

জীবিকা:

বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং শিকার হল শবরদের প্রধান জীবিকা। বর্তমানে কৃষিকাজের শ্রমিক কিংবা বিভিন্ন কলকারখানায় দিনমজুর হিসাবে কাজ করে। অবসর সময় তারা জঙ্গল থেকে কাঠ, ফল, মধু এনে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়।

গ্রাম সংগঠন:

শবরেরা নিজস্ব পঞ্চায়েতের দ্বারা গ্রামের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মিটিয়ে নেয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে এরা 'প্রধান' বলে। প্রধানের সিদ্ধান্তকে গ্রামের সবাই মেনে নেয়। পঞ্চায়েত বিচার ব্যবস্থায় নারীদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। অবৈধ সম্পর্ক, চুরি এবং ডাইনি অপবাদের অভিযুক্তকে জরিমানা দিতে হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার করলে গ্রাম থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

জন্ম সংস্কার:

শবর মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় নানারকম বিধি-নিষেধ মেনে চলে। সন্ধ্যাবেলা একা তাকে কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। শিশুর জন্মের পর শিশুটিকে ঘরের উঠানে এক কোণে কিছু সময়ের জন্য হালকা করে পুঁতে রাখা হয়। শিশু জন্মের ২১ দিন পর অশৌচ শেষ হয়। শিশুটির দাঁত ওঠার আগে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি পালন করে।

বিবাহ সংস্কার:

শবরদের সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন আছে। ছেলের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বিবাহের প্রস্তাব মেয়ের বাড়িতে যায়। বিয়েতে কন্যাপণের ব্যবস্থা আছে। বিধবা বিবাহের প্রচলনও শবরদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

মৃত্যু সংস্কার:

শবররা মৃতদেহকে দাহ করে না, কবর দেয়। কলেরা, বসন্ত কিংবা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু হলে মৃতদেহকে জঙ্গলে ফেলে দেয়।

অর্থনৈতিক জীবন:

শবরা আর্থিক দিক দিয়ে খুব দুর্বল। তাদের পূর্বপুরুষরা বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ইংরেজ সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা নানাভাবে শোষিত, অত্যাচারিত হয়েছিল। ইংরেজ সরকার আইন করে বনজঙ্গল সংরক্ষণ করে দেওয়ায় তাদের পক্ষে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা সংকটজনক হয়। অন্যদিকে আস্তে আস্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভাঙ্গন ধরতে শুরু করে। স্বাধীনতা লাভের পর শবররা জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজকে বেছে নিয়েছিল। নিজস্ব জমি না থাকার কারণে, অন্যর জমিতে দিনমজুর কৃষক হিসেবে খাটতে হত। সেটাও বছরের ৩-৪ মাস কাজ পাওয়া যায়। তাই বেশিরভাগ সময় তাদেরকে কাজের অভাবে অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটাতে হয়। বর্তমানে ইঁটভাটা, কলকারখানায় কাজ করতে দেখা যায়। অর্থের দিয়ে সামান্য সামান্য পরিমাণ স্বচ্ছলতা দেখা দিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কিছু উন্নতি হয়নি বললেই চলে। শবর গ্রামে গেলে এখনো শোনা যায়- 'জল চাই, স্কুল চাই, বাঁচতে চাই'।

লোধা জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি:

'লোধা' শব্দটি সংস্কৃত 'লুব্ধক' শব্দ থেকে এসেছে। 'লুব্ধক' শব্দটির অর্থ হল ব্যাধ। H.H Risley তাঁর *Tribes And Castes of Bengal* (1891) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বাংলার আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। লোধা জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন-

> Lodha, a sub-tribe of Bhumijs in chota Nagpur.[২৭]

ব্রিটিশ সরকার লোধাদেরকে 'অপরাধপ্রবণ জাতি' (Criminal Tribe) হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এই 'জন্মদাগী' অপবাদটি ১৯৫২ সালে আইন করে তুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের পর, আইনের মাধ্যমে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কলঙ্ক দূর করে। প্রশাসন অন্যান্য আদিবাসীদের মতো জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও তা আজ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি।

বাসস্থান:

লোধারা জঙ্গলের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করে। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, ঘরগুলি খড় কিংবা তালপাতা দিয়ে ছাওয়া থাকে। প্রায় প্রতিটি ঘরে দরিদ্রতার ছাপ দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় মূলত লোধা জনগোষ্ঠীর বসতি দেখা যায়।

পোশাক পরিচ্ছদ:

লোধাদের পোশাক পরিচ্ছদ খুব কম। ছেলে-মেয়েদের দু-একটার বেশি জামা কাপড় থাকে না। মেয়েরা অলঙ্কার ব্যবহার করে না, শখ করে বনের লতাকে চুড়ি বানিয়ে পরে। বর্তমানে কেউ কেউ বাজার চলতি জার্মান সিলভার বা কাঁচের চুড়ি পরে।

জীবিকা:

জীবিকা নির্বাহের জন্য বনজ সম্পদের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। দল বেঁধে বনজ সম্পদ কাঠ, পাতা, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং বাজারে বিক্রি করে। এই সামান্য পরিমাণ আয় দিয়ে তারা সংসার চালায়। ব্রিটিশ সরকারের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 'অপরাধপ্রবণ' জাতির কলঙ্কের জন্য আজও তারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় দিনমজুরের কাজ পায় না।

গোত্র:

লোধারা ৯টি গোত্রে বিভক্ত রয়েছে। প্রত্যকটি গোত্রের নিজস্ব গোত্র দেবতা আছে, তাই তারা গোত্রের নামে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মেনে চলে।

গোত্রের নাম	টোটেম
ভক্তা বা ভুক্তা	চিরকা আলু
মল্লিক	মকর
কোটাল	চাঁদ এবং কচ্ছপ
নায়েক বা লায়েক	শাল মাছ
দিগার	শুশুক
দণ্ডপাট বা বাঘ	বাঘ
পরামাণিক	এক জাতীয় পাখি
আড়ি বা আহরি	চাঁদা মাছ
ভুঁইমাছ	শোলমাছ

ছক-৬

গ্রাম সংগঠন:

লোধা সমাজে গ্রাম পরিচালনার জন্য তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আছে। সংগঠনের পঞ্চায়েত প্রধানকে 'মুখিয়া' বলা হয়। মুখিয়া গ্রামের সমস্ত রকমের সমস্যা সমাধান করে। পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় ব্যক্তি হল 'ডাকুয়া'। গ্রামে কোনো ধরনের সমস্যা হলে 'ডাকুয়া'র সাহায্য 'মুখিয়া'কে জানানো হয়। সমাজের দোষী ব্যক্তিকে অপরাধের শাস্তি হিসেবে জরিমানা দিতে হয়।

মৃত্যু সংস্কার:

লোধারা মৃতদেহকে দাহ করে, কিন্তু সংক্রমক রোগে মৃত্যু ঘটলে মৃতদেহকে দাহ করে না, কবর দেয়। দাহ করার সময় মৃতদেহের মাথার কাছে কাস্তে রেখে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস দুষ্ট আত্মা দেহটিতে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্তঃসত্ত্বা নারীর কিংবা শিশুর মৃত্যু হলে কবর দেওয়া হয়।

ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী:

লোধারা মূলত প্রকৃতির পূজারী, আরাধ্য দেবতার হল 'বড়াম'। জঙ্গলের কোন পুরানো গাছের নিচে 'বড়াম' দেবতার নামে ফুল ও ফল দিয়ে পূজা করে। এছাড়াও লোধারা নানা দেবদেবীর পুজো করে। যেমন- বনদেবীর নাম চণ্ডী বা চাণ্ডী। লোধাদের কাছে চণ্ডী একমাত্র শক্তিশালী বনদেবী। সংক্রমক রোগ নিয়ন্ত্রণকারী দেবী হিসেবে শীতলা দেবীর পূজা করে।

অর্থনৈতিক জীবন:

লোধারা আদিকাল থেকে বনজঙ্গলে বসবাস করত। বনজঙ্গল তাদের খাবার জোগায়, তাই বনজঙ্গলকে উজাড় করতে চায় না। ইংরেজ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে বনজঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের তিন দশকের পর সরকার তাদের 'পাট্টা' জমি দেয়, যা চাষের পক্ষে অযোগ্য ছিল। মেদিনীপুরের 'লোধা উন্নয়ন সেল'এ লোধারা কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্যর আশা নিয়ে চিঠি লিখেও কাজ হয়নি। বর্তমানে তারা ইঁটভাটা, কারখানাগুলোতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে।

খেড়িয়া/খাড়িয়া জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি:

একসময় ব্রিটিশ সরকার লোধাদের মতো খাড়িয়া বা খেড়িয়াদেরকেও 'অপরাধপ্রবণ' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। গ্রামে গঞ্জে চুরি হলে একমাত্র খেড়িয়ারা দোষী হত।

খেড়িয়াদের উৎপত্তি সমন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না। H.H Risley তাঁর 'Tribes And Castes of Bengal' (1891) গ্রন্থের প্রথম খন্ডে খেড়িয়া জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন-

> Kherwar or Safa Hor sub tribe of Santals in the Santhal parganas who affect a high degree of ceremonial purity.[২৮]

বাসস্থান:

খেড়িয়ারা বনজঙ্গল কিংবা পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করে, ছোট ছোট মাটির ঝুপড়ি ঘর, খড়ের ছাউনি। খেড়িয়া জনজাতি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত পাহাড়ী খেড়িয়া, দুধ খেড়িয়া, ঢেলকি খেড়িয়া। পাহাড়ী খেড়িয়া ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম, রাঁচি, এবং হাজারিবাগের বিভিন্ন জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় তাদের বসবাস দেখা যায়।

জীবিকা:

জীবিকা নির্বাহের জন্য খেড়িয়াদের বনজ দ্রব্যর উপর নির্ভর করতে হয়। জঙ্গলের পাতা, কাঠ, মধু বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। বর্তমানে কিছু খেড়িয়াগোষ্ঠী কৃষিকাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে।

গোত্র:

খেড়িওয়া জনগোষ্ঠীর অনেকগুলি গোত্র রয়েছে এবং গোত্রের নামে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ সবাই মেনে চলে। বিভিন্ন গোত্রের নাম ও ধর্মীয় প্রতীক গুলি হল-

ক. পাহাড়ি খেড়িয়া

গোত্রের নাম	ধর্মীয় প্রতীক
গুলগু	শাল মাছ
ভুইয়া	এক রকম মাছ
জারু	ইঁদুর
বাদ্যা	ওল
টেসা	এক জাতীয় পাখি
হেমব্রম	সুপারী

ছক-৭

খ. দুধ খেড়িয়া

গোত্রের নাম	ধর্মীয় প্রতীক
ডুংডুং	পাঁকাল মাছ
কুলু	কচ্ছপ
সামাদ	তিতির পাখি
বিলুং	লবণ
সরেং	পাথর
বা	ধান
টোপো	ঐ নামের এক পাখি
কিরো	বাঘ

ছক-৮

গ. ঢেলকি খাড়িয়া

গোত্রের নাম	ধর্মীয় প্রতীক
মুরু	কচ্ছপ
সরেন	পাথর
সামাদ	হরিণ
বারলিহা	ঐ নামের এক প্রকার ফল
চারহা	ঐ নামের পাখী
হাঁসদা	পাঁকাল মাছ
টোপনো	ঐ নামের পাখী
মেল	গোবর

ছক-৯

গ্রাম সংগঠন:

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো খেড়িয়াদেরও নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কেন্দ্রে গ্রাম-প্রধান থাকে। গ্রামের সমস্তরকম বিবাদগুলোকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা মীমাংসা করে। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে 'পারহা পঞ্চায়েত' গঠিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে যে সমস্ত সমস্যা মীমাংসা হয় না, তা 'পারহা পঞ্চায়েত' এ বিচার করা হয়।

জন্ম সংস্কার:

খেড়িয়া জনজাতির নারী অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় থেকে কিছু কিছু বাধা নিষেধ মানতে হয়। এ সময় একা কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। তাদের বিশ্বাস এ সময়ে যে কোন অশরীরী আত্মার কু-দৃষ্ট পড়তে পারে। অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন কোন জীব হত্যা করে না। শিশু জন্মের ৯ দিন পর অশৌচ কাটানো হয়। পাহাড়ী খেড়িয়ারা শিশু জন্মের ১ বছর পর নামকরণ করে। অন্যদিকে দুধ ও ঢেলকি খেড়িয়ারা ছেলেমেয়ের ২১ দিনের মাথায় নামকরণ করে।

বিবাহ সংস্কার:

খেড়িয়া সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নেই। কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। স্ত্রী যদি অলস, ব্যাভিচারিণী কিংবা বন্ধ্যা হলে, স্বামী তাকে ছেড়ে দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদকে তারা 'সাওরাইদোম মেলায়ানা' বলে।

মৃত্যু সংস্কার:

খেড়িয়ারা মৃতদেহকে কবর দেয়, রিজলি সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিবাহিতদের মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং অবিবাহিতদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহকে কবর স্থানে নিয়ে যাওয়ার আগে তেল ও হলুদ মাখনো হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হলে তাকে কবর দেওয়া হয়।

ধর্ম বিশ্বাস ও দেবদেবী:

খেড়িয়াদের নিজস্ব কোন ধর্ম নেই, আরাধ্য দেবতা হল 'গিরিং বা বেরো'। বনে- জঙ্গলে যাওয়ার আগে তারা গিরিং দেবতাকে স্মরণ করে। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা 'গিরিং' দেবতার পূজা করে। খেড়িয়াদের বিশ্বাস প্রত্যেক পাহাড়ে 'গিরিং' দেবতা আছে। 'গিরিং' দেবতায় ঝড়-বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতো খেড়িয়ারা নানারকম তুক-তাক ও যাদু মন্ত্রেকে বিশ্বাস করে।

অর্থনৈতিক জীবন:

একসময় ইংরেজ সরকার খেড়িয়াদের 'অপরাধপ্রবণ' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। চুরি-ডাকাতি হলে ইংরেজ সরকারের পুলিশ তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। তাই তারা শান্তিতে ঘর-সংসার করতে পারেনি, প্রতিনিয়ত তাদেরকে বাসস্থান পালটাতে হয়েছে। এরফলে তাদের সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে তারা শহরাঞ্চলের পাশাপাশি কলকারখানাগুলোতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে।

মুণ্ডা জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি:

'মুণ্ডা' শব্দটি 'মুণ্ড' থেকে উদ্ভুত। 'মুণ্ড' কথাটির অর্থ মাথা। গ্রামের মাথা অর্থাৎ প্রধান অর্থে মুণ্ডা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মুণ্ডারা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বাসিন্দা ছিল। পরবর্তীতে তারা আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আজমগড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আজমগড়েও তারা বেশিদিন স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি। সবশেষে ছোটনাগপুর অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। H.H Risley তাঁর *Tribes And Castes of Bengal* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে মুণ্ডা জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে বলেছেন-

> A large Dravidian tribe of chota Nagpur classed on linguistic grounds as kolarian and closely akin to the Hos and sandals, and probably also to the kandhs.[২৯]

বাসস্থান:

মুণ্ডা সম্প্রদায়রা ছোটনাগপুরের পর্বত্য অঞ্চল থেকে তারা ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদ, পালামৌ ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অধিকাংশ বাড়ি মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল হয়। গ্রামের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়। ঐ জায়গায় উৎসব, অনুষ্ঠানে সকলে মিলে নাচ ও গান করে।

পোশাক পরিচ্ছদ:

মুণ্ডাদের পোশাক আড়ম্বরপূর্ণ নয়, পুরুষেরা পাঁচ-ছয় হাত লম্বা একধরনের গামছা পরে। কাপড়ের দুই প্রান্তে রঙিন সুতোর কারুকার্য থাকে। মেয়েরা দু' খন্ড কাপড় পরে, একটিকে 'লাহাঙ্গা' অপরটি 'পারিয়া' বলে। এগুলি এদের জাতীয় পোশাক। বর্তমানে মুণ্ডা ছেলেমেয়েদেরকে এ জাতীয় পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায় না। অধিকাংশ ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট আর মেয়েরা শাড়ি, সালোয়ার ইত্যাদি নানা ধরনের পোশাক ব্যবহার করে। মেয়েদের অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা যায়।

জীবিকা:

প্রাচীনকাল থেকে মুণ্ডাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। ছেলে মেয়ে উভয়ে কৃষিকাজে সমানভাবে কাজ করে, মেয়েরা লাঙল স্পর্শ করে না। অন্যর জমিতেও তারা ক্ষেত-মজুর হিসাবে নিযুক্ত হয়। উত্তরবঙ্গের চা বাগানেও বহু মুণ্ডা কাজ করে। বর্তমানে অনেকে পশুপালনকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

গোত্র:

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো মুণ্ডা সমাজেও বিভিন্ন গোত্র দেখা যায়। তাদের গোত্রের নাম গাছপালা, পশুপাখি, ফুল-ফলের নামে হয়। যেমন-

গোত্রের নাম	গোত্রের প্রতীক/টোটেম
ভেঙরা	ঘোড়া
হার্নসা	হাঁস
জিরহুল	একরকম ফুল
বুলুম	লবণ
আম্বা	আম
মুনডারি	তিতির পাখি
কানদরু	এক রকমের মাছ
গোন্দলি	এক জাতীয় শস্য
কেরকেট্টা	এক জাতীয় পাখি
পরতি	কুমীর

ছক-১০

যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তারা সেই নির্দিষ্ট প্রতীককে 'টোটেম' হিসেবে চিহ্নিত করে।

গ্রাম সংগঠন:

মুণ্ডা সমাজে গ্রাম পরিচালনার জন্য তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানকে 'মুণ্ডা' বলা হয়। এছাড়াও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় রয়েছে পাহান (পুরোহিত)' এবং মাহাতো (কোটাল বা বার্তা বাহক)। গ্রামের পঞ্চায়েত সভায় মুণ্ডা, পাহান, এবং মাহাতো সকলের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

জন্ম সংস্কার:

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো মুণ্ডা নারীকে অন্তঃসত্ত্বা থাকা সময় থেকে নানারকম বিধি নিষেধ মানতে হয়। সন্ধ্যেবেলা অপদেবতার ভয়ে, একা কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। শিশুটির কল্যাণের জন্য 'গরাসি বোঙ্গা'র কাছে একটি মুরগি মানত করে। শিশু জন্মের ৮ দিন পর অশৌচ কাটানো হয় একে মুণ্ডারি ভাষায় 'নাড়তা' বলে। শিশুটির ৩-৪ বছর বয়সে কান

ফোঁড়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তাদের বিশ্বাস কান ফোঁড়া না হলে মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না।

বিবাহ সংস্কার:

মুণ্ডা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নেই। পিতা-মাতাই ছেলে-মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে দেয়। বিবাহে কন্যা পণ প্রচলন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুণ্ডা সমাজে পঞ্চায়েত বসিয়ে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি চাওয়া হয়। বিধবা বিবাহেরও প্রচলন আছে।

মৃত্যু সংস্কার:

মুণ্ডারা মৃতদেহকে দাহ করে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতদেহকে তেল-হলুদ মাখিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। মৃতদেহের চিতাভস্ম একটি মাটির ভাঁড়ে সংগ্রহ করে পরিবারের নিজস্ব শ্মশানে সমাধিস্থ করে।

ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী:

মুণ্ডাদের আরাধ্য দেবতা হলেন 'সিংবোঙ্গা'। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 'সিংবোঙ্গা'র নামে তারা পূজা করে। শিকারে বের হওয়ার পূর্বে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'চণ্ডীবোঙ্গা'র নামে আরাধনা করে। এছাড়া পাহাড় পর্বতের দেবতা হিসেবে 'বুরুবোঙ্গা' নদ-নদী ও জলাশয়ের দেবতা হিসেবে 'ইকিড়বোঙ্গা' ছোট নালার দেবী হিসেবে 'নাগেএরা'র আরাধনা করে।

অর্থনৈতিক জীবন:

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার আসার আগে মুণ্ডাদের জীবন খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুখে শান্তিতে বসবাস করত। ব্রিটিশ সরকার আসার পর থেকে তাদের উপর নানারকম শোষণ ও উৎপীড়ন শুরু হয়। তাই তারা বাধ্য হয়ে শোষণ যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ করেছে। ব্রিটিশ সরকার প্রতিবারেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্য মুণ্ডাদের বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করেছে। এরফলে মুণ্ডাদের আর্থিক-সামাজিক জীবনে দারুণ সংকট দেখা দিয়েছিল। তাই তারা জীবিকার সন্ধানে শিল্পাঞ্চল কিংবা শহরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে শুরু করে।

বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসীদের অবস্থান:

বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে আদিবাসী সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। চর্যাকাররা ৯০০- ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সাধনার গূঢ়ার্থ রচনা করেছিলেন। তারা সমাজের বিভিন্ন জাতির জীবনকে তুলে ধরে সাধনার গূঢ়ার্থ সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যে আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন লোকাচার প্রবল ভাবে দেখা যায়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যান অংশে লিখেছেন-

নিবাসে কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জায়াজীব বসিল কামিলা।[৩০]

তাঁর কাব্যে যে চণ্ডী দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* গ্রন্থে চণ্ডী দেবীকে অনার্য আদিবাসীদের দেবী বলেছেন। তৎকালীন সময়ে আর্য ও অনার্য মেলবন্ধনে অনার্য দেবী আর্য সমাজের দেবী হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, কিছু জায়গায় তাদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথাকথিত সমাজের উপর তলাকার মানুষের নিয়ে সাহিত্যে রচনা করলেও, তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা বলতে, আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ডা, বিরহড় ও খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন সময়ে আদিবাসী সম্পর্কে বাঙালিদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* নামক ভ্রমণকাহিনি থেকে এই আদিবাসী সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকে রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আদিবাসীরা গুরুত্ব পায়নি। অথচ তাদের নিয়ে লেখার মতো উপকরণ চারপাশে প্রচুর ছিল। এই সময় আদিবাসীরা ইংরেজ সরকার, মহাজন ও দিকুদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করেছে, তবুও তাদের কাহিনি কোনও সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের শান্তিনিকেতনে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘকাল ছিলেন। আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্য কম ছিল তাই তিনি সাহিত্যে তাদেরকে কম এনেছেন। তিনি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে আদিবাসী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে পল্লীউন্নয়নের কাজ করেছেন। তাই তিনি একবার সখেদে বলেছিলেন-

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, বাগদি রহিয়াছে তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সমন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে

একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না।[৩১]

তাঁর ‘পল্লীপ্রকৃতি অভিভাষণ’ (১৩৪৬) প্রবন্ধে তাদের পরিচয় মেলে-

সেখানকার মানুষ যারা সাঁওতাল সত্য পরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাঁদের আমি।[৩২]

কাব্য-কবিতা ও গল্পে, যেমন- *পুনশ্চ* কাব্যের ‘বাসা’, ‘সাধারণ মেয়ে’, ‘ক্যামেলিয়া’, ‘খোয়াই’ ও ‘কোপাই’ কবিতায় সাঁওতাল রমণীর ছবি পাওয়া যায়। অন্যদিকে *বীথিকা* কাব্যের ‘সাঁওতাল মেয়ে’ কবিতাতেও শ্রমজীবী সাঁওতাল রমণীর চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর ‘দুরাশা’ ও ‘শেষকথা’ গল্পে আদিবাসী প্রসঙ্গ রয়েছে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১৯ সালে তাসখন্দে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্‌ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা ধারায় সমাজতন্ত্রবাদের অনুপ্রবেশে ঘটে, তা ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে রচনার বিপরীত পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলেছেন-

উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন...।[৩৩]

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন। *কল্লোল* পত্রিকার লেখকগণ এই সহায় সম্বলহীন, প্রান্তবর্গীয় মানুষদেরকে সাহিত্য তথা সমাজে পরিচয় দিলেন। পূর্বসুরী সাহিত্যিকরা সমাজের প্রান্তবাসীদের বহু বিচিত্র জীবন যন্ত্রনার ঘটনা নিয়ে সাহিত্যে রচনা করেন নি। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। কথাসাহিত্যে এইসব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের বুকে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যা সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। কল্লোলীয়রা নানা দিক থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাদেরই একজন লেখক ছিলেন। তাঁর লেখক হয়ে ওঠার পিছনে শোষিত, বঞ্চিত আদিবাসী মানুষদের অবদান রয়েছে। তাঁর গল্পে প্রথম

কাহিনির মূল বিষয়বস্তু রূপে আদিবাসীদের জীবনযন্ত্রণাকে দেখা যায়। কয়লাখাদানের শ্রমিক আদিবাসী সাঁওতালদের ব্যক্তি জীবনের দুর্দশা ও বঞ্চনার সাক্ষী হয়ে উঠল তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পগুলো। যেখানে কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া, সেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈলজানন্দের সাহিত্য রচনার স্বতন্ত্র ধারাকে প্রশংসা করেছেন-

> শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র ঘোষণায় কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্য সভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রাপালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কান্ড করছি জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি- দরিদ্র নারায়ণের পূজারীর মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।[৩৪]

এর আগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠলেও, কৌম সাহিত্য রচনা হয়নি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের শৈশব কেটেছিল কোলিয়ারির মালিক মাতামহের বাড়িতে। কয়লাকুঠিতে চাকরির সূত্রে যৌবনে অন্ডাল ও রানীগঞ্জ এলাকার খনি অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় সাঁওতাল, বাউড়ি কুলি-কামিনদের দৈনদিন জীবনযাত্রার ছবি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আদিম অনার্য কৌম জনগোষ্ঠীর প্রেমজ জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। গল্পের শুরুতে জোড়জানকী কয়লাকুঠির প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে-

> কয়লা-খাদের মুখ হইতে কয়লা-টানা ছোট ছোট গাড়ির সরু ট্রাম লাইন, আঁকিয়া বাঁকিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া দূরে একটা 'ডিপো'র কাছে শেষ হইয়াছে।... আমগাছের কচি কচি নূতন পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পথ দেখিয়া সাঁওতাল ও বাউরি কুলিগুলা কয়লা-বোঝায় ট্রাম গাড়ি লাইনের উপর ঠেলিয়া আনিতেছিল। এক দিকে কুলি রমণীরা 'সাইডিং' এর উপর বড় বড় মালগাড়িতে কয়লা বোঝাই করিতেছিল। কয়লা ফেলার ধুপ ধাপ শব্দ এবং ট্রাম লাইনের ঘড়াঘড়ানির তালে তালে তাহাদের অপূর্ব মেঠোসুরের আনন্দ সঙ্গীত বর্ষার জলো হাওয়ায় কাঁপিয়া বহুদুরের শূন্য প্রান্তরে মিলাইয়া যাইতেছিল।[৩৫]

জোড়জানকী কয়লাখনিতে শ্রমিক হিসেবে সাঁওতাল ও বাউরি পুরুষ, মহিলা উভয়ে কাজ করত। ১৭৭৪-১৮৪০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকদের চাহিদা কম থাকায় স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্নীয় তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলাদের কুলি-কামিনরূপে নিয়োগ করত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি ছোটগল্পে খনি শ্রমিকদের অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ভয়াবহ জীবন চিত্র উঠলেও, অনার্য পুরুষ রমণীর কামাসক্তি তা অতিক্রম করেছে। সাঁওতাল যুবক নানাকু ও বাউরি রমণী বিলাসী তারা দু'জনে ঝরিয়া ছেড়ে জোড়াজানকী কয়লাখনিতে

পালিয়ে আসে। এখানে আসার পর নানকু ও বিলাসীর দাম্পত্য জীবনে সংকট দেখা দেয়। নানকু অপর এক কুলী রমণী মাইনুর প্রেমে পড়ে যায়। স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা রমণী বিলাসী তার প্রেমিক খালাসী রমণার সঙ্গে থাকলেও তাকে বিয়ে করতে রাজী নয়। সে নানকুকে বিয়ে করতে চায়। নিরাপত্তাহীন কয়লাখনিতে চাপা পড়ে মৃত নানকুর সন্ধানে গিয়ে বিলাসীও ক্ষয়প্রাপ্ত কয়লা স্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়। 'ঝুমরু' গল্পে রূপসা কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিদের দরিদ্রপীড়িত জীবনের একটি বড় সমস্যা হল বর্ষাকালে ছাতার অভাব। গল্পের শুরুতে প্রায় শোষিত অত্যাচারিত শ্রমিকদের চেতনার জাগরণের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত থাকার সত্ত্বেও তা প্রজ্বলিত হয় নি। 'রূপসা' নামক ছোটগল্পে কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলি-কামিনদের আর্থিক অসহায় অবস্থার দিকটি বর্ণনা করেছেন-

> এই দুরন্ত বর্ষার দিনে ছাতি ছাড়া তাহাদের চলে কেমন করিয়া? একে তো ঘরের ফুটা চাল গড়াইয়া জল পড়িবে, তাহার উপর মেয়ে-ছেলে সকলে মিলিয়া খোলা মাথায় চলা ফেরা করিলে পরিনাম যাহা হইবে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কোম্পানি ছাতা কিনিয়া দিবে না- নিজেদেরও তেমন সঙ্গতি নাই যে পয়সা খরচ করিয়া ছাতি কিনিবে। কাছে বনজঙ্গল থাকিলেও- বা শিয়াড়ি পাতায় ছাতি তাহারা নিজেরাই তৈরি করিয়া লইতে পারে।[৩৬]

অভাবের তাড়নায় ক্ষেপে উঠা সাঁওতালরা শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় মালিকের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারত। কিন্তু গল্পকার সে বিষয়ে উদাসীন থেকে ফরিদপুরের জঙ্গলে শিয়াড়ি পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে ঝুমরু মতির প্রেমজ সম্পর্ক ও ঝুমরুর পালিতা মা দাসীর মাতৃত্বকে প্রধান বিষয় করে তুলেছেন। 'রেজিং রিপোর্ট' নামক ছোটগল্পটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'রেজিং' কথাটির অর্থ হল কয়লা তোলা। খনি থেকে কয়লা তোলার পর মালিকের কাছে মোট হিসাব পাঠাতে হয় তাকে 'রেজিং রিপোর্ট' বলে। সমস্ত কয়লাখনিতে উৎপাদনেই হল প্রথম ও শেষ কথা। অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রত্যাশায় প্রতিদিন শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়লাখাদের গহ্বরে প্রতিনিয়ত জীবনহানির আশঙ্কায় জমি দিয়ে কিংবা অমানবিক অত্যাচার করেও শ্রমিকদের ধরে রাখা সম্ভব হত না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আধুনিকীকরণের আগে কয়লাখনিগুলি শ্রমিকের কাছে মৃত্যুপুরীর সমান ছিল। ব্যপক হারে কয়লা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

> ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল কোলফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন (C.R.O)... সংগঠনের পরিচালনায় ছিল একজন রিক্রুটিং তত্ত্বাবধায়ক ও একজন লেবার অফিসার। আর প্রয়োজনীয় কর্মচারী তাদের জন্য বরাদ্ধ ছিল। ছিল ৮টি লেবার ডিপো। যখনই কোনো কয়লাখাদের জন্য লোক দরকার পড়ত, কলিয়ারির ম্যানেজার কোনো একটি রিক্রুটিং ডিপোতে সর্দার পাঠিয়ে দিতেন। আগাম বাবদ টাকার একটা অংশও সঙ্গে দিয়ে দিত। তারপর গ্রাম থেকে শ্রমিকদের নিয়ে এসে তাদের নির্দিষ্ট কলিয়ারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত ১১ মাসের চুক্তিতে.....।[৩৭]

শ্রমিক সংগ্রহের জন্য রিক্রুটং কন্ট্রাক্টাররা দালাল লাগিয়ে নানানরকম মিথ্যা কথা বলে কিংবা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষদেরকে শ্রমিকরূপে বিভিন্ন খনিতে যোগান দিত। একসময় লেখককেও চাকরি সূত্রে এই অবাঞ্ছিত ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। বাস্তবসম্মত কারণে অতিরিক্ত কয়লা উৎপাদনের প্রত্যাশায় সাহেব জেম্সের নির্দেশে বিপদজ্জনক স্থানে কয়লা কাটতে গিয়ে সাঁওতাল যুবক টুইলা মাটিতে চাপা পড়ে মারা যায়। সেই মৃতদেহ শনাক্তকরণে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার গহ্বরে বাঙালি রেজিংবাবু চঞ্চলকুমার, ডাক্তারবাবু ও স্বয়ং ম্যানেজার সাহেব জেম্স প্রবেশ করে। রেজিংবাবু চঞ্চলকুমারের বকলমে কতৃর্পক্ষের নির্মম অমানবিক শোষণ, নির্যাতনের বাস্তব রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণকে বিকৃত করে টুইলার পরিণতি অভাবগ্রস্ত শ্রমিকের লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুতে পর্যবসিত করে।

> পরদিন 'মাইন-ইন্সপেক্টরে'র নিকট দু একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বৃদ্ধ ম্যানেজার মিস্টার জেম্স হাসিতে হাসিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, চুরি করিয়া বেশি কয়লা কাটিবার আশায় তাদের বেড়া পার হইয়া টুইলা Hanging Coal (ঝোলা কয়লা) কাটিতে গিয়া মরিয়াছে। সেখানে কাজ করিতে তাহাকে কেহই হুকুম দেয় নাই।[৩৮]

চঞ্চলকুমারের অনুরোধে মৃত টুইলার স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, কোম্পানির বাজে খরচের সামিল। অর্থলোলুপ সাহেবের এই নির্মমতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে-

> যে হতভাগিনীর স্বামীকে কোম্পানির স্বার্থের জন্য জানিয়া শুনিয়া হত্যা করা হইল, তাহাকে আজ এই দুর্দিনে কিছু সাহায্য করা যদি কোম্পানির বাজে খরচ হয় তাহা হইলে কোম্পানির আসল এবং সত্য ন্যায়ের খরচ কোন্‌খানে, চঞ্চল সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। কথাটা শুনিয়া তাহার রাগও হইল, ভাবিল, মনুষ্যত্ব- বিবর্জিত এই ক্ষুদ্র সাহেবের দল নিজের স্বারথ সিদ্ধির জন্য করিতে পারে না, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়ার কিছুই নাই।[৩৯]

রেজিংবাবুর বাঙালি সুলভ শ্রমিক দরদী মানসিকতা দেখে মালিক স্বার্থহানির আশঙ্কায় তাকে বরখাস্ত করে। অপরাধবোধে অনুতপ্ত বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তি চঞ্চলকুমার নিজের পাপ স্খালনের জন্য প্রাপ্য টাকা কোম্পানির ক্ষতিপূরণ বাবদ মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগীকে দেয়। এই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চঞ্চলকুমার অপরাধপ্রবণ অসহায় হৃদয়-বেদনায় নিভৃত-এ অশ্রুবর্ষণ করেছে। কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন শক্তিশালী মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতায় শ্রমিকরা শিকার হয়েছিল। তাই সোহাগী নির্বিবাদে পুনরায় অন্ধকার মৃত্যু গহ্বরে ক্ষুধাসম শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় তৎপর হয়ে ওঠে। 'পলহানের বিহা' ছোটগল্পে সাঁওতাল যুবক পলহান বর্ধমান জেলায় কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে খোঁড়া হয়। এরফলে পলহান আর কাজ করতে পারত না। শেষ পর্যন্ত বীরভূমের আদিবাসী মেয়ে টগরীকে বিয়ে করে। যৌবনবতী টগরীর চাহিদা পূরণ না হওয়ায়, অন্য এক বাঙালিবাবুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। স্বামীত্বের অধিকার হারানোর ক্ষোভে দুঃখে পলহান শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

কয়লাকুঠির নির্মম শোষণে পলহানের জীবন যৌবনকে শেষ করে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী পলহানের বিবাহ-বাসনা, দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব কলহ গল্পের মূল বিষয় হলেও, খনি অঞ্চলের অভিশপ্ত শ্রম জীবনের আগ্রাসনে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যার সকল স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়াকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিয়েছে। 'মা' ছোটগল্পটিতে কয়লাখনি অঞ্চলের কুলি-কামিন সাঁওতাল কন্যা পরী প্রেমজীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একদিকে প্রেমাস্পদের প্রতি আদিম টান, অন্যদিকে পিতার আদেশ পালন করা- এই দুই'র মাঝখানে পড়ে দুখনের ভাইজি পরীর জীবন বিচিত্র রহস্য ভরে উঠেছে। পরীর প্রেমিক টুরা। বিয়ে করে তারা দু'জনে সংসার জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। দুখন পরীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করায় এই মর্মে যে, পরী কোনোদিন কাউকে বিয়ে করবে না। একদিন খনির অন্ধকার গহ্বরে টুরা পরীর সামনে কামনার উদ্দামতা নিয়ে দাঁড়ায়, পরীও তার প্রতি সমর্পিত হয়। এরপর অনেকদিন কেটে যায়, অপরদিকে দুখনও মারা যায়। পরীর পেটে টুরার সন্তান তবুও পরী টুরাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। পরীর সন্তান জন্ম নিলে, মা-পরী সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য টুরার বাড়িতে উঠে। পিতৃ আদেশের কাছে প্রেমের প্রবলতা হার মানলেও সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সেই প্রেমই বড় হল।

শৈলজানন্দের সাহিত্য মূলত খনি অঞ্চলকেন্দ্রিক। এছাড়াও 'বিজুয়িনী', 'বনবিহগী', 'মরণ বরণ', 'বলিদান' ও 'অভাগা' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে পর্যালোচনা করলে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের শোষিত ও নিপীড়িত হাহাকারের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু তাদের শ্রেণি চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি শ্রমিক ও মালিককে দুটি শ্রেণি হিসাবে না দেখে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনচিত্রকে প্রধান করে তুলেছেন। খনি অঞ্চলের প্রকৃতগত পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বের দ্বারা সমাজ-আর্থ পটভূমির পরিবর্তনের কোন ব্যাখ্যা দেননি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) কর্মসূত্রে জীবনের প্রথম পর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলার বাইরে বিশেষত বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, এবং মধ্যপ্রদেশের অরণ্যঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছেন। অরণ্য অঞ্চলে বসবাস ও পরবর্তী কালে দীর্ঘ ভ্রমণের সূত্রে, বিভূতিভূষণ বিভিন্ন সময় অরণ্য তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সবরকম আদিবাসী মানুষদেরকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের জগৎ ভৌগোলিক পরিসীমা ছাড়িয়ে পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যপৃত হয়েছে। *আরণ্যক* (উপন্যাস), 'কালচিতি', 'কবি', 'শিকারী, ও 'বোতাম' প্রভৃতি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু তারই প্রতিফলন। এছাড়াও 'অভিযাত্রিক'(১৯৪১), 'স্মৃতির রেখা'(১৯৪১), 'তৃণাঙ্কুর'(১৯৪৩), 'ঊর্মিমুখর'(১৯৪৪), 'বনে-পাহাড়ে'(১৯৪৫), 'হে অরণ্য কথা কও'(১৯৪৮), '১৯৩৩-এর ডায়েরি', '১৯৩৪-এর ডায়েরি' '১৯৪৩-ডায়েরি'- প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনিগুলিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের গল্প-

উপন্যাসে পূর্বভারতের অরণ্যবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সাংস্কৃতিক পরিচয় কিভাবে ফুটে উঠেছে তার সম্পূর্ণতা পেতে ভ্রমণকাহিনীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনী হল 'হে অরণ্য কথা কও'। গভীর অরণ্যর রহস্যঘেরা পরিবেশে লেখকের অন্তর্লোকের উদ্ ঘাটনের কথা রয়েছে। ধলভূমগড়, পশ্চিম সিংভূমের সারান্ডা ফরেস্ট, ঘাটশিলার নিকটবর্তী অরণ্য অঞ্চলের পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্যবাসী উপজাতি শ্রেণি মানুষদের জীবনযাত্রাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন- সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতি। অরণ্যর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বঞ্চনা, শোষণ ও জীবন সংগ্রামের টুকরো টুকরো বিবরণ ভ্রমণকাহিনীর মূল বিষয়। হো মেয়েরা মাত্র সতেরো পয়সা মজুরিতে মাঠাবুরুর উঁচু দুর্গম পথ বেয়ে মাথায় করে কাঠ নিয়ে আসে। এছাড়াও তিনি ধলভূমগড়ে চাকুলিয়ার হাটে ঝাঁটা বিক্রি করতে আসা সাঁওতাল মেয়েদেরকে দেখেছেন। অরণ্যর বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা সাঁওতালদের কথা লিখেছেন। অন্নাভাব ও স্থানীয় শাসকদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হো, মুণ্ডারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত হো কুমারী মেয়েদের নামের তালিকা দিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা কথাসাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রবীন্দ্র- শরৎ উত্তর কথাসাহিত্যে তাঁর স্থান অভ্রভেদী। উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি উচ্চস্তরের সাফল্য দেখিয়েছেন। আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পরবর্তীকালে তিনি রাঢ় অঞ্চল কেন্দ্রিক সাহিত্যে রচনা করেছিলেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যে পরাধীন ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের আগমনে সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনে গ্রাম সমাজ আত্মসম্মানের দাবিতে মাথা তুলে দাঁড়ায় অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির অবসান অপরদিকে ধনতন্ত্রের (বণিকতন্ত্রের) সূচনা হয়। এখানেও শ্রেণি সংঘর্ষের ব্যক্তিগত দিকটা তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কখনও ছোটগল্পের সীমিত পরিসরকে অতিক্রম করে রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে অসাধারণ নৈপুণ্যতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি ছোটগল্প ও উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে প্রান্ত সমাজের জাতিগত ও শ্রেণিগত বৈষম্যর চিত্র রয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে মাঝিমাল্লা, মুচি, হাড়ি, বাগদি, জেলে, কুমোর, ডাকাত, ডাইনি, ফাঁসুড়ে, কোল, সাঁওতাল ও মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা স্থান পেয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাসের ফুল' গল্পের পটভূমিতে রয়েছে রানীগঞ্জের একটি কোলিয়ারি অঞ্চল। গল্পে কুলি-কামিন রমণী শ্রমজীবী চুড়কী, মালিক শ্রেণি ও আমলাতন্ত্রের অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে। চুড়কী খনি শ্রমিক, খনির কর্মচারী বিনোদকে সে ভালোবাসে। চুড়কী বিনোদকে প্রত্যহ একটা করে জবাফুল উপহার দিত। সারাদিন কাজ করার পর সামান্য একটু ক্লান্তির ফাঁকে কুলি-কামিনদের জীবনে প্রেমের প্রকাশ অন্যতম মানবতার

লক্ষণ। কিন্তু তাদের ভালোবাসা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আদিম সরলমতি চুড়কীকে মালিক শ্রেণির অর্থলিপ্সার নিষ্ঠুরতার হাতে শিকার হয়েছিল। একদিন খনিতে আগুন লেগে যাওয়ায়, অতিরিক্ত মজুরির লোভ দেখিয়ে চুড়কী ও বিনোদকে খনি গর্ভে আগুন নেভানোর জন্য নামানো হয়। বিনোদ খনি গর্ভ থেকে ফিরে এলেও চুড়কী খনি গর্ভে মারা যায়। কয়লাখনি গর্ভে আগুন জ্বলে ওঠা, আগুনের হাত থেকে খনিজ সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে সাঁওতাল রমণী চুড়কীর জীবন ঘাস ফুলের মত দলিত হয়েছিল। এভাবেই প্রতিনিয়ত কয়লাখনি অঞ্চলে কুলি-কামিন শ্রমিকদেরকে নানারকম সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছিল। 'কমল মাঝির গল্প' গল্পটি ছোটদের জন্য লেখা। কমল মাঝি কালকেপুরের ডাঙ্গার সাঁওতালদের সমাজপতি, সকলে তার কথা মানত। গ্রামে ঝগড়া বিবাদ হলে কমল মাঝি মিটিয়ে দিত। লেখক ছেলেবেলায় কমল মাঝির কাছে সৃষ্টিতত্ত্বের গল্প শুনেছিলেন। কমল মাঝির ধারণা ভগবান আদিতে দুই মানুষ সৃষ্টি করেছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা হল আজকের মানুষ। 'শিলাসন' গল্পটিতে নির্দিষ্ট কোন আদিবাসীর উল্লেখ নেই। গল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের জীবনযাত্রার ক্রমবিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূতত্ত্ববিদ্ ও বিলেত থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার পাস, বিজ্ঞানবাদী অমল চৌধুরী। সে সময় দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টের কাজ চলছিল, ভূতত্ত্ববিদ্ হিসেবে তার কাজ ভ্যালি প্রজেক্টের কুফল সম্পর্কে অনুসন্ধান করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো। অনুসন্ধান কাজের সূত্রে তিনি প্রথমে একটি জীপ, একটা ট্রলার, তিনজন অনুচর এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টের অঞ্চলে ঘুরে দেখছিলেন। প্রজেক্ট এলাকাটি জঙ্গলে ঘেরা, মাঝে মাঝে ছোট খাটো টিলা বা পাহাড় ইতস্তত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদিন জীপটি রাস্তায় দুর্ঘটনায় শিকার হলে তাকে নেমে স্থানীয় আদিবাসীদের একটি গ্রামে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অমল বেশ কয়েকদিন এখানে থেকে এই মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে নানা তথ্য সংগ্রহ করে, নিজের অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন। নগর বহির্ভূত, সভ্যতা বিবর্জিত এইসব অরণ্যবাসীদের জীবনযাত্রা, পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যাভাস, সবকিছুই শহুরে অমলকে রোমাঞ্চিত করে। পেশাগত কাজ করতে করতে একটা নেশা যেন তাকে পেয়ে বসে। একদিন তিনি ঘুরতে ঘুরতে একটি গ্রাম খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্রামটি অরণ্যর মধ্যকার আর পাঁচটা গ্রাম থেকে স্বতন্ত্র। ঐ গ্রামে তাকে রাত কাটাতে হয়। কিন্তু তারপর থেকেই অমলের জীবন পরিবর্তিত হতে শুরু হয় এবং প্রতিনিয়ত নানা আকস্মিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। গল্পকারের ভাষায় বলা যায়-

> আজ জগতে আর্য-অনার্য ভেদটা উঠে গেলেও, মুখে না মানলেও, ওদের আমাদের বিচার-ধারাটা স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সভ্য অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন আর সংস্কার মুক্ত বিশ্বাসবাদী আর বুদ্ধিবাদী, যা বলা যাক, দুটি স্তরভেদে রূপান্তরিত হয়েছে।[৪০]

আর্যজাতির প্রতিনিধি অমল চৌধুরী আদিবাসীদের জীবনে সরল বিশ্বাস দেখেছে। তারা দেবতারজ্ঞানে এক শুভ্র শিলাসনকে পূজা করে। তাদের বিশ্বাস আগত অতিথির অপমান হলে ধর্মভ্রষ্ট হবে, সাদা পাথর কালো হয়ে যাবে, আকাশ তাম্রবর্ণ ধারণ করবে, গাছের পাতায় শুঁয়োপোকা লাগবে, নদীর জলে পোকা থিক থিক করবে, পাখিগুলো শকুনের মতো ডাকবে, বাঁশের বাঁশি শব্দহীন হয়ে যাবে এমনকি সূর্যের স্বর্ণ বর্ণ সিসার মতো হয়ে যাবে। বিশেষত এই জনগোষ্ঠীর নিষ্ঠা, আজন্ম লালিত এক সংস্কারের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস, হিংসা, দ্বেষ কলুষতা বর্জিত জীবনাচরণ, এক নারীর তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, শুদ্ধাচারী মন সবকিছু অমলের শিক্ষিত অহংকারী মনকে এক পলকে সে শিক্ষা দিয়ে যায়। অমল চৌধুরীকে নতুন মানুষে পরিণত করে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)'র 'বুধনী' ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজাতির আদিম অসভ্য বর্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক বিল্টু ও নায়িকা বুধনী। বুধনীকে দেখে বিল্টু তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বিল্টু বুধনীকে বিয়ে করে এবং একটি সন্তান হয়। জাগতিক নিয়মে সন্তানটি মাতা বুধনী'র অনেক সময় দখল করে নিয়েছিল। সেই অপরাধে বিল্টুর আদিম প্রেম হিংস্র হয়ে ওঠে। বুধনীকে শুধুমাত্র একার করে পাওয়ার জন্য সে শিশু সন্তানটিকে হত্যা করে। লেখক তার 'বুধনী' ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজাতির আদিম অসভ্য বর্বতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ইতিহাস' ছোটগল্পে দুই প্রান্তবর্ণের অসম লড়াই- নিষাদের সঙ্গে শবরের।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)'র 'আন্টাবাংলা' ছোটগল্পে এক ওঁরাও পরিবারের অত্যাচার-লাঞ্ছিত ও মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ট্র্যাজিক পরিণতির ছবি পাওয়া যায়। গল্পে বিরসা ওঁরাও ও তার পুত্রবধূ নীলকর সাহেবের কুঠিতে কাজ করে। এক ছুটির দিনে কুঠিতে না গিয়ে নিজের খেতে কাজ করার অপরাধে সাহেব তাকে শাস্তি দেয়। বৃদ্ধ বিরসা শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। আর এই বিরসার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওঁরাও পরিবারের ট্র্যাজেডির শুরু হয়। বিরসার পুত্রবধূ ও বোটরার মা সাহেবের রক্ষিতাতে পরিণত হল। বোটরা হল টেনিস ক্লাবের বল কুড়োবার চাকর। অবশেষে নীলকর সাহেবরা নীলকুঠি বিক্রি করে চলে যায়। অপরদিকে বোটরা পি.ডব্লু.ডি কাজে রুলার গাড়ির ড্রাইভারিতে যোগ দিল। মানসিক অবসাদ দূর করতে মদের নেশায় আসক্ত হয়। একদিন রুলার গাড়ির স্টিয়ারিং এর উপর ঢলে পড়ে বোটরা মারা গিয়েছিল। একদিকে নীলকর সাহেবের অত্যাচার অপরদিকে বোটরা তীব্র মানসিক অবসাদ থেকে উঠতে না পারায় ওঁরাও পরিবারটি চিরতরে হারিয়ে যায়।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)'র ছেলেবেলা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা হাজারিবাগ অঞ্চলে কেটেছে। এ কারণে তিনি ছোটবেলা থেকে বিহারের পাহাড়, জঙ্গল, মালভূমি, নদী ও খনি অঞ্চলে ঘুরেছেন। সেখানকার আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের জীবনচর্চা,

মননচর্চা ও জীবনবোধকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। এই আদিবাসী সমাজকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ নামক ছোটগল্প লিখেছিলেন। গল্পে এক মুণ্ডা তরুণ ‘হোরো’ ওরফে স্টিফান হোরোর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। হোরো লেখাপড়া এবং খেলাধুলা উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। একদিন হোরো পড়াশুনায় উদাসীন হয়েছে । হোরোর মনে প্রভাব বিস্তার করে আদিবাসী সমাজের এক বুড়ো সোখা ও আদিবাসী মেয়ে চিরকি মুর্মু। তাই সে মাদল বাজিয়ে নাচে, ইলি খেয়ে নেশা করে, চিরকিকে সে ভালোবাসে। সব কিছু জেনে ফাদার লিন্ডন হোরোকে আটকে দিল কিন্তু তাতেও আশানুরূপ ফল হয়নি। এ সময় মুণ্ডা-সাঁওতাল-ওঁরাওদের সঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিবাদ চলছিল। আদিবাসী সমাজ বনাম ফাদার লিন্ডনের হোরোকে অধিকার করার লড়াই হল ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’। গল্পকারের ভাষায় বলা যায়-

> একদিকে কেম্বিজের এম.এ বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিন্ডন।.....অপরদিকে কোন্ এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই– বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস।[৪১]

ফাদার লিন্ডন বুড়ো সোখাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং চিরকি মুর্মুকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টিফান হোরোকে অধিকার করতে পারেনি। তাই জেল বন্দী থেকে টি.বি. রোগে আক্রান্ত হয়েও সে পরাজিত হয় নি। সে সগর্বে ঘোষণা করে তার নাম রুনু হোরো। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> পরাধীন ভারতের রক্ত ফেটে পড়া গল্প হিসেবে না দেখে আমি ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পটিকে স্বাধীন ভারতে আজো পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের জীবনযন্ত্রণার অসামান্য রূপায়ণ হিসেবে দেখতে চাই।[৪২]

এছাড়াও ‘মানশুল্কা’ ও ‘ফসিল’ ছোটগল্পে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)’র ‘মতিলাল পাদরী’ গল্পটি বাঙলাদেশ-বিহার সীমান্তে এক সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকার পটভূমিতে রচিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলাল পাদরী, তার মাটির গির্জা ঘরটি এক টিলার উপরে অবস্থিত। গির্জার উপরের শালকাঠের ক্রুশ চিহ্নটি দূর থেকে দেখা যায়। মাটির গির্জা ঘরের বেদীতে নানারকম সাঁওতালি কারুকার্য আঁকা ছিল। গির্জার সামনে একটা খড়ের ঘরে মতিলাল পাদরী বাস করতেন। গির্জায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই প্রবেশ করতে পারত। হঠাৎ একদিন আষাঢ় মাসে এক জল ঝড়ের রাতে গির্জার ঘরের দিকে কুকুরের ডাক শুনে গিয়ে দেখলেন একটি বিবস্ত্র এক সাঁওতালি মেয়ে গির্জাঘরের একটি কোণে প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মতিলাল তার সহকারী ফুলনকে দিয়ে ধাই বীণাকে ডাকা হল। মতিলাল ও ফুলন গির্জার মধ্যে এমন ঘটনা দেখে উভয়ে লজ্জিত বোধ

করে। অবশেষে শিশুর কান্না শোনা গেল, পাদরী চারিদিকে আলো দেখলেন, কালো আকাশে বক কিংবা নীল আকাশে পায়রা। গল্পের অবৈধ শিশু সন্তানটিকে পাদরী প্রাণ নামে ডাকত এবং শিশুটির উপর তিনি দেবত্ব আরোপিত করেছিলেন। গির্জার পাদরী মতিলাল তাকে মেরীপুত্র বলে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেছে। অন্যদিকে শিশুর মা ভামরকে নিয়ে গ্রামে কানাঘুষো শোনা যায়। তাই মতিলাল পাদরী গির্জা থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। শিশুর নিষ্কলুষ ভঙ্গি আবার তাকে ফিরিয়ে এনেছে। ছোটগল্পে লেখক সাঁওতাল শিশুটির অলৌকিক মহিমাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও 'নিম অন্নপূর্ণা' ও 'বাগান কেয়ারি' গল্পে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে (১৯১৮-১৯৭০)'র ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজাতির এক যাযাবর জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের যেখানে শেষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্প সেখান থেকে শুরু হয়েছে। গল্পের সূচনা পর্বে দেখা যায় ডুম ডুম ড্রুম নাগাড়া বাজিয়ে তাদের আগমন ঘটেছে। সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে একদল সাঁওতাল কুমারদহের জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর জমিদারির মধ্যে পালগ্রাম বসবাস শুরু করেছিল। জমির জন্য তারা জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর কাছে এসেছিল। যে অঞ্চলটিতে তারা ঘর বাঁধবে বলে অনুমতি চাইতে এসেছে তার নাম শুনে জমিদার আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল 'পালগ্রাম?...সেখানে থাকবে?' স্থানটি যে বসবাস উপযুক্ত নয় সেটা জমিদার জানতেন। প্রাচীনকালে সেই স্থানটিতে কোনও এক রাজবংশের বসবাস ছিল। বর্তমানে কালের নিয়মে সেটি 'টিলা' বা উঁচু ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য বিষয় হল সেখানে বর্তমানে ডাকাতদের আস্থানা ও মাঝে মাঝে বাঘেরও দেখা মেলে। এই ভয়ংকর রোমহর্ষক জায়গায় তারা কি করে থাকবে! সে কথা জমিদার ভাবছিল, কিন্তু নৃসিংহ মুখুজ্যের কথায় আশ্বস্ত হন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা কালো গ্রানাইটের তৈরী কিরাতের দলের ভয় নেই। সাঁওতালদের কথায়– বাঘ যদি তাদের খেতে পারে, তাহলে তারা বাঘকে খাবে না কেন! তাছাড়াও এই প্রকৃতির বুকে তাদের খাবারের রসদ কম পড়বে না। যদি ভালো খাবার না পায় তাহলে মাটিতে থাকা বিভিন্ন স্কন্দমূল, পাথরে থাকা সাপ বা গোসাপ পোড়া খেয়ে তারা জীবনকে অতিবাহিত করবে।

জমির খাজনা স্বরূপ তারা মহারাজের কাছে একটা শূকর নিয়ে এসেছিল। জমিদার তাদের দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন। চন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছে এই জমির জন্য তার খাজনার প্রয়োজন নেই, পালগ্রাম জঙ্গল সাফ করে দিলে খাজনা মুকুব হয়ে যাবে। এই মনুষ্য বসতিহীন ছোট টিলা পাল গ্রামকে কালক্রমে তারা একটি সুন্দর গ্রামে পরিণত করেছিল। জীবনকে বাজি ধরে তারা সেখানে সোনার ফসল ফলাতে শুরু করল। এখন তাদের আর শিকার করতে জঙ্গলে যেতে হয় না, শস্য ক্ষেতের মাঝে একটি মাচা তৈরী করেছে জন্তু

জানোয়ার এলেই তাকে শিকার করে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসকেরও পরিবর্তন ঘটে। চন্দ্র চৌধুরী মারা যাওয়ার পর তার পুত্র ইতিহাসে এম.এ, ইন্দ্র চৌধুরী জমিদার পদে আসীন হয়। ইতিহাস বিশেজ্ঞ ইন্দ্র চৌধুরী টিলা (পালগ্রাম) দেখে রহস্য সন্ধানের জন্য প্রবল উৎসুক হয়ে পড়ে। এর জন্য সে ১০-২০ হাজার অর্থের সাহায্যে খুঁড়তে চায়। কিন্তু মৃত প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা জানতে আর এক প্রাগৈতিহাসিক জীবকে উচ্ছেদ করতে হবে তা তাঁর বিবেককে আঘাত দেয়নি। কঠোর পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে তোলা নব পালগ্রামকে তারা পরিত্যাগ করতে চায় না, এর জন্য তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। অবশেষে ইন্দ্র চৌধুরী সাঁওতালদের কাছে পরাজিত হয়েছে। ইন্দ্র চৌধুরী তার মনের মধ্যে ইতিহাসের পাতায় নতুন সভ্যতা আবিষ্কার করার বাসনা চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়। এখানে এক ইতিহাসের বিরুদ্ধে আর এক ইতিহাসের লড়াই, যেখানে সাঁওতালরা জয়লাভ করেছে। লেখক তাঁর গল্পের ‘সৈনিক’ নামের মধ্যে দিয়ে সৈনিক স্বভাবের সাঁওতালদের সংগ্রামশীল মনোভাবকে বোঝাতে চেয়েছেন। অপর একটি ছোটগল্প হল ‘বিতংস’। সাঁওতালদের দরিদ্র, লাঞ্ছিত, অসহায় ও বঞ্চিত জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পে যোগী সুন্দরলাল একজন দালাল শ্রেণির মানুষ। একদিকে কালা জ্বরের প্রকোপে দলে দলে চা শ্রমিক মারা যাচ্ছে, চা বাগানের কাজ প্রায় বন্ধের মুখে, ঠিক তখনই সুন্দরলাল সাহেবদেরকে চা বাগানে নতুন কুলি সংগ্রহ করে আনার আশ্বাস দিয়েছিল। আসামের চা বাগানে সচরাচর কুলি জোগানো খুব মুশকিল হয়। সুন্দরলাল সাঁওতালদের নানারকম আদিভৌতিক ক্রিয়াকর্মের কাহিনি শুনিয়েছে। কারণ সাঁওতালরা কুসংস্কারকে প্রবলভাবে বিশ্বাস করে। সুন্দরলাল এই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে নিজের কাজ হাসিল করেছে। ফাল্গুন মাসে ‘বসং বোংগা’র পুজোর দিন সে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী শোনায়। এ মড়ক থেকে মুক্তির জন্য তাদেরকে নাঙা বাবার শিষ্য সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সে-ই তাদেরকে নতুন পথ দেখাবে এবং তারা সুখে জীবনযাপন করতে পারবে। দেবতার অপঘাতে মৃত্যুর ভয়ে তাদের এই যাত্রা সুখের ছিল না। তাই তারা ঘর ছাড়ার দুঃখে পুরুষ সাঁওতালরা বাঁশি বাজিয়ে দুঃখকে ভোলার চেষ্টা করেছে। এভাবেই তারা কালাযাদুর মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেছে। এছাড়া ‘টোপ’, ও ‘হাড়’ গল্পে আদিবাসীদের শোষিত জীবন যাত্রার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)’র ‘মানুষ-অমানুষ’ ছোটগল্পে একদল বুনো আদিম মানুষের (শবর জাতি) জীবনচর্চা ও হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। এরা বানর মারার দল, বানর তাড়ানো ও শিকার করা এদের জীবিকা। গল্পে শাঁখাভাঙা গ্রামে তীর ধনুক নিয়ে একদল মানুষ এসে হাজির। গ্রামের মোড়লের সঙ্গে রিদে কোটালের দর কষাকষি হয়। অবশেষে দলটি বানর তাড়ানোর বিনিময়ে নগদ ৭ টাকা ও তিন জোড়া গামছাতে রাজি হয়েছিল। গ্রামে বানর তাড়ানোর পর অন্যত্র চলে যাওয়ার আগে মোড়লের কাছে মজুরি নিতে তাদের ঝামেলা হয়।

মোড়ল তাদের ঠকাতে চায়, তারা জানায় নগদ ৭ টাকা ও দু জোড়া গামছা মজুরি হিসেবে দেওয়ার কথা ছিল। এতে বানর তাড়ানোর দল অসন্তুষ্ট হয়। এভাবে তারা গ্রামের মালিক শ্রেণির কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হয়েছে। অপর একটি ছোটগল্প 'লাটুয়া ওঝার কাহিনি'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাটুয়া ওঝা, জাতিতে সাঁওতাল। গুণিন বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। নানান পূজা ও সাধনা করে সে দৈবশক্তি লাভ করেছে। রোগ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তার কাছে বহু লোক আসত। একসময় লাটুয়া ওঝা গুণিন হিসেবে খ্যাতি থাকলেও বর্তমানে আর চলে না, তাই পূর্বের কার্যকলাপ সম্পর্কে গল্প করে তার অসহায় জীবনকে সামান্যতম ক্ষণিকের জন্য সে তৃপ্তি দিতে চায়। কেমন করে সাপে কাটা মৃতদেহকে সে বাঁচিয়েছিল, কেমন করে কয়লাখনি অঞ্চল থেকে সাপকে তাড়িয়েছিল, সে সব কাহিনির স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা তার পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক। চরম অভাব অনটন অসহায়ত্ব নিয়ে তাকে জীবনযাপন করতে হয়েছে। লেখক একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ওঝার জীবনে নস্টালজিক চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'ঝুমরা বিবির মেলা' ছোটগল্পে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যে বাস্তবতা চিরদিনই ছিল। রামায়ণ মহাভারত ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও তাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথায় বর্ণিত রয়েছে। *'চর্যাপদ'* থেকে শুরু করে *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'লোরচন্দ্রাণী', 'মঙ্গলকাব্য'* ও *'চৈতন্যজীবনীসাহিত্য'* আজ পর্যন্ত যতগুলো সাহিত্য রচিত হয়েছে কেউ সমাজ বাস্তবতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। সাহিত্যে মানুষের কথা বলে, তাদের বেঁচে থাকার কথা বলে। মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)'র ছোট গল্পেও তেমনই সমাজ বাস্তবতার ছবি ফুটে উঠেছে। যারা সমাজের দলিত ও উপজাতি শ্রেণির মানুষদের জীবনযাত্রাকে নিয়ে তার রচনার সম্ভার সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর বেশিরভাগ রচনায় পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপর মালিক বা দালাল শ্রেণি মানুষের অত্যাচার, প্রশাসনিক অত্যাচার গল্পের মূল বিষয়বস্তু। উপজাতি সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য বছরের পর বছর আদিবাসীদের সঙ্গে মিশেছেন। শুধুমাত্র বাইরে থেকে দেখা নয়, তিনি দলিত-উপজাতি সমাজের অন্তরে প্রবেশ করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর এমনই একটি ছোটগল্প 'দ্রৌপদী'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী জাতিতে সাঁওতাল, বয়স ২৭ বছর। দ্রৌপদীর স্বামী দুলাল মাঝি পুলিশের গুলিতে নিহত। দ্রৌপদী নিজের আখের গোছানোর জন্য নয়, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের নিজের প্রাপ্য অধিকারটুকু বুঝে নেওয়ার লড়াই-এ সাহায্য করতে এসেছিল। এর জন্য সরকার তাদেরকে দেশদ্রোহী অ্যাখ্যা দিয়েছিল। অবশেষে দ্রৌপদী মেঝান ধরা পড়ে এবং সেনানায়ক অর্জন সিং প্রথমে ঘণ্টাখানেক ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, তারপর দ্রৌপদীকে– 'বানিয়ে নিয়ে আসা হয়' এই বানানোটা আর কিছু নয় একজন সাধারণ সাঁওতাল রমণীকে চার হাত পা বেঁধে দিয়ে যথেচ্ছভাবে গণধর্ষণ ও নানারকম দৈহিক অত্যাচার

করে। আসলে এই অত্যাচার ক্ষমতার দম্ভে প্রশাসন আদিবাসীদের উপর নিচ্ছক অত্যাচারের একটি প্রতিচ্ছবি। মহাশ্বেতা দেবীর অপর একটি ছোটগল্প হল ‘সাঁঝ-সকালের মা’। গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের (শবর জাতি) দরিদ্র জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র জটি, জটিরা প্রাচীন জরা ব্যাধের বংশধর, মেদিনীপুরের পাখমারা যাযাবর সম্প্রদায়ের মেয়ে। পাখমারা সম্প্রদায়ের বিয়ে কখনো তাদের সমাজের বাইরে হয় না। জটি শীতকালে সুবর্ণরেখার চরে শিস দিয়ে পাখি ধরত। সেখানেই একদিন উৎসবের সঙ্গে তার দেখা হয়, বেঁটে, বলিষ্ট, শ্যামলা, চেহেরা, কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। সে জাতিতে কান্দোরী, জটিদের তুলনায় উঁচু জাত। কান্দোরিদের জাত ব্যবসা চিকনপাটি বোনা। জটিকে দেখে গান বাঁধে। সেই থেকে তাদের পরিচয় ও প্রেম পর্ব শুরু হয়। কিন্তু জটি বিয়ে করতে রাজি নয় কারণ, জটিরা জরা ব্যাধের বংশধর, কৃষ্ণকে বাণ মেরেছিল। অবশেষে উৎসব জটিকে বিয়ে করে দূরের দেশে পালিয়ে গিয়েছিল। পাখমারারা সম্প্রদায়রা অনাচার মানবে না, সেটা উৎসব ভালোভাবে জানত। বিয়ের কিছুদিন পর উৎসব চোলাই মদের বিষক্রিয়ায় মারা যায়। জটি ছেলে সাধনকে নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। একদিকে জটির রূপের প্রতি পুরুষ মানুষের কামনা ও লালশার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো। অন্যদিকে ক্ষুধার হাত থেকে সাধনকে বাঁচাতে হবে। জটি একখানা লাল রঙের কাপড় আর ত্রিশূল নিয়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকতে শুরু করে- সে দিন থেকে জটি ঠাকুরনী হয়ে যায়, সব মানুষকে দৈব স্বভাবে সাহায্য করে, রাতে সাধনের মা। সারাদিনে ভক্তের কাছ থেকে যে পরিমাণ চাল পেত, তাতে সাধনের জন্য রাতে ভাত রাঁধত। নিজে সামান্য পরিমাণ ভাত খেত। দীর্ঘদিন ধরে কম পরিমাণ খাওয়ার ফলে এক সময় জটি ঠাকুরনী অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘কুড়োনির বেটা’ ছোটগল্পে লোধা উপজাতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে আলোচিত ঝাড়গ্রামের কাছে অরণ্যচারী লোধা সম্প্রদায় মানুষের বাস। লোচন আর কুড়োনির ইচ্ছা তাদের ছেলে জুড়ন একদিন বাবুদের ছেলের মতো বই খাতা নিয়ে স্কুলে পড়তে যাবে। লোচন মহাপাত্র বাবুদের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করে। একদিন মিথ্যা চোর-অপবাদে লোচনকে বাবুরা পিটিয়ে মারল। বাবু নির্লজ্জের মতো কুড়োনির রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বাড়িতে ঝিয়ের কাজ দিয়েছিল। কুড়োনি বুকের মধ্যে কষ্টকে চেপে রেখে সংসারের অভাবের তাড়নায় জুড়নকে বাবুদের বাড়িতে গরু চরানোর কাজে পাঠায়। চরণ বাবু এলে জুড়নকে সে পড়তে পাঠাবে। চরণ রাজনৈতিক কর্মী, লোধাদের স্বাধীন ইচ্ছা মহাপাত্রদের পছন্দ হয় না। লোধার ছেলে আবার বই খাতা নিয়ে পড়তে যাবে! একদিন তার বাবা লোচনের মতো জুড়নকে চুরির মিথ্যা অপবাদে বাবুরা পিটিয়ে আধমরা করে দিয়েছিল। কুড়োনি ছুটে যায়, চরণ নিজের দলবল নিয়ে ছুটে যায় শেষ পর্যন্ত বাবুদের গাড়ি করে জুড়নকে বাঁচানোর তাগিদে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কুড়োনি যাবার আগে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, মুখ বুজে মার খাবার দিন শেষ হয়ে এসেছে। জুড়নকে

কোলে নিয়ে কুড়োনি বসে থাকে, হাট থেকে কিনে আনা নতুন হারিক্যানটি জুড়োনের পাশে রাখে, জুড়ন পড়বে। জুড়ন বাবার মতো মরবে না, ওর মায়ের স্বপ্নকে পূরণ করবে। লোধারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখেছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য অধিকারটুকুকে ছিনিয়ে নিতে শিখেছে। এছাড়াও 'শিকার', 'বান', 'বাঁয়েন', 'ক্ষুধা', 'ভাত', 'গিরিবালা', 'আজীর', 'অপারেশন? বসাই টুডু', 'ময়না সতী', 'রুদালি', 'নুন', 'বেহুলা', 'জাতুধান', 'মাদার ইন্ডিয়া', 'ম্যাডনা', 'জন্মদিন', 'প্রতি ৫৪ মিনিট', 'চোলি কা পিছে', 'চিরা চরিত', 'রোম্থা', 'চম্পা', 'বিছন', 'এজাহার', 'সুরজ', 'গাগরাই', 'একটি রাত কহানি', 'আই পিসি ১৭৫', 'হরিরাম মাহাত', 'বাঘের থাবা', 'শিশু', 'পিন্ডদান', 'জাল', 'অন্ন', 'অরণ্য', 'অস্তি', 'বিশালাক্ষীর ঘর', 'সংরক্ষণ', 'রাখদর' ও 'স্তনদায়িনী' প্রভৃতি ছোটগল্পে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯৪৭)সত্তর দশকের কথাকার। লেখকের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন নানারকম বৈচিত্র্যের মোড়কে মোড়া। তিনি বলেছেন-

> নেশা ও পেশার সূত্রে আমাকে এ দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে নানা সময়। গল্প উপন্যাস লেখা চলছিলই....."[৪৩]

তাঁর ছোটগল্পগুলি হল আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক জীবন্ত দলিল। আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, তাদের দারিদ্র, রাজনীতির কাছে অসহায়তা, বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক উপাদানের অভাব, সামাজিক-মানসিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গল্পের মূল বিষয়। আদিবাসীদের সমাজবাস্ততার যন্ত্রণার দিকগুলি তিনি গল্পের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু বাস্তবে আদিবাসীদের উন্নতি হয়নি। কারণ, সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে একশ্রেণির আদিবাসী 'এলিট' হয়েছে। অপরদিকে, অধিকাংশ আদিবাসী মানুষ বঞ্চিত হয়েই চলেছে। আর যারা আদিবাসী শুভাকাঙ্ক্ষী, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবী তাদের প্রত্যকের মুখোশের আড়ালে স্বার্থান্বেষী মনোভাব লুকিয়ে আছে। তাঁর 'আলোচনাচক্র' ছোটগল্পে তার প্রতিফলন দেখা যায়। সকাল থেকে কুসুমডিহি গ্রামে একেবারে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। স্কুলের ছোট মাঠটা চেয়ার-টেবিলে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এখানে সরকারি উদ্যোগে এক 'আদিবাসী সমাজ' বিষয়ক এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তাই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুদ্ধিজীবী, আদিবাসী গবেষক, আদিবাসী শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমাজসেবী ভদ্রজনেরা এই রুক্ষ-ট্যাঁড়ভূমিতে আদিবাসীদের সমস্যা-সমাধানের কথা শুনতে ও বলতে এসেছেন। আদিবাসী দপ্তরের সরকারী অফিসার দে সাহেব সমাজ কল্যাণমূলক সেমিনারের আহ্বান করেছেন-

> গভর্নমেন্ট থেকে কিছু টাকা সেমিনার করার জন্য....তোমাদের(মধু সিং-কে) ওখানেই এটা হোক, ওখানে....প্রায় সব শ্রেণির ট্রাইবই আছে, ব্যাপারটা বেশ জমবে। প্রচুর লোক আনতে

হবে কিন্তু, আমি কলকাতা থেকে কয়েকজন আদিবাসী বিশেজ্ঞ আনব, সঙ্গে খবরের কাগজের লোকও যাতে পাবলিসিটি ভালো হয়।[৪৪]

সেমিনার উপলক্ষ্যে কুসুমডিহি গ্রামে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী প্রোজেক্ট অফিসার এস.ডি.ও আদিবাসী বিশেষজ্ঞ, আদিবাসী লেখক, আদিবাসী অফিসার দে ও মন্ডল বাবুর মতো সম্মানীয় ব্যক্তি, তথা সমাজের প্রথম শ্রেণির ব্যক্তিদের নিয়ে চাঁদের হাট বসেছিল। এছাড়াও আরো অনেকে ছিলেন, যেমন হাইস্কুলের শিক্ষক রাজকুমার হাঁসদা, রায়বাবু, গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার মধু সিং ও পঞ্চায়েতের প্রধান। অনুষ্ঠান কভার করতে কলকাতা থেকে দুই সাংবাদিক বিবস্বান বসু ও তার দুই সঙ্গী সুদেষ্ণা, কৌস্তভকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। প্রত্যেক বক্তাই নিজের বক্তৃতাকে সবার কাছে মনোগ্রাহী করে তোলা ও অনুষ্ঠানের 'রেপুটেশন' বজায় রাখতে তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে দূর-দূরান্ত থেকে সেই সকাল দশটায় আগত ক্ষুধার্ত আদিবাসীরা মঞ্চের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে রয়েছে। সকলের মনের মধ্যে মহা উৎসাহের ভাব দেখা গিয়েছিল। তারা সবাই ভেবে নিয়েছিল যে সরকারের পক্ষ থেকে নতুন একটা উৎসবের আয়োজন হবে। উৎসব প্রিয় আদিবাসীরা সেমিনার সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। দীর্ঘ সময় ধরে সেমিনারের বক্তব্য শোনা সকলে অধৈর্য হয়ে ওঠে। অসংখ্য বড়ো-বড়ো ব্যক্তিদের মিঠে মিঠে বক্তৃতায় তাদের দিকে কেউ-ই এতটুকু খেয়াল করবার প্রয়োজনটুকু বোধ করেনি। কারণ, প্রত্যেকে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল। আদিবাসী উন্নয়নের ব্যনার যে কেবল সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয় তা প্রমাণিত হয়। আদিবাসীদের কাছে 'সেমিনার কী' তার ধারণা থেকে-

অনেকেরই মুখে মুখে ঘুরছে সেমিনার শব্দটি। সেমিনার ব্যাপারটা কি তা অনেকেই জানতে চাইছে। কেউ বলছে, সেমিনার কি কোন নতুন পরব? কেউ বলছে, এটা কি কোন নাচের ইংরিজি নাম?[৪৫]

অন্যদিকে হাই স্কুলের শিক্ষক রাজকুমার হাঁসদা নিজের স্বার্থপূরণের নেশায় ব্যস্ত। তাই স্বজাতির বঞ্চিত মানুষদের কথা ভাববার সে সময় পায় না। এই সব মান্যগণ্য অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যস্ততায় ভুলে যায় সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য কী! একই সাথে ভুলে যায় মঞ্চের দিকে হাঁ করে জটলা করে বসে থাকা অভুক্ত, বঞ্চিত, রিক্ত স্বজাতির মানুষদের কথা। গল্পের অন্যতম চরিত্র ঈশানচন্দ্র দিগার জাতিতে লোধা। ব্রিটিশ সরকার লোধাদেরকে 'Criminal Tribe' ঘোষণা করেছিল। এই অমানবিক আইনটি ১৯৫২ সালে রদ হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ এখনও তাদের চোর বলে অপমান করে। লোধা যুবক ঈশানচন্দ্র দিগারের আক্ষেপ সেখানেই! আদিবাসী বিশেষজ্ঞদের বিশাল পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার পর, ঈশানচন্দ্র সরকার-আইন-প্রশাসন-সমাজের ভন্ড দুমুখো রূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। মঞ্চে উঠে সে বলে-

আমারে কেউ বক্তিমে করতে ডাকেনি, তবে সব বাবুরো দু-চার কথা যখন বলছেন, আমারো একটু বক্তিমে করতে ইচ্ছে হল। আমার নাম ঈশানচন্দ্র দিগার। আমি জাতে লোধা।.... বইতে

> লেখা আছে, লোধারা চোর। তা বাবুরো, আমি চোর নই, অমি এতক্ষণ বাবুদের বক্তিমে শুনেতেছিলাম। সব মিঠেন মিঠেন কথা বাবুদের।... কিন্তু এই সব অফিসার বাবুদের অফিসে গেলে তাঁরা আমাদের চিনতে পারেন না। সিলিপ দিয়ে বসে থাকে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। S.D.O সাহেব এলেন... কি মিঠেন মিঠেন সব কথা।... বাবুরো বলে, গরমেণ্টকে লেখা হয়েছে, এই দ্যাখো কাগজ। তা বাবু, কাগজ দেখলি কি আমাদের পেট ভরবে? তা ঘুরতি ঘুরতি এখন সব ছেড়ে দিইছি। বউ-বিটিকে বলিছি, তোর টাকা লাগবেনি। মনে কর, গরীব গরমেণ্টকে দান করে দিয়েছিস।[৪৬]

একথা শুনে মাঠের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অভুক্ত অবস্থায় বসে থাকা শীর্ণ ও কালো কালো ক্ষয় ধরা শরীরগুলোর শিরদাঁড়া টান টান হয়ে ওঠে। ঈশানচন্দ্র দিগার যেন তাদের মনের অন্তরের কথা বলে দিয়েছে। শহরের বাবুরা তো এতক্ষণ সে কথা বলেনি, এসব অধিকারের কথা শুনতে তারা সেমিনারে এসেছিল। কিন্তু মুহূর্তে সব উলট-পালট হয়ে যায়। উন্নয়নশীল ভারতের একমাত্র উন্নয়নের 'ব্র্যাণ্ড পার্সন' শিক্ষিত যুবক রাজকুমার হাঁসদা জানায় গ্রামের মূর্খগুলো সেমিনার সম্পর্কে কিছু বোঝে না। সুষ্ঠু সেমিনারে অসভ্যদের অভদ্র-আচরণ বরদাস্ত করা যাবে না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঈশানচন্দ্র দিগারকে মঞ্চে থামাতে ওঠে। কারণ, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে অশিক্ষিত ঈশানচন্দ্র দিগারের এই আচরণ তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষদের সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। লেখক তাদের ভিতরকার মনের মধ্যে জমে থাকা অব্যক্ত কথা, তাদের প্রতিনিধি ঈশানচন্দ্র দিগারের মুখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও 'ইনস্‌পেকশন' 'বিষয় যখন গনা', 'হরিণের মাংস' ও 'হাঁড়িয়ার দেশ' প্রভৃতি ছোটগল্পে আদিবাসীদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচার, দুর্নীতি ও তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪)'র 'বীজ' ছোটগল্পে দরিদ্র সাঁওতাল আদিবাসীদের উপর মহাজনের আর্থিক শোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, একসময় খরার কবলে পড়ে চাষযোগ্য জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, এর ফলে গ্রামের সমস্ত কৃষিজীবী সাঁওতালরা অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছিল। তাদের আরাধ্য দেবতা 'মারাং বুরু'র নামে নানান রকম পূজার্চনার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছে। পুরো সাঁওতাল সমাজ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এই সংকটের সময় সরকার পক্ষ (বি. ডি. ও অফিস) থেকে তাদেরকে সাহায্যের কথা জানানো হয়। গ্রামের সবাইকে চাষের জন্য বিনামূল্যে নতুন বীজধান দেওয়া হবে। কিন্তু গ্রামের মুখিয়া (মহাজন) তাদেরকে বাধা দেয়, মুখিয়া তাদেরকে পরামর্শ দেয়, পরদেশী বীজধান ক্ষেতে রোপন করলে অজন্মা হবে, ফসল ভালো হবে না। তাই বাধ্য হয়ে সরকারের বীজধানের পরিবর্তে গ্রামের সবাই মুখিয়ার গোলার ধান কর্জ নিয়েছিল। একমাত্র গমিয়া মুখিয়ার গোলার ধান কর্জ নেয়নি। ধান চাষের পর দেখা যায়, গমিয়ার ক্ষেতের ধান সব থেকে ভালো ফলন

হয়েছে। তা দেখে সরকার তাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে, এতে মুখিয়ার সম্মানে আঘাত লাগে। তাই মুখিয়া গমিয়াকে খুন করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত মুখিয়া মারা যায়। এখানে আদিবাসী সাঁওতালরা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এছাড়াও 'উরাং গাড়া', 'হাতির ছাপ', 'খরার আকাশ', 'লাস খালাস', 'লু', 'নুনা সামডের গল্প', 'অরণ্যের জীবন' ও 'কোলভরা' প্রভৃতি ছোটগল্পে আদিবাসীদের উপর শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭) সত্তর দশকের কথাশিল্পী। তাঁর শৈশবকালটা গ্রামে কেটেছে তাই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের আদব কায়দা, সংস্কৃতি ও ভালোবাসা পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় ধরে নগরবাসী হলেও তাদের প্রতি গভীরভাবে নাড়িরটান অনুভব করেন যা আজও সময়ে অসময়ে তাঁকে বিচলিত করে তোলে। তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যে সেই সব চরিত্রগুলো ভিড় করেছে। যেমন- 'হুলমারার ভমরা মাঝি' ছোটগল্পে ভমরা মাঝি হুলমারার গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, নিজস্ব সম্বল বলতে শুধুমাত্র বাস্তুভিটে ছাড়া কিছু নেই। তাই সংসারের হাল টানতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেয়েছে। সমাজের বাবু শ্রেণি মানুষদের কাছে হাত পাততে হয়েছে কিন্তু সব আশা ব্যর্থ। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবিহারীর ১৫ কাঠা শোলজমিন ভাগে চাষ করতে রাজী হয়েছিল। বঙ্কুবিহারী আইচ কিছুদিন পর ভমরা মাঝির কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়েছিল। সরকারের ভূমিসংস্কারের আইন অনুসারে ভমরা মাঝি ভাগ জমির উপর স্বত্ব থাকার ফলেও তাকে শেষ পর্যন্ত জমিদার বঙ্কুবিহারী আইচ জমি কেড়ে নিয়েছিল। জমিদারের চোখ রাঙানিতে ভমরা মাঝি জমির উপর তার অধিকারের কথা ভুলে গিয়েছিল। জমিদারের কাছ থেকে ভমরা মাঝি প্রতারিত হয়েছে। এছাড়াও 'চিকনবাবু', 'নাবাল', 'বাঁশফুলের কাব্য', 'খাঁচার পাখি' ও 'জনকুঁদরা' প্রভৃতি ছোটগল্পে তিনি সমাজে যারা চিরবঞ্চিত, অবজ্ঞাত, নিপীড়িত মানুষ বিশেষত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের সমাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাঁওতাল, শবর, লোধা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও তাদের প্রতি শোষণ বঞ্চনার দিকটি তুলে ধরেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা (১৯৫২)'র একটা স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে। তাঁর স্বভূমি বাছুর- খোঁয়াড় গ্রাম ও সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রিক(কামার, কুমোর, সাঁওতাল, ভুঁইয়া, ভূমিজ, লোধা, শবর প্রভৃতি জনজাতি) সেখানকার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির একজন নিপুণ কথাকার। জন্মভূমি মাটির সঙ্গে নাড়ীরটান, সেই ভিজে মাটির সোঁদা রুক্ষ গন্ধ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে প্রাণের নিবিড়তা, তাদের সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান, ব্যথা-বেদনা, ঈর্ষা-দ্বেষ সব কিছুই তাঁর মনকে প্রতিনিয়ত স্পর্শ করেছে। তাই তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম বাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষ ও তাদের বিচিত্র সংস্কার, কুসংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস ও অসহায়তার ছবি ফুটে ওঠে। যেমন 'দু কান কাটা' গল্পে সরকারি নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের

জীবন-জীবিকার পরিবর্তনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঝাড়গ্রাম জেলার সংলগ্ন অঞ্চলের লোধা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে ওঠে। গ্রামজীবনের উন্নয়ন ও জনসাধারণের সচেতনতার নানা সরকারি প্রকল্পের কথা উল্লিখিত আছে। যেমন- সাক্ষরতা প্রকল্প, ঘরে ঘরে শৌচাগার প্রকল্প, জন্ম নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচি, টীকাকরণ কর্মসূচি, মদ্যপান দূরীকরণ, মুরগির পুলেসার রোগের অনুসন্ধান, গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, হ্যাচারি, বাবুই ঘাসের দড়ি ও শালপাতার থালা তৈরী, ফুড প্রসেসিং, প্যাডি প্রসেসিং, ছাগল প্রতিপালন প্রকল্প ইত্যাদি। তমোনাশ চ্যাটার্জী গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক, তিনি নির্দিষ্ট দিনে সরকারের সহায়তায় পাবলিকের কাছ থেকে ছাগল কিনে আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লোধা পাড়ায় ছাগল বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ অন্যান্য জনজাতির তুলনায় ঐ অঞ্চলের লোধারা অনেকটায় পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়াও ‘কুসুমতলা’, ‘চিড়কিন ডাঙা’, ‘খোরপোষ’, ‘ধর্মের গাড়ু’, ‘শকুনির পাশা’ ও ‘খবা তিহার গল্প’ প্রভৃতি ছোটগল্পে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈকত রক্ষিত নব্বইএর দশকের মধ্যভাগে তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে নগরজীবন থেকে গ্রাম জীবনে নিয়ে গেছেন, বিশেষ করে একেবারে গ্রামের প্রান্তে থাকা অন্তেবাসী মাটির মানুষের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো বিপুল বৈচিত্র্যের সমারোহ নেই, সমাজের প্রান্তিক, নিম্নবর্গীয়, অন্তেবাসী মানুষদের দৈনন্দিন জীবনে অসহনীয় লড়াই, অস্তিত্বের সংকট, জীবন-জীবিকার সংকট, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভ্যাস ও ভাষা প্রভৃতির বিষয়ে একটা সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- ‘মূলুন’ ছোটগল্পে গোবিন্দপুর গ্রামের সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুরা মাঝি, স্ত্রী আদরি মেঝান। সংসার চালানোর জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে গোরু-ছাগল বাঁধার দড়ি, পদ্মফুলের আঁটি, কুসুমের বিচি মানবাজারের হাটে বিক্রি করে। গ্রামের প্রত্যেকের অল্প পরিমাণ কিছু চাষের জমি থাকলেও দুরা মাঝির বাস্তু ভিটের একমাত্র বাঁশপাতার চালাঘর ছাড়া আর কিছু নেই। তাই তাকে বাধ্য হয়ে মানবাজারের হাটের কেনা বেচার উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই গল্পকার এই প্রান্তিক, অন্তেবাসী মানুষগুলোর প্রতিনিয়ত ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে পেটের ক্ষুধা মেটায়। এছাড়াও ‘রাঙামাটি’, ‘শবরচরিত’ ছোটগল্পে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যে রচনার প্রধান উপাদান ছিল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র। বাংলায় এই কথাসাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সার্থকভাবে সূচনা হয়েছিল। সমাজে প্রচলিত জাতিতত্ত্ব অনুযায়ী চারটি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ভারতীয় মানব ইতিহাসে সমাজের উপরতলা মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে আরও অন্য সম্প্রদায় মানুষের বসবাস দেখা গেলেও তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কালের নিয়ম অনুসারে একদিন ইতিহাসের বিবর্তন ঘটে,

একেই স্বামী বিবেকানন্দ 'শূদ্র জাগরণ' নামে অভিহিত করেছেন। সভ্যতার আদিলগ্নে ব্রাহ্মণরা সমাজের উচ্চপদে অবস্থান করলেও একদিন শূদ্ররাই সেই পদে অধিষ্ঠিত হবে। এভাবেই বিশ্বজগত চালিত হবে। সাহিত্যে সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে সমাজের উপরতলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। নিম্ন শ্রেণি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনি খুবই কম ছিল। বঙ্কিম পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বেশিরভাগ অংশে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার কাহিনি পাওয়া যায়। আদিবাসী মানুষের জীবন কাহিনি বেশি পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিলাসী' ছোটগল্পে সাপুড়েদের জীবনযাত্রা ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্পে সমাজের প্রান্তিক এলাকার শূদ্রদের জীবনযাত্রাকে বর্ণনা করেছেন। বিশ শতকের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রান্তজীবন ও চেতনার পরিচয় কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়ের কথাসাহিত্যে গণমুখী জীবন প্রান্তজনের প্রতিবাদী চেতনার জটিল রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে তা আরও ব্যপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, আখ্যানের চেহরা পালটে যায়। একই সঙ্গে গল্পের বিষয়, গড়ন, জনচেতনা ও পাঠক মন পালটে যায়। রবীন্দ্র উত্তর কল্লোলযুগে প্রথম তাদের আগমন ঘটে। এই পর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম তাদেরকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিল। এরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যে তাদের দেখা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্প, ভ্রমণ সাহিত্যে ও উপন্যাসে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। পাহাড়ি রুক্ষ ও জঙ্গালাকীর্ণ ভূমির মধ্যে আদিবাসী জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে ছোটগল্প, উপন্যাসে তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বিষয়কে তুলে ধরেছেন। তাদের আচার-আচরণ, নাচ-গান বিভিন্নরকম সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় আদিবাসী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জাতিকে আপন করে তাদের দুঃখ বেদনাকে জানাতে চেয়েছেন যা তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম নেতা তিলকা মাঝি থেকে শুরু করে সিধু, কানহু, বসাইটুডু, দ্রৌপদী ও দুল্হন মাঝি কাউকে তিনি বাদ দেননি। কালের নিয়ম অনুসারে তাদের দাবিকে তাঁর সাহিত্যে বর্ণনা করেছেন। তাই অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর রচনা অনেকটা জীবন্ত। এছাড়া আরো অনেক সাহিত্যিকদের রচনায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, অনিল ঘোড়াই, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা ও সৈকত রক্ষিত প্রভৃতি। শুধু প্রকৃতি নয় সাহিত্যিকরা সমগ্র জীবনের শিল্পী। সে জীবন সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, লোধা ও খেড়িয়াদের দৈনন্দিন চালচিত্রের জীবন। বাংলা আখ্যান ভুবনে যা নতুন। এই সমস্ত সাহিত্যিকরা এক নতুন

জীবনবোধ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনকে যেমন বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছেন তেমনি এনেছেন আখ্যানের নতুনত্ব। এখানেই তাঁদের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, সুকুমার(সম্পাদিত), *বৃন্দাবন্দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত,* সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৫।

২. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদিত), *কবিকঙ্কন-চণ্ডী(কালকেতু),* রত্নাবলী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯,পৃষ্ঠা -২৫৬।

৩. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১০৮।

৪. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩-৪।

৫. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' *একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫৩।

৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩।

৭. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১০৮।

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৪।

৯. চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ, *প্রসঙ্গ উত্তর রাঢ়,* পৃথা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৮।

১০. গুপ্ত, ক্ষেত্র(সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩৫।

১১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১২৪।

১২. সেন, সুকুমার(সম্পাদিত), চৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য আকাডেমি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১০৭-১০৮।

১৩. হেমব্রম, পরিমল, 'ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', সিংভূম সাহিত্য ঝাড়খন্ড সংখ্যা, শারদ সংকলন, ১৪০৯, পৃষ্ঠা-১০৪।

১৪. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪০২, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।

১৫.বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., কলকাতা, আষাঢ়, ১৪২২, পৃষ্ঠা-৪।

১৬. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-23.
১৭. Risley, H.H, *Tribes And Castes of Bengal(vol.2)* 1998, Page-224.
১৮. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-26.
১৯. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-30.
২০. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-56.
২১. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-66.
২২. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-21.
২৩. Troisi, J, *Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal,* Manohor, 2021, Page-28.
২৪. মুর্মু, সাধুরাম, *লিটৌ গডেৎ* (১ম খন্ড), মার্শাল বাস্বের, ঝাড়গ্রাম, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৭।
২৫. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার (সম্পাদিত), *চর্যাগীতির ভূমিকা,* ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা- ২১৪-২১৫।
২৬. Risley, H.H, *Tribes And Castes of Bengal (vol.2)* 1998, Page-241.
২৭. Risley, H.H, *Tribes And Castes of Bengal (vol.2)* 1998, Page-21.
২৮. Risley, H.H, *Tribes And Castes of Bengal (vol.1)* 1998, Page-486.
২৯. Risley, H.H, *Tribes And Castes of Bengal (vol.2)* 1998, Page-101.
৩০. দাস, ক্ষুদিরাম(সম্পাদিত), *কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২১৬।
৩১. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (৩য় খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৪১৫, পৃষ্ঠা-২৬৬।
৩২. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (১৩দশ খন্ড), 'অভিভাষণ' শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৭২।
৩৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ,* এম. সি সরকার, ৮ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪০৫, পৃষ্ঠা-১৬।
৩৪. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খন্ড), 'সাহিত্যের পথে' বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা-৫৫৩।
৩৫. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা ১৪২৩, পৃষ্ঠা-২০৯-২১০।

৩৬. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ২৫১।

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাণীগঞ্জ কয়লা অঞ্চলের ইতিবৃত্ত,* যোধন প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২০-২২।

৩৮. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা ১৪২৪, পৃষ্ঠা-২৫১।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৪০. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদিত), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (৩য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

৪১. ঘোষ, সুবোধ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা- ২০৮।

৪২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বিশ বছর (১৮৯১-২০১০),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৭০।

৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'আমার উপন্যাস লেখার ইতিহাস', *কোরক,* প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা- ৬৮।

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *আমার একান্নটি গল্প,* একুশ শতক, ২০০৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৮।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৮।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৫।

ছকের সূত্রনির্দেশ:

১. ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতিও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৪।

২. শ, ড. রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৯, পৃষ্ঠা-৬৩৮।

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪১।

৫. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (১ম খন্ড), সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২০০৬, পৃ- ১৯৩।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬২।

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩।

৯.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩।

১০.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫২।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

শিল্প সাহিত্যের জগতে যাদের একসময় ঠাঁই হতো না, ভারতবর্ষের বর্ণবিভাজিত সমাজে যারা দারিদ্র ও পেশাগত কারণে সাধারণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে, নিজেদের শ্রম ও কৃষিকাজ যাদের একমাত্র সম্বল ছিল তারাই কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে সমাদর-সহানুভূতি-শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সাহিত্যে-শিল্পের মূল বিষয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে বিষয় ভাবনায় কয়লাকুঠির পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প, উপন্যাসে নতুন রকমের স্বাদ এনেছিলেন। *কল্লোল* বা *কল্লোল* পরবর্তী পত্রিকাগুলোতে তিনি কয়লাকুঠির কথাকার হিসেবে পরিচিত। কয়লাকুঠির পরিচয়-পরিবেশ-শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সব কিছুই তাঁর রচনায় আঁ-কড়া হিসেবে ওঠে এসেছিল। তিনি তা *গল্প লেখার গল্প* এবং *দিনমজুর-গল্প সংকলন* : নিবেদন-অংশ এ স্বীকার করেছেন- গল্পের পরিমন্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্ররা হবে সাঁওতাল। সাঁওতাল সম্প্রদায় নিয়ে রচিত ছোটগল্পগুলি অল্পদিনের মধ্যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক-বাড়ি বীরভূম জেলার রূপসীপুর(রূপসপুর) গ্রামে। তাঁর বাবা ধরণীধর মুখোপাধ্যায় ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির লোক, তিনি সাপ ধরতে পারতেন এবং ম্যাজিকও দেখাতেন। সেই সব শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে তিনি ভূতের গল্প, সাপের গল্প, খুনের গল্প, মানুষের গল্পে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম দু'জন আলাদা ধর্মের হলেও, একসময় তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রবল ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেই সময় কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬) গল্প আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন। পরবর্তীকালে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গল্পে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই সময় সারা বিশ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। তাই দুজনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর পল্টনে ভর্তির জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শৈলজানন্দের প্রভাবশালী মাতামহের কারসাজিতে তার ছাতির মাপ কম হওয়ায় বাদ পড়ে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম যুদ্ধে চলে যান। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সাথীহারা হয়ে একা মামার বাড়ি ফিরে যান। কলেজে ভর্তি হলেও অর্থাভাবে কলেজ মাঝ পথে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাতামহের কয়লাকুঠিতে কুমারডুবীর লোহার কারখানায় টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড এ চাকরী পান। কিছুদিন চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে দেন, কারণ এসব কাজ তাঁর জন্য নয়। সাহিত্য সাধনায় নিজেকে একনিষ্ঠভাবে নিয়োগ করলেন। কিন্তু দারিদ্র তাঁর পিছু ছাড়ে না। সমকালীন রাঢ় অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

সমাজ সংসারের নানা ঘটনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, উত্থান-পতনে তাঁর মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রতিনিয়ত তাদের জীবনের নতুন কিছু সত্যকে উপলব্ধি করতে লাগলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনা একান্ত মৌলিক ছিল। তিনি সমসাময়িক নানারকম অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনার দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন। অতএব শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনার বিষয়বস্তু জানতে হলে, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা সম্পর্কে একান্ত জানা দরকার।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশাল প্রভাবশালী হলেও, পরবর্তীকালে তাঁর আর্থিক অবস্থা এক সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছিল। মামার বাড়িতে থাকাকালীন মাতামহের উপপত্নীকে নিয়ে 'আত্মঘাতী ডায়েরী' নামে একটি ছোটগল্প লেখেন। এটিই তাঁর প্রথম ছোটগল্প। মাতামহের উপপত্নীকে নিয়ে গল্প লেখার অপরাধে মামার বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মাতামহ তাকে ভুল বুঝে পথ দেখতে বলেছিল। অবশেষে কয়লাকুঠির চাকরি ছেড়ে কলকাতার এক মেসে থাকতে শুরু করলেন। মেস জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর 'ধ্বংসপথের যাত্রী' গল্পে পাওয়া যায়। সেই সময় তাঁর কাছে লেখনী শক্তি, কঠোর সহিষ্ণুতা ও ভগবানের উপর অগাধ বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন সম্বল ছিল না। দরিদ্রের তাড়নায় তিনি কলকাতার ভবানীপুরে পানের দোকান করেন, সেখানেই তাঁর প্রথম মুরলীধর বসু (১৮৯৭-১৯৬০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) প্রমুখ তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে আড্ডা শুরু হয়। পরবর্তীকালে তাঁর পানের দোকান বন্ধ হলেও সাহিত্য সাধনা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকার কারণে, শেষ পর্যন্ত দরিদ্র সাহিত্য সাধনার পথকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তিনি প্রথম 'কয়লাকুঠি' (মাসিক পত্রিকা *বসুমতী* ১৩২৯, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) গল্পের মাধ্যমে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং একই সময়ে *প্রবাসী* পত্রিকায় 'রেজিং রিপোর্ট' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। *কল্লোল* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'মা' নামক ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে *কল্লোল* পত্রিকার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, সময় মতো সব লেখকদের ন্যায্য প্রাপ্য টাকাও দিতে পারত না। এই সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ তাই সামান্য টাকার জন্য তাকে প্রকাশকের কাছে যেতে হয়েছিল। প্রাপ্য টাকা চাইতেও তিনি অনেক সময় লজ্জাবোধ করতেন। তবুও তিনি কারো কাছে আর্থিক সাহায্য নেননি। একসময় কল্লোল কতৃর্পক্ষের সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়ার কারণে *কল্লোল* পত্রিকা ছেড়ে *কালি কলম* পত্রিকায় সম্পাদক পদ গ্রহণ করেছিলেন। *কালি কলম* পত্রিকায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস *মহাযুদ্ধের ইতিহাস* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। অবশেষে *কালি কলম* পত্রিকার কতৃর্পক্ষ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আর্থিক সহায়তা দিতে না পারার জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে আবার তিনি কল্লোলে ফিরে এসে কিছু গল্প

লিখেছেন। কল্লোলীয়দের সবচেয়ে কাছাকাছি থেকেও *কল্লোল* চেতনার অংশীদার হতে পারেন নি। গল্পের বিষয়বস্তু, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কল্লোল-চেতনার- বিরুদ্ধবাদে'র অংশীদার হিসেবে নিজেকে তাঁর সহযোগী সতীর্থদের সমসূত্রে গ্রথিত না করে তিনি এক পৃথক অবস্থান তৈরি করেছিলেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিক্তিতে আত্মপ্রক্ষেপহীন নিরুত্তাপ এক নির্লিপ্তির সঙ্গে তিনি রচনা করেছেন সাওঁতাল-বাউরিদের জীবনকাহিনী, পরে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের ইতিকথা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে জটিলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কল্লোল যুগের ভাববিহ্বলতা আর রোমান্টিকতা মিশ্রিত ভাবনার অভিঘাত তাঁর উপরে পড়েনি। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্লোলীয় ছক- যাযাবর কল্পনা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আবেগের মিশ্রণ, রোমান্টিসিজমের মোহমাখানো জীবনায়ন, প্রেমের বর্ণনায় প্রাচীন রক্ষণশীল রীতির পরিবর্তে যৌন জীবনের অকপট প্রকাশের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব অনুসরণ না করে, তিনি এক নিজস্ব মৌলিক রীতি তৈরি করেছেন। ছোটগল্প গুলিতে সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সহজলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বন্দ্ব জটিলতা বিহীন জীবনের চালচিত্র এঁকেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শেষ জীবনে অর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে সিনেমা পরিচালনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'নন্দিনী' (১৯৪১)। ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ (B.F.J.A) থেকে 'বন্দী' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন। এরপর তিনি 'জীবন মরণ', 'ডাক্তার', 'শহর থেকে দূরে', 'শ্রীদুর্গা', 'সন্ধি' 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম', 'রায়চৌধুরী', 'একই গ্রামের ছেলে', প্রভৃতি ছোটগল্পের কাহিনিগুলিকে অতি দক্ষতার সহিত চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করেন। নিজে 'কথা কও' ছবিতে অভিনয় করেছেন।

ভারতবর্ষে বর্ণবিভাজিত সমাজ সৃজনের পিছনে কুটিরশিল্পের একটা সরল সম্পর্ক রয়েছে। কুটিরশিল্পকে অবলম্বন করে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সমাজের অধিকাংশ মানুষের পেশা বর্ণভিত্তিক ছিল তাই বর্ণভিত্তিক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত মানুষ জাতি-বর্ণ-ধর্ম-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সংগঠিত স্থায়ী কর্মী হিসেবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময় রেলপথ ও কলকারখানা গড়ে ওঠায়- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অন্যদিকে রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়। কয়লা একমাত্র জ্বালনির উৎস হওয়ার ফলে কয়লাখনির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আগে থেকে কয়লাখনির উৎপাদনের কাজে কিছু লোক যুক্ত ছিল। দেশীয় পদ্ধতিতে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো, তাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেত না। অধিক সংখ্যক মানুষ ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন

বিকল্প রাস্তা ছিল না। সেদিন কয়লাখনিগুলোতে অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ হয়েছিল। এই সব শ্রমজীবী মানুষ সরাসরি খনিকর্মী হিসেবে যুক্ত হতে পারেনি। কারণ, কয়লাখনি মালিকরা স্বল্প সংখ্যক স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে, বাকি কর্মীদেরকে ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিয়োগ করা হত। কয়লাখনি ঠিকা কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবন কয়লাখনি খাদের মতোই অন্ধকার ছিল।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ ছোটগল্প কয়লাখনি অঞ্চল কেন্দ্রিক। এর আগে ভারতের কয়লাখনির ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা একান্ত দরকার। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' কোম্পানির উদ্যোগে ১৭৭৪ সালে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জে কয়লাখনি শুরু হয়। জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ১৮২৮ সালে 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' নামে এক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর কয়লাখনি ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করতে ১৮৩৬ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে রাণীগঞ্জ কয়লাখনিটি সত্তর হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে রাণীগঞ্জের কয়লাখনিটিই ভারতবর্ষের বৃহত্তম ছিল। উৎপাদনের পরিমাণও বেশ ভালোই ছিল। কিছুদিন পর দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' এবং নারায়ণ কুলির একটি খনি এক সঙ্গে সংযুক্ত করে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' নামে একটা নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে কয়লাখনির ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। প্রথম পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে 'সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিস কোম্পানি লিমিটেড' নামে এক সরকারি কয়লা সংস্থা গঠিত হল। কয়লাখনি ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের উত্থান পতনের ইতিহাসে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশদের উদ্যোগে ভারতে তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হলেও, কিংবা শিল্পের উন্নতি হলেও শ্রমিকদের দুর্গতি ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছিল। কুলি-কামিনদের জীবনযাপন সামন্ততান্ত্রিক রাজাদের আমলে প্রচলিত দাস জীবনের স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বেশির ভাগ বাংলা কাব্যগুলিতে দেব-দেবী মাহাত্ম্য জ্ঞাপনের কথা রয়েছে। আসলে বাংলা কাব্য গুলিতে দেব-দেবী মাহাত্ম্য জ্ঞাপনের কথা বাংলা কথাসাহিত্যরই একটি অঙ্গ। এর মাধ্যমে আমরা বাংলার সমাজজীবনের উত্থান পতনের ইতিহাসকে জানতে পারি। কিন্তু পরবর্তীকালে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য পাশ্চাত্য ভাব বিলাসিতার দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল। এর ফলে বাংলা কথাসাহিত্যর জন্ম লগ্নে বাংলার জন-জীবন ও লৌকিক সংস্কৃতি উপেক্ষিত হয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। সমাজজীবনের নানারকম বৈচিত্র্য গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে কোনো বিশেষ ভৌগোলিক স্থানের প্রাকৃতিক চিত্র, উচ্চারণ রীতি, ভাষা- সংস্কার, রীতি-নীতি জীবন-চর্যা, ধ্যান-ধারণা ও জীবনানুগ আলেখ্য পাওয়া যায়। যা এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিচয় বহন করে। আর এই আঞ্চলিকতা বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম সার্থক সূচনা ঘটে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।

তিনি তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের একঘেঁয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনাস্বাদিত মুক্তির সুখ বয়ে আনলেন তাঁর 'কয়লাকুঠি' জাতীয় গল্পে। 'কয়লাকুঠি' জাতীয় গল্পগুলিতে রাঢ় অঞ্চলের কৃত্রিমতাবর্জিত মানুষদের সরল জীবনযাপন তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। 'কয়লাকুঠি' (১৩২৯), 'রেজিং রিপোর্ট' (১৩২৯), ও 'মা' ছোটগল্পের বিষয়বস্তু একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী, কল্পনার রঙে রাঙানো লোকশ্রুত কাহিনি নয়। অধিকাংশ ছোটগল্পগুলি তাঁর অভিজ্ঞতা নির্ভর রচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে *প্রবাসী*তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য রচনার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন-

> শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি- দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি।[১]

ভারতের শ্রমজীবী মানুষের উত্থান পতনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্য ছায়া ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর *রক্তকরবী* নাটকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। নাটকে উল্লিখিত যক্ষপুরীতে শ্রমিকদের উপর অমানবিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি সর্বদা সহানুভূতি ছিল, তাই বিশু ও ফাগুলালদের মতো চরিত্ররা প্রতিবাদে সাহস পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা রবীন্দ্র বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হলেও, রবীন্দ্র জীবনদর্শনের বাইরে এসে তাঁরা যে সাহিত্যে সৃষ্টি করেছিল, তা পুরোপুরি রবীন্দ্র ভাবনা বিরোধী ছিল না বরং রবীন্দ্র ভাবনারই পরিপূরক। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের অবহেলিত মানুষগুলিকে সাহিত্যের আঙিনায় টেনে এনে এক নতুন সাহিত্যের সূচনা করেছিল। সমাজে অবহেলিত মানুষগুলির বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, প্রেমের অচেনা জগৎ ও তাদের ধর্ম সংস্কারকে ঘিরে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা এক অজানা পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম একজন লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনি অঞ্চলও যে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা আনতে পারে, তিনি তা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীর সব মানুষের সুখ দুঃখ একরকম হতে পারে না। বিশেষ করে ভৌগোলিক অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার মান পালটে দেয়। এভাবেই তাঁর প্রথম বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার হাতেখড়ি ঘটে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্পে একই সঙ্গে বিশ্বস্ততা ও সততার পরিচয় পেয়েছেন। কয়লাখনি বিষয়ক গল্পধারার প্রেমোপজীব্য কাহিনিগুলিতে সাঁওতাল-বাউরিদের নিঃসঙ্কোচ প্রেম,

ভালোবাসায় ঈর্ষা ও আত্মত্যাগ গল্পে প্রকাশিত হওয়ার পর নতুন স্বাদ নিয়ে বাঙালি পাঠকের মনে সাড়া জাগিয়েছিলেন। 'কয়লাকুঠি' আদিম জনগোষ্ঠীর প্রেম ও বিবাহিত জীবনের বিচিত্র ছন্দের পরিচয় বহন করে। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য শুধু নয়, ভাষা ব্যবহারের গুণেও তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের সাহিত্য পাঠকের সমাদর লাভ করেন এবং বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতা আমদানি হয়। এই আঞ্চলিকতার রঙে রঞ্জিত হয়ে তাঁর গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনবত্বের বিকাশ ঘটল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আঞ্চলিকতা ও অভিনবত্ব প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৫ম খন্ড) গ্রন্থে বলেছেন-

> স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে "লোক্যাল কালার", তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।[২]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত কারণগুলি তাঁর কথাসাহিত্যের ঘটনা স্থান থেকে আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়। সাহিত্যে আঞ্চলিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আঞ্চলিক সাহিত্যের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

১. একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের অখন্ড, নিবিড় পটভূমি।

২. চরিত্র কাহিনির উপর অঞ্চল বিশেষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যর অমোঘ প্রভাব।

৩. আঞ্চলিক হয়েও সার্বজনীন।

৪. লেখকের গভীর জীবন বোধ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শৈশবে রাঢ় অঞ্চলে বেড়ে উঠার কারণে কয়লাখনি অঞ্চলের জনজীবনকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এর আগে অন্তেবাসী মানুষের জীবনযাত্রা বাঙালি পাঠকের কাছে অজানা ছিল। শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনই নয় তাদের ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল যাঁদের কথা কেউ কখনো ভাবেনি, যাদের বঞ্চনার কথা কেউ শোনেনি তাদের কথা শোনাতেই স্বতন্ত্র এক জগৎ নিয়ে সাহিত্যে এসেছিলেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠি প্রতীকের কথাকার। কয়লাকুঠি এলাকার ভৌগোলিক পরিচয়, পরিবেশ-শ্রমিক-মালিক জীবনপ্রবাহ-মানবপ্রকৃতি মোটামুটি সবকিছুই তাঁর রচনায় আঁ-কড়া হিসাবে পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে সাঁওতালরা কুলিমজুর। এরা বিশেষত রাণীগঞ্জ, উখরা, দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখনিতে কর্মরত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই সব সাঁওতাল কুলিমজুর-দিনমজুরদের নিয়ে বিচিত্র পটভূমিকায় ছোটগল্প লিখেছেন। সাঁওতাল খনি শ্রমিকদের জীবন তাঁর ছোটগল্পে নানাভাবে পাওয়া যায়। শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়, একদিকে কয়লাকুঠির মালিক, ম্যানেজার ও প্রশাসন আর অন্যদিকে দৈনন্দিন খেটে খাওয়া কুলি-কামিনদের দল। ম্যানেজারের দ্বারা নব নিযুক্ত কুলি-কামিনের দলকে আড়কাঠির মাধ্যমে এক কয়লাকুঠি থেকে অন্য কয়লাকুঠিতে কিংবা চা বাগানে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে চালান করে দিত। এর পরিণাম হিসেবে সহজ সরল কয়লাখনির কামিনরা প্রতিনিয়ত দালালদের যৌন লালসায় শিকার হয়।

কয়লাকুঠি পরিচালনার দায়িত্বে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুরা থাকত, তবে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুর দল কেউ শেষ পর্যন্ত কয়লাকুঠিতে স্থায়ীভাবে থাকতে পারত না। অনেক সময় বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুরা কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি বেশি মানবিক হওয়ার কারণে ম্যানেজারের চক্রান্তে চাকরী জীবন থেকে বরখাস্ত হয়েছে। এছাড়াও কয়লাখনি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে কোন বিপর্যয়ে ব্যথাদীর্ণ হয়ে, মর্মাহত হয়ে কিংবা বিচ্ছেদ-বিধুরতায় আক্রান্ত হয়ে কয়লাকুঠির চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। একসময় লেখক নিজে বড়বাবু কিংবা রেজিংবাবুর দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কারণ, লেখক সাময়িক কিছু সময়ের জন্য কয়লাকুঠিতে চাকরি করেছিলেন এবং সহানুভূতিশীল মন নিয়ে কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। কয়লাখনিতে চাকরী করার সুবাদে ম্যানেজারদের মনুষ্যত্বহীন অত্যাচার সহজ-সরল সাঁওতাল দিনমজুর এবং তাদের পরিবার জীবন ও গোষ্ঠীর মর্মান্তিক পরিস্থিতি তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। তাই তিনি পরিবারে আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কয়লাখনি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী লোকজন তারা কেউ শোষণযন্ত্রের চালক, কেউ বা সেই যন্ত্রচালকের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করত। এদেরকে নিয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ধনতন্ত্রের- বণিকতন্ত্রের শোষক মূর্তি, নরখাদক মূর্তি অঙ্কন করেছিলেন। শোষকদের কথা অনুযায়ী এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত থাকে। আড়কাঠি'রা শোষিত ও শোষকের মাঝে থাকে, অপরদিকে শোষকের কাছাকাছি অবস্থান করে। এরা কয়লাখনি শ্রমিকদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করে বণিকতন্ত্রের শোষণযন্ত্রকে সচল রেখেছিল। আবার বড়বাবু ও রেজিংবাবুরা শোষণযন্ত্রের অংশ হয়েও শোষিতজনের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তবে আর্থ-সামাজিক-মানবিক এইসব দিক থেকে আড়কাঠিদের চেয়ে অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। কখনো বড়বাবু ও রেজিংবাবুরা শোষিতদের পক্ষ নেওয়ার ফলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে, অথবা কয়লাকুঠির জীবন থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে শোষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এরা কেউই মালিক নয় বা মালিকের উত্তরাধিকারীও নয়, কিন্তু খনি পরিচালনা ও মুনাফা বৃদ্ধিতে এদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। খনি-শ্রমিকদের উপর শারীরিক অত্যাচার ও পীড়ন চালিয়ে শোষণ করে। কয়লাখনি থেকে যত বেশি সম্ভব মুনাফা অর্জন করা যায়। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরি বৃদ্ধি কোন কিছুই তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি।

বড়বাবু, রেজিংবাবুদের একটাই উদ্দেশ্য বেশি করে মুনাফা অর্জন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কোথাও কোম্পানীর ব্যক্তি মালিকানার দাপট দেখাননি, ম্যানেজারকে দন্ডমুন্ডের কর্তা করে পরোক্ষে ব্যক্তি মালিকানার স্বেচ্ছাচারী অমানবিক রূপটা গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তিন দশকের প্রথম দিকে আর্থিক সংকটের কারণে কুমারডুবির কয়লাখনিতে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প কয়েকদিনে খনি অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই জাতীয় গল্প রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কয়লাকুঠি কেন্দ্রিক তাঁর প্রথম ছোটগল্প হল 'কয়লাকুঠি'। গল্পটিতে সাঁওতাল, বাউরি, বস্তিবাসী, কুলি কামিনদের প্রেমজ জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। আদিম অনার্য জনগোষ্ঠীদের ভাষা, আচার-আচরণ, হাবভাব, রীতিনীতি, প্রণয়, বিরহ চিত্র তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, আর সেগুলো তাঁর গল্পে রূপায়িত হল। তাই তাঁর গল্পের শুরুতে জোড়জানকী কয়লাকুঠির প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে-

> কয়লা-খাদের মুখ হইতে কয়লা-টানা ছোট ছোট গাড়ির সরু ট্রাম লাইন, আঁকিয়া বাঁকিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া দূরে একটা 'ডিপো'র কাছে শেষ হইয়াছে। সেই ঘন-বিন্যস্ত আম-বাগানের ভিতর, ট্রাম লাইনের এক পাশে, একটা ছোট কদমগাছের তলায় বিলাসী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; থমথমে আকাশে ছেড়া-ছেঁড়া মেঘগুলার এক পাশে চাঁদ উঠিয়াছিল।...সাঁওতাল ও বাউড়ি কুলিগুলা কয়লা-বোঝাই ট্রাম গাড়ি লাইনের উপর ঠেলিয়া আনিতেছিল। এক দিকে কুলি রমণীরা 'সাইডিং' এর উপর বড় বড় মালগাড়িতে কয়লা বোঝাই করিতেছিল। কয়লা ফেলার ধুপ-ধাপ শব্দ এবং ট্রাম লাইনের ঘড়ঘড়ানির তালে তালে তাহাদের অপূর্ব মেঠোসুরের আনন্দ- সঙ্গীত বর্ষার জলো হাওয়ায় কাঁপিয়া বহুদূরের শূন্য প্রান্তরে মিলাইয়া যাইতেছিল।[৩]

জোড়জানকী কয়লাখনিতে সাঁওতাল ও বাউরি পুরুষ রমণী উভয়ে কর্মরত ছিল। ১৭৭৪- ১৮৪০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকদের চাহিদা কম থাকায় স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্গীয় তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের পুরুষ ও রমণীদের কুলি-কামিন রূপে পাওয়া যেত।

'কয়লাকুঠি' ছোটগল্পটি তুলনামূলকভাবে বড়। গল্পে মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে। গল্পের মাধ্যমে তিনি একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিখুঁতভাবে কলমের ক্যামরায় তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্পে পুরুষ চরিত্র দুটি নান্‌কু ও রম্‌না দুজনে জাতিতে সাঁওতাল। নারী চরিত্রও দুটি বিলাসী ও মাইনু পিয়ারী। বিলাসী জাতিতে বাউরি আর মাইনু পিয়ারীর জাতের উল্লেখ নেই। বিষণ নামে এক কিশোর চরিত্রটি সাময়িক কিছু সময়ের জন্য পাওয়া যায়। প্রথমে বিলাসী ঝরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করছিল। হঠাৎ একদিন বিলাসী নান্‌কুর সঙ্গে রাণীগঞ্জের জোড়জানকী কয়লাখনিতে পালিয়ে যায়। মাইনু পিয়ারী ও রম্‌না রাণীগঞ্জের জোড়জানকী কয়লাখনিতে একই সঙ্গে সবাই কাজ করছিল। ছোটগল্পে বিলাসী ভালোবাসে নান্‌কুকে, নান্‌কু ভালোবাসে মাইনু পিয়ারীকে আর মাইনু পিয়ারী ভালোবাসে রম্‌নাকে, রম্‌না ভালোবাসে

বিলাসীকে, এ নিয়ে একটা জটিল চতুর্ভূজ প্রেমের প্লট নির্মাণ করেছেন। বিলাসী নানকুকে বিয়ে করেছে, বিয়ের পরেও নান্‌কু, মাইনু পিয়ারীকে ভুলতে পারেনি। বিলাসী রম্‌নার সঙ্গে প্রেম করে নান্‌কুর অবৈধ সম্পর্কের প্রতিশোধ নিতে পারত, কিন্তু বিলাসী নিজের সম্মানের ভয়ে তা করেনি। একদিন বিলাসী জানতে পারে, তার স্বামী নান্‌কু মাইনু পিয়ারীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, বিলাসী প্রতিশোধ মানসিকতা নিয়ে, সামাজিক নিয়মের সমস্তরকম আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে রম্‌নার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। রমনা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, তার বাড়িতে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কাজ করতে পারবে না।

বিষণ এসে বিলাসীকে জানায় খাদের ভিতর নান্‌কু খুন হয়েছে এবং মাইনু পিয়ারীকে মৃত অবস্থায় খাদের উপর পাওয়া গেছে। বিলাসী নান্‌কুর খুনের খবর শুনে রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে কয়লাখাদে নামে। অবশ্য খাদে নামার ব্যপারে ইঞ্জিন চালক রম্‌না তাকে সাহায্য করেছিল। খাদে নেমেই বিলাসী প্রথমে নান্‌কুর মৃতদেহ পায়। অন্ধকারে সে হাতের স্পর্শে নিজের স্বামীকে চিনতে অসুবিধা হয় নি। বিলাসী আর বাঁচতে চায় না, আবার পরোক্ষণে সে তার মত পালটে নিয়েছে। মনে মনে সে বাঁচার কথাও ভেবেছিল এবং নান্‌কুকে নিয়ে সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলাসীর আশা পূর্ণ হয়নি। তাই বিলাসী তার স্বামীর মৃতদেহকে কাঁধে করে খাদের ভিতর থেকে সামনের দিকে টলতে টলতে এগিয়ে আসছিল। পৃথিবীতে তার বিন্দুমাত্র বাঁচার ইচ্ছা নেই। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিলাসীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাকে অবিশ্বাস্য করে তোলেননি, বরং পাঠকের কাছে বিলাসীর মৃত্যুকে অনিবার্যভাবে পরিকল্পনা করেছেন। হঠাৎ খনির ভিতরে মাটির চাপ কিংবা কয়লার চাপ পড়ে একই সঙ্গে বিলাসী ও মৃত নান্‌কু কয়লাখাদে সমাধিস্থ হল। বিলাসী রম্‌নাকে কথা দিয়েছিল, খনির নিচে ঘণ্টা বাজালেই সে যেন তাকে ইঞ্জিন চালিয়ে উপরে তুলে আনবে। কয়লাখনিতে আর ঘণ্টা বাজে নি, ইতিপূর্বেই কয়লাখনির গহ্বরে বিলাসীর মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল।

আলোচ্য গল্পটিকে অনেকে কয়লাখনি শ্রমজীবী মানুষদের দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প বলেছেন। গল্পটি সাঁওতাল-বাউরি সম্প্রদায় কুলি-কামিনদের একটি বাস্তব প্রেম আখ্যান। গল্পকার সাঁওতালদের নাচ-গান-মাদলের দ্রুম দ্রুম তালের সঙ্গে অন্তর্নিহিত প্রাণের ভাষার সংযোগ রয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে দিনমজুরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও সরকারি পক্ষকে পাওয়া যায়। এই সরকারি পক্ষের আবার দুই ভাগ রয়েছে- একদিকে পুলিশ প্রশাসন, কয়লাকুঠি ম্যানেজারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, অপরদিকে সরকারি অফিসের লোকজন যাঁরা প্রতি মুহূর্তে ভুল তথ্য পান, এর ফলে শোষিতের পক্ষ নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও প্রমাণাভাবে শোষকের কথা মত চলতে হয়। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে সেইসব দিকগুলি স্পষ্ট হবে।

‘রেজিং রিপোর্ট’ ছোটগল্পটি *দিনমজুর* গল্পগ্রন্থে ‘বিচারক’ নামে সংকলিত হয়েছে। ‘রেজিং’ কথাটির অর্থ হল ‘কয়লা তোলা’। খনি থেকে কয়লা তোলার যে মোট হিসাব মালিকের কাছে পাঠাতে হয় তা ‘রেজিং রিপোর্ট’। কয়লাখনি মালিকদের মূল লক্ষ্য হল মাটির নীচ থেকে বেশি পরিমাণে কয়লা তোলা। মালিকের এই অতিরিক্ত কয়লা তোলার চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কয়লাখাদে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হত। কয়লাখাদে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যু ছিল এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কয়লাখাদের গহ্বরে জীবনহানির আশঙ্কা থাকায় অধিকাংশ শ্রমিক কিছুদিন কাজ করার পর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। ম্যানেজারের কঠোর নিরাপত্তা থাকার কারণে একজন শ্রমিকও পালাতে পারত না। এরপর তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চলত। আধুনিকরণের (১৯৫৬) পূর্ব পর্যন্ত কয়লাখনিগুলি শ্রমিকদের কাছে মৃত্যুপুরীর সমান ছিল। কয়লাখনিতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ১৯৪৫ সালে ‘কোল্ডফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন’ নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। সংগঠন পরিচালনার জন্য একজন রিক্রুটিং তত্ত্বাবধায়ক ও একজন লেবার অফিসার ছিল। প্রয়োজনীয় শ্রমিক তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। সর্বমোট তাদের ৮টি ডিপো ছিল। যখনই কোনো কয়লাখাদে শ্রমিক প্রয়োজন হতো, তখন কোলিয়ারির ম্যানেজার কোনো একটি রিক্রুটিং ডিপোতে সর্দার পাঠিয়ে দিতেন। এরপর ১১ মাস চুক্তিতে গ্রাম থেকে শ্রমিকদের নিয়ে এসে নির্দিষ্ট কোলিয়ারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ডিপোতে ফিরে গিয়ে খাওয়া দাওয়ার হিসাব বাদ দিয়ে বাকি পয়সা পেত। এর জন্য ‘কোল্ডফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন’ তত্ত্বাবধায়ক কোলিয়ারির মালিকের কাছ থেকে কমিশন পেত। তবে বেশিরভাগ শ্রমিক মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পালিয়ে যেত কিংবা একবার কোনোরকমে মেয়াদ শেষ করতে পারলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত, আর সে কোনোদিন কয়লাখনিতে কাজ করতে আসত না। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য রিক্রুটিং কনট্রাক্টররা দালাল লাগিয়ে নানান মিথ্যা কথা বলে কিংবা স্বচ্ছল জীবযাপনের প্রলোভন দেখিয়ে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষদেরকে শ্রমিকরূপে বিভিন্ন খনিতে যোগান দিত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এইসব দাস ব্যবসায়ী আড়কাঠিদেরকে মধ্যস্বত্বভোগী বলেছেন। একসময় স্বয়ং লেখককেও চাকরী সূত্রে গ্রামাঞ্চল থেকে সস্তায় কুলিকামিন জোগাড়রের কাজ করতে হয়েছিল।

গল্পের মূল বিষয় অতিরিক্ত কয়লা উৎপাদন করতে গিয়ে কয়লাখনির ভিতরে কর্মরত সাঁওতাল কুলি টুইলার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া। খনির ভিতরে তেরো নম্বর কাঁথির চালের পাথর বেশ নরম ছিল, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে একথা জেনেও ম্যানেজার মিস্টার জেমস্ শ্রমিকদেরকে সেখানে কয়লা কাটার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ ম্যানেজারের কাছে শ্রমিকদের বাঁচা-মরা তেমন বড় কিছু নয়, বড় হল বেশি মুনাফা অর্জন

করা। সেই চাহিদা পূরণ করতে শেষ পর্যন্ত টুইলাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কোম্পানির নির্দেশ মতো রেজিংবাবু চঞ্চলকুমারকে কাজ করতে হয়। চঞ্চলকুমার চোখের সামনে শ্রমিকদেরকে লাঞ্ছিত হতে দেখলেও বাস্তবে তাদের জন্য কিছুই করতে পারে না। শুধু রাগে নিজেই গুমরে মরে, তাই তার ব্যথিত মন ও রাগের উত্তরে সাময়িক এক মানবিক নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছিল-

> আমাকে কেন পাপের ভাগী করলে সাহেব? আমি আগে থেকেই বলে এসেছি, খাদে কোথাও এতটুকু আয়তন নেই, বেশি রেজিং-এর আশা ছেড়ে দাও। তুমি আমার সে কথা শুনলে না, বললে নেহি মাংতা কুছ – রেজিং চাই – রেজিং! ...নাও এবার রেজিং!.. ও 'আনসেফ গ্যালারিতে' ও বেচারাকে কেন পাঠালে সাহেব?[৪]

আবার-

> চঞ্চল মনে-মনেই বলিল, নির্দোষ ওই সাঁওতাল কুলিযুবকের প্রাণের দাম, তোমার রেজিং-এর দামের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। নিজের স্বার্থের জন্য নিরীহ বেচারীদের খুন করে সাহসী হওয়ার চেয়ে বাঙালী যেন তার ভীরুতার কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকে চিরকাল, - তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না সাহেব।[৫]

কোম্পানির হেড অফিসের নির্দেশে এইভাবে দীর্ঘদিন মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে মিস্টার জেমস্ কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যুতে মানবিকতার দিক থেকে, আইনত দিক থেকে ও বিবেকের দিক থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। মিস্টার জেমস্ ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন মন নিয়ে অর্থের চাহিদায় তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে-

> ...কুছ পরোয়া নেই। এমন কত খুন হয়ে গিয়েছে আমার হাতে।...এখনও চাই, আরও বাড়াতে হবে রেজিং। হেড-অফিসের তাড়া সইতে হয় আমাকেই, বুঝলে চঞ্চল?[৬]

ব্যবসায়ী কৌশলে মিথ্যা কথা বলে সরকারি আমলা মাইনস্ ইন্সপেকটরকে বিভ্রান্ত করে দুর্ঘটনার সমস্ত দায়ভার মৃত শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির নৈতিকতা বিরুদ্ধ মনোভাবকে জেমস্ এর চরিত্রে আরোপ করে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরদিকে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি মানুষদের উত্থান ও মালিক শ্রেণি কিংবা তাদের প্রতিনিধির দলের ক্রমবর্ধমান মুনাফা চাহিদার এক নিশ্চিত পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ধনতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্বরূপ ম্যানেজার জেমস্ সমস্ত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণি ও সমাজের উপরে ইচ্ছাকৃতভাবে কলঙ্ক আরোপ করেছেন-

> পরদিন 'মাইনস-ইন্সপেক্টরে'র নিকট দু-একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বৃদ্ধ ম্যানেজার মিস্টার জেমস হাসিতে হাসিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, চুরি করিয়া বেশি কয়লা কাটিবার আশায় তাদের বেড়া পার হইয়া টুইলা hanging coal (ঝোলা কয়লা) কাটিতে গিয়া মরিয়াছে। সেখানে কাজ করিতে তাহাকে কেহই হুকুম দেয় নাই।[৭]

জেমস্ কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সব সময় ব্যস্ত থাকত, দিনমজুর কুলি-কামিনদের প্রতি মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। টুইলার স্ত্রী সোহাগী তার ব্যক্তিগত মানবিক অধিকারও জেমস্ কর্তৃক অপহৃত হয়ছে। তাই সোহাগীকে বাধ্য হয়ে জেমসের মানবিকতা বিহীন ব্যবসায়ী আচরণে বীভৎসতার কাছে মাথা কুটে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে।

> সাহেব সজোরে বুটের ধাক্কা দিয়া সোহাগীর হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,- নেই, হাম কিসিকো নেই যানে দেগা। ছোঁড়ী পাগলা হো গিয়া,- যাও!
>
> কয়েকজন সাঁওতাল কুলি দূরে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল– মৎ যানে দেও উসকো। পুলিশ আনেসে হাম লাশ উপরমে লে আয়েগা। যাও হাত পাকাড়কে ইসকো ধাঁওড়ামে লে চলো।[৮]

ম্যানেজার কর্তৃক কয়লাখনিতে কর্মরত মানুষদের অধিকার খর্ব করা, তাদের জীবনে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ম্যানেজারের আচরণে, কয়লাখনিতে কর্মরত শ্রমিকদের নীরতায় তা প্রমাণিত। সে শুধু শ্রমিকদের মানবিক অধিকার অপহরণ করে না, একই সঙ্গে মানবতার দাবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্লজ্জের মতো তাদের অর্থনৈতিক অধিকারও কেড়ে নিয়েছিল। ম্যানেজারের কূটকৌশল চালে নির্দোষী টুইলাকে কয়লা চুরির অপরাধে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে ম্যানেজার যখন সোহাগীর জন্য সাহেবের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা বললে, সাহেব সজোরে পায়ের বুট মাটিতে আছড়ে বলল, - “Damn your Twila, Babu!” কোম্পানির বাজে খরচ আমি হতে দিব না– জানো?” টুইলার অবর্তমানে দিনমজুরের বউ খাবে কি? জেমস্ জানায় ‘খাটবে খাবে’। ঔপনিবেশিক বণিকতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত জেমসের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মানবিকতার জায়গা ছিল না। বণিকতন্ত্র বিনা প্রাপ্তি ছাড়া সাধারণ মানুষকে কিছুই দিতে চায় না, তাই টুইলার অপমৃত্যু, সোহাগীর বিধবা জীবন ও কয়লাখনির কুলি-কামিনদের দুর্বিষহ জীবনযাপন কোনটাই তার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি। অবশেষে চঞ্চলকুমার সাহেবের বণিকতন্ত্রের সবরকম কুটকৌশলের চাল বুঝতে পেরেছিল। লেখক তাই অর্থলোলুপ সাহেবের এই নির্মমতার প্রকৃত স্বরূপ চঞ্চলকুমারের অসন্তোষের মধ্যে দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন-

> যে হতভাগিনীর স্বামীকে কোম্পানির স্বার্থের জন্য জানিয়া শুনিয়া হত্যা করা হইল, তাহাকে আজ এই দুর্দিনে কিছু সাহায্য করা যদি কোম্পানির বাজে খরচ হয় তাহা হইলে কোম্পানির আসল এবং সত্য ন্যায়ের খরচ কোন্‌খানে, চঞ্চল সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। কথাটা শুনিয়া তাহার রাগও হইল, ভাবিল, মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত এই ক্ষুদ্র সাহেবের দল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করিতে পারে না, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়ায় কিছুই নাই?[৯]

শ্রমিক দরদী চঞ্চলকুমার বাঙালিসুলভ আচরণে মালিক শ্রেণির স্বার্থহানির কারণ হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ সমূহ সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করে দিয়েছিল। সাহেবের লিখিত নির্দেশে প্রজাদরদী চঞ্চলকুমার’কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোলিয়ারি ত্যাগ করতে হয়।

> I am sorry. Your services are no longer required. I dismiss you and give you order to be be cleared up and leave Colliery within 24 hours.
> Herewith I send a slip to the Cashier who will pay you up.
> You should not call for any explanation as I have seen you, with my own eyes, in the pit No. 5.G.D. James[১০]

অপরাধবোধে অনুতপ্ত বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তি চঞ্চলকুমার সাময়িক কিছু সময়ের জন্য মানসিকভাবে শান্তি পেতে কোম্পানি থেকে প্রাপ্য সমস্ত টাকা মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগীকে দিয়েছিল। দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চঞ্চলকুমার লোকচক্ষুর আড়ালে শুধু একা একা চোখের জল ফেলেছে। অন্যান্য শ্রমিকদের এ ব্যপারে কোন প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়নি। অতএব সাধারণ শ্রমিকরা শক্তিশালী মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার শিকার হয়েছে। স্বামী সোহাগিনী নারী সোহাগী নির্বিবাদে পুনরায় অন্ধকার মৃত্যু গহ্বরে ক্ষুধাসম শত্রুর মোকাবিলায় তৎপর হয়ে ওঠে।

ম্যানেজার, রেজিংবাবু, সর্দার ও পুলিশ সব মিলিয়ে যে স্বতন্ত্র শ্রেণিবোধ তাতে বিবেক-মানবতা-ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয় এবং সবার শেষে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারে স্বার্থরক্ষার কথা ভেবে রেজিংবাবু তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু মালিক পক্ষের আপত্তির কারণে সমর্থনের সুযোগ পায়নি, ফলস্বরূপ তাকে বরখাস্ত হতে হয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রী ধনতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থার একটা দিক প্রকাশ পেয়েছে। আর জেমস্ এর বিচারে তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'ফসিল' গল্পের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। 'ফসিল' গল্পে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সংঘাতের শিকারে অঞ্জনগড়ের কুর্মী প্রজারা মরিসাস থেকে আগত বৃদ্ধ দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে অধিকারবোধে সচেতন হয়ে উঠে। উভয় শক্তি শেষ পর্যন্ত তাদের পরস্পরের শত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে মাহাতদের নেতৃত্বে গড়ে উঠা সংগ্রামী চেতনা থেকে উত্থিত বিদ্রোহকে বিনাশ যজ্ঞের আয়োজন শুরু করে। খনিগর্ভে ধ্বসে পড়া পীটের নীচে সমাধিস্থ হয়ে গেল শ্রমিকদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা। মৃত্যুপুরীর সেই আবরণ ভেদ করে শ্রমিকদের গণ আন্দোলনের কাহিনি কোনদিন দিনের আলোয় প্রকাশের পথ অন্বেষণ করতে পারবে না।

> লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ির গাঁইতা- কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূমিপর্যায়ে কোয়ার্টস্ আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই![১১]

সর্বহারাতন্ত্রের শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রামের প্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পে সর্বহারাতন্ত্রের শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রামের প্রভাব পাওয়া যায় না।

কল্লোলগোষ্ঠীর কয়েকজন লেখক মানুষের দরিদ্র নিয়ে যে রূপ সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই অর্থে অন্যায় অমানবিক বিষয়ে তেমন সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয় না। ‘ঝমরু’ গল্পের কুলি- কামিনরা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পে সংগঠিত প্রতিবাদী মানসিকতার দিকটি স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন। আর শৈলজানন্দ মুখপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণা, কামতাড়িত জীবনের নানা সমস্যা ও মানুষের অধিকারবোধ নিয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেমনই তাঁর একটি ছোটগল্প হল ‘মরণ বরণ’। গল্পে এক বৃদ্ধ কয়লাখনি শ্রমিকের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত যন্ত্রণা-দগ্ধ জীবনের এক করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধ শ্রমিকটির নাম ভাটুল, খাদের নিচে ব্লাস্টিং–এর কাজ করত। তিনি ছয় ছেলের পিতা, ছেলেরা বড় হয়ে জোড়াজানকীর কয়লাকুঠি খাদে কাজ করত। ভাটুলের পরিবারে বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ আসতে শুরু করে, সেই টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমি কেনে, সংসারও সুখে চলছিল। কিছুদিন পর সুখের সংসারে দুঃখ প্রবেশ করে। প্রথমে তার স্ত্রী কোন এক অজ্ঞাত কারণে অকালে মারা যায়। তারপর তাঁর ছয় ছেলে অর্থের লোভে প্রবল বর্ষণমুখর দিনে কোন এক সন্ধ্যায় আসন্ন বিপদকে উপেক্ষা করে তারা কয়লাখাদে কাজ করতে নেমেছিল। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তারা কাজ করার পর বাড়ি ফিরে, কিন্তু সেদিন কেউ বাড়ি ফিরে আসেনি, চিরদিনের মত খাদের তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। এরপর বৃদ্ধ ভাটুল এক যুবতী মেয়ে রুকিকে বিয়ে করে কিন্তু তার জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করতে অক্ষম। তাই রুকি গোপনে কয়লাখাদের সাহেবের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ রুকির গর্ভে এক সন্তান আসে। রুকি’র গর্ভের সন্তানকে বৃদ্ধ ভাটুল নিজের ঔরসজাত সন্তান ভেবে ফাগুকে নিয়ে বেশ সুখে ছিল। একদিন এই অবৈধ সন্তান ফাগু সদ্য সন্তানহারা ভাটুলের পিতৃ হৃদয়কে নৈতিকতার প্রশ্নে নাড়া দিয়েছিল। প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় বৃদ্ধ ভাটুল নিজের পৌরুষের অক্ষমতায় স্বামীত্বের অধিকার হারানোর ক্ষোভে দুঃখে অন্ধকার পাতালপুরীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। ভাটুলের আত্মহত্যার ঘটনা শুনেও রুকি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, বিচলিত হয়েছিল সেইদিন, যেদিন সাহেব রুকি ও ফাগুকে ফেলে রেখে অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যায়। সেই দিনই বোঝা গেল কয়লাখনির সরলপ্রাণ মানুষদের বিশ্বাসের জায়গাটা! কয়লাখনিতে খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের জীবন দর্শনে কোনও জটিলতা নেই, তাদের জীবন মুক্ত, স্বাধীন ও সরল। জীবনের এই সরলতাই তাদের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা বৃদ্ধ ভাটুলের মতো কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে রুকি সাহেবকে করুণভাবে অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল কিছুই হয়নি। একদিন সাহেবের কাছে রুকির যৌবনের প্রয়োজন ছিল। আজকে সাহেবের কাছে রুকির প্রয়োজনের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সাহেবকে রুকির ভবিষ্যত নিয়ে আর ভাবতে হয়

না। অতি তাচ্ছিল্যে ভাবে পকেট থেকে দুই টাকা বার করে বলল 'ডো রোপিয়া লো'। ফাগুকে 'রসগুল্লা' খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে টাকা দিয়ে, সাহেব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। এভাবেই কয়লাখাদে কর্মরত আদিবাসী মেয়েরা সাহেবদের দ্বারা প্রতারিত হত।

'পলহানের বিহা' গল্পে এক সাঁওতাল যুবক পলহান বর্ধমান জেলার কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। সে আর আগের মতো কয়লাখনিতে কাজ করতে পারে না। এই অবস্থায় সে বীরভূমের এক আদিবাসী মেয়ে টগরীকে বিয়ে করে। কিন্তু যৌবনবতী টগরীর দাম্পত্য জীবন সুখের না হওয়ার কারণে সে এক বাঙালিবাবুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পলহান স্বামীত্বের অধিকার হারানোর ক্ষোভে দুঃখে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ ভাটুলের মতো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। কয়লাকুঠির নির্মম শোষণ পলহানের জীবন যৌবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। খনি অঞ্চলের অভিশপ্ত শ্রম জীবনের আগ্রাসনকে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এক এক করে সকল স্বপ্ন, জীবনের সমস্ত রকম চাওয়া পাওয়াকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিয়েছে। স্ত্রী টগরীও তাকে প্রতি পদে অপমান করেছে। কয়লাখনির অধিকাংশ সাহেবদের চরিত্রের দোষ ছিল। সাঁওতাল রমণীদের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি ছিল। এইসব কারণে একসময় কয়লাখনি অঞ্চলে বসবাস করা সাঁওতাল, বাউরি কামিনদের গর্ভে সাহেবদের ঔরসজাত সন্তান জন্ম নিত।

'অভাগা' ছোটগল্পে ঝরিয়ার নিকটবর্তী খনি অঞ্চলের শ্রমিক টুইলার স্ত্রী মতিয়া ম্যানেজার সাহেবের নারীলোলুপতার শিকার হয়। ম্যানেজার সাহেব মাইনে দিয়ে একজন লোক নিয়োগ করেছিল। সাহেবের কথা মতো সে পয়সার লোভ দেখিয়ে কিংবা জোর জবরদস্তি কম বয়সী মেয়েদেরকে সর্বনাশ করানো তার কাজ ছিল। সুন্দরী মতিয়ার প্রতি সাহেবের যৌন লোলুপতার নজর পড়ে সেই কারণে স্বামী সোহাগিনী নারী মতিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। টুইলা স্ত্রীর আত্মহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সাহেবের মেমকে বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ করেছে। নিজেকে খুনি আসামী হিসেবে চিহ্নিত করে। এখানে একমাত্র টুইলাকেই প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। অন্যত্র ভাটুল কিংবা পলহন নিজের পৌরুষত্বের অপমানের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে *কালিন্দী* (১৯৪০), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) অনার্য অশিক্ষিত সভ্যতার অন্তরালবর্তী কুলি রমণীরাই ধনতন্ত্রের প্রাণ-পুরুষদের রিরংসার শিকার হয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের কাহার রমণীরা সামন্তপ্রভুদের রক্তবীজকে নিজ শরীরে ধারণ করে, পিতৃত্বের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে, সেই সব রক্তবীজ অঙ্কুরিত করেছে বাঁশবাদির জঙ্গলে। একইভাবে *কালিন্দী* উপন্যাসে সাঁওতাল রমণী সারী কল মালিক বিমল মুখার্জীর যৌন সঙ্গী হয়েছে।

'ঝুমরু' ছোটগল্পটি রূপসা কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলি-কামিনদের দারিদ্রপীড়িত কঠোর জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। রূপসা কয়লাকুঠির কুলি-

কামিনদের বর্ষাকালে সবার ছাতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কারোর ছাতা কেনার মতো সামর্থ্য নেই। তাই তারা বর্ষার সময় শিয়াড়ি পাতা দিয়ে ছাতা বানাবে বলে, ফরিদপুরের জঙ্গলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ম্যানেজার তাদেরকে ছুটি না দিয়ে রবিবার ছুটির দিনে পাতা সংগ্রহের উপদেশ দিয়েছিল। সাঁওতাল কুলি-কামিনরা তা নত মস্তকে মেনে নিয়েছিল। অভাবের তাড়নায় ক্ষেপে ওঠা সাঁওতালরা শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় মালিক কিংবা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারত কিন্তু তারা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়নি। ম্যানেজারের কথায় নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াতেও আত্মমর্যাদার বিষয়ে সোচ্চার হল না। এভাবেই রূপসা কয়লাকুঠির ম্যানেজার স্বৈরাচারী মানসিকতা দিয়ে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদেরকে আর্থিকভাবে শোষণ করেছিল।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে উল্লিখিত দিনমজুরদের জীবনে কোম্পানি ও ম্যানেজারদের বাদ দিয়ে আর এক শ্রেণি মানুষের প্রভাব দেখা যায়। এরা রেজিংবাবু কিংবা বড়বাবুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই শ্রেণির মানুষেরা রেজিংবাবু কিংবা বড়বাবুদের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে। লেখক এই মধ্যস্বত্ত্বভোগীদেরকে ‘আড়কাঠি’ বলেছেন। এই শ্রেণির মানুষেরা সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে জ্যান্ত মানুষদেরকে কেনাবেচা করে। কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনে ‘আড়কাঠি’দের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ‘বনবিহগী’ ছোটগল্পে সেই সময়ের মানুষ কেনাবেচার বাস্তব সত্যর প্রতিফলন ঘটেছে। আড়কাঠির সদস্যরা পুলিশের ছদ্মবেশ ধরে গ্রাম থেকে ৩০ জন সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদেরকে কয়লাকুঠিতে কাজের প্রলোভনে নিয়ে যায়। এই দিনমজুর শ্রমিকরা আড়কাঠিদের ফাঁদে পড়ে স্বাধীন বন্য জীবন থেকে প্রথমে কয়লাকুঠি তারপর আসামের চা-বাগানে শ্রমিকের কাজে চালান হয়ে যায়। কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে মুকরী (ময়নাটুলির) ম্যানেজার সাহেবের লালসার শিকার হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় মুকরী ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর পাশ দিয়ে দোকানের ‘সয়দা’ করতে যাওয়ার পথে এক হিদুস্থানী চাপরাশী তার পথ অবরোধ করে। সে জানায় ম্যানেজার সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। মুকরী চাপরাশী কাছ থেকে ডাকার কারণ জানতে চাইলে সে কিছুই জানায়নি। চাপরাশীর কথা মতো মুকরীও সাহেবের বাংলোতে ওঠে, ম্যানেজার সাহেব মদ খেয়ে রক্তিম-নয়নে চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল। মুকরী ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে ডাকার কারণ জানতে চাইলে দৃঢ় মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরে। মুকরীও অসহায়ভাবে ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে মুক্তি পেতে কাকুতি মিনতি শুরু করল। লেখক ঘটনাটাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন মনে হয় যেন, সাঁওতাল কামিনকে অবৈধভাবে উপভোগের অধিকার তার ম্যানেজারির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বণিকতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের কাছে মনুষ্যত্ব-মানবিকতা-বিবেকবোধ যেমন মূল্যহীন, তেমনি ভোগ্যপণ্যের মতোই শ্রমিকরা তাদের কাছে পণ্য-বিশেষ। অতএব কামিন মুকরীকে ভোগের ও বলাৎকার করার অধিকার ম্যানেজার সাহেবের যেন সহজাত প্রবৃত্তি।

গল্পে সহজ সরল সাঁওতাল মেয়ের উপর ম্যানেজার সাহেবের বন্য পশু সুলভ বর্বর আচরণ ও লালসা পীড়নের কথা খুবই অপমানকর। সেই সহজ সরল মেয়েটি নিজের শরীরের পবিত্রতা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কয়লাখনিতে কর্মরত সাঁওতাল মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে দেহকে বিক্রি করতে রাজী হয় না। তাদের কাছে অর্থের চেয়েও দৈহিক শুদ্ধতাই বড়। সেই দৈহিক শুদ্ধতার অমূল্য সম্পদকে রক্ষার জন্য আর্থিক নিরাপত্তার উৎসটিকে সে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে, প্রতিবাদে-প্রতিরোধে দুর্বার হয়ে উঠতে পারে। মুকরীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল, আড়কাঠিদের কথায় সে আসাম যেতে সম্মতি জানিয়েছিল। মুকরী সম্মতি জানানোর পিছনে অবশ্য সোনার সঙ্গে চিরসঙ্গিনী হওয়ার বাসনা পূর্ণ করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুকরী সাহেবের বর্বরোচিত আচরণকে বন্য কৌশলে প্রতিহত করল এবং সোনাকে নিয়ে নিঃসহায় নিঃসম্বলভাবে সেই খনি সংলগ্ন কুলি-ধাওড়া ছাড়ল। কয়লাখনির কুলি-কামিনরা নিজেদের মানসম্মান বাঁচাতে কোনরকম আপস মীমাংসা করতে চায় না। সোনা ও মুকরী তাপসীর কুঠিতে যায়। কয়লাকুঠিতে সাঁওতাল সর্দার থাকার কারণে কাজ পেতে তাদের অসুবিধা হয়নি। সর্দার তাদের দু'জনকে বিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাপসীর কয়লাকুঠি সর্দার হিসেবে ম্যানেজারের কাছে যথেষ্ট সুনাম আছে। মুকরী সর্দারের কাছে জানতে পারে যে, ম্যানেজার সাহেব খুব ভাল! সর্দারের বাংলোর সামনে ময়নাটুলি কয়লাকুঠির ভীতসন্ত্রস্থ, অপমানিত, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সাহেবের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুকরী তারই খাদে কাজ করতে গিয়ে সোনার সঙ্গে বিয়ের দিনে ম্যানেজার সাহেবের গুলিতে খুন হয়েছিল। একথা জানার পরেও সর্দার খুনী লম্পট লালসাগ্রস্ত অপরাধী ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে। এমনকি প্রতিবাদিনী মুকরীর মৃত্যুতে সর্দারকে বিন্দুমাত্র ব্যথিত ও বিচলিত হতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে মুকরীর প্রেমিক সোনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্ভবত তাপসী-কুঠির সাহেবে'ই করেছিল। পরের দিন সকালে আর সোনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ময়নাটুলির ম্যানেজার সাহেবের মুকরীকে বলাৎকারের চেষ্টায় তার বাধাদানে অপমানিত হওয়ায়, পরে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব নিয়ে সোনা ও মুকরীকে খুঁজে বের করা এবং তাপসীর ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর সামনে তাদের বিবাহ উৎসবে মত্ত মুকরীকে চাবুক মারা এক অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল। অনেকটাই নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচারের সমপর্যায়। কিন্তু কয়লাখনির ম্যানেজার সাহেবরা অত্যাচারের দিক দিয়ে নীলকুঠি সাহেবদের মতো হলেও তারা স্বতন্ত্র। কয়লাখনির ম্যানেজার সাহেবরা চাপরাশীর দ্বারা মুকরীকে সাহেবের বাংলোতে ডেকে আনার কৌশল এবং সোনাকে হত্যা করার অন্তরালে একটা পূর্বপরিকল্পিত কৌশল কাজ করেছে। ধনতান্ত্রিক ও বণিকতান্ত্রিক গোষ্ঠীরা সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক উপরে অবস্থান করে এবং নানারকম কৌশলও জানে। তাই ধনতান্ত্রিক ও বণিকতান্ত্রিক গোষ্ঠীরা বেশি ভয়ংকর হয়।

আলোচ্য ছোটগল্পটির পরিণতি খুবই মর্মান্তিক। মুকরী-সোনার বন্য সরল তাদের দু'জনের গভীর ভালোবাসার ট্রাজিক পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে সাঁওতাল কুলি-কামিন যুবক-যুবতীদের জীবনে এক ট্রাজেডির পরিচয় দান করলেও, বাস্তবে সেই ট্রাজেডি মানুষ ও দেশের আইনকানুনের নিরিখে সাঁওতাল জীবনের সহজ সরল পবিত্র প্রেমভাবনার চূর্ণিত বিনষ্টিরই এক কাহিনি। গল্পটিকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায়, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ইঙ্গিত বহন করে। লালসাগ্রস্ত ম্যানেজার সাহেবের বিরুদ্ধে ময়নাটুলির ধাওড়ার কুলি-কামিনরা আন্দোলনে সরব হয়নি। পরিকল্পিতভাবে মুকরীকে ও তার প্রেমিক সোনাকে হত্যা করার পরও 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পের মতো তাপসী খাদের অন্যান্য সাঁওতাল কুলি-কামিনরা নীরব। সোনা মুকরীর প্রতিবাদকে একজনের ব্যক্তিগত প্রতিবাদ বলে পরিগণিত হলেও, প্রকৃত পক্ষে তা কুঠির ম্যানেজার সাহেবের বর্বর পীড়নের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। মালিক শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিবাদ।

আড়কাঠির সদস্যরা বন সংলগ্ন গ্রাম থেকে সহজ সরল সাঁওতাল যুবক যুবতীদেরকে নানারকম ভয় দেখিয়ে কিংবা অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রথমে কয়লাখাদের শ্রমিক বানায় তারপর ধীরে ধীরে তাদেরকে আসামের চা বাগানে চালান দেয়। এইসব শ্রমিকদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হয়, তা নিয়ে তারা চিন্তা করে না। এমনই এক 'নারীর মন' নামক ছোটগল্পে আড়কাঠিদের প্রসঙ্গ এসেছে। গল্পে ভুলির চরিত্রই প্রধান। ভুলির স্বামী পীরু মাঝি শ্যালিকা টুরনীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। টুরনী পীরুর সঙ্গে অবাধ মেলেমেশায় বাধা নেই। ভুলি, স্বামীর এ ধরণের আচরণে প্রতিবাদ জানালে পীরুর হাতে মার খেয়েছিল। ভুলি স্বামীকে শাঁয়েস্তা করতে পূর্ব প্রেমিক ভোলার কাছে গিয়েও সে আশানুরূপ ফল পায়নি। ভোলা পীরুকে জব্দ করতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত পীরুর কাছে নিজেকে হার মানতে হয়েছিল। যখন ভুলির সব চেষ্টায় বিফলে যায়, তখন সে স্বামীর সঙ্গে আর থাকতে চায় না। অন্যদিকে কয়লাকুঠির শ্রমিক ভুলির স্বামী পীরু মাঝি টুরনীকে নষ্ট করেছে। এই অপরাধবোধে টুরনী কয়লাকুঠি ছেড়ে আসামের চা বাগানে যেতে রাজি হয়েছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আড়কাঠির সদস্যরা কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল মেয়ে টুরনীকে টাকার বিনিময়ে কিনে নিতে চেয়েছিল। এই খবর শোনা মাত্র ভুলি মুহূর্তে চমকে যায়। কয়লাকুঠি ছেড়ে টুরনী আসামের চা বাগানে কাজ করতে যাবে! ভুলি জানে আসামের চা বাগানে একবার কেউ গেলে আর ফিরে আসে না। বোনের প্রতি অগাধ স্নেহ ভালোবাসার মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখে এবং পীরুর উপর অভিমান করে, নিজের জীবনের প্রতি বিরাগ হয়ে টুরনীকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় ভুলি আসামের চা বাগানের কাজে যেতে রাজি হয়েছিল- 'টুরনী আমারই বোন, সে যাবেক নাই, চল্ আমি যাব।' ভুলি আড়কাঠি সদস্যর সঙ্গে স্টেশনে এসে দেখল, তার মতো আরও প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন কুলিকামিন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল ছল করিয়া আসিল। দূরে পলাশ বনের ভিতর দিয়া টুর্-নী ছুটিতে ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল। ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল,—কাঁদছিস কেনে? ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল- দুৎ কাঁদব কেনে লো?[১২]

মাত্র পঁচিশ টাকার বিনিময়ে আড়কাঠির সদস্যরা টুরনীকে কিনেছিল, তার পরিবর্তে আজকে ভুলি আসামের চা বাগানে চলল। আড়কাঠির সদস্য অতি আনন্দের সঙ্গে ভুলিকে জানায় পঁচিশ টাকার বিনিময়ে সে দু'জন সাঁওতাল মেয়েকে কিনেছে। এভাবেই আড়কাঠির সদস্যরা সাঁওতাল মেয়েদের অভাবের তাড়নার সুযোগে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে কিনে নেয়, কিন্তু আড়কাঠির সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া পাওয়ার দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি নয়, অর্থের টোপ দিয়ে দুর্নীতির ফাঁদকে বিছিয়ে রাখে, আর সহজ সরল সাঁওতাল সমাজের ভুলি ও টুরনীরা তাতে ধরা পড়ে।

'বন্দী' নামক ছোটগল্পে বৃদ্ধ সুখন মাঝি তার কয়লাখনিতে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছে। কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে, তার সাতটি ছেলে মারা গিয়েছিল। সাতটি সদ্য জোয়ান ছেলের মৃত্যুর অভিঘাতে সুখনের জীবনটাই পালটে গিয়েছে। তাই তাকে বাধ্য হয়ে বার্ধক্যজনিত শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থাতেও কয়লাখনিতে দিনমজুরের কাজ করে। সে এই বার্ধক্যের দিনগুলোতে শ্রমে, কষ্টে ও দুশ্চিন্তায় পুরোপুরি ভারাক্রান্ত। কয়লাখনিতে না গেলে তার সংসার চলে না। অন্যদিকে মাইন ইনস্পেক্টরের মত অনুযায়ী সরকারের এক জরুরী বিজ্ঞতিতে জানায় শ্রমিকদের আশঙ্কাজনক কয়লাখনিতে নামা নিষেধ। কিন্তু ম্যানেজার সাহেব মাইন ইনস্পেক্টরের নিষেধকে অমান্য করে, শ্রমিকদেরকে দ্বিগুণ মজুরির লোভ দেখিয়ে বেআইনিভাবে কয়লাখাদে নামার উৎসাহ দিয়েছিল। ম্যানেজারের কথায় দ্বিগুণ মজুরির লোভে পানটু ও তার বোন নিশি কয়লাখাদে কয়লা কাটতে যায়। দুইজনে কর্মরত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে দুর্ঘটনাবসত কয়লাখাদের ছাদ ভেঙে পড়ে। নিশি সেখানে মাটির নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। ম্যানেজার সাহেব নিশির মৃত্যুর ক্ষতিপূরণবাবদ পানটুকে পঞ্চাশ টাকা দিতে চেয়েছিল। পানটু টাকাগুলোর দিকে একবার অসহায়ভাবে তাকায়! একটা টাকা হলেই তাদের একদিন চলবে, সেখানে সে পঞ্চাশ টাকার কথা ভাবতেই পারে না। ম্যানেজারের কাছে নিশির জীবনের মূল্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা! ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি ম্যানেজার সাহেব অর্থের বিনিময়ে শ্রমিকদের জীবনকে কিনে নিতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) এর *অঙ্গার* (১৯৫৯) নাটক স্মরণ করা যেতে পারে- নাটকটি আসানসোলের বড়াধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনার পটভূমিতে রচিত। নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল- খনি শ্রমিকদের জীবনের কথা, শোষণ বঞ্চনার কথা, সংগ্রামের কথা, শ্রমিকদের মৃত্যু ও তাদের হাসি কান্নার কথায় ব্যক্ত হয়েছে।

খনিতে কর্মরত অবস্থায় বিনুর সহকর্মী দীননাথ মিথেন গ্যাসের প্রভাবে বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায়। কিন্তু কোম্পানি এই দায় স্বীকার করতে নারাজ, এমনকি কোম্পানির মালিকও স্বীকার করে না যে, কর্মরত অবস্থায় একজন শ্রমিক মারা গেছে। দীননাথের মৃতদেহকে দূরে কোথাও সরিয়ে রেখেছে। শ্রমিকরা সবকিছু জানে, তবুও মুখ বুজে চুপচাপ রয়েছে। এরা শুধু আর্থিক ভাবেই শোষিত হয়না, নিজের জীনকে মৃত্যুর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে, মুনশিকে ঘুষ দিয়ে সামান্য মজুরির বিনিময়ে খনিতে কাজ করে। কোম্পানি সরকারের আইন মানে না, শ্রমিকদের নিরাপত্তাও দেয় না। কোম্পানির কাছে তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। কোম্পানি টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের জীবনের মূল্যকে কিনে নিতে চায়। নাট্যকার খনি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শোষণের এক নির্মম অভিজ্ঞতাকে টেনে এনেছেন। যা নাটকটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে ‘বন্দী’ গল্পের অনেক মিল রয়েছে। ‘বন্দী’ গল্পের ম্যানেজার সামান্য টাকার বিনিময়ে খনির ভিতরে কয়লা তুলতে গিয়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছে। কারণ, ম্যানেজার সাহেব মাইন ইনস্পেক্টর নির্দেশকে অমান্য করেছে, ফলস্বরূপ কয়লাখাদে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার খবর জানাজানি হয়ে গেলে, ম্যানেজারকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ম্যানেজার ও সর্দার উভয় পক্ষই কুলি-কামিনদেরকে বিপজ্জনক খাদে নামিয়ে আসন্ন বিপদ ডেকে এনেছে। মাইন ইনস্পেক্টরের নির্দেশ মানলে বিপদের সম্ভবনা খুবই কম ছিল। ‘রেজিং রিপোর্ট’ গল্পে কয়লাখাদের দুর্ঘটনায় টুইলা মারা গেলে জেমস্ একাজ করেনি। রেজিংবাবু চঞ্চলকুমার টুইলার স্ত্রী সোহাগীর প্রতি সহানুভূতি দেখানোয় বরখাস্ত হয়েছে। কারণ টুইলার মৃত্যু ও দুর্ঘটনার জটিলতা জেমস্ প্রসাশনের সহায়তায় কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু বন্দী গল্পের ম্যানেজার তা চেষ্টা করেও পারেনি।

সুখেন মাজি সদ্য একমাত্র কন্যাকে হারিয়েছে, তাই ক্ষতিপূরণবাবদ ম্যানেজারের দেওয়া টাকার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে। কারণ পুত্রদের হারিয়ে অর্থলিপ্সু ম্যানেজারের চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে। সে ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিশির দাম নিতে চায়নি। এভাবেই বৃদ্ধ সুখেন মাঝি কয়লাকুঠিতে শ্রমিকবলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সুখেন মাঝির টাকা নিতে আপত্তি থাকায় পানটু সাহেবের টাকা যথাসময়ে ফেরৎ দিয়েছে। পানটুকে এ ব্যপারে তার প্রেমিকা পানি সহায়তা করেছিল। পানটু সাহেবের কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়নি। অর্থের দম্ভ দিয়ে কুলি-কামিনদের জীবনের মূল্যকে কেনা যায় না। পানটু ও পানির দৈনন্দিন জীবনে অভাব থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজারের কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়নি। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটুট রয়েছে। পরবর্তীকালে তারাই সুখেন মাঝির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে সমস্ত কুলি- কামিনদের সামনে উগরে দিয়েছিল। সমস্ত কুলি-কামিনরা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রেজিং রিপোর্ট, বনবিহগী গল্পের শ্রমিকদের মতো তারা নীরব থাকেনি।

শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারের কুলি-কামিনদের প্রতি সমস্তরকম কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ মুনাফা লাভের পথে তীব্র বাধা সৃষ্টি হয়, এটা ম্যানেজার কোন মতেই মেনে নিতে পারেনি। ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সমবেত বিরোধিতার প্রতিবাদ একটি শ্রেণির প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ায়। ম্যানেজার সাহেব প্রতিবাদের উৎসকে বিনষ্ট করার জন্য শ্রমিকদের উপর শোষক শ্রেণির উগ্র মানসিকতা, ভীতি প্রদর্শন ও মানসিক পীড়ন করতে শুরু করে। ম্যানেজারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শোষিত ও নিপীড়িতদের বিরোধিতা এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ স্তব্ধ হবে। এতে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য হলেও ম্যানেজার একটু চাপমুক্ত হতে পারে। পানটু ও পানির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে- প্রথমত, চাপরাশীকে ডেকে তার অধীনস্থ গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা পানটু ও পানিকে ধরে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের মধ্যে তাদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে বন্দী করে, খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে দিনের পর দিন আটকে রেখেছে, যাতে করে প্রতিবাদের মনোবল ভেঙে যায়। তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে তাদেরকে মুক্তির আশ্বাস দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছে তারা যেন খাদের অনিয়মের কথা ও দুর্ঘটনাজনিত নিশির মৃত্যুর খবর পুলিশ প্রশাসনকে জানাবে না। কিন্তু পানটু ও পানি নিজেদের বিবেকবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার ব্যর্থ হয়েছে। চতুর্থত, পানটু ও পানি ম্যানেজারের পূর্বপরিকল্পিত কৌশলের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর অপরাধে অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনেই বন্দী অবস্থায় মারা যায়।

আলোচ্য ছোটগল্পটি শ্রমিকদের ধনতান্ত্রিক বণিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ(সংগ্রামের) লড়াইয়ের এক ক্রমবিবর্তনের বাস্তব চিত্র। ধনতান্ত্রিক বণিক শক্তির প্রতীক ম্যানেজার সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা, কামনা-বাসনা-লোলুপতার দ্বারা সুখেন, পানটু ও পানির ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রতিনিয়ত তারা সাহেবের ফাঁদ পাতানো বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাদের কাছে বেরিয়ে আসার একটি মাত্র উপায় ছিল, কফিনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। কখনো বা তারা সেটা প্রতিবাদের পথে না গিয়ে নীরবে মেনে নিয়েছে, আবার কখনো তাদের সহ্যর সীমা অতিক্রম করেছে, তখন তারা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শোষক শক্তির কৌশলের কাছে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে না পারার কারণে শেষ পর্যন্ত তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ ছোটগল্পে কয়লাকুঠিতে অত্যাচারিত দিনমজুরদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার শোষণ পীড়নের ছবি এঁকেছেন। 'সাঁওতাল' ছোটগল্পে সাঁওতালদের অত্যাচারিত এক আরণ্য জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। কয়লাকুঠির শ্রমিকজীবনে তারা যেমন ম্যানেজারদের দ্বারা অত্যাচারিত, বঞ্চিত ও প্রতারিত তেমনই অরণ্যতে বসবাসকালীন সময়ও তাদেরকে অত্যাচার ও বঞ্চনা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল। এখানে তারা বাসভূমি জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সেই অধিকার ফিরে পেতে তারা প্রবলভাবে সচেষ্ট,

সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সংঘাতে তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সাঁওতালরা সহজ সরল হওয়ার কারণে প্রতিদিন সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই তারা জমি হারানো অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর ভস্মীভূত গ্রামকে ছেড়ে, অরণ্য জীবনের বৃত্তি ত্যাগ করে নতুন জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছিল। এই জীবিকা সন্ধানের পথে তাদেরকে কয়লাকুঠির আশঙ্কাজনক এক পরিস্থিতে নিয়ে যায়। সেই কয়লাকুঠির আবর্ত থেকে তারা কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারেনি।

কয়লাকুঠির গল্পগুলিতে মালিক অদৃশ্যই রয়ে গেছে। কয়লাকুঠির মালিকানা নিয়ে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। নিজেদের অধিকারকে কায়েম রাখার জন্য ম্যানেজারকে নিযুক্ত করেছে। ম্যানেজার মালিকের আয় বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকবিরোধী, মানবিক অধিকার বহির্ভূত নানারকম কাজ করেছে, শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করেছে ও তাদের অধিকারবোধকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। ‘সাঁওতাল’ ছোটগল্পে এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। গল্পে মালিক থাকলেও তাকে দেখা যায় না। জমিদারকে বেশি পরিমাণে খাজনা আদায় করে দেওয়ার নামে খাজনা সংগ্রাহকরা অত্যাচার করেছে, লুণ্ঠতরাজ করেছে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে চরিতার্থ করেছে। জমিদারের কাছে মিথ্যা কথা বলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থাকে বেশ মজবুত করে তুলেছে। জমিদারের হুকুম অনুযায়ী নব নিযুক্ত নায়েবকে কাজ করতে হয়।

> ফলত, দরিদ্র প্রজাগণের দণ্ড-মুণ্ডের বিধানকর্তা রূপে নায়েব মহাশয় জমিদারিতে সপরিবারে পাইক-পেয়াদা সহ বাস করিতে লাগিলেন এবং উৎকট দরিদ্র পীড়নের যত প্রকার কূট পন্থা তাঁহার জানা ছিল, তৎসমুদয় প্রয়োগ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে জমিদারকে খুশি করিয়া ফেলিলেন; এবং নিজের জন্য যাহা করিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।[১৩]

জমিদারের হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে নব নিযুক্ত নায়েবের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘাত বেঁধেছিল। কারণ সাঁওতালরা জমিদারের জমিদারিতে বসবাস করে ঠিকই কিন্তু নব নিযুক্ত নায়েবের হুকুম মানতে নারাজ ছিল। এক চাপরাশীর বিবরণ থেকে জানা যায়-

> হুজুর, জঙ্গলকা ইস্‌তরফ সাঁওতাল লোগন সব মোকান বনাইছে – ডাঙ্গা কাট্‌কে, জমি তৈয়ার করছে – এত্‌না বড়া-বড়া ধানকা গাছ ভি হুয়া। জঙ্গল্‌সে লকড়ি ভি কাট্‌তা, শুকা পাতা ভি লিয়ে যাচ্ছে, আউর, হাম্‌ লোগ ডাক্‌ছে তো বাত্‌সে ভি পিসাব কর্‌ দিস্‌ছে।[১৪]

নায়েব এই বিরোধকে চিরতরে নির্মূল করতে চায়। নায়েব অতি সুকৌশল প্রয়োগ করে সংঘবদ্ধ সাঁওতালদের শাঁয়েস্তা করার চেষ্টা করেছে। প্রথমে নায়েব চাপরাশীদের নির্দেশ দিয়েছিল-

> সব বেটাকে জোর করে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে - দেখি, কেমন কথা না শোনে।[১৫]

নায়েব বলপ্রয়োগের কথা বলতে গিয়ে লেঠেল ও চাপরাশীর দল সমবেত সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে যায়। সাঁওতালরা আদিম অনার্য অধিবাসী হলেও দুনিয়ার

কারো চোখ রাঙানির অনুশাসন মেনে চলে না। নায়েবের এই প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নায়েব চাপরাশীদেরকে সঙ্গে করে তাদের সামনে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চায়-

> পুনরায় সেই অত্যাচারীর দল এক ভদ্রবেশী যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহাদেরই কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সাঁওতালেরা সকলে একটুখানি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ... নায়েব জিজ্ঞাসা করিল, তোরা কতদিন আছিস এখানে?... অত-সব জানি না ত। কি করতে এসেছিস্ তুই? আমার লোকের কথা শুনিস নি কেন? নায়েব-মহাশয় একটু জোরে বলিলেন, আমি কে জানিস? ...এমন সময় একটা চাপরাশী বলিল– উনি গাঁয়ের রাজা আছেন, জানিস? হাম্‌রা উনার চাপরাশি আছি।... নায়েব কহিলেন– আমার গাঁয়ে তোদের খাট্‌তে হবে– জমির খাজনা দিতে হবে।...একজন চাপরাশি লাঠি লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া বুঝাইয়া বলিল, তাহলে এই জায়গাটি ছোড়ি দিতে হবে।[১৬]

এক বৃদ্ধ সাঁওতাল জানায়, এই জায়গা আমাদের, আমরা সবাই বনের কাঠ দিয়ে ঘর করেছি, জমি চাষ করেছি। নায়েব মহাশয় সাঁওতালদের গতিক ভাল বুঝতে না পেরে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। নায়েবের এই প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত, নায়েব তার যৌবন লালসাকে চরিতার্থ করতে এক সন্ধ্যায় সাঁওতাল মেয়ে টেবিকে চাপরাশির দ্বারা অপহরণ করে। এর ফলস্বরূপ ক্রুদ্ধ সাঁওতালরা তীর ধনুক নিয়ে নায়েবের বাড়ি ঘেরাও করে-

> ...সাঁওতাল পুরুষ-রমণী বালক-বালিকায় তাঁহার উঠানটা প্রায় ভরিয়া গেছে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। নায়েবকে দেখিবামাত্র তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাদের টেবিকে তুঁই ধরে এনেছিস –দে বার্ করে দে। তা না হলে তুখে বিঁধেই মারব।[১৭]

নায়েব ভয়ে টেবিকে ছেড়ে দেয়। টেবির মুখ থেকে নায়েবের সমস্ত রকম অত্যাচারের কথা শুনে মুহূর্তে তারা আরো জ্বলে উঠল। নায়েবের এই প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

নায়েব দ্বারা অপহৃত টেবিকে সাঁওতালদের সমাজের বিধান অনুযায়ী মরতে হল। সমাজের বিধান বাধ্য হয়ে টেবির পিতা লখাইকে মেনে নিতে হল। সমাজের বিধান অনুযায়ী টেবিকে গাছে বেঁধে সাঁওতালরা বিষাক্ত তীর মেরে হত্যা করেছিল এবং বনেই টেবির চিতা জ্বালিয়ে, বনের শিকারের আরাধ্য দেবতা বোঙ্গার উদ্দেশ্য পুজো দিয়ে সবাই জ্বলন্ত চিতার সামনে শপথ নিয়েছিল-

> এ অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইলে তাহাদের শান্তি নাই। যে কোনো লোক তাহাদের ত্রি-সীমানা মাড়াইবে, তাহাকেই এই টেবির মতো নিষ্ঠুর ভাবে বিষাক্ত বাণে হত্যা করা চাই।[১৮]

সেই দিনই সাঁওতালরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে শপথ অনুসারে নায়েবের এক চাপরাশিকে তীর মেরে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ হিসাবে নায়েব রাতের অন্ধকারে সাঁওতাল পল্লীতে

আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। নায়েবের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে অসহায় সাঁওতালরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা কোথায় বাসা বাঁধল তার সঠিক হদিশ মেলেনি।

> গৃহহীন নিঃসম্বল বনচারী এই সাঁওতালের দল এখানের ডেরা তুলিয়া আবার সেই বনের ধারে-ধারে সরু পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোথায় তাহাদের পথ চলার শেষ এবং কোথায় তাহাদের রাত্রি প্রভাত হইবে, আবার কোথায় কোন্ নিরুপদ্রব জঙ্গলের ধারে এই স্বাধীন-চেতা আত্মবিশ্বাসী অনার্যের দল কুটির বাঁধিবে ভগবান জানেন![১৯]

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে তাদের কয়লাখনির দিনমজুর হওয়ার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সদ্য ঘর হারা সাঁওতালরা বন ছেড়ে দূরের কোন গভীর অরণ্য কিংবা দূরের কোন খনি অঞ্চলে যেখানে নায়েবের চাপরাশিরা কোনোদিনই পৌঁছাতে পারবে না। লখাই কন্যা হারানোর স্মৃতিকে আঁকড়ে সেখানেই পড়ে থাকে, পাগলের মতো চারিদিকে 'মা' 'মা' করে ছুটে বেড়ায়। লখাই প্রতিশোধ নিতে নায়েবের সাত বছরের কন্যাকে অপহরণ করে কিন্তু নায়েবের মেয়েকে হত্যা করেনি। কেবলমাত্র নায়েবের হৃদয়ে কন্যা হারানোর বেদনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল। দুই দিন পর চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। নায়েবের ছয়-সাত বছরের কন্যাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইদিন থেকে আর লখাইকে সেখানে দেখা যায় না। কোথায় পালিয়ে গেছে কেউ জানে না। সবার সন্দেহ হল নায়েবের মেয়ে নিয়ে কি লখাই পালিয়ে গেল? নিশ্চয়ই বন থেকে বনান্তরে যায়নি, একেবারে নতুন কোনো জায়গায় যেখানে নায়েবের চোখ রাঙানি থাকবে না। আর সেই জায়গা হতে পারে কোনো কয়লাকুঠি কিংবা নতুন কোন গ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নায়েব শ্রেণির লোকেরা এভাবেই সাঁওতাল সমাজের লখাইদের মতো মানুষদের জীবনটা বদলে দিয়েছিল। প্রথমে বনজঙ্গল তারপর কৃষিজমি থেকে এক এক করে তাদেরকে বিতাড়িত করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কয়লাকুঠির কেনা শ্রমিকে পরিণত করেছে।

'সাঁওতাল-পল্লী' নামক ছোটগল্পে কিন্নির মা ও সুখেনের মা দু'জনেই বাল্যকালের খেলার সঙ্গী, তাদের সম্পর্কটা আরো দৃঢ় করার জন্য সই পাতিয়েছে এবং একে অপরের ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। বিয়ের রাতে কিন্নির মায়ের ডাকাত ছেলে মুংরা তার মাকে জানায় যে, কিন্নির বিয়ে অন্য একটা ছেলের সঙ্গে হবে। মুংরার বাবা নাকি ভুতু মাঝির ছেলে গারাং এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে ঠিক করেছে। কিন্নির মা সেটা অনেক আগেই জানত। আর্থিক সংকটের কারণে কিন্নির মা সুখেনের মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রাখতে পারে নি। অভাবের তাড়নায় কিন্নির বাবা আসাম চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে আড়কাঠির ফাঁদে পড়েছিল। সেখান থেকে শারীরিক অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিল। সেই সময় ভুতু মাঝি তাকে আর্থিক সাহায্য করে। কিন্নির বাবার ইচ্ছা ছিল গারাং এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে দেবে। গারাং ও মুংরা দু'জনে ডাকাত, তারা দু'জন মিলে ডাকাতের দল খুলেছে। তাই কিন্নির মা গারাং এর সঙ্গে কিন্নির বিয়ে দিতে

চায়নি। কিন্তু কিন্নির দাদা এই বিয়েতে বিরোধিতা করে। সে কিন্নিকে গারাং সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। এতে কিন্নির মা কিছুতেই রাজী হয়নি, সে জানায় আমার একমাত্র সুন্দরি মেয়ে কয়েদ-খাটা ডাকাতের ঘরে বিয়ে দেব না। কিন্নির মা মেয়েকে নিয়ে সুখেনদের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। এই বিরোধিতার অপরাধে কিন্নির মা একদিন রাতের অন্ধকারে নিজের ছেলেকে বিষ তীর মেরে হত্যা করেছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্পটিতে একটি সামাজিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন, কিন্নির মা বয়ান অনুযায়ী যে ছেলে দুঃখের দিনে সাহায্যের হাত বাড়ায় না, সেই আজ চরম শত্রুতা করে দিয়ে গেছে। মানুষের এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর কিছু হয় না। গল্পটিতে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মা তার ছেলেকে নিজের হাতে হত্যা করেছে, মা তার একমাত্র ছেলে পরিবারের প্রতি ও সাঁওতাল সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে বিষ তীরের সাহায্য নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

'মা' ছোটগল্পটি কয়লাখনির একটি পরিবারকেন্দ্রিক গল্প। গল্পে কয়লাখনি শ্রমিক দুখন সর্দার জাতিতে মুণ্ডা, তার দুই ছেলে এবং ভাই কয়লাকুঠিতে কাজ করত। কয়লাখনিতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যেমন মাটি চাপা পড়ে সমাধিস্থ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কয়লাখনি মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য কয়লাখাদে কয়লা কাটতে গিয়ে একে একে সবাই মারা যায়-

> অসুরের মতো বলবান তাহার এক ভ্রাতা এবং দুইটি পুত্র ছিল। তাহারা চারজনে মিলিয়া কয়লা কুঠিতে কাজ করিত। আহারের সংস্থান করিতে গিয়া পয়সার পরিবর্তে তাহারা গায়ের রক্ত দিয়াছে। দুবেলা পেট পুরিয়া খাইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া গায়ের যে রক্তটুকু জমা করিত, মনিবের পায়ে সেটুকু ঢালিয়া দিয়াও যখন কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, তখন তাহারা প্রাণ দিতেও কসুর করিল না। সেই কয়লাখনির পাতাল-গহ্বরে ভীষণতম স্থানে কয়লা কাটিতে গিয়া একে একে তাহারা সমাধিস্থ হইয়া রহিল, - বেদনা দুর্ভোগ সহিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিল, সে নিজে![২০]

দুখন সর্দার ক্ষতিপূরণবাবাদ খনি মালিকের কাছ থেকে কিছুই পায়নি। পুত্রশোকে দুখনের স্ত্রীও মারা গেল। কয়লাখনির জন্য তারা জীবন ও যৌবনের সব কিছু নিঃশেষ করেও সুখের মুখ দেখেনি। কয়লাখনির প্রভাবশালী মালিকদের দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্যই দুখনদের জন্ম, এই শোষণের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই, দিনে দিনে শোষণের যন্ত্রণা তাদেরকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দুখনকেও শোষণের বেড়াজালের ফাঁদে পড়ে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মুক্তি পেতে হয়েছিল।

দুখনের একমাত্র কন্যা সিদ্ধেশ্বরী কুলি ধাওড়ার এক স্বাস্থ্যবান সাঁওতাল যুবককের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের কিছু দিনের পরে মেয়েটা নিজের স্বামীর দুশ্চরিত্রের কথা মাঝে মাঝে তার বাবাকে জানাত কিন্তু দুখন সে সব কথা কোনদিন বিশ্বাস করত না। একদিন সত্যিই সিদ্ধেশ্বরী কুলি ধাওড়ায় গিয়ে দেখল তার মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

...কন্যা মরণের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। পিতাকে দেখিয়াই ক্ষণিকের জন্য চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতেই কন্যার দুচোখ ছাপাইয়া জল আসিল, অতি কষ্টে বলিল, - বিষ খেয়েছি বাবা, আমাকে আর বাঁচাস না – আমি চল্লম।[২১]

আর এই দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তার ভাইঝি পরীকে দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে নিয়েছিল-

‘তুই কখনও বিয়া করতে পাবি নাই পরী। ... দুখন বলিল, - মিছে কথা লয়– বল মা বল। ই বুড়ার কথা রাখবি কি না বল’।[২২]

একথা বলে ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে পরীকে রেখে দুখন মারা যায়। শেষ পর্যন্ত পরী একথা রাখতে পারেনি। লামার ছেলে টুরা পরীকে ভালোবেসেছিল কিন্তু বিয়ে করতে রাজী ছিল না। পরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুরা পরীকে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়েছে। পরীও কয়েকদিন পর বুঝতে পারে তার গর্ভে টুরার সন্তান এসেছে। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অপকর্মের ঘৃণায়, লজ্জায় ক্ষোভে, দুঃখে পরী আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারল না। কেবলমাত্র গর্ভে আসা সন্তানের জন্য তাকে বাঁচতে হবে। সন্তান জন্মের পর পরীকে পৃথিবীতে বাঁচার জন্য নতুন করে বুক বাঁধতে হল। পরী কয়লাখনির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেও সন্তানের জন্যই খুঁজে পায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। গল্পে টুরা ও পরীর সঙ্কটাপন্ন দাম্পত্য জীবনের চেয়ে, একজন মায়ের মাতৃ হৃদয়েই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

‘বলিদান’ ছোটগল্পে লাকু মাঝি ও টগরী স্বামী স্ত্রী দুজনেই কয়লাখনিতে কাজ করে। সোনিয়া নামে তাদের একটি শিশু সন্তানও ছিল, যদিও প্রথম সন্তান লছমনিয়া শিশুকালে মারা যায়। দু’জনে কয়লাখনিতে দিনমজুরের কাজ করে সংসার বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল। সদ্য নবজাত শিশুকে নিয়ে তারা অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। সোনিয়াকে উচ্চশিক্ষিত করে কয়লাকুঠির বাবু বানাতে চায়। কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হয়নি। এ বছর কৃষিজ ফসলের ফলন ভালো না হওয়ার কারণে লাকু মাঝি ক্ষেতের বোঙার কাছে একটা মুরগি মানত করে। সকালে পূজার আয়োজন চলছিল হঠাৎ এমন সময় কয়লাকুঠি গোমস্তা বাবুর ডাক পড়ে, কয়লাখাদের চার নম্বরে আগুন লেগেছে। যে করেই হোক কয়লাখাদের আগুনকে নেভাতে হবে, সবাইকে ডবল হাজরি পাওয়ার প্রলোভন দেখায়। কেউ তারা ডবল হাজিরার প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারে নি। একমাত্র টগরী কাজে যেতে অসম্মতি জানায়, কারণ সেদিন বোঙার পূজা। গোমস্তা বাবু লাঠি ঠুকে জানিয়ে দেয়, ম্যানেজার সাহেবের হুকুম মানতে হবে। অবশেষে লাকুর পিছনে পিছনে সোনিয়াকে কোলে করে টগরীও চলতে শুরু করল। টগরী সোনিয়াকে বোয়ান ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দু’জনেই কাজে নেমে পড়ল। লাকু দূর থেকে দেখল চার নম্বর কয়লাখাদের দেওয়ালের গায়ে একটা ছিদ্র দিয়ে আগুনের শিখা তীব্র গতিতে নির্গত হচ্ছে। কয়েকজন সাঁওতাল কুলি সাহস করে গেলেও, কিন্তু তীব্র গ্যাসের ঝাঁজ সহ্য করতে না পারায় বন্ধ করতে

পারল না। অন্যদিকে ম্যানেজারের লোক দূরে দাঁড়িয়ে কুলিদেরকে চিৎকার করে কাজে উৎসাহ দেয়। লাকু জানত সেখানে সমূহ বিপদ তবুও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, টগরীর বাধাকে অমান্য করে আগুন নেভাতে এগিয়ে এসেছিল।

> এই অসভ্য অনার্য জাতির শিরায় শিরায় এখনও বোধ করি আদিমানবের উগ্র রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাই তাহারা সমূহ বিপদের মাঝেও ক্ষুদ্র প্রাণের ভয়ে কোনোদিন পিছু হটিয়া আসে না। লাকুর উন্নত স্ফীত বক্ষ উৎসাহবাণী পাইয়া বার-বার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, সস্নেহে টগরীর হাতটা ধরিয়া বলিল– টগরী, আমি যাই।[২৩]

লাকু একতাল মাটির ঢেলা ছিদ্র পথে ছুঁড়ে বন্ধ করল ঠিকই কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের তীব্র ঝাঁজে মূর্ছাহত হয়ে সেখানে পড়ে যায়। স্বামীর করুণ আর্তনাদ শুনে টগরীও বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যায় এবং সেও মূর্ছিত হয়। দুর্ঘটনার খবর শুনে ম্যানেজার সাহেব অতি দ্রুত সাইডিং'র দিকে আসছিল। কুকুরটা তার পিছনে পিছনে ছুটছিল। সাইডিং'র পাশে একটা বোয়ান ঝোপের আড়াল থেকে শিশুর আর্তনাদ শোনা গেল, কুকুরটাও দেখা যাচ্ছিল না। একটু পরে কুকুরটা রক্তমাখা মুখ নিয়ে বোয়ান ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল, তখনও তার মুখ থেকে তাজা রক্ত ঝরছিল।

> সাহেব ও সরকার দুজনেই ছুটিয়া সেই ঝোপটার নিকটে যাইতেই দেখিল, মাংস স্তূপের মতো এক মানব-শিশু সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে– নিষ্ঠুর কুকুরটা তাহার ঘাড়টা চিবাইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে।[২৪]

দুই জনের জ্ঞান ফেরার পর টগরী তার শিশু সন্তানের খোঁজ নিতে শুরু করল। ম্যানেজার সাহেব সরকারের মাধ্যমে লাকুর ছেলের অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্য দশ টাকা বকশিস দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ কথা শোনার পর লাকুর চোখ দিয়ে জলের পরিবর্তে আগুন বেরোতে শুরু করল, বকশিস দেওয়া টাকা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সে সাহেবের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়, বাস্তবে তা কিছু লাভ হয়নি। অন্যদিকে পিটারসন কোম্পানি লাকুকে ধাওড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ম্যানেজারকে নোটিস দিয়েছে, কারণ জায়গাটা পিটারসন কোম্পানির যে-কোনদিন 'Subside' করা যেতে পারে। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী মিলে মৃত ছেলেকে অড়হড় ও বড়ধনা ক্ষেতের মাঝামাঝি জায়গায় কবর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অসহায়ভাবে বাড়ি ফিরল। টগরী চোখের জল মুছিয়া বলিল বোঙাকে যখন বলেছি, তখন একটা মোরগ তাকে দিতে হবে। লাকু মোরগটা বোঙার উদ্দেশ্য বলি দিয়ে এবং প্রণাম করে জানিয়েছিল-

> রাগ করিস না বোঙা, তুকে আরও এনেক কিছু দিথম, মদ দিথম, ভাত দিথম– কত কী দিথম। কিন্তুক আজ আমার সোনিয়া নাইরে– তাকে কেনে লিলি ঠাকুর-বাবা? বলিতে বলিতে লাকুর চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।[২৫]

আজ সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছে, বোঙাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। তাই লাকু একমাত্র আরাধ্য দেবতা বোঙার কাছে ভরসা রেখে সমস্ত রকমের অভাব অভিযোগের কথা শুনিয়েছে।

আর যেন বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। পরের দিনই লাকু অড়হড় ক্ষেত দেখতে গিয়ে পায়ের নিচের মাটিটা ভূমিকম্পের মতো টলমল করতে শুরু করল। এমন সময় চারিদিকে কিছু অড়হড় ক্ষেতের জমি পাতাল গহ্বরে বসে যায়। লাকু সেখান থেকে উঠে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারল না। পুনরায় প্রকান্ড একটা মাটির চাংড়া মাথার উপরে পড়ে মাটির নিচে চিরদিনের মতো তলিয়ে যায়। টগরী লাকুকে আর খুঁজে পায় নি, কাঁদতেও পারছিল না, তাই বোঙার প্রতি অভিমান করে বলে- ঠাকুর বাবা পূজা দিয়েও তোর রাগ ভাঙাতে পারলাম না। টগরী লছমনিয়াকে (প্রথম ছেলের নামে পোষা মোরগ) কোলে করে ম্যানেজার সাহেবের বাঙলোর সামনে এসে দাঁড়াল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করার সঙ্গে বেয়ারা আসে টগরীও তার আঁচল থেকে লছমনিয়াকে বার করে দিয়ে দেয়। ম্যানেজার সাহেব এক এক করে টগরীর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, আজকে সে বড্ড একাকীত্ব অনুভব করে! পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো তার কাছে কিছুই সম্বল নেই, তাই তার শেষ অবলম্বনটুকুও সাহেবের কাছে সমর্পণ করে অচেনা এক জগতে চলে যেতে চায়।

> টগরী উন্মাদিনীর মতো অশ্রুহীন চোখে বলিল– উহাকে কেনে ছাড়বি সাহেব...সোনিয়াকে লিয়েছিস, আমার লাকুকে নিলি, লছমনিয়াকেও লিয়ে লে সাহেব...আমার মাথার কিরা ...সে আর বলিতে পারিল না। তাহার শেষ অবলম্বনটুকুও সাহেবের কাছে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল।[২৬]

আলোচ্য ছোটগল্পে শ্রমিক শ্রেণির অসংগঠনেই টগরীর মতো নারীর অসহায়ত্বের মূল কারণ। ম্যানেজারের চূড়ান্ত অমানবিক নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও লোভলালসার যূপকাষ্ঠে একে একে নবজাতক নিষ্পাপ শিশু সোনিয়া, লাকু মাঝি, লছমনিয়া এবং টগরী বলি হল। ধনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সর্বহারা শ্রমিকদের আত্মবলিদানই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

'রহস্যময়ী' ছোটগল্পে মইনু নামক মেয়েটি কয়লাকুঠিতে নতুন কাজ করতে এসেছিল। এর আগে সে হাজারিবাগের এক কয়লখনিতে কাজ করত। জাতিতে সাঁওতাল, গায়ের রঙ কুচ্ কুচে কালো, মুখের গড়ন খুবই সুন্দর ফর্সা হলে রাজরানী বলা হত। কয়লাখনির ম্যানেজার সাহেব, ঠিকাদার থেকে শুরু করে সবাই মইনুকে ভালোবাসতে চায়। মইনু পাঁচ নম্বর কুলি ধাওড়ায় থাকে। পেটের দায়ে দিনরাত খাটতে হয়। শরীরের কঠোর পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য কম বেশি নেশাও করে। মইনু কাজ করতে গিয়ে ঠিকাদারের কাছ থেকে সিগারেট চায়। একদিন কাজ করতে গিয়ে মইনু হঠাৎ কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। ঠিকাদার মইনুকে খুঁজতে গিয়ে এক জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়াল। সেখানে দেখল মইনু এক সাহেবের সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা করছে, কাউকে ভালোভাবে চেনাও যাচ্ছে না। ঠিকাদার বাধ্য হয়ে মইনু'র নাম ধরে একবার জোরে ডাক দেয়। মইনু ও কোটপ্যান্ট পরা একজন সাহেব জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। এ সাহেব কয়লাকুঠির চেনা সাহেব নয়। সাহেবের প্রশ্ন অনুযায়ী ঠিকাদার

জবাব দেয়। সাহেব জানায় মইনুর পিছনে ছয় মাস ধরে ঘুরছে। ছয়মাস আগে মইনু হাজারিবাগের কয়লাখনিতে কাজ করত, পালিয়ে বেড়ানো ওর স্বভাব। সাহেব বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার তবুও সে সাঁওতাল মেয়ে মইনুকে বিয়ে করতে চায়। সাহেব মইনুকে দেখতে না পেয়ে পাগল। তাই সাহেব ঠিকাদারকে দশ টাকা বকশিস দিয়ে মইনুর খবর জানতে চাই। ঠিকাদার ঠিক তিন চার দিন পর পিয়ারশোল কোলিয়ারিতে কুলি কামিন আনার জন্য গিয়েছিল। আর সেখানেই ঠিকাদারের সাথে মইনুর দেখা হয়। ঠিকাদার মইনুকে সাহেবের সমস্ত কথা জানায়, কিন্তু মইনু এসব কথায় অসম্মতি জানায়। মইনু জানায়, আমার মাও ঠিক এমনই এক সাহেবকে বিয়ে করেছিল। মায়ের সেই সময় রূপ যৌবন দুটোই ছিল কিন্তু এগুলো তো চিরদিন থাকে না। মার বয়স হল, বয়সের সঙ্গে সবই গেল, তখন সাহেব একদিন কোথা থেকে এক বুড়ি মেমকে নিয়ে এসেছিল। তারপর আর মায়ের দুঃখের শেষ নেই। মা একদিন আমার হাত ধরে সমস্ত দুঃখের কথা জানায়। মা মারা গেল, মরার আগে আমার হাতদুটো ধরে বলল- 'আর যা করিস করবি মইনু, কিন্তু কালো চামড়ার সাঁওতাল আমরা- সাদা চামড়ার সায়েবের সঙ্গে কোনদিন ভাব করতে যাস না।' মইনু তার মায়ের দুঃখের কথা বলতে বলতে অজান্তেই চোখে জল ছল ছল করছিল। সাহেবরা বিশ্বাসঘাতক হয়, ভালোবাসার মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে না। মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' নামক ছোটগল্পের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে। 'শিকার' গল্পের নায়িকা আদিবাসী রমণী মেরী ওরাওঁ। মা ভিক্‌নি ওরাওঁ, অস্ট্রেলিয়ান এক সাহেবের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে। সুযোগ সন্ধানী সাহেব ভিক্‌নি ওরাওঁ এর গর্ভে সন্তান দিয়ে পালিয়ে যায়। মেরী ওরাওঁ সাহেবের বংশধর, মায়ের সাংসারিক জীবনে সাহেবদের দ্বারা প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে, সে সাহেবদেরকে ঘৃণা করে। রহস্যময়ী গল্পে সাহেব পালিয়ে যায় নি, অন্য এক বুড়ি মেমকে নিয়ে এসেছে। আলোচ্য ছোটগল্পে কয়লাকুঠির ঠিকাদার, সাহেব সাঁওতাল মেয়েদেরকে লোলুপ চোখে দেখে। সাহেব মইনুকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা তার যতই প্রত্যাখ্যাত হয় ততই মইনুকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র হয়ে ওঠে।

'প্রতিবন্ধক' ছোটগল্পে লেখক নিজে গল্প কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ময়নাবুনি কয়লাকুঠিতে এক ম্যানেজারের কাজের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। গল্পের মধ্যে কয়লাখাদে শ্রমিকদের জীবনের প্রেমভালবাসা, ক্ষোভ, হিংসা, লোভ লালসার ছবি আছে। কয়লাখাদের হেড অফিসের নির্দেশ, বেশি করে কয়লা তুলতে হবে। অফিসের নির্দেশ অনুযায়ী কয়লার চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় শ্রমিকরা কয়লাখাদে মাটি চাপা পড়ে মারা যায়। এই সব মৃত শ্রমিকদের অফিস খোঁজ খবর নেয় না এমনকি অফিসের খাতায় তাদের নাম থাকে না। পরিবারের কেউ তাদের মৃত্যুর কারণও জানতে চায় না। সাঁওতালরা সৎ প্রকৃতির হয়, মিথ্যা কথা বলতে জানে না, জীবনে যা কিছু করে চূড়ান্ত না করে ছাড়ে না, মদ খায় মাতাল হয়, নাচে, আনন্দ করে, সেদিকে তাদের কুণ্ঠাবোধ নেই। আবার কঠোর পরিশ্রম

করতেও সাঁওতালরা পিছপা হয় না। পল্টু নামক একজন সাঁওতাল কুলি আমবাগানের পাশের ধাওড়াতে থাকে। একদিন পল্টু ম্যানেজারকে দেখে তাদের ধাওড়াতে আসতে অনুরোধ করে। সেই সময় ধাওড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চারিদিকে আমের মুকুলে গাছগুলো ছেয়ে গেছে, রঙ বেরঙের প্রজাপতি উড়ছে, কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক মনোরম পরিবেশ। পল্টু দূর থেকে তার বৌকে দেখায়, গায়ের রঙ কালো হতে পারে কিন্তু কালো যে এত সুন্দর ম্যানেজার আগে তা জানতেন না। ম্যানেজারের বর্ণনায় পল্টুর বৌ কালো মার্বেল পাথর হতে কোন এক নিপুণ শিল্পী নারী প্রতিমাটি কুঁদিয়া বার করেছে। মেয়েটির নাম কিন্নি। পল্টু সমাজের নিয়ম মেনে কিন্নিকে বিয়ে করেছ। কিন্নি পল্টুর সঙ্গে ঘর করতে চায় না, কিন্নির স্বাস্থ্যবান ঝুমনকে পছন্দ তার সঙ্গে সংসার করতে চায়। ঝুমনও কিন্নিকে পল্টুর কাছ থেকে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। কিছুদিন পর ম্যানেজার হঠাৎ জানতে পারে কিন্নিকে কেন্দ্র করে ধাওড়ায় পল্টু ও ঝুমনের মধ্যে মারামারি হয়েছে। সেদিন সামান্যতম ভুলের জন্য ঝুমন পল্টুর কাছে হেরে যায়। ফলস্বরূপ ঝুমন, কিন্নির পাওয়ার আশাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, চাপা একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে ধাওড়া থেকে পালিয়ে যায়।

> ...কিন্নিকে পাইবার আশা যাহার নাই, এ পৃথিবীতে তাহার বাঁচা মরা দুই সমান। ঝুমন একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়া কিছুদিনের জন্য কোথায় যে চলিয়া গেল কেহ তাহার খোঁজ-খবর পাইল না।[২৭]

অন্যদিকে ম্যানেজারের সঙ্গে পল্টুর দেখা হলে ঝুমনের নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পল্টু এখন মদ খায় বৌয়ের নামে ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করে। ঝুমন কিন্নির ভালোবাসার টানে আবার ধাওড়াতে ফিরে কিন্নির সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্নি কৌতূহলবশত ধাওড়াতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়- '...তোকে না দেখে আর থাকতে পারলাম না।' কিন্নিকে পাওয়ার আশা ব্যর্থ হওয়ায় ঝুমন আত্মহত্যা করতে চায়। আজকে ঝুমন পিলারের গায়ে 'ডিনামাইট' ফাটিয়ে সে মরবে। ঝুমন আত্মহত্যার উদ্দেশ্য খাদের দিকে চলে যায়। পল্টু কিন্নির কাছে ঝুমন আসার খবর জানতে পারে। পল্টুও খাদের নীচে গেল 'ডিনামাইট' নিয়ে ঝুমনকে মারার জন্য। কিন্তু 'ডিনামাইট' ফাটিয়ে পল্টু নিজেই মারা গেল। অন্যদিকে 'ডিনামাইট' বিস্ফোরণে কয়লাখাদ থেকে বের হবার পথ পরিষ্কার হয়েছে। সেই পথেই ঝুমন ও কিন্নি কয়লাখাদের উপরে উঠে এল। ঝুমন ও কিন্নির মাঝখানে ভালোবাসার প্রতিবন্ধক হিসাবে পল্টু ছিল। আজকে আর পল্টু নেই, কয়লাখাদ থেকে উপরে ওঠার রাস্তাও খোলা, প্রতিবন্ধক বলতে কিছুই থাকল না। শেষ পর্যন্ত লেখক গল্পে ভালোবাসার জয়কে দেখিয়েছেন, যা কয়লাখনি শ্রমিক জীবনের অন্যতম একটি অঙ্গ।

'ফুল-দোল' ছোটগল্পটি কয়লাকুঠির শ্রমিকদের বসন্ত উৎসব দিয়ে শুরু হয়েছে। কয়লাকুঠির শ্রমিকরা বসন্ত উৎসব পালনের আয়োজন করেছে। সাঁওতালরা প্রকৃতির পূজারী,

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নষ্ট হতে দেয় না। তাই তারা প্রকৃতির আগমনকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানায়। নিজেদেরকে প্রকৃতির সাজে রাঙিয়ে তোলে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। সাঁওতাল যুবক পুন্‌কা ও এক যুবতী সুখী বসন্ত উৎসব আয়োজন উপলক্ষে বনে ফুল তুলতে যায়। আগামীকাল তাদের ধাওড়াতে বসন্ত উৎসব পালন করা হবে।পুন্‌কা ও সুখী দু'জন মিলে ঝুড়ি ভর্তি ফুল তুলেছে। ফুল তুলতে গিয়ে পুন্‌কা ও সুখীর প্রেম পর্ব শুরু হয়, একে অপরকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। পুন্‌কার ভয় হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু ছিল না। অন্যদিকে সুখীর বাবা মাতলা নামক ছেলেকে পছন্দ করে, তার পাঁচ বিঘা জমি আছে, পঁচিশটা মুরগি আছে। এই সব টানাপোড়নের মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে একে অপরের বাড়ির পথে চলে যায়।

পুন্‌কার অর্থনৈতিক দিক স্বচ্ছল নয়, ধাওড়ায় এসে দেখে তার মা বৃদ্ধ পিতার ক্ষত স্থানে আগুনের সেঁক দেয়। পুন্‌কা জানতে পারে যে কাবুলিওয়ালা তার বাবাকে মেরেছে, কারণ ঋণ টাকা কাবুলিওয়ালাকে সময় মতো ফেরৎ দিতে পারেনি। পুন্‌কা ঘরে থাকলে কাবুলিওয়ালা এ কাজ করার সাহস পেত না। পুন্‌কা সেই নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কাবুলিওয়ালার এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চায়। পুন্‌কা রাগে রাতে ভাত খায় নি। অবশেষে মায়ের কথায় একটু ভাত খায়। সে রাতে ঘুমোতে গিয়ে তার মাথায় অভাবের সংসার নিয়ে নানারকম চিন্তা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে খেয়াল ছিল না। সকালে উঠে দেখে তার বৃদ্ধ মা উঠোনটা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে কয়েকটা বনের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে।

> দৈন্য-প্রপীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুন্‌কা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যুষে সে তাহার মলিন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধা মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধ্যে কখন তাহাদের কুটির এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি সুন্দরভাবে ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া, গোবরের নাত দিয়া তাহার উপর কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে।[২৮]

আজকে উৎসবের দিন পুন্‌কার বাবা উঠোনে ছড়ানো ফুলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে মনে মনে পূর্বের স্মৃতিকে খেয়াল করছিল। কিন্তু যাদের পেটে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন পড়ে না তাদের কাছে উৎসবের কোন গুরুত্ব নেই। সে তার বৃদ্ধ পিতার কাছে গল্প শুনেছে, বন জঙ্গলে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন অভাব অনটন ছিল না, সামান্য ঋণের অর্থের দায়ে কাবুলিওয়ালার মার খেতে হত না, যে কোন উৎসবে সবাই মিলে এক সাথে নাচত, আনন্দ করত। আজকে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে উৎসবের আনন্দ সব হারিয়ে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ক্ষুধার্ত পুন্‌কার এক এক করে মনে পড়ে যায়, উৎসবের দিনের কথা, উঠোনে ছড়ানো ফুলগুলো যেন তাকে দেখে উপহাস করছে। এছাড়াও আজকে সুখীর কাছে যাওয়ার কথা ছিল, যদি সুখীর বাবা মাত্‌লার সঙ্গে বিয়ে দেয়, তাহলে গায়ের জোরে তাকে সুখীকে জয়

করতে হবে। পুন্‌কা ইতস্তত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফুলগুলিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে কাজে যায়। সময় তখন বেলা একটা, খাদের ভিতর থেকে কিছু বোঝা যায় না। চারিদিকে শুধু অন্ধকার, দূরে একটা আলো দেখতে পায় কিন্তু সেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকারেই বেশি দেখা যায়। আজকে উৎসবের দিন ধাওড়ার কেউ কাজ করতে আসে নি। অন্যদিনের মতো আজকে খাদের নীচে গোলমাল নেই। পুন্‌কা উৎসবের দিনের কথা মনে করে, সাময়িক কিছু সময়ের জন্য একটা কয়লা চাপের উপর বসে। সে মুহূর্তে দেখতে পায়, কয়লাখাদের গাঢ় অন্ধকারে কয়লাস্তরে গায়ে গায়ে নানারকম ফুল নিমেষে ফুটে উঠল। আর পুন্‌কা সামান্য টাকার বিনিময়ে মৃত্যুগহ্বরে কাজ করছে।

> তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি হাসি, গান উৎসব আনন্দ– পেটের দায়ে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষুসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্ দিক দিয়া যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে কে জানে? এ কী বেদনা– এ কী দুর্ভোগ![২৯]

ম্যানেজারের ভয়ে পুন্‌কা আবার কাজ করতে শুরু করে। কঠিন কয়লার উপর তার গাইতি খং খং করে আর্তনাদ করতে লাগল। কাজ করার সময় হঠাৎ কয়লাখাদের দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। খাদের ভিতরের বহু বিপদে নিরীহ কুলিদেরকে গ্রাস করেছে তার হিসাব নেই। পুন্‌কা আজ সেই সব নিরীহ কুলিদের মতো পাতালপুরীর কয়লাখাদে হারিয়ে যেতে চায়।

> এই খাদের ভিতরে বহুবিধ আপদ-বিপদ, নিরীহ কুলিদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে তো গ্রাস করে না। তাহার মতো অনেক লোক এই পাতালপুরীতে পেটের জন্য প্রাণ দিয়েছে– এখন তাহাদের মৃত আত্মাগুলা জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের সঙ্গী করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার্ত প্রাণের শত ধন্যবাদে তাহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়।[৩০]

এদিকে খাদের উপরে ধাওড়াতে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘরে বাইরে পথে ঘাটে ফুলের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে। যুবকরা আড়বাঁশিতে বেহাগের সুর বাজায় আর যুবতীরা গান ধরেছে। আজ তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রস শোষণ করবে। উৎসবের দিনে সুখী ও মাতলার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সুখীর একটুখানি সম্মতির প্রয়োজন। সুখী বিয়েতে রাজী ছিল না কারণ পুন্‌কা এখনই আসবে, মাত্‌লার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সুখীর দাবি পুন্‌কার অর্থ নেই ঠিকই গায়ের জোর তো আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুন্‌কা আসে নি, সুখী অভিমান করে দুই হাত দিয়ে নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলে, পায়ের গয়নাগুলি মাটিতে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে পালিয়ে যায়। সুখী চারিদিকে শুধু পুন্‌কাকে খুঁজেছে, উৎসবের উদ্দাম স্রোত ক্রমশ মন্দীভূত, পুন্‌কার আসার সম্ভবনা খুবই কম তাই বাধ্য হয়ে বিয়েতে রাজী হয়েছে। সুখীর বাবা দলপতির সম্মুখে মাত্‌লার হাতে মেয়েকে তুলে দেয়। এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্‌কার কাছে পৌঁছায়নি। পুন্‌কা বিকালে খাদ থেকে উঠে খাজাঞ্চির নিকট সমস্ত দিনের পরিশ্রমের রোজগারের মাত্র এক টাকা নিয়ে ধাওড়ার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। আসার পথে রাস্তায়

জানতে পারে মাত্‌লার সঙ্গে সুখীর বিয়ে হয়েছে। এই দুঃসংবাদ শোনার পর চারিদিকে অন্ধকার দেখতে পায়। কয়েকটা ফুলের উপর মাতালের মতো টলতে টলতে চলতে শুরু করল। পুন্‌কা কয়েক পা চলার পর পথের পড়ে থাকা ঝুমকা ও বাবলা ফুলগুলিকে কুড়িয়ে নেয়। সে মনে মনে ভাবছিল সুখী ঝুমকা ফুলটি কানে পরেছিল আর বাবলা ফুলটি নাক-ছাবি করেছিল। ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে ফুলগুলিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে হাঁটছিল, ফুলগুলি আগুন মনে হয়েছিল। পুনরায় পুন্‌কা মর্মভেদী দুঃখ-নিরাশা নিয়ে পথ চলতে শুরু করে। এখন উৎসব শেষ হয়ে গেছে, সবাই ক্লান্ত, ফুলের গন্ধ আসছে না, বাঁশির আওয়াজ শোনা যায় না, কারো মুখে কথা নেই, নীরব বিশ্বপ্রকৃতি, আকাশ-বাতাস একে অপরের দিকে চেয়ে চুপচাপ রয়েছে। পুন্‌কা ধাওড়ায় কাউকে কিছু বলেনি, রোজগারের টাকা বৃদ্ধ পিতাকে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কালো মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলেছে, চারিদিক থেকে শুধু গাঢ় অন্ধকার ছুটে আসছে। পুন্‌কার অন্ধকার আবর্তের মাঝখানে প্রলয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এভাবেই লেখক কয়লাখনির শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে একটি স্বার্থক প্রেমের গল্প রচনা করেছেন।

‘রাঙা-শাড়ি’ ছোটগল্পে লেখক মজ্‌রো কয়লাকুঠি সাঁওতাল কুলি ধাওড়ার যুবক যুবতীদের প্রেম ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করেছেন। কয়লাখনিতে কাজ করার পর সন্ধ্যার সময় কুলিরা নাচ-গান ও বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ করে। লুটন মজ্‌রো কয়লাকুঠিতে কাজ করতে আসে, মাথায় বাব্‌রী চুল, গলায় লালকাঁটির মালা, বুকখানা বেশ চওড়া। কয়লাকুঠিতে এসে লুটন ও লুটনীর প্রেম ভালোবাসার পর্ব শুরু হয়। লুটন বিয়ে করতেও রাজী ছিল। লুটনী আশ্বিন মাসের পুজোতে লুটনের কাছে একটা দামী রাঙা শাড়ী বায়না করে। লুটনের কাছে দামী শাড়ী কেনার পয়সা নেই, তাই সে বন্ধ গ্যালারি’র মুখে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঝোলা কয়লা চুরি করে কাটতে গিয়েছিল। গাইতির দিয়ে সিউনির মুখে দু’তিনটা চোট দিতেই একটা প্রকান্ড কয়লার চাংড়া উপর থেকে পড়ল। কয়লার চাংড়া আঘাতে বামহাত ও ডান হাতের তিনটি আঙুল পুরো থেঁতলে যায়। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও লুটনের হাত দুটোর কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারল না। লুটন আর চিরজনমের মতো কাজ করতে পারবে না। শারীরিক অসুস্থতার সময় লুটনকে সেবা করার জন্য কেউ পাশে থাকল না। সেই সুযোগে লুটনীর দাদা ডোমন, লুটনীর বিয়ে পানটুর সঙ্গে ঠিক করল। পানটু আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই স্বচ্ছল, বিয়েতে দুই কুড়ি টাকা খরচ করবে। এ খবর শোনার পর লুটন বুকের ভিতর এক অব্যক্ত বেদনার জ্বালা অনুভব করেছিল।

> লুটনের মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটা অজানা বেদনায় শিহরিয়া উঠিল। মাথার চুলগুলা শিরশির করিতে লাগিল। মনে হইল, লুটনীর মুখখানা তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেও বা এ

তড়িৎ-শিহরণ থামিতে পারে! কিন্তু কেমন করিয়া ধরিবে? তাহার বেদনার্ত হাত দুইটা নিঃসাড় নিস্পন্দভাবে বিছানার উপর পড়িয়া আছে,-নড়াইবার শক্তি নাই![৩১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লুটনের শারীরিক অসুস্থতা ও আর্থিক সংকটই বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়াল। ছোটগল্পটি কয়লাখনি কুলিকামিনদের অপূর্ণ এক প্রেম কাহিনির প্রতিরূপ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনি অঞ্চলের ম্যানেজারদের অত্যাচার বেশ কিছু গল্পে পাওয়া যায়। শুধু ম্যানেজার সাহেবরাই নয় এদের সাথে জমিদার, রেজিংবাবু, বড়বাবু, আড়কাঠিদের অত্যাচারে কাহিনিও লিখে গেছেন। যেমন সাঁওতাল গল্পে টেবির উপর নায়েবের অত্যাচার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই গল্পে নায়েব অপমানের প্রতিশোধ নিতে সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে 'অভাগা', 'রেজিং রিপোর্ট', ও 'বনবিহগী' গল্পে। গল্পের চরিত্র গুলি বেশিরভাগ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা মূলত কয়লাকুঠির শ্রমিক। গল্পগুলিতে কুঠি মালিকদের নির্যাতন ও কয়লাকুঠির শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জৈবিক যন্ত্রণা ও পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসায় যুক্ত রয়েছে। প্রতিনিয়ত কয়লাকুঠির শ্রমিকরা পেটের দায়ে মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে পৃথিবীর অতল গহ্বরে কয়লা কাটতে যায়। কিংবা কয়লার সন্ধানে কয়েক শত গ্রামকে মাটির তলায় বসিয়ে শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছে। আসলে কয়লার প্রয়োজন ও কয়লা তুলতে সাঁওতালদের উপর অত্যাচার, শোষণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্বংস- পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কের প্রতীক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কিছু গল্প গুলিতে পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের আচার-বিশ্বাস প্রথা কেন্দ্রিক আদিবাসী সংস্কৃতির অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন, তেমনই পাহাড় জঙ্গল নদীনালা অধ্যুষিত ধর্মীয় বিশ্বাসের টুকরো টুকরো ছবিও অনেক গল্পে ধরা পড়েছে। যেমন পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় উৎসব 'বাঁধনা পরব'। 'বাঁধনা পরব' পশ্চিমরাঢ়ের সাঁওতাল, বাউরি, ভূমিজ, মাহাত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় লোক-উৎসব। 'বাঁধনা' শব্দটি বন্দনা থেকে এসেছে। পশ্চিমরাঢ়ের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর কৃষি নির্ভর। কৃষিকাজে অন্যতম সহায়ক গবাদি পশুকে তারা দেবতা জ্ঞানে আরাধনা করে এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে সর্বত্রই উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোরু এবং কাড়াকে (পুরুষ মহিষ) খুঁটিতে বেঁধে খেলানোর প্রথা প্রচলিত আছে। একে 'গোরু খটা' এবং 'কাড়া খুটা' বলা হয়। উৎসবের শেষ দিনটিতে এই গোরু বা মোষকে খুঁটিতে বেঁধে নাচানো হয় তাই 'বাঁধনা পরব' বলা হয়। বাঁধনা উৎসব সেই গো আরাধনা বা গো বন্দনার উৎসব। 'পৌষ-পার্বণ' গল্পেও 'বাঁধনা পরব'র প্রসঙ্গ আছে। কয়লাকুঠি ধাওড়ার বাসিন্দা সাঁওতালরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তিনদিন ধরে 'বাঁধনা পরব' উৎসব আনন্দে আত্মহারা। সেই জনগোষ্ঠীর দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এই পূণ্য দিনটিতে দামোদর নদীতে স্নান করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। তাই তারা পূণ্য অর্জনের জন্য একদিন আগেই দমোদরে গিয়েছিল।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে কয়লাখনি অধ্যুষিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ জীবনের প্রকাশ পেয়েছে। শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষরা নয়, খনি অঞ্চলের সব মানুষের মধ্যে যে জৈবিক প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষ আছে, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক মানদন্ডে তা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটগল্পগুলি পরিবেশ ও পটভূমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রচনা করেছেন। যা তাঁকে পূর্ববর্তী ও সমকালীন সাহিত্য থেকে ভিন্ন স্বাদের বলে মনে হয়। গল্পে তিনি শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকা জীবনের কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু সে জীবন তাদের শ্রেণি সংঘর্ষের উত্তীর্ণ জীবন নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে শ্রেণি সংঘর্ষ দেখাতে চেয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প শ্রেণি চেতনাকে উজ্জীবিত করেননি। ছোটগল্পে মানুষের হৃদয় অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত মানুষের হৃদয়। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলিতে সমাজের অবক্ষয়িত রূপ ধরা পড়লেও, শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক চেতনাকে বাস্তাবায়িত করতে পারেননি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সাহিত্যে এক নতুন যুগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, সেখানে সাহিত্যের তত্ত্ব বড় কথা নয়, শ্রমজীবী অশিক্ষিত মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতায় অত্যাশ্চার্যভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে একদিন দুর্লভ ছিল। আসলে তিনি শ্রমজীবী মানুষের সমাজে অর্থনৈতিক দিকটিকে প্রাণবন্ত করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে পালা বদলের সূচনা করেছিলেন, সেখানেই বাংলা ছোটগল্প মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সাহিত্যের পথে’ *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খন্ড), বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা-৫৫৩।

২. সেন, সুকুমার *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (৫ম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০০৯, ৮ম মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৪৮।

৩. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), ১৪২৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২০৯-২১০।

৪. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), ১৪২৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২৬৫।

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫-২৬৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৬।

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫।

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৬।

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৮।
১১. ঘোষ, সুবোধ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, ২০২০, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৩৭।
১২. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), ১৪২৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২৪০।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৬।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৬।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৭।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৭-৩২৮।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৯।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩০।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩১।
২০. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), ১৪২৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-১৯২।
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯২।
২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৩।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮০।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮২-২৮৩।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৪।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬৫।
২৮. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (১ম খন্ড), ১৪২৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২০৫।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।
৩১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), ১৪২৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-৯৬।

তৃতীয় অধ্যায়:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ

চর্যাপদ এর কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে *মঙ্গলকাব্য, শিবায়নে* কাব্যেও আদিবাসী প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। উনিশ শতকেও বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখা যায়। যেমন- স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামক শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুরাশা', 'শেষকথা' গল্প এবং *পুনশ্চ* কাব্যের 'বাসা', 'সাধারণ মেয়ে', 'ক্যামেলিয়া', 'কোপাই', 'খোয়াই' কবিতা ও *বীথিকা* কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে', কবিতায়। কল্লোলের কালে সমাজে অবহেলিত মানুষদের নিয়ে নির্মিত হল বাংলা কথাসাহিত্যে। *কল্লোল* পত্রিকার লেখকগণ প্রথম সহায়-সম্বলহীন, প্রান্তবর্গীয় মানুষদের সাহিত্য তথা সমাজে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। এরা অধিকাংশ ছিল ভিখারি, শহুরে, বস্তিবাসী ও বারাঙ্গনা। আদিবাসী সমাজ আত্মমর্যাদায় ঋজু ব্রাত্যই রয়ে গেল। বাংলা কথাসাহিত্যে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আদিবাসী প্রসঙ্গ চর্চিত না হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ ছিল। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল- অনভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর *কল্লোলের কালে* গ্রন্থে বলেছেন-

> এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের জনসাংকর্ষের মুখ্য ভাগ হচ্ছে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের দল। তারা বর্ণগত ও অর্থগত দুই মানদণ্ডে ই অন্ত্যজ শ্রেণি বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকদের হাতে এই অন্ত্যজ মানুষেরা এতকাল সুবিচার পায়নি।... কল্লোলীয়রা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন, কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়নে ব্যক্ত করতে চাইলেন।...স্বকালের অবস্থাগত পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্য, তারুণ্যের জেদ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে তাঁরা অন্তেবাসীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বা কোনো রাজনৈতিক শিক্ষার ফলে জনজীবনের শরিক হন নি। তাঁদের জনজীবনবাদ অন্যদিক থেকে যত অর্থবহই হোক না কেন কতটা সাহিত্যিক 'বিলাস' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর ইতিহাস যখন কেবল রক্তক্ষয়ী অবমাননার দলিল, সারা বিশ্বে এক উত্তাল পরিস্থিতি, *কল্লোল, কালি-কলম* পর্বের অতি রুক্ষ অবক্ষয়িত বাস্তব যখন বাঙালি পাঠক সাধারণের মনোভূমিকে ওয়েস্টল্যান্ড করে তুলেছিল সেই পর্বে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য কথাকার। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে একে একে ওঠে আসে গ্রামবাংলার নিস্তরঙ্গ জীবন পাঁচালি। *কল্লোল*

পত্রিকাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইল-ফলক রূপে ধার্য করা হয়। *কল্লোল* (১৯২৩) পত্রিকা প্রকাশের এক বছর আগে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। *কল্লোল* যুগের একদল লেখক সাহিত্যে রবীন্দ্রসৃষ্ট পথের বিরোধিতা করে অন্য পথে চলার প্রয়াস করেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্ট সাহিত্য পথে হেঁটেছেন, সময়টাকে ভালোভাবে অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)কে পাশ কাটানোর নামে এই সময় যে রবীন্দ্র বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল। তিনি কোনোদিন নিজেকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি তাঁর ১৯২৯-এ *পথের পাঁচালী* সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখানো পথ থেকে বেরিয়ে অন্য পথে হাঁটা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য মহান সাহিত্যিক ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে যুক্তিহীন উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করার প্রয়োজন নেই। তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধে ('রবীন্দ্রনাথ', 'রবিপ্রশস্তি' ও 'প্রথমদর্শনে') তারই প্রমাণ মেলে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন *কল্লোল* লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগদান করেননি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে পশ্চিমী সাহিত্যের মোহে অন্ধ না হয়ে, তিনি সাহিত্যে নিয়ে এলেন দেশজ উপকরণ-গ্রামের সহজ সরল অবহেলিত পতিত জীবনের অফুরন্ত সঞ্চয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও দেশজ উপকরণ রয়েছে, তবে তাঁর সাহিত্যে মানুষের জৈবিক চেতনার তীব্রতা বেশি প্রখর ছিল। এছাড়াও আদিম প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ ও হিংসা ছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি চরিত্রগুলি কল্পনার গাঢ় রঙে রঞ্জিত নয়। গ্রামে কিংবা শহরে একেবারে নগণ্য অবহেলিত সাধারণ পতিত মানুষদের বিড়ম্বিত জীবন ও নির্মম বাস্তব রূপ সবই তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে দেখা বাস্তব ঘটনাগুলি সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প, উপন্যাস, দিনলিপি বা ভ্রমণকাহিনিগুলি তারই প্রমাণ দেয়। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক জীবনভাবনার রূপায়ণ সম্পর্কে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন-

> কল্লোল-পর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংশয় অস্থিরতা ও 'নেতিবাদী' তির্যক জীবনদৃষ্টি আশ্রিত কথাসাহিত্য থেকে বাঙালীহৃদয়ে যে নিগূঢ় মুক্তিপিপাসা, তা কতকটা চরিতার্থ হয়েছে একদিকে যেমন তারাশঙ্করে, অন্যদিকে তেমনই বিভূতিভূষণে।... রাঢ়ের আঞ্চলিক বর্ণ-বৈচিত্র্য, অল্প-পরিচিত লোকায়ত জীবন-পরিবেশ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তজীবনের অস্তরাগ-মহিমা, দুর্বার জৈব চেতনার তীব্র রসোল্লাস—সমস্ত কিছুই তারাশঙ্করের নাটকীয় রসকল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে পাঠকের দৃষ্টি সম্মুখে এক বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনের রহস্যলোক উন্মুক্ত করে দেয় যেন। ... বলা যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীন, নিতান্ত মামুলি। তাঁর কাহিনী মুখ্যত গ্রামীণ পরিবেশে রচিত গার্হস্থ্য জীবনের গল্প।[২]

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অপরিসীম অবদানের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। উপন্যাস, গল্প সংকলন, গল্প, দিনলিপি-ভ্রমণকাহিনি ও বিচিত্র জগৎ নামক কল্পভ্রমণের বই নিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন-আত্মা-শিল্পচেতনা এক ভিন্ন মেজাজে রাঙিয়েছেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি বর্ণনা, অধ্যাত্ম-চিন্তা কিংবা নিরন্ন সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক কথায় মানব জীবনের বিচিত্র চিন্তা ভাবনাকে আশ্রয় করে তাঁর সৃষ্টির সম্ভারকে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলির পটভূমি হল পশ্চিমরাঢ়ের গ্রাম। গ্রামের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে বসবাস করা দরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এরা সব সময় সভ্য সমাজের বাইরে অবস্থান করে। এরা সভ্য সমাজের কাছে মূল্যহীন। সেই সব গ্রাম্য পরিবেশের মানুষগুলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। প্রকৃতির সমস্ত কিছু তাঁর কাছে মূল্যবান। চারিপাশে ঘটে যাওয়া অতি তুচ্ছ বিষয় কিংবা ঘটনাকে সহজ সরল ভাষায় পাঠকের চোখের সামনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে যারা অবহেলিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের দুঃখ যন্ত্রণা দেখে কোনোদিন বিরক্তিবোধ করতেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মূলে এইসব মানুষরা বেশি করে বিরাজ করে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। *তৃণাঙ্কুর* গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

> বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল- এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়েছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ... যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে।[৩]....

তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলার দুর্ভিক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষদের আর্তনাদ, যে করুণ আর্তনাদ, কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। চারিদিকে হাহাকার, মৃত্যুমিছিল, উলঙ্গ কঙ্কালসার মানুষগুলির ভিক্ষার করুণ আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি ঘাটশিলা থেকে আসার সময় স্টেশনে এসব করুণ দৃশ্য দেখে অসহ্য ব্যথা অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মতো কত গৃহবধূ ভারবাহী পশুর মতো উদয়াস্ত খাটচে, হয়ত পেটপুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়ত দু-দিন

> কি তিন-দিন, হয়ত সেই পুজোর সময় একবার, কোন সাধ-আহ্লাদ পুরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখে নি, বাইরের দুনিয়ার কিছু খবর রাখে না—পাঁড়াগায়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।[৪]

প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার কথায় তিনি গল্প, উপন্যাস কিংবা ভ্রমণকাহিনিগুলিতে আজীবন লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র মানুষদের ভিড় থেকে কোনোদিন মুক্তি পেতে চাননি। তিনি মিছিল-আন্দোলন-সংগ্রামে সংগঠিত জনতার ভিড় থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ রচনায় সাধারণ মানুষের আত্মদর্শনকে নিজের মতো করে দেখেছেন। তাঁর প্রকৃতি চেতনা মানুষের আত্মদর্শনের একটি অংশ। তিনি মানুষের আত্মদর্শনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যুদ্ধ, বিপ্লব, বিদ্রোহ ও আন্দোলনকে গল্প উপন্যাসের বিষয় করেননি। প্রতি মুহূর্তে তিনি উপেক্ষিত মানুষদের সংসার জীবনে লড়াইয়ের উৎসকে খুঁজেছেন। মানুষের এই লড়াই প্রকৃতির মতো বহমান ছিল। তাই তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যে চিত্রিত জীবন ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

পৃথিবীর বাস্তব জগৎ সংসারে দরিদ্র মানুষের জীবন রুক্ষ, কর্কশ ও অসহনীয় রূপে দেখা দিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিষয়গুলোকে নানারূপে দেখেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসেগুলিতে দরিদ্র মানুষদের প্রতি ভালোবাসা ও মরমী মনের মায়া মাখিয়ে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষগুলোর নির্মম দরিদ্র অসহায় অবস্থা তিনি কলমের তুলিতে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। তিনি রুক্ষতাকে সযত্নে দূরে সরিয়ে উদার মানসিকতায় তাদের জীবনযাপনকে নিরীক্ষণ করেছেন। গভীর অনুরাগের সহিত সেগুলোকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অঙ্কিত অধিকাংশ চরিত্রগুলি দরিদ্রকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি সাহিত্য প্রতিভাকে দরিদ্র জীবনের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা অথবা ক্ষোভ ইত্যাদির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি। তাই তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসগুলিতে দরিদ্র-চিত্রণ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে। বৃহত্তর মানব সমাজে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষগুলির দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠক সমাজকে মেনে নিতে পারার সহজ অভ্যাসকে আয়ত্ত করার এক বার্তা দিয়েছেন। নিষ্ঠুর দরিদ্র এক এক করে জীবনের সব ঔজ্জ্বল্য কেড়ে নেয়, কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখের হাসি, সততা, মনুষ্যত্ব এবং সর্বোপরি জীবনের শান্তি কোন কিছুই কেড়ে নিতে পারেনি। দরিদ্র নয়, মানুষের জীবনে যা অক্ষয় শক্তি ধরে রাখে তার নাম মনুষ্যত্ব। সেই সত্যকে তিনি তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসে সুস্পষ্ট করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখন্ড সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তাঁর বেশিরভাগ গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি'র পরিসীমা বাংলা ছাড়িয়ে পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলার বাইরে বিশেষত বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া এবং মধ্যপ্রদেশের

অরণ্যঞ্চলে দীর্ঘকালীন বসবাসের সূত্রে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় বর্ণনা করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘকালীন অরণ্যবাস ও ভ্রমণের সূত্রে অরণ্য সংলগ্ন বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদেরকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর রচিত *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাস, 'কালচিতি', 'কবি' ও 'শিকারী' নামক ছোটগল্পে কাহিনিসূত্রে বিধৃত সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অবিকৃতভাবে *তৃণাঙ্কুর* (১৯৪৩), *ঊর্মিমুখর* (১৯৪৪), *বনে-পাহাড়* (১৯৪৫), *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮), *১৯৩৪-এর ডায়েরি, ১৯৪৩-এর ডায়েরি,* প্রভৃতি দিনিলিপি বা ভ্রমণকাহিনিগুলিতে একই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। তবে তাঁর দীর্ঘদিনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় রচিত ভ্রমণকাহিনী কিংবা দিনলিপিগুলিতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কথোপকথনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপন্যাসে চরিত্রের ও কাহিনির মাধ্যমে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা যায়। আর ছোটগল্পগুলিতে সেই মানবজীবনের সামগ্রিক জীবনবোধের খন্ডাংশ নির্মিত হয়েছে। আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের সৃষ্টির মূলে তাঁর বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার মানুষদের প্রতি ভালোবাসায় ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর ভ্রমণকাহিনি কিংবা দিনলিপিগুলিতে মানুষ আর প্রকৃতির স্মৃতিকে সঞ্চয় করতে ব্যক্তিগতভাবে কতটা তৎপর ছিলেন তারই প্রমাণ দেয়। উপন্যাসগুলি তাঁর প্রকৃতিকেন্দ্রিক আর ছোটগল্পগুলি অনেক বেশি মানুষমুখী ছিল। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৩১-২০১৬) লিখেছেন-

> প্রকৃতি-চেতনার যে অপার্থিব আলোয় তাঁর পথের পাঁচালী, আরণ্যকের মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি উদ্ভাসিত, ছোটগল্পে তার প্রকাশ নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মানুষের পরিচয় নিশ্চয় নগন্য নয়, সর্ববিধ রচনাতেই তাঁর মানুষের প্রতি অপরিমেয় মমত্ববোধের ছবিটি গাঢ় রঙে আঁকা, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কয়েকটি উপন্যাসে দেখি মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত এক সামগ্রিক রূপ। কিন্তু ছোটগল্পে প্রকৃতি প্রায়শই অনুপস্থিত, সেখানে আছে কেবল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নয়, মানুষের- একান্তভাবে মানুষেরই 'মানবিক' পরিচয় সন্ধান সেখানে লেখকের অন্বিষ্ট।[৫]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। তিনি তাঁর ছোটগল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে সমাজ-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। যেমন- 'কালচিতি', 'শিকারী', 'বোতাম', 'অরণ্য' ও 'কবি', গল্পে সাঁওতালদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। নিম্নে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গল্প ও দিনলিপিগুলিতে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবসী জনজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় আলোচনা করা হল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালচিতি' নামক ছোটগল্পটি ভ্রমণকাহিনির আদলে রচিত। 'কালচিতি' গল্পটি ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমসাময়িকে রচিত। গল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবস্থান ধরা পড়েছে। কালচিতি গ্রামের প্রধান নারান হাঁসদা'র নিমন্ত্রণ পেয়ে গল্পকথক সপরিবার তার বাড়িতে গিয়েছিল। গল্পকথকের বাড়ি থেকে কালচিতি গ্রামের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল, সেখানে পৌঁছতে ডিবুডুংরি ও সারোয়া নামক দুটি জঙ্গলাবৃত পাহাড় পার হতে হয়েছিল। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা অতি দুর্গম পথ দিয়ে মন্থর গতিতে গরুর গাড়ি ছুটতে লাগল, পাহাড়ি রাস্তার দুই পাশে প্রকৃতির অতি মনোরম দৃশ্য-

> মাইল দুই গিয়ে টাউনের সীমা ছাড়ালাম। তারপর একটা ঝাঁটি শালচারার বন, সেও মাইলখানেক — তার পরেই পড়ল ডিবুডুংরি পাহাড়। পাহাড়ের উপর এঁকেবেঁকে গরুর গাড়ি উঠতে লাগল। তখন বেলা দুটো, আদৌ রোদ নেই। মেঘস্নিগ্ধ আকাশতল, অথচ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই, শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাহাড়ের চড়াইয়ের বড় বড় শাল, করম, আসানের ছায়াবহুল জঙ্গল, এক রকমের ছোট বাঁদর খেলা করে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। করম গাছের হলদে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে পাষাণময় পথের উপর। যেন কে ইচ্ছে করে ছড়িয়ে রেখেছে।[৬]

পথে যেতে কাড়াডোবা নামে এক মুণ্ডাদের গ্রাম পড়েছে। তাদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি পরিষ্কার এবং দেওয়ালগুলির গায়ে নানারকম পশুপক্ষী ও গাছপালার ছবি আঁকা ছিল। কাড়াডোবা গ্রামের অধিকাংশ মুণ্ডারা দরিদ্র আর অন্নাভাব থেকে বাঁচতে স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এখনও কালচিতি গ্রাম অনেক দূরে অবস্থান করে, আবার নির্জন বন পথে যাত্রা শুরু হল। অনেক দূর যাওয়ার পর ঢেঁড়াপানি নামে একটা গ্রাম পড়ল। গল্পকথক ঢেঁড়াপানি গ্রামের এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হয়। বৃদ্ধের নাম গনু সর্দার, তার পরনে ছিল দুই ইঞ্চি চওড়া কৌপিন বস্ত্র মাত্র, নিজের বয়সও ঠিক মত বলতে পারে না। বৃদ্ধ সকালে ভিজে চাল নুন মেখে খেয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে বেরিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য গল্পে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আশ্চর্য এক জীবন সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

> ...ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমনকি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতি আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধের অন্ধকারে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরে।[৭]

গনু সর্দারের দেশলাই চাওয়া, কাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাকের পাতা বিড়ির মতো করে আধহাত লম্বা, পিকা খাওয়া সবই জীবন্ত ও বাস্তব ছবি। অরণ্য সংলগ্ন আদিবাসী মানুষেরা কোনোদিন বাজারের তৈরি বিড়ি কিনে খায় না।

অবশেষে গল্পকথক নারান হাঁসদার বাড়িতে পৌঁছে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের আভাস পেয়েছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছেদ ও আচার-আচরণে তাদের আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে-

> তাদের পরনে ফর্সা শাড়ি, গায়েও ব্লাউজ, এমনি অজ বন্য গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক মার্জিত ও সভ্য, এদের কথাবার্তাও ভালো, খানিকটা এ অঞ্চলের বুলি ও টান থাকা সত্ত্বেও ভালো বাংলা বলেই মনে হয়।[৮]

নারান হাঁসদার পরিবারের অতিথি আপ্যায়নেও আধুনিকতার প্রভাব দেখা যায়। এদের খাদ্যাভ্যাসে আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল। নারানের ভাই অতিথিদেরকে চা পান করতে ডেকেছে। অন্যান্য খাবারের মধ্যে ছিল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর ইত্যাদি। সাঁওতাল পরিবারটির মধ্যে সব থেকে বেশি আধুনিকতার পরিচয় হল, গ্রামের স্কুলে নারান হাঁসদার মেয়ে সুশীলার শিক্ষকতা করা। সুশীলা হাঁসদা কুড়ি টাকা বেতনে গ্রামের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে ছেলেমেয়েদেরকে পড়ায়। সে মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনর পাস করেছে এবং খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল থেকে সেলাই ও সামান্য কিছু ইংরেজি শিখেছে। এর জন্য সুশীলা হাঁসদাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হয়নি। শুধু মাত্র সে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। সুশীলা হাঁসদা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারে না, কিন্তু শুনতে ভালোবাসে তাই স্কুলের লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বই আনার কথা ভাবে। সুশীলা হাঁসদার প্রাইমারি স্কুলের এক ছাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে গল্পকথককে অবাক করেছিল। প্রাইমারি স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা গান্ধিজী (১৮৬৯-১৯৪৮)'র ছবিকে চেনে, শ্লেটে অঙ্ক কষতে পারে। এমনকি তারা স্বাধীন ভারতবাসী হিসাবে 'জয়হিন্দ' বলতেও দ্বিধবোধ করে না।

সুশীলা হাঁসদার উদ্যোগে কালচিতি গ্রামে আদিবাসী সাঁওতালদের উন্নতি সমগ্র আদিবাসীদের সামাজিক অবস্থানের মাপকাঠি হতে পারে না। তাই গল্পকথক ফেরার পথে তার বিপরীত দৃশ্যই দেখেছিলেন—

> এপাশে টেঁড়াপানি গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তৈল ও বন-করনজার তৈলের মিটমিটে আলো। কেরোসিন তেল এসব দুর্গম বনাঞ্চলে আদৌ পৌঁছায় না আজকাল, তার ধারও এরা ধারে না।[৯]

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা বন্যহস্তীর ভয়ে খুব সাবধানে ডিবুডুংরি পাহাড়ের গভীর বনভূমির মধ্যে দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে গরুর গাড়ি চালায়। আকাশে মেঘভরা জ্যোৎস্না, অন্ধকার খুব বেশি গাঢ় নয়, পথ দেখতে অসুবিধা হয় না। হঠাৎ বনের নির্জন পথে টেঁড়াপানি গ্রামের দুইজন নির্ভীক সাঁওতাল মেয়ে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। তারা দুজনে কালিকাপুরের হাটে কাঠ বিক্রি করতে গিয়েছিল। অধিকাংশ আদিবাসীদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অরণ্যর উপরে নির্ভর করতে হয়। গল্পটিতে সেই বাস্তব চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়-

...এ বনই এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া। স্নেহময়ী জননীর অঙ্কের সমান অদের কাছে এই পাণ্ডববর্জিত বন্যাঞ্চল, বাঘ-ভালুক এদের বাল্যসঙ্গী।[১০]

আলোচ্য ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের দুটি ভিন্ন দিককে তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিকারী' ছোটগল্পে আদিবাসীদের ধর্মীয় অবস্থার রূপরেখা তথা ধর্মাচরণ ও ধর্মগত জীবনযাপনের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়েছে। 'শিকারী' ছোটগল্পে সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত একাধিক গ্রামের কথা বলা হয়েছে। সেই গ্রামগুলোতে বসবাস করা অধিকাংশ আদিবাসীরা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তারা চুকুরদির গ্রামে সাবাইঘাসে ছাওয়া ধাওড়া চালাঘরের গির্জাতে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করতে যায়। পাদরি সাহেব মাসে একবার গির্জাতে এসে তাদেরকে নিয়ে উপাসনা করেন। আবার চুকুরদি থেকে একটু দূরে বনকাটির গ্রামে 'কোল' ও 'মুণ্ডা' সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। এরা খ্রিস্টান নয়, গ্রামের বাইরে শাল গাছের নীচে 'মারাং বোঙ্গা' অর্থাৎ সূর্যদেবের পূজার থান রয়েছে। সবাই 'মারাং বোঙ্গা' অর্থাৎ সূর্যদেবের উদ্দেশ্য মুরগি বলি দেয়। ঐ দিন গ্রামের সবাই এক সাথে রান্না করে খায়। সন্ধ্যার সময় তারা রান্না করার মাটির জিনিসপত্রগুলি ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে। এরকমই এক ধর্মীয় পরিবেশে মাগনিরাম বড় হয়েছিল। মাগনিরামের বাবা জাতিতে সাঁওতাল। ছোট বেলায় রাঁচিতে বড় হয়েছে, এ কারণে তার মাগনিরাম নাম রাখা হয়েছিল। সাধারণত সাঁওতাল ছেলেদের এমন নাম রাখা হয় না। মাগনিরাম কবি স্বভাবের লোক, জগৎ-কে কবির কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে। সে ছড়া ও গান বাঁধতে পারে, তাই বোঙ্গা পরবের সময় নিজের বাঁধা ছড়া ও গান বন্ধু নন্‌কুকে শেখায়। মাগনিরাম একটু উদাস প্রকৃতির ছেলে, তাই গ্রামের সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা সবসময় তাকে বিরক্ত করে। যখন মাগনিরাম কবি স্বভাবে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর কথা সুর আর ভাষার রূপ দেয় তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে। মাগনিরাম শারীরিক অসুস্থতার কারণে গাছে উঠতে পারত না। তাই সে অন্যান্য সাঁওতাল যুবকদের মতো জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পাহাড় ডিঙিয়ে বনে যেতে পারত না। তীর ধনুক ধরে বনে শিকারে যেতে পারত না। কিন্তু সে তার বাবার মতো একজন নামকরা লোক হতে চেয়েছিল, বাবার মনে সুখ এনে দিতে চেয়েছিল। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পাহাড় থেকে নেমে আসা মাদী হাতিটি ব্যপক হারে কৃষকদের ক্ষেতে ফসল নষ্ট করেছিল। ঘাটোয়ালির কাছারি থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাইকে ঢেঁটরা দেওয়া হয়েছে এবং কাছারি থেকে ঘোষণা করা হল যে মাদী হাতিটিকে মারতে পারবে তাকে একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। চারিদিকে শিকারীর দল মাদী হাতিটিকে মারার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এ বিষয় নিয়ে শিকারী দল কেউ কারোর সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় না, কারণ কোন শিকারী যদি তার কাছ থেকে হাতি মারার কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। তখন মাগনিরাম মনে মনে কল্পনা করে, একশো টাকা পেয়ে বাবাকে খুশি

করার কথা। তাই সে সাঁওতাল বীর শিকারী ঢেমনকে খোশামোদ করে দু-খানা বিষ মাখানো শলা জোগাড় করে হাতি মারতে জঙ্গলের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে মাগনিরাম হাতি মারার পর, বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। সে তার বাবাকে সুখের পরিবর্তে দুঃখই দিয়েছিল। মাগনিরামের এই মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে গল্পে বলা হয়েছে-

> বাজরা ক্ষেতের মধ্যে তিন জায়গায় মাগনিরামের দেহের তিনটি রক্তাক্ত থেঁৎলানো টুকরো।[১১]

মাগনিরামের বাবা ঢেমন সর্দারের সাক্ষ্যের জোরে ঘাটোয়ালী কাছারি থেকে একশো টাকা পেয়েছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য ছোটগল্পটিতে মাগনিরামের কবিস্বভাব, আত্মস্বচেতনতা ও কল্পনাপ্রবণতা অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। মাগনিরামের ব্যক্তিগত দুঃখ- যন্ত্রণা গল্পের মূল বিষয় হলেও, সমগ্র আদিবাসী সমাজের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতবর্ষে দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক শাসনের আদর্শে তৈরি হওয়া স্বভাবে আদিবাসীদেরকে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঠেলে দিতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। তাই সামান্য একশো টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এক আদিবাসী যুবককে পাগলা হাতি মারার কাজে নিযুক্ত করেছে। যার পরিণতি খুবই মর্মান্তিক হয়েছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের পর আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা সংবিধানে স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা পায়। এর আগে আদিবাসী সমাজকে(খ্রিস্টান ধর্মকে সামনে রেখে) খ্রিস্টান মিশনারিরা সাহায্য করছিল। অবশ্য এর পিছনে তাদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কারণ ছিল। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (১৯৩০-২০১৪) বলেছেন-

> পরাধীন ভারতবর্ষে সাঁওতালদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য শাসক গোষ্ঠী সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাধ কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে, সাঁওতালদের ভাল-মন্দ দুই-ই হয়েছে।[১২]

‘শিকারী’ ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা হলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নয়ন কিছুই হয় নি। গল্পে তারই আভাস পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যে’ নামক ছোটগল্পটি ভ্রমণের আদলে রচিত। আসলে এটি তাঁর ভ্রমণকাহিনি বা দিনলিপির অংশ বিশেষ বলা যেতে পারে। তিনি ভ্রমণ করতে গিয়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে এক সাঁওতাল গ্রামের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যকে বর্ণনা করেছেন। গালুডি নামে এক ছোট গ্রাম এ থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে ‘রাখা মাইন্‌স’ নামে একটা রেলস্টেশন আছে। সব দিকে পাহাড় ও ঘন বনজঙ্গলে ঘেরা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা ওপারে সিদ্ধেশ্বরডুংরি ও ধনঝরি শৈলমালা অবস্থান করে। বহুদিন পূর্বে এখানে একটা তামার খনি ছিল, কোম্পানি ফেল হওয়ার কারণে এখন আর মানুষজন কেউ থাকে না। শুধুমাত্র ম্যানেজারের বাংলোটি নীরব ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে পড়ে রয়েছে। এর পাশে ঘন জঙ্গল ও

পাহাড়ে ঘেরা সাঁওতালী গ্রামটি অবস্থান করে। এক সাঁওতাল বৃদ্ধ জানায়, এই জঙ্গলে বসবাস করা খুবই কঠিন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বন্যজন্তুর আক্রমণ লেগে আছে। একটু অসতর্কভাবে চলাফেরা করলে বন্যজন্তুর নিকট বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়। প্রথম দিকে তিনি সাঁওতাল গাইড ছাড়া জঙ্গলে যেতেন না। একবার এক সাঁওতাল যুবককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সিদ্ধেশ্বরডুংরিতে উঠেছিলেন। সেখানে বুনো হাতি, পাহাড়ের গায়ে গুহা, নানারকম গাছপালা, ফুল, ফল সব মিলিয়ে এক অপরূপ দৃশ্য দেখেছিলেন-

> এ-সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যাঁরা ঘন অরণ্যানী, নির্জন শৈলমালার সৌন্দর্য ভালোবাসেন তাঁদের এ সব স্থানে আসা দরকার। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষীণকায়া পার্বত্য নদী—হয়তো হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করে বইচে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে। দুধারে জনহীন বনভূমি, কেঁদ, পলাশ ও শালের জঙ্গল, ঘন প্রান্তরাকীর্ণ।[১৩]

এক বৃদ্ধ সাঁওতালের সঙ্গে কথোপকথনে জানতে পারে মাইল পাঁচেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে এক পুরোনো দেউল রয়েছে। তিনি পুরোনো দেউল দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে, দোলের আগের দিন বেরিয়ে পড়লেন। সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডির পাকা রাস্তা দিয়ে বেলা এগারোটার নাগাদ গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলেন। এর আগেও তিনি কুলামৌড়া গ্রামে সাঁওতালি উৎসব দেখতে এসেছিলেন। তাই তাঁর পথ চিনতে খুব বেশি অসুবিধা হয় নি। অবশেষে তিনি যখন কুলামৌড়া গ্রামে পৌঁছেছিলেন তখন রাত বারোটা। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ, গ্রামে রাতের অন্ধকারে অচেনা লোককে দেখে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছিল। কুকুরের ডাক শুনে গ্রামের লোকজন সবাই মনে একটা চাপা আশঙ্কা নিয়ে জাগছিল এবং মুহূর্তে লেখককে দেখে সবাই অবাক হল। আবার দুপুরের সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তাকে বনে যেতে দেখেছিল। গ্রামের লোকজন লেখককে নিশুতি রাতের অন্ধকারে একা জঙ্গলে ঘুরতে নিষেধ করেছিল। কুলামৌড়া গ্রামের সবাই তাকে সতর্ক করে বলেছিল-

> খুব বেঁচে গিয়েছিস্ বাবু! শঙ্খচূড় সাপের সামনে পড়লে আর বাঁচতিস্ না! ধন্ঝরি বনে বড্ড শঙ্খচূড় সাপের ভয়।[১৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যে' নামক ছোটগল্পে বিশেষ কিছু না থাকলেও, সহজ-সরল অক্ষরজ্ঞানহীন বনজঙ্গলে বসবাসে অভ্যস্ত সাঁওতালরা জঙ্গলের বিপদসঙ্কুল জায়গা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শহুরে বাবুদেরকে 'গাইড' করে তা স্বীকার করতে হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' নামক ছোটগল্পের পটভূমি ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলা। এই গল্পটিও ভ্রমণকাহিনি বা দিনলিপির অংশ বিশেষ। ভ্রমণ কাহিনির আদলে রচিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিংভূমের পাহাড়ি দুর্গম পথে ভ্রমণ করতে গিয়ে এক গ্রাম্য কবি রঘুনাথ দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রঘুনাথ দাস জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ সম্পর্কে লেখককের সামনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিল। পরিবেশটা খুবই সুন্দর ছিল, তামা পাহাড়ের দুই পাশে সারি

সারি করে শালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, পর্বতসানুর বনে দেবকাঞ্চন ফুলের গন্ধে চারিদিকে ভরে গেছে। এমনই এক পরিবেশে সাঁওতালি চেহেরার কবি, মাথায় বাবরি চুল, কালো সুঠাম দেহ রঘুনাথ দাস তার স্বরচিত কবিতা আপন মনে আবৃত্তি করে চলেছে। গ্রাম্য কবি রঘুনাথ দাস তার মনও খাঁটি ছিল। লেখক তাকে জঙ্গলে থাকতে অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়-

> ...কষ্ট কেন হবে বাবু? এমন বনের মধ্যে পাহাড়ের নীচে। শালফুল যখন ফোটে, সে গন্ধে পাগল করে দেবে, সে সময় আসবেন বাবু। দেখুন না কত ফুল ফুটে আছে এ সময়। সকালে কত শিউলি ফুল পড়ে থাকবে পাহাড়ের বনে। আর দিনকতক পরে আশ্বিন মাসের প্রথমে এখানে জ্যোৎস্নারাতে ঘরে বসে পড়ি বা লিখি, শিউলি ফুলের সুবাস কি! এক-একদিন আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় না। সারা রাত এখানে শুয়ে থাকি।[১৫]

পথের মধ্যে কুলামৌড়া গ্রামে চায়ের দোকান চালানো পরীবানু নামে এক মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়-

> ...কিছুদূরে গিয়া একটি বনমধ্যস্থ সাঁওতালী গ্রাম, নাম কুলামাড়ৌ। সেখানে পথের ধারে একটি ছোট্ট কুটির, তাহার পাশে শালের খুঁটিতে বোলানো একটা কেরোসিনের টিনের ভগ্নাংশ, তাহাতে অতি জরুরি বিজ্ঞপ্তি লিখিত আছে- “এই মাস হইতে দুকান খোলা হইয়াছে।[৬]

গল্পে উল্লিখিত ‘পরীবানু’ নামটির মধ্যে মুসলমানী ঐতিহ্যর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত আদিবাসীরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে এ ধরণের নাম দেয় না। তবুও রঘুনাথ দাস নিজের স্ত্রীকে পরীবানু’র দেশের মেয়ে বলে দাবি করেছে। সাঁওতাল কিংবা সমগোত্রীয় আদিবাসী। সে বনের ফুলকে ভালোবাসে, খোঁপায় পরে। স্বামীর জন্য শাল পাতায় মুড়ে ভাত কিংবা ভুট্টাপোড়া নিয়ে আসে। বনজঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসীরা শহুরে বাবুদের মতো দুবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। অনেক সময় তাদেরকে ভুট্টাপোড়া খেয়ে দিন কাটাতে হয়। কার্তিক মাসে কুলামাড়ৌ গ্রামের আদিবাসী মেয়েরা একধরনের জংলী আলু খুঁড়তে যায়। সেই আলু খেয়ে তাদের পনেরো দিন কেটে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে অভাবের সংসারকে গল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন।

‘কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে’(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)- জীবনচরিতের মধ্যে সবসময় কবির পূর্ণসত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু দিনলিপির মধ্যে লেখকসত্তার অনেকটা খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ দিনলিপি হল লেখকের মনের আত্মগত, যেখানে লেখকের নিজস্ব সত্তা স্ব মহিমায় প্রকাশিত হয়। তাই লেখকের ভালো লাগা-মন্দ লাগা আনন্দ-বেদনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে দিনলিপিতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের অনেকখানি তা ধরা পড়েছে তাঁর রচিত দিনলিপিগুলিতে-

> বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে- দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার সঙ্গে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশি তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে- ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদিহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরি লেখার শুরু- [১৭]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নিবিড় প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তিনি দিনলিপির পাতায় কেবল প্রকৃতির রূপচিত্রকে অঙ্কন করেননি। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাঁর রূপমুগ্ধ বিস্ময়াভিভূত মন এক আশ্চর্য কল্পনাশক্তি লাভ করেছে। সেই কল্পনাশক্তি শিশু সুলভ আচরণ নয়, প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের লক্ষণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনাশক্তি পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক লর্ড বায়রন(১৭৮৮-১৮২৪)-এর 'Child Harold's Pilgrimage' সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে– 'I love not man the less, but nature more.' তাঁর কাছে বিশ্বপ্রকৃতি এক পবিত্র জায়গা। প্রসঙ্গক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)'র 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)'র 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী', 'জাপান যাত্রী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' সতীনাথ ভাদুড়ী(১৯০৬-১৯৬৫)'র 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' ইত্যাদি রচনাগুলির প্রসঙ্গ এসে যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিগুলিতে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের মানস বৈশিষ্ট্যকে আরও বেশি করে উন্মোচন করে। বস্তুত দিনলিপির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার অন্তরঙ্গ গূঢ় পরিচয় অনুসন্ধান করা। তাঁর রচিত দিনলিপিগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিনলিপির জন্য এক যথার্থ অনন্য শিল্পী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত দিনলিপিগুলি বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেকটি দিনলিপি'ই অন্তর্লোকের অভূতপূর্ব রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করে। সেগুলি পড়তে পড়তে আমরা অন্য এক মায়াময় জগতে উপনীত হই, যা চেনা হয়েও অচেনা, আবার অচেনা হয়েও চেনা। চেনা জিনিসকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করি। দিনলিপিগুলি লেখক হৃদয়ের রহস্যর চাবিকাঠি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রুটিন' মাফিক রোজকার কাজের মতোই দিনলিপি লিখছেন। সর্বদা তিনি সাল তারিখ মেনে দিনলিপি লিখতেন না। একই সঙ্গে কখনও একাধিক দিনলিপি লিখেছেন। তবে তাঁর প্রতিটি দিনলিপি বর্ণনা ও অভিজ্ঞতায় একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দিনলিপিগুলি আকর্ষণ করার প্রধান দিক হল- তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবন ও মননের পরিচিতি। প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা ও অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয়। লেখকের নিজস্ব অনুভূতির কিছু কথা। দিনলিপিগুলির মাধ্যমে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীল সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর রচিত দিনলিপিগুলি কেবল 'A writer's note book' নয়, দিনলিপিগুলি নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তার এক স্বচ্ছতম দর্পণ। অধিকাংশ দিনলিপিগুলিতে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ এসেছে। সেগুলি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল-

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *তৃণাঙ্কুর* দিনলিপিটিতে **১৯২৯** সালের **১৯** শে জুন থেকে **১৯৩৯** সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ভ্রমণ সংক্রান্তের বিবরণ পাওয়া যায়। দিনলিপিটিতে কলকাতা থেকে শুরু করে বনগাঁ, নাগপুর ও বিক্রমখোল সর্বত্রই তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে চারপাশের জগৎ থেকে জীবনের মহত্তর সত্যের খোঁজ করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের প্রসঙ্গে অরণ্যর নির্জন রহস্যময় প্রকৃতির কথা এসেছে। সম্বলপুর অঞ্চলে ভ্রমণের সূত্রে আরণ্যক পরিবেশে হাটে কেনাবেচা করতে আসা সাঁওতাল মেয়েদের কথা পাওয়া যায়। লেখকের নিপুণ কলমের টানে আজও তারা সাহিত্যের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে-

> রোদ কি অপূর্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম- বেগুন, রেড়ির বীজ, কচি হঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি নিচ্ছে।[১৮]

সেই সময়ের অধিকাংশ আদিবাসীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর ছিল না। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে হাটে-বাজারে জিনিস কেনাবেচা করত। তাই দিনলিপিটিতে উল্লিখিত সাঁওতাল মেয়েটির বিনিময় প্রথার মাধ্যমে হাটে কেনাবেচার ছবিটি আজও পাঠক সমাজকে ভাবায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ঊর্মিমুখর*(১৯৪৪) দিনলিপিটিতে **১৯৩৫** সালের মে মাস থেকে **১৯৩৬** সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভ্রমণ সংক্রান্তের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি দিনলিপিটিতে মানুষ আর প্রকৃতির কাছাকাছি অবস্থানকে ব্যক্ত করেছেন। আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপনে ব্যথা বেদনার কথা লিখেছেন। ঝাড়খন্ড রাজ্যের সিংভূম জেলায় ভ্রমণে রাখামাইন্স্ অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। সাঁওতালদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাওয়া, বিভিন্ন উৎসবে সাঁওতালি নাচ এছাড়াও কাঠ কাটতে গিয়ে অরণ্যের মধ্যে বন্য হাতি বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদেরকে বনের কাঠ ও পাতার উপর নির্ভর করতে হত। এরকম তাদের জীবনের টুকরো টুকরো ছবিও তাঁর দিনলিপিটিতে ধরা পড়েছে। যেমন-

> কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম—বরমডেরা ও কুলামাতো। আর-বছর যে রাস্তা ধরে সাটকিটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোজা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়।... টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে যাচ্চে, বললে— বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতি জল খেতে নামবে।[১৯]

সাঁওতাল জাতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, তাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে জানা যায়, যেমন- তাদের গানে আছে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেইরকম কিছু সমগ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর আলোচ্য দিনলিপিটিতে এক

জায়গায় সাঁওতাল জাতির নাচের প্রসঙ্গকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—

> রুথামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম।[২০]

এছাড়াও তিনি জঙ্গলে বসবাস করা সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনের নানারকম সমস্যাকেও তুলে ধরেছেন। বনে বসবাসকালীন তাদেরকে প্রায়েই বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াইয়ের সম্মুখীন হত। আবার অনেক সময় তাদেরকে প্রাণও দিতে হয়েছে। তাই তারা অরণ্য বন্যজন্তুর আশঙ্কায় অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছিল-

> ...চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উঠোনে আগুন জ্বেলে সম্ভবত আগুন পোয়াচ্চে। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম— এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতি বাঘ নামে না? তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে— বাবু, ভয় করে কি হবে? যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।[২১]

অতএব 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিটিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিগুলি ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বনে-পাহাড়ে* (১৯৪৫) ভ্রমণদিনলিপিতে ছোটনাগপুর (সিংভূম, রাঁচি ও সারগুণ্ডা ও কোলহান প্রভৃতি) অরণ্য অঞ্চলের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঝাড়গ্রাম, ঘাটশিলা সংলগ্ন অঞ্চলের অরণ্য-প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসীদের জীবনে বহু দুঃখ-যন্ত্রণার করুণ সুর শোনা যায়। আলোচ্য ভ্রমণকাহিনিতে ঘাটশিলা জঙ্গলে সাঁওতাল যুবকের কণ্ঠে বাংলা গান ও কাঁদোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েদের মাছ ধরার প্রসঙ্গ আছে। এছাড়াও ঘন জঙ্গলের মাঝে 'সামানকুই' বা 'বুধনকুই' নামক হো মেয়েদের সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়েছিল। লেখককে কেন্দ্র করে হো মেয়েদের হাসি, আন্তরিক আপ্যায়ন 'জোম্‌পে জোম্‌পে' (ভাত তৈরি—খাও) বলা, প্রভৃতি বর্ণনা অতি বাস্তব। হো মেয়েদের মুখের সরলতা লেখকের মনকে কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকার কারণে, তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হত। অনেক সময় তাদেরকে অভাবে সংসারে বনের ফলমূল খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল। অবসর সময়ে তারা বুনো খেজুর পাতা দিয়ে মাদুর বোনে। এই অরণ্যই তাদের মাতৃভূমি।

আর্থিক সংকট মুক্তি পেতে হো ও মুণ্ডা মেয়েরা খনিতে কাজ করে। সাময়িকভাবে তারা পরিশ্রমকে লাঘব করার জন্য খনিতে কাজ করার সময় সমবেত হয়ে গান করে। আদিবাসী মানুষরা আর্থিকভাবে শোষিত, লেখকের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে-

> বিদেশীর স্বার্থে আমাদের দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসরে সিংভূমের এই অপূর্ব অরণ্যভূমি অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করচে বিলাতের বড়

মানুষেরা, আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।[২২]

সংসার জীবনে দারিদ্র আর বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও তারা অফুরন্ত আনন্দের সহিত বেঁচে থাকতে চায়, হাটে আসা হো, মুণ্ডা মেয়েদের সাজসজ্জার বর্ণনা আছে। যা তাদের সমাজজীবনে একান্ত বাস্তব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বনে-পাহাড়ে* নামক ভ্রমণকাহিনিতে আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বনজঙ্গলে বসবাস করা সাঁওতাল, হো ও মুণ্ডা সমস্ত শ্রেণির আদিবাসীদের সঙ্গে একটা আন্তরিক সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। তাই তিনি তাদের বাস্তব জীবনের ছবিকে ভ্রমণকাহিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮) দিনলিপিটি ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে রচিত। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য দিনলিপিটিতে ধলভূমগড়, পশ্চিম সিংভূমের সারান্ডা ফরেস্ট, ঘাটশিলার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ভ্রমণে বিভিন্ন আদিবাসী (সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি) সম্প্রদায়ের মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাই তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য তাদেরকে চাকুলিয়ার হাটে আসতে হত। একসময় তিনি সাঁওতাল মেয়েদেরকে চাকুলিয়ার হাটে ঝাড়ু বিক্রি করতে দেখেছিলেন। তাদের নিত্যদিন বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার সাহসিকতার কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। লাখন মাঝি ভাল্লুকের আক্রমণে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসীরা চরম দরিদ্র ও স্থানীয় শাসকের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। প্রবল শীতেও তাদেরকে গাছের তলায় একমাত্র খেজুরের ছেঁড়া চাটাই ও আধছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথাকে সম্বল করেই রাত কাটাতে হত। এই অসহায় মানুষগুলির করুণ অবস্থা দেখে তাদের প্রতি সহমর্মিতা হয়ে লিখেছেন-

এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ি চালাবে- মজুরি কত, না দৈনিক এক টাকা।[২৩]

পূর্ববর্তী দিনলিপির চেয়ে *হে অরণ্য কথা কও* দিনলিপিতে আদিবাসী মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলি অনেক বেশি বাস্তব। সাঁওতালদের প্রত্যক বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেওয়ালে গাছপালার আলপনা দেওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে-

ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতাল গ্রাম পথেই পড়ে- সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কারভাবে লেপে-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলপনার মত পাখি আঁকা, গাছপালা আঁকা।[২৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে আদিবাসীদের উন্নতির দিকটি কিছুটা হলেও ধরা পড়েছে। যেমন- ধনুর্ধর বাস্কে স্কুলে যায় কিংবা আংকুয়া ডাকবাংলোর চৌকিদারের স্ত্রী হো মেয়েটি মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করে। তবুও আদিবাসী মানুষদের দারিদ্রময় জীবনযাপন তাকে বেশি করে ভাবিয়েছিল। হো সম্প্রদায় মানুষদের পান্তা ভাত আর বনকচু মেশানো ডাল খেয়ে জীবনযাপন করা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি তাঁর জীবনদৃষ্টির মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন-

> এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না, বুনো হাতি মানে না, বাঘ মানে না— যদি দু'টাকা কি দেড় টাকা গাড়ির ভাড়া মেলে, তবুও খায় বনকচু সিদ্ধ আর ভাত।[২৫]

অতএব *হে অরণ্য কথা কও* দিনলিপিটিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী সাঁওতাল, হো ও মুণ্ডাদের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৩৪, ১৯৪৩-এর দিনলিপিগুলিতে তাঁর অরণ্য ভ্রমণ ও অরণ্য সংলগ্ন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩৪ সালের ২রা- ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারির দিনলিপিতে ঘাটশিলা, গালুডি ও সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণের সূত্রে সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। উৎসবের সময় মেয়েরা তুলি দিয়ে দেওয়ালে আলপনা দেয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তারা বনে কাঠ কাটতে যায়। তাদেরকে পাহাড়ের অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে কাঠ ও পাতা সংগ্রহ করতে হত। ১৯৩৪ সালের ২রা ফ্রেব্রুয়ারির এক দিনলিপিতে তার প্রমাণ মেলে-

> সাঁওতাল একজন যুবতী এতক্ষণে এক বোঝা কাঠ ও শালপাতা নিয়ে আস্‌চে জঙ্গল থেকে, বল্লে পাটকিটা থেকে আস্‌চি।[২৬]

অরণ্য জগৎ ছাড়া তারা কিছু চিনত না। তখনও তাদের মনে শহর সম্পর্কে ধারণা আয়ত্তের বাইরে ছিল। তাই তারা কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে কলকাতা সম্পর্কে বিস্ময় আর কৌতূহলের শেষ ছিল না। ১৯৩৪ সালের ২১শে ফ্রেব্রুয়ারির এক দিনলিপিতে তার প্রমাণ মেলে—

> সাঁওতাল কুলি যারা কয়লা বইছিল তারা আমার সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলে। কলকাতায় দুতালা দালান আছে বাবু? কল্‌কাতায় গাছ নেই- সেখানে কি সব গাছ কেটে ফেলেচে।[২৭]

১৯৪৩ সালের ১১ই মার্চের দিনলিপিটিতে ক্রোমাইট খনিতে কর্মরত সাঁওতাল মেয়েদের প্রসঙ্গ এসেছে। খনিতে কাজ করার ফাঁকে কিংবা পাহাড় থেকে কাঠ নিয়ে নামার সময় পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের কিছু টুকরো ছবি পাওয়া যায়-

একটা গাছের তলায় সাঁওতাল মেয়ে ও পুরুষের দল কাঠের বোঝা নামিয়ে ছায়ায় বিশ্রাম করচে। কাঠ মাথায় দলে দলে মেয়ে-পুরুষ নামচে পাহাড়ের পথ বেয়ে। মাদ্‌লার হাটে বিক্রি করে চার আনা পাঁচ আনা রোজগার করবে। অন্য কোনো উপজীবিকা নেই এদের।[২৮]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপিগুলিতে জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসী মানুষদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপিগুলিতে সাঁওতাল, হো ও মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহজ-সরল জীবনযাপনের দিকটি বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে দরিদ্র আর অসহায়তাই তাদের নিত্যসঙ্গী হয়েছে। তবুও তারা সবসময় হাসিমুখে থাকতে চায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি পরিশ্রমী হয়। সামান্য কিছু আয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বনের শুকনো কাঠকে তারা হাটে-বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের সংসারে অভাব দূর হয় না। বর্তমানে এখন তারা বিভিন্ন কলকারখানা ও খনিতে দিনমজুরের কাজ করে। তবে ভারতবর্ষের আধুনিক সভ্যতায় নাগরিক জীবন সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে। কারণ, আজকে তারা গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবধারা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তাই তারা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প, দিনলিপি ও ভ্রমণকাহিনিতে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)'র মতো রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালদের অর্থনৈতক সংকট কিংবা তাদের অতীত গণসংগ্রামের ইতিহাসকে প্রধান বিষয় করে তোলেন নি। সাহিত্য অরণ্য আর আদিবাসীদের অভিন্নসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। 'শিকারী' ও 'কালচিতি' গল্পে স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময়ের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) *বিদ্রোহ* (১৮৯০) উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্রের প্রতিনিধি জঙ্গুর অরণ্যপ্রদেশ-এ ফিরে যেতে চেয়েছিল। পরবর্তী কালে মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) উপন্যাসে আদিবাসী চরিত্র বীরসা মুণ্ডা অরণ্যর যাবতীয় অধিকার ফিরে পাওয়া ও ব্রিটিশদের শোষণ শাসন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প কিংবা উপন্যাসের চরিত্রে নীরবতার মধ্যে দিয়ে পাঠক হৃদয়ে তাদের হয়ে প্রতিবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন।

তথ্যসূত্র:

১. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, *কল্লোলের কালে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১০৭-১০৮।

২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮৬-২৮৭।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'তৃণাঙ্কুর', *বিভূতিরচনাবলী* (৪র্থ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৫ম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৫২।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'উইলের খেয়াল', *গল্প সমগ্র* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৪৫৭।
৫. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৫১।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৭৮।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮০।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮১।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি', *গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮৪।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কালচিতি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮৪।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'শিকারী',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৯৭।
১২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (১ম খন্ড), পরিবেশক : সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২২০।
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অরণ্যে',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬২০।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অরণ্যে',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬২৪।
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কবি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬০৯।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'কবি',*গল্প সমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬০৫।

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'হে অরণ্য কথা কও'(উৎসর্গ পত্র)*বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৫৪।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'তৃণাঙ্কুর,' *বিভূতি রচনাবলী* (৪র্থ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৫ম মুদ্রণ, পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩১০।

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ঊর্মিমুখর,' *বিভূতি রচনাবলী* (৫ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩৭৮-৩৭৯।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ঊর্মিমুখর,' *বিভূতি রচনাবলী* (৫ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩৮০।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'ঊর্মিমুখর,' *বিভূতি রচনাবলী* (৫ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩৮২।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বনে-পাহাড়ে', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭০২।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'হে অরণ্য কথা কও', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৮৩।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'হে অরণ্য কথা কও', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬২৬।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'হে অরণ্য কথা কও', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬৫০।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, '১৯৩৪-এর ডাইরি', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭৫০।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, '১৯৩৪-এর ডাইরি', *বিভূতি রচনাবলী* (ষষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭৬২।

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, '১৯৪৩-এর ডায়েরি', *বিভূতি রচনাবলী* (৮ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৪৫২।

চতুর্থ অধ্যায়:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এক জমিদার পরিবারে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১)এর জন্ম হয়। রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত বীরভূম জেলার প্রায় একতৃতীয়াংশ ভূ-প্রকৃতি হল রুক্ষ-কঠোর রাঙামাটি। এক কথায় বলতে গেলে বীরভূম একেবারে কড়াধাতের মাটির দেশ, তাঁর *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) উপন্যাসে সেই ভূ-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়-

> হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধু-ধু করে বালি – একপাশে মাত্র একহাঁটু গভীর জল কোনমতে বয়ে যায়– মা–মরা ছোট মেয়ের মতো শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে, কোনমতে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ; ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মতো; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মতো যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।[১]

এই প্রকৃতি যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৪-১৯৫০) চোখে দেখা প্রকৃতি নয়। রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়ে যায়। তা দেখতে অনেকটা আগুনে পোড়া লোহার মতো লাল হয়ে যায়। এই মাটি কোদাল বা গাঁইতি দিয়ে কাটা যায় না, ধার বেঁকে যায়। কোদাল বা গাঁইতির মতো কৃষিকাজের যন্ত্র দিয়ে কোপ দিলে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপেই আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছিলেন-

> বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে। মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। শুধু অটুট বললেই বোধ হয় সব বলা হয় না। ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হ'ল। দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে-তা আজও আমার চোখে ভাসছে।[২]

যে রাঙামাটির দেশ একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে(১৮৬১-১৯৪১) উদাস করে তুলেছিল। সেই রাঢ় অঞ্চল অন্তর্গত রাঙামাটির দেশে শক্ত মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া লাভপুরের বুকে এক সূতিকাগৃহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসার টান থাকার জন্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে রাঢ় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি মাতৃভূমির ঐতিহ্যর গৌরবকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্য আজীবন নিজের সাহিত্য জীবনের সাধনাকে বা তপস্যাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের

রাঙামাটি আপন ঐতিহ্য র উপহার স্বরূপ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনপীঠে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলের রাঙামাটি তার জন্মভূমি। জন্মভূমিরভূ-খন্ড মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহ্য সিক্ত ও স্নাত। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে সাধনা সেই পথে মনোনিবেশ করেন। সমগ্রজীবন ধরে নিরন্তরে মাতৃঋণ পরিশোধের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। এইসব কারণের জন্য তাঁর সাহিত্যের ভৌগোলিক মানচিত্রে বীরভূমের চিত্রটি এক বিশেষ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের জগৎ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর সাহিত্যের অধিকাংশ চিত্রিত চরিত্রাবলীর ভৌগোলিক পটভূমি হল বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-কলকাতা, এছাড়াও উড়িষ্যা-ঝাড়খণ্ড-দিল্লী এমনকি ওপার বাংলার সুদীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। তিনি সাহিত্যে সাধনার প্রথম থেকে নিজের বীরভূম জেলাকে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, সারাজীবন ধরে তিনি সেই স্বপ্নকে বাস্তাবায়িত করার জন্য সাধনা করেছিলেন। তিনি সাময়িক কিছুদিনের জন্য জমিদারী তদারকির কাজে বীরভূম জেলার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল গোগো, দোগাছি, বেলেড়া, ভালাস মস্তোলী প্রভৃতি বহু গ্রামে গেছেন প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এবং অনেক সময় তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ দুঃখেরও অংশীদার হয়েছেন। মানসিক ভারসাম্যহীন ক্ষ্যাপা বাউন্ডুলের মতো গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন আঞ্চলিক মেলা গুলোতে খুব আগ্রহের সহিত ঘুরেছেন। আবার কখনো দেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে তাঁর এলাকায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামে দীর্ঘ ছয়মাস ধরে ঘুরেছেন, নিয়মিতভাবে প্রতিনিয়ত মানুষের জন্য খেটেছেন। ঐ সময়ের কথা প্রসঙ্গে এক জায়গায় নিজেই বলেছেন-

> সকালে বাইসিক্‌ল নিয়ে বের হই-গ্রামে গ্রামে ঘুরি, পথঘাট নালা-খাল দেখে বেড়াই। ভাঙা পথ মেরামত করাই, আঁকাবাঁকা নালাকে সোজা করে কাটাই; ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে পরিচয় করি। তাদের মনের খবর বিচিত্র পরিচয় নিজের মনে বহন করে ফিরে আসি।[৩]

আর এইসব চরিত্রগুলি অধিকাংশ তাঁর চোখে দেখা সাধারণ মানুষ। যেমন বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা বিজন ভট্টাচার্য(১৯০৬-১৯৭৮) কিংবা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)'র মতো কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানারকম সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি সর্বব্যাপী সহানুভূতি নিয়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মিত চরিত্রগুলি বাস্তবে নিজের চোখে দেখা- তাঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ দেয়। এখান থেকে জানা যায় যে কমলিনী বৈষ্ণবী, কালী কর্মকার, নিতাই, বসন, নসুবালা, রাধিকা, বেদেনী, জগন্নাথ, করালী কাহার, সীতারাম মাস্টার, স্বর্ণ, শিবি বেদিয়ানী, ভোলা, লছমনিয়া, চণ্ডীহাড়ী, ফুলমণি, হেদো মণ্ডল, বনওয়ারী, কমলি, সাবিত্রী, ভোলাই, ভামিনী, মনি, কালীচরণ, শশীডোম, শম্ভু, রাঙ্গাদিদি, লছমী, শিবনাথ, গুপে, কমল

মাঝি, সোনা মাঝি প্রভৃতি বহু চরিত্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর '*আমার সাহিত্য- জীবন*' গ্রন্থে বলেছেন-

> পাষাণপুরী-র অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ। আমি যেদিন সিউড়ি আদালতে শমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল। আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলিধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরনে ছিন্নবিছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষতচিহ্ন, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমাদপুরে বসেছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারাদুটিও পিঙ্গল, বিড়ালের চোখের তারার মতো। সেইখানেই শুনলাম কালীর কাহিনি।....কালীর কাহিনি, কালীর মূর্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।[৪]

নিঃস্বার্থভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশার তাগিদে এলাকার মানুষদেরকে চেনার প্রতি তাঁর একটা ব্যক্তিগত অহংকারও ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলার প্রকৃতি-জনপদ, বাঙালির জীবন-চর্যা, ধর্ম-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি দু'চোখ ভরে দেখেছেন 'শাক্ত-বৈষ্ণব সংঘর্ষের বাস্তব রূপ। যেমন- জেলে, মুড়ি ভাজুনী, মেথর ও চাকরদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এছাড়াও পটুয়া, বেদিয়া, বাজীকর, সাপুড়ে ও বাউল-বৈষ্ণব প্রভৃতি যারা লাভপুরের বাড়ির আনাচে-কানাচে ভিক্ষা করে বেড়ায় তাদের সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি পূর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন-

> এদের মধ্যে হাড়ী, ডোম, বাগদি-বাউরিরাই প্রধান। অন্যান্য উপজাতির মধ্যে আছে রাজবংশী, জেলে, লেট, ভল্লা, সদ্গোপ, কোরা, কাহার, লোহার, ভুঁইমালী, মুচি, মেথর, চামার, যদুপতিয়া ও সাঁওতাল।[৫]

রাঢ় অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশটা আদিবাসী অধ্যুষিত, তাই রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে আদিম কোমসংস্কৃতির উপাদান গুলো বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এই অঞ্চল থেকে সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে আদি অস্ট্রাল বা নিষাদ ও দ্রাবিড়ভাষী দাস-দস্যুদের বসতি, উত্তরবঙ্গের কিরাত-সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুসংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলেও তেমনি নিষাদ-দাস-দস্যু সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। এই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে বহন করে চলেছে রাঢ় অঞ্চলের উপেক্ষিত জনসমাজ- তথাকথিত হাড়ি-বাগদি, বাউরি, ডোম, কাহার ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জনজাতি। এই আদিম জনজাতিদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের বিচিত্র রকমের ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সক্রিয় যা পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের প্রতি পরতে পরতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যক্তিগতভাবে চেনাকে একমাত্র সম্বল করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার ভদ্র সমাজের অমার্জিত মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁর সাহিত্যে শিল্পে নিজের মতো করে লিখে গেছেন যা বর্তমানে সামাজ বিজ্ঞানী গবেষকদের কাছে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম এক জীবন্ত দলিল হিসেবে দাবি করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের নদনদীকে সাহিত্যের এক বিশেষ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে পাতায় বীরভূমের নদনদীকে এক জীবন্ত চরিত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নদীগুলি বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী তাদের চরিত্র পালটায় কখনও তৃষাতুর জীবনে ক্ষুধিত পাষাণ, কখনও প্রবৃত্তির উন্মত্ত লালসায় চঞ্চল, কখনও ক্রুর নিষ্ঠুর নিয়তির মতো ভয়ানক ধ্বংস যজ্ঞে মাতোয়ারা, কখনও পুরাণ মহিমার মাহাত্ম্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি বীরভূমের প্রত্যক নদনদীগুলোকে তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি মনস্তাত্বিক চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে দেখেছেন। নদী তার প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বীরভূম জেলার বেশ কিছু অংশকে পলিমাটি দিয়ে ভরাট করেছে। এর ফলে সেইসব জায়গা গুলো শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছে। এ পলিমাটি একদিন বীরভূমের প্রত্যেক চাষির স্বপ্ন ছিল, তাই দিনমজুর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের একমাত্র অন্নের উৎসভূমিও বলা যায়। এ মাটিকে ঘিরে চাষিদের অনাবিল আনন্দ দেখা যায়-

> মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে-মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।[৬]

এই নদীগুলি তার তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ামক ভাগ্যদেবতা হিসাবে প্রবাহিত হয়েছে। বীরভূমে প্রবাহিত নদ-নদীর বৈশিষ্ট্যর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা গড়ে উঠেছে। বীরভূমের অজয়, কোপাই, কালিন্দী প্রভৃতি নদ-নদীকে তিনি সাহিত্যে এক জীবন্ত মানবী চরিত্র রূপে অঙ্কন করেছেন। তিনি নদ-নদীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* (১৯৫১) বর্ণিত কোপাই নদীকে কাহারদের কন্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুধু এ তুলনায় শেষ নয়, বর্ষাকালে কোপাই নদী অজগর সাপের মতোই ফুঁসছে। প্রতিনিয়ত ঢেউয়ে ফুলে উঠেছে যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে, ঠিক যেমন ‘বিষম ঢাকি’ বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুনে অজগর সাপ তার বিরাট অঙ্গ আছড়ে আছড়ে হাজার ফণায় ছোবল মেরে নাচে। উপন্যাসে নদীকে কেবল এক জীবন্ত চরিত্র বলে শেষ করেননি, একই সঙ্গে নদীর জৈবিক উন্মাদনায় মত্ত সে দিকটিও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাঢ় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যের তাপে যেমন রুক্ষ প্রান্তরের মাঠ ডাইনি বা ডাকিনীর মতো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, ঠিক তেমনই বর্ষাকালে নদনদী গুলি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তাই তিনি বীরভূমের নদনদীকে বর্ষাকালের ভয়ঙ্কর রূপকে ডাকিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ময়ূরাক্ষী যেমন ‘রাক্ষসীর মতো ভয়ঙ্করী’ কোপাই নদীও তেমনই ‘একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী’। তিনি বর্ষাকালে বীরভূমের নদনদী গুলির উজ্জ্বল জলধি তরঙ্গের মধ্যে প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছেন। এই জন্য তিনি কোন একসময় বর্ষাকালের নিশুতি

রাতে অজয় নদের ডাককে শুনতে পেয়েছিলেন- "খাবং খাবং জমি খাব, ঘর খাব গেরাম খাব" ধ্বনি। কালিন্দীর কূলে গিয়ে দেখেছেন 'কালী জিভ চাটে'। তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে কালী সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। *কালিন্দী* (১৯৪০) নদীর ভয়ঙ্করতা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> ...কালী যাকে নিলে, কার সাধ্যি তাকে বাঁচায়! কত গেরাম যে উনি খেয়েছেন, তার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। ফি বছর দেখবে, কত চাল, কত কাঠ, কত গরু, কত মানুষ কালীর বানে ভেসে চলেছে যমের বাড়ি। একবারে সাক্ষাৎ পেত্যক্ষ করেছি আমি।[৭]

প্রাক সাহিত্যিক পর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশী রাজনৈতিক দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তৎকালীন সিউড়ির রাজনৈতিক দলের নেতা শরৎ মুখোপাধ্যায় এবং গোপিকাবিলাস সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর নিত্য যোগাযোগ ছিল। তিনি একসময় রাজনীতির মধ্যে দিয়ে দেশের সেবা করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে গান্ধীজীর (১৮৬৯-১৯৪৮) নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কয়েক মাসের জন্য (২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ তারাশঙ্কর 'সি-ক্লাস' প্রিজনার হিসাবে) সিউড়ী জেলখানায় বন্দী করেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূমের লাভপুর গ্রামে জন্ম হলেও সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন তিনি জেলখানা থেকে প্রথম দেখেছিলেন। সিউড়ী জেলখানা যেন সাহিত্যিক তারাশঙ্করের ধাত্রীগৃহ। তিনি নিজেই বলেছেন-

> সিউড়ি জেলখানা থেকে যেদিন মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসি, সেদিন রাজবন্দিদের সভায় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করে বলেছিলাম, এ-পথ আমার নয়। আমার পথ আমি চিনেছি। আমি সেই পথেই আমার যৌবনে-গৃহীত সংকল্পের সাধনা করব। সে-পথ সাহিত্যের পথ।[৮]

দৈনন্দিন জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জেলার মানুষদেরকে প্রতিনিয়ত দেখেছেন আর সেইসব মানুষ গুলোর মুখে ভাষা সংযোজন করে সাহিত্যের পাতায় চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তকে(১৯০৩-১৯৯৮) বলেছিলেন-

> আমার বই বলুন আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ এখানকার জীবন নিয়েই লিখেছি। তার বেশি আমার আর কিছু নেই।[৯]

সাহিত্যে রচনার বেশিরভাগ অংশটা তাঁর বীরভূম জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যে রচনার প্রথম পর্বে তারাশঙ্কর তাঁর নিজের জেলা বীরভূমকে কলমের আঁচড়ে সাহিত্যের পাতায় অমর করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি সমগ্র জীবন ধরে সাধনায় রত ছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলাসাহিত্যের অন্যতম এক প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী। তাঁর সাহিত্যের আনুমানিক সীমানা হল, বীরভূম জেলার পূর্বে কীর্ণাহার থেকে পশ্চিমে রাজনগর, উত্তরে ময়ূরাক্ষী বিধৌত গণুটিয়া, বেলেড়া থেকে দক্ষিণ কোপাই এমনকি অজয়

তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত একটি ভৌগোলিক মানচিত্রকে গল্প উপন্যাসের ফ্রেমে একত্রিত করে বেঁধে রেখেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের পাতা উলটানো মানে বীরভূম জেলার ভূগোলের মানচিত্রটি একবার অজান্তে অনুসন্ধান করা। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসে এবং ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রে তিনি উচ্চস্তরের সাফল্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র-শরৎ উত্তর কথাসাহিত্যে তাঁর স্থান অভ্রভেদী। অনেক কথাসাহিত্যিক উপন্যাসে পারঙ্গম হলেও ছোটগল্পে সাফল্যলাভ করতে পারেন না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সবটা উলটো হয়ে গেছে, তিনি দুই ধরনের কাহিনিতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সমাজজীবনকে দুদিক থেকে বুঝতে চেয়েছেন। ছোটগল্পকারের জীবনদৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উভয়ের রূপ রসের মধ্যেও স্বতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও অনেকটা সত্য। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বিষয়বস্তুও যেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনই আবার পাশাপাশি বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় চিত্র। তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘাসের ফুল’ ছোটগল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় **১৯৩৩** সালে প্রকাশিত হয়। ‘ঘাসের ফুল’ গল্পে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাঁওতালদের দারিদ্র পূর্ণ জীবনযাপনের এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রথম কয়লাখনি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কুলি-কামিনদের দারিদ্র পূর্ণ জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে কয়লাখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে আরো সুন্দর ও বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> যন্ত্রের নির্মম পেষণে এইভাবেই কত ‘ঘাসের ফুল’ অনুক্ষণ বিদলিত হচ্ছে। কয়লাকুঠীকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্প লেখেন শৈলজানন্দ। কিন্তু তারাশঙ্কর কয়লাখনির পরিবেশকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় সম্পূর্ণায়িত করেছেন। পাতালপুরীর অগ্নিগর্ভ পরিবেশে প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল ঘটনারাজির মধ্যে একটি ‘ঘাসের ফুলে’র অভিশপ্ত হৃদয়মাধুর্যকে লেখক যে-ভাবে অনাবৃত করেছেন তা তাঁর সৃজনীপ্রতিভার অতুলনীয় নিদর্শন।[১০]

রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে চুড়কী নামের এক সাঁওতাল মেয়ের জীবনকে কিভাবে ঘাসের ফুলের মত চুর্ণ বা পেষণ করা হয়েছে সেই করুণ চিত্র ‘ঘাসের ফুল’ ছোটগল্পে লেখক তুলে ধরেছেন। রাণীগঞ্জ কোলিয়ারির সামান্য কর্মচারী বিনোদ সুকণ্ঠ গায়কও ছিল। তবে মাঝে মাঝেই খনি মালিকদের অনুরোধে তাকে থিয়েটারের নায়িকা সাজতে হত। অপরদিকে কয়লাখনি কুলি-কামিন চুড়কী বিনোদের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। সে প্রতিদিন বিনোদের গান শুনতে চায় এবং গান শোনার বিনিময়ে একটি করে জবাফুল দিতে চায়। কিন্তু বিনোদ তা পছন্দ করে না, তাই বাধ্য হয়ে চুড়কীর প্রেম কয়লাখনির সুড়ঙ্গ পথে আশ্রয় নিয়েছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে একদিন খনিগর্ভে চরম বিপর্যয় ঘটল, খাদের ভিতর বারুদ জ্বলছে, খাদ ক্রমশ গরম হয়ে ওঠে। যে কোন মুহূর্তে অগ্নিকান্ডে কয়লাখনির সর্বনাশ হতে পারে। এই অবস্থায়

সর্বনাশের ভয়ে কয়লাখনি মালিকের মাথায় হাত, ম্যানেজারও ভেবে কুল কিনারা খুঁজে পায় না। অবশেষে কোলিয়ারির হবু ম্যানেজার অতুলবাবু ভয়ঙ্কর এই বিপদ থেকে মুক্তির একটা উপায় বার করল। খনিতে আগুন লাগার মুহূর্তে অতুল নিজের হবু ম্যানেজার হওয়ার আশা পূর্ণতার আভাস পেয়েছে। সে মনে মনে ভেবেছে নিঃসন্দেহে ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হবে। খনি বিজ্ঞান সম্পর্কে তার কিছুটা হলেও জ্ঞান হয়েছে। এই আগুন পৃথিবীর বুকে লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ, সে আগুন জলে নিভানো যাবেনা না, আগুন নিভানোর উপায় সে মোটামুটি আয়ত্ত করে নিয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সে পরের উপকার করবে না। সে ম্যানেজারি করে মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়। এই সামান্য টাকার বিনিময়ে সে জীবনের ঝুঁকি নিতে চায় না। এইরূপ স্বার্থবাদী মনোভাব তার মনে কাজ করছিল। কয়লাখনি মালিক ম্যানেজার অতুলের কাছ থেকে এরূপ আশা করেনি। অবশ্য যে জায়গায় আগুন লেগেছে, সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু খাদের বাকি অংশটা বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবে। অতুল তার কাজের বিনিময়ে একজন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের পারিশ্রমিক দাবি করেছে। নিরুপায় মালিক অতুলের কথায় সম্মত জানিয়েছে। অতুল বিনোদকে গ্যালারির মুখ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছে। যে গ্যালারি গুলোতে আগুন লেগেছে সেগুলো বন্ধ করে দিতে পারলেই আগুন নিভে যাবে। তাছাড়া খাদে জল ভর্তি করে দিলেও আগুন নিভবে না। শুরু হল অন্ধকার খনিগর্ভে খনি রক্ষার রুদ্ধশ্বাস এক সংগ্রাম। এক এক করে গ্যালারির মুখ বন্ধ করে দিতে লাগল। আর মাত্র তিনটি গ্যালারি বাকি রয়েছে। খনিতে ধোঁয়ার পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, একা বিনোদের পক্ষে গ্যালারির মুখগুলো বন্ধ করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সে হাজার কষ্ট স্বীকার করে একটু একটু করে ২৫ নং গ্যালারির মুখে এসে দাঁড়াল। অপরদিকে ২৮ নং গ্যালারিতেও কাজ চলছে, কোনোরকমে ২৭ নং গ্যালারিটা বন্ধ করতে পারলে যুদ্ধ শেষ। এই সময় চুড়কী খনিগর্ভে গভীর প্রেমের আবেগবশত বিনোদের চোখ চেপে ধরলে, বিনোদ বিরক্তি বশত এক ঝটকায় চুড়কীকে ফেলে পদাঘাত করে তার প্রেমকে প্রত্যাখান করে সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে। প্রেমাস্পদের এইরূপ ব্যবহারে চুড়কী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ের মধ্যে মান অভিমানের পালা চলে। কিন্তু ততক্ষণে খনিগর্ভে আগুন বিশাল আকার ধারণ করেছে। বিনোদ আত্মরক্ষার তাগিদে খনি থেকে নিজে পালিয়ে গেলেও চুড়কী শেষ পর্যন্ত পালাতে পারেনি। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় বাকি ১২টা গ্যালারিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্যালারির মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় চুড়কী খনিগর্ভে চিরদিনের মতো বিলীন হয়ে যায়। প্রথমদিকে বিনোদ চুড়কীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও মনে মনে তাকে খুব ভালোবাসত। সেই ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে বিনোদ চুড়কীকে উদ্ধার করার জন্য অতুলের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ম্যানেজার বিনোদের কথায় কর্ণপাত করেনি। ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত

বিনোদকে আর কোলিয়ারিতে রাখা নিরাপদ হবে না, কারণ সে চুড়কীর মারা যাওয়ার ঘটনাকে ফাঁস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত বিনোদকে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল। ম্যানেজার শেষে জানায় বেচারা বিনোদ জানে না, যে সম্পদ বাঁচল তাতে ঐ মেয়েটির মতো কত হাজার স্ত্রী- পুরুষের জীবিকার সংস্থান হল।

'ঘাসের ফুল' ছোটগল্পে কয়লাখনিগর্ভে আগুন জ্বলে উঠা, আগুনের হাত থেকে খনিজ সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে বহু আদিবাসী শ্রমিকরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই বিপদমুখী কাজ করতে গিয়ে চুড়কীর মতো বহু আদিবাসী শ্রমিককে যন্ত্রের নিষ্পেষণে ঘাসের ফুলের মতো দলিত হয়ে অকালে খনিগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এই সব সাধারণ খেটে খাওয়া আদিবাসী শ্রমিকদের নাম সরকারী কোন নথীতে পাওয়া যায় না, এরা 'বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে খনিগর্ভে পড়ে থাকে। এভাবে এক শ্রেণির দালালরা আদিবাসী খনি শ্রমিকদের জীবনকে নিয়ে প্রতিনিয়ত দর কষাকষি করে। দালালদের কাছে আদিবাসীদের জীবনের কোন মূল্য নেই। দালালরা পয়সার বিনিময়ে তাদেরকে কেনাবেচা করে। লেখক গল্পের মাধ্যমে কয়লাখনি অঞ্চলের সেই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন।

'শিলাসন' গল্পটিতে দুটি ভাগ রয়েছে- একদিকে রয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূতত্ত্ববিদ্ এবং অপরদিকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরী তাঁর তথ্য সংগ্রহ সূচক অভিযানের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনির বর্ননা (গল্পের কথক এক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে গল্পটি বর্ননা করেছেন), অন্যদিকে সাহিত্যিক, তাঁর গল্প কথক বন্ধুর অনুরোধে গল্পটি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ভূতত্ত্ববিদ্ এবং মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরী আগাগোড়ায় বিজ্ঞানবাদী মতবাদে বিশ্বাসী, বিলাত থেকে (মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার) পাস করা একজন বিদগ্ধ মানুষ, তাঁর কথা বার্তায়, আচার ব্যবহারে সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা-

> কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম, বিদগ্ধ জনেদের মধ্যেও যিনি নাকি বকের মধ্যে হংসতুল্য বিদগ্ধ, যাঁর নাসা উচ্চ, ওষ্ঠ বক্র, বাক্‌বিস্তারভঙ্গী তির্যক্ এবং তীক্ষ্ণ, যাঁর দুটি চোখের একটি অহরহই কৌতুকে চঞ্চল এবং অপরটি উজ্জ্বল, মনে প্রাণে বিজ্ঞানবাদী, বিলেতে-পাস মাইনিং ইংঞ্জিনিয়ার সেই অমল চৌধুরীর নাকি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে।[১১]

ভূতত্ত্ববিদ্ এবং মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অমল চৌধুরী সম্প্রতি দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্টের কুপ্রভাব সম্পর্কিত গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি জীপ, একটি ট্রলার, জনা তিনেক অনুচর এবং কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে খনি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এসেছিল। অমল হঠাৎ একদিন বাড়ি ফেরার পর তার স্বাস্থ্যর অবনতি দেখা যায় এ খবর শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অবশেষে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু অমলের খোঁজ নিতে এসে দেখে খবরটা সত্যি। অমল বন্ধুর কাছে তার শারীরিক অবনতির কারণগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। অমল দামোদর অঞ্চলে তথ্যসংগ্রহের নেশায় ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তার জীপটি বিকল হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে নিকটবর্তী এক পাহাড় ও অরণ্য

ঘেরা এক আদিবাসী অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও ঘন অরণ্য দ্বারা আবৃত থাকার কারণে জনবসতি খুব বেশি দেখা যায় না। এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের থাকা খাওয়া, বেশভূষা আধুনিক সভ্যতার মানুষদের কাছে মানানস নয়। আজও বহু আদিবাসীদের জীবন জীবিকা নির্বাহের যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা তা রোমাঞ্চকর সৃষ্টি করে। স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হলেও আদিবাসী সমাজকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। অমল তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহের সময় তাকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। কারণ তার কথায় বা প্রশ্নে সহজ সরল আদিবাসী মানুষদের স্বার্থে যেন আঘাত না লাগে। অমল তার তথ্য সংগ্রহের নেশায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার সময় একটি গ্রামে এসে পৌঁছায়। গ্রামের খানিকটা দূরে একটি পাহাড়। প্রথমে গ্রামটি দেখে তার কিছুটা স্বতন্ত্র মনে হল, একটু পরিচ্ছন্ন ও সম্ভ্রান্ত। অমল ঐ গ্রামে রাতে থাকার জন্য মোড়লের কাছে অনুমতি চায়। মোড়লও অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। মোড়ল অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান দিল। অমল রাতে সেই গ্রামের মোড়লসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে যে, এই গ্রামের অধিকাংশ আদিবাসীদের পেশা মাটির পাত্র, মাটির পুতুল তৈরি ও কাঠের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কমবেশি চাষাবাদও করে। তুলনামূলকভাবে হাতের কাজ বেশি করে। তাই এই গ্রামকে শিল্পীর গ্রাম বলা হয়। কিছুক্ষণ পর মোড়লের জামাই কাঁদন বাড়িতে আসে, কাঁদন হল অরণ্যবাসী ঐ সম্প্রদায়ের মোড়লের জামাই। মোড়লের মেয়ে পালিয়ে গিয়ে কাঁদনকে বিয়ে করেছে। শহরাঞ্চলে কাজ করার ফলে কাঁদন বেশ কিছু নিয়ম কানুন ও কৌশল তার আয়ত্তে ছিল। কাঁদন খুব যুক্তিবাদী ছিল, যুক্তি ব্যতিরেকে কোন কিছুকে মানতে রাজী ছিল না। একমাত্র শ্বশুর মোড়লকে ছাড়া সে কাউকে পরোয়া করে না। আদিবাসী সমাজে রাগ, হিংসা, দ্বেষ এসব রাখা তাদের গোষ্ঠীতে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হত। বিশেষত অতিথিকে অবমাননা করলে সমূহ বিপদ। আজীবন ধরে তাদের এই সংস্কারকে নিজেদের মধ্যে লালন করে এসেছে। কিন্তু কাঁদন এসবকে কিছুই অন্ধভাবে মানতে চায়নি। কাঁদন প্রতিহিংসা পরায়ণও বটে, কাউকে সে সহজে ক্ষমা করে না। কাঁদন একটু এগিয়ে এসে অমলকে দেখে চলে যায়। অমল পরের দিন সকালে মোড়লের কাছে বিদায় নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামটা পার হওয়ার পর নদী ও পাহাড় ঘেরা ছোট খাটো নানারকম (পলাশ, কুটুশ, বাঘনখী)'র ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি অতিদুর্গম পথ, বড় বড় পাথরের চাঁই। সেই সুযোগে মোড়লের জামাই কাঁদন ঝোপের আড়াল থেকে অতর্কিতে অমলকে আক্রমণ করে-

সে বলল, চিনতে পাছিস না? দাঁতগুলি তার আরও বেরিয়ে পড়ল। বলতে লাগল, আমি তুকে কাল সন্‌জেতে দেখেই চিনলম। এক লজরে চিনে নিলম। হ্যাঁ। সা-রা-রা-ত ঘুম হল না। মোড়লের ডরে বুঝাপড়াটা করতে লারলাম। ভোরবেলাতে থেকে গাঁয়ের বাইরে এসে বসে আছি। কুন্ পথে তু যাবি চল্, কাঁদন যাবে, বুঝাপড়া করবে সে।[১২]

অমলের প্রতি তার একটা প্রতিহিংসা আছে। অমল প্রথমে এই আক্রমণের কারণ বুঝে উঠতে পারেনি। অবশ্য একটু পরে অমলের অণ্ডাল রেলস্টেশনের ঘটনা মনে পড়ল। সেই দিনের ঘটনা কাঁদনের পিছনে কিছু মানুষকে ছুটতে দেখে অমল কাঁদনকে চোর বা অপরাধী ভেবে পাথর ছুঁড়ে আহত করেছিল। এর ফলে কাঁদন উত্তেজিত জনতার শিকার হয়-

বিস্মৃতি একটা পর্দার মত সরে গেল। - চোখে অণ্ডাল রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফুটে উঠল, প্ল্যাটফর্মের উপরে একজন লম্বা কালো জোয়ান একটা লোহার ডান্ডা হাতে ছুটে চলে আসছে দেখলাম। পিছনে একদল ভদ্রবেশধারী তাকে অনুসরণ করছে। ধর্-ধর্। ওই ডান্ডা-হাতে লোকটাই কাঁদন। আমি একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওর কপালে ওই ক্ষতটা করে দিয়েছিলাম। আঘাতে অভিভূত হয়ে কাঁদন তার হাতের লোহার ডান্ডাটা ফেলে দিয়ে ‘বাপ’ বলে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছিল।[১৩]

অবশেষে অমল জানতে পারে কাঁদনের দোষ ছিল না, তাই অমল জি.আর.পি কে খবর দিয়ে কাঁদনকে প্রাণে বাঁচায়। কিন্তু কাঁদন অমলের সেই অন্যায়ের কথা ভুলতে পারেনি। কাঁদন সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে অমলকে আক্রমণ করেছিল। মোড়লের উপস্থিতিতে অমল আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যায়। এরপর ঘটনা পরম্পরায় যা ঘটে যায় অমলের নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু উপায় ছিল না।

আজ জগতে আর্য-অনার্য ভেদটা উঠে গেলেও, মুখে না মানলেও, ওদের আমাদের বিচার-ধারাটা স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন আর সংস্কারমুক্ত বিশ্বাসবাদী আর বুদ্ধিবাদী, যা বলা যাক, দুটি স্তরভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিবাদী মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই ওদের বিচার কিন্তু বিশ্লেষণ করি নি, অবাক হয়ে পদ্ধতির বিচিত্র মাধুর্য শুধু দেখে গিয়েছিলাম।[১৪]

তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন, যুক্তিহীন ও কুসংস্কারে ভর্তি, তবুও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ইউরোপীয় ভাবধারায়পুষ্ট সংস্কার বর্জিত অমলকে আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পদপ্রান্তে অবনমিত হতে হয়েছিল।

গ্রামের মোড়ল কাঁদনের উদভ্রান্ত অবস্থা থেকে সংযত করার জন্য পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সাদা পাথরকে দেবতা জ্ঞানে স্মরণ করে। কারণ, আদিবাসী (সাঁওতাল) সম্প্রদায় এক মনুষ্য দেবতার আরাধনা করে, যিনি তাঁদের শিখিয়েছিলেন যে অতিথির কোন অবমাননা করলে কিংবা মনের মধ্যে হিংসা বা প্রবৃত্তির অসংযম হলে কিংবা প্রতিশোধ পরায়ণতা এলে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা সাদা পাথর ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাবে, নীলাভ আকাশ তাম্রবর্ণ হবে, বাতাসে মড়া পোড়ানোর গন্ধ আসবে, নদীর জলে পোকা হবে, বনে বনে পাতায় পাতায় ফুলে

শুঁয়োপোকা হবে, পাখির ডাক শকুনের ডাকের মতো ভেসে আসবে প্রভৃতি নানারকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে-

> -হুই সাদা পাথরটোর দিকে তাকা। তাকিয়ে থাক্। সাদা পাথরটো কালো হয়ে যেছে, আকাশের নীলবরণএইবারে তামার বরণ হয়ে উঠবেক; বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ; নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; হুই চারিপাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়োপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবেক শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশি বোবা হয়ে যাবেক; তারপর সুরুয-ঠাকুরের সোনার বরণ হয়ে যাবে সীসার মতন, আঁ-ধা-র হয়ে যাবে। পৃথিবী- আঁ-ধা-র-[১৫]

কাঁদন তার শ্বশুরের নীতিবাচকমূলক কথাগুলো ভাল লাগে নি, তবুও তাকে শ্বশুরের কথা মতো অমলের পায়ের তলায় নতজানু হয়ে নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল-

> কাঁদন নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, কি বলতে হবে সে জানত, বললে, আমার মনের পাপ তোমার চরণে দিলাম, তুমি চরণ দিয়ে তাকে মার, আমাকে মুক্তি দাও। আমার বাড়ি চল, আমার মনের মধু তুমি লাও।[১৬]

সে নতজানু হয়ে নিজের পাপী মনকে অমলের পায়ে সমর্পণ করে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হল, সেইদিন রাতে অতিথি অপরাধীর বাড়ীতে থাকবে এবং অপরাধী নিজ হাতে ক্ষীর ও মধুর পায়েস রান্না করে অতিথিকে খাওয়ালে তবে সে পাপ থেকে মুক্তি পাবে। মোড়লের এই শর্তে অমলকে কাঁদনের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে স্বাধীনচেতা কাঁদন তাদের সম্প্রদায়ের বংশ পরম্পরায় প্রচলিত শাস্ত্রের এই বিধানকে সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে পালিয়ে গিয়ে গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। পরেরদিন সকালে অমল ঐ পাহাড়ে যায়, সেখানে গিয়ে পুরোহিতকে সামান্য পরিমাণ কিছু অর্থ দিয়ে ঐ 'শিলাসন' এর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পারে এবং তা শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। অমল কাহিনী শুনতে শুনতে সে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিল, কখন যে সন্ধ্যা নেমে আসে সেটাও সে বুঝতে পারেনি। 'শিলাসন' সম্পর্কে যাবতীয় গল্প শুনে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। অমল হঠাৎ সন্ধ্যার সময় মোড়লের মেয়েকে শিলাসনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল এবং মেয়েটির কাছ থেকে সে জানতে পারে, কাঁদন বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কাঁদন অমলের প্রতি পূর্ব অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তার বিরুদ্ধে খেপে গেলেও সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমা চায়নি। কাঁদনের যুক্তি বিনা দোষে শুধুমাত্র পাপের ভয়ে ক্ষমা চেয়ে সবার সামনে নিজের ব্যক্তিগত মান সম্মানকে বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়ায় শ্রেয়। কাঁদন শেষ পর্যন্ত নিজের জেদে অটল থেকে জিতে যায়। নিজের গোষ্ঠীর লোকেদের কাছে সে ক্ষমা চায়নি। এদিকে মেয়েটিও(কাঁদনের স্ত্রী) দোটানায় পড়ে যায়, একদিকে সে স্বচক্ষে গোষ্ঠীর অমঙ্গলও দেখতে পারে না। আবার অন্যদিকে গ্রামের লোকেদের স্বামীর প্রতি নিন্দা শুনতে হয়, তার উপর ভালোবাসার মায়াও ত্যাগ করতে পারে না, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাকে প্রতি মুহূর্তে জর্জরিত করে। কিন্তু এদিকেও আবার সহজ সরলা

পড়াশোনায় অনভিজ্ঞা আদিবাসী মেয়ে কাঁদনের স্ত্রী সামান্যতম নৈতিক জ্ঞান থাকার কারণে, সে অমলের কোনোরকম ক্ষতি করতে চায় না। তাই তাদের বাড়িতে অমলকে রাতটুকু থেকে যেতে বলে, কারণ কাঁদন হয়ত আবারও আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে পারে। কিন্তু বাধা থাকা সত্ত্বেও অমল বেরিয়ে পড়ে। আদিবাসী গ্রাম থেকে দামোদর প্রোজেক্টের যেখানে কাজ চলছে এই সামান্যতম পথের মধ্যে পুলিশ প্রশাসন নানারকম তল্লাশি শুরু করেছে। একে একে তার যাবতীয় নথি ও সার্টিফিকেট যাচাই করার পরও পুলিশ তাকে ছাড়পত্র দেয়নি। অবশেষে তার এক বন্ধু পুলিশের সহায়তায় বাঁচে, সে অমলকে ঐ পথে জিপ নিয়ে ফিরে যেতে পরামর্শ দেয়। অমলও তার পুলিশ বন্ধুর কথা মত সেই পথে রওনা দিয়েছিল। পঞ্চাশ মাইল পথ যাওয়ার পর শিলাসন প্রস্তর স্তূপের সামনে জিপ গাড়িটি আবার খারাপ হয়ে যায়। অমল ইতিমধ্যেই জায়গাটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। ইতস্তত চারিদিকে ঘুরাফেরা করতে করতে বনের প্রান্তভাগে এক যুগল মানব-মানবীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অমলের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি, যে কণ্ঠ দুটি কাঁদন ও তার স্ত্রীর। হঠাৎ অমলের মনের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ উদয় হল। সে ভাবল যদি কাঁদনের সামনে গিয়ে স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণ করে, তাহলে তাদের শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন হবে না। এই আদিবাসী গোষ্ঠী আদিমতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। একই সঙ্গে প্রণয়ী যুগলের দাম্পত্য জীবনও সুখী হবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে অমল হঠাৎ পুলিশ গাড়ির শব্দ শুনতে পায়, কাঁদনও পালিয়ে যায়। পরে জানা যায়, এই জায়গায় একদল বামপন্থী পানাগড় ডাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র, বারুদ চুরি করে এনে আন্ডার গ্রাউন্ডে খাদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া পিলা কাটিং করে নিয়ে গেছে বণিকের দল কিন্তু ‘স্যাণ্ড প্যাকিং’ করেনি। মাটির নিচে জমানো বারুদের প্রবল বিস্ফোরণের ফলে ভোরের নাগাদ ঐ অঞ্চলে ধ্বস নামতে শুরু করে, শিলাসনও(দেবতা জ্ঞানে পূজিত সাদা পাথর) ক্রমশ সেই ধ্বসের গর্তে ঢুকে যেতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশত সেই দুর্ঘটনায় কাঁদনের মৃত্যু হয়। কাঁদনের স্ত্রীও কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। কাঁদনের স্ত্রী প্রাণ দিয়ে সেই ‘শিলাসন’কে অক্ষত রাখতে চেয়েছিল। অপরদিকে গ্রামবাসীরাও গভীর দুঃখে সবাই বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখা গেল। কিন্তু বাস্তবে আশানুরূপ ফল কিছুই হয়নি। নিয়তি যে বড়োই নিষ্ঠুর তাদের কায়মনো বাক্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়নি। অপরদিকে আদিবাসীদের করুণ অবস্থা দেখে অমলের চোখেও জল ছলছল করছিল। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এ কারণে, এই অসহায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলি দীর্ঘ তিনদিন কঠোর পরিশ্রম করে সমস্ত মাটি, পাথরকে সরিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজিত ‘শিলাসন’কে মাটির উপরে তুলে আনল। অমল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা ঠেকাল এবং একই সঙ্গে কাঁদনের স্ত্রীর নিষ্ঠার কাছে অমলের যাবতীয় অহংকার ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হওয়ার গর্ব যেন মুহূর্তের মধ্যে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে সামনের তাক থেকে এক টুকরো সাদা পাথর নামিয়ে নিয়ে অমল তার মাথায় ঠেকালে। বললে, আমি ভাবছি শুধু সেই দেবতার কথা, যে দেবতা এই আসনের উপর ছিলেন তার কথা। আর ভাবি মূর্তিমতী নিষ্ঠার মতো ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির কথা।[১৭]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিলাসন' ছোটগল্পটিতে কোথাও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই। গল্পের মধ্যে আদিবাসীদের যে ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। আদিবাসী মানুষেরা সাধারণত সহজ সরল অরণ্যবাসী নিষ্ঠা পরায়ণ তাদের ব্যক্তিগত সংস্কার নিয়ম নিষ্ঠা, দেবতার প্রতি অসীম বিশ্বাস, পবিত্রতার কাছে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বাকবৈদগ্ধ্যেপূর্ণ, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মনকে কখনও কখনও নত হতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমল মাঝির' গল্প গল্পটি ছোটদের জন্য লেখা। আলোচ্য গল্পে শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী লাল কাঁকরের টিলা দিয়ে ঘেরা 'কালকেপুর' গ্রামের এক বৃদ্ধ সাঁওতাল সমাজপতির মুখে সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র হল কমল মাঝি, বয়স প্রায় নব্বুই, বিরানব্বুই কিংবা পঁচানব্বুই। কালকেপুর গ্রামের সকলে তার কথা মানত। কমল মাঝির নির্দেশে কালকেপুর রুক্ষ ডাঙ্গা জমিকে কেটে সাঁওতালরা চাষের উপযোগী করে তুলেছে। গ্রামের যাবতীয় লড়াই-ঝগড়া-বিবাদ হলে কমল মাঝি মিটিয়ে দিত। একসময় কমল মাঝি লেখকের বাড়িতে দিনমজুর কৃষক হিসেবে কাজ করত। সেইসূত্রে কমল মাঝির সঙ্গে লেখকের একটা সৌহার্দ্য সম্পর্ক ছিল। লেখকের ছেলেবেলায় কমল মাঝি তাঁকে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি শুনিয়েছিল। কমল মাঝি লেখককে ভালবাসত-

ভারী ভালবাসত আমাকে। আমাকে সে গল্প বলত। ওদের গল্প। কমল ছিল ওদের সমাজের মাতব্বর ব্যাক্তি। কালকেপুরের ডাঙ্গার সাঁওতালদের সমাজপতি।[১৮]

লেখকের মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কমল মাঝির মুখে শোনা একটি গল্প। সময়টা ছিল **১৯৩১** সাল, তখন তিনি দেশ সেবা ও সাহিত্যসেবা একই সঙ্গে করছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরাধে(ব্রিটিশ সরকারের মতে দেশদ্রোহিতা) সদ্য জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। একদিন লেখক কমল মাঝির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে বলেছে, তুমি নাকি সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়েছ? আবার সাধারণ মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য অনেক লেখালেখিও করেছ, সেগুলো ছাপাও হয়েছে! তুমি পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য জান কি? কিভাবে পৃথিবী, মাটি, জল, পাখি ও মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। কমল মাঝির ধারণা সভ্যতা সৃষ্টির আদি লগ্নে ভগবান যে দুই জন মানব-মানবী সৃষ্টি করেছিলেন তাদের বংশধরেরা হল আজকের পৃথিবীর সমস্ত মানুষ। আমি বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন -

লোকে বুলছে, তু সাহেবান লোকের সঙ্গে লড়াই দিছিস। আবার বুলছে, অনেক সব লিখছিস পড়ছিস। ছাপা হচ্ছে সি সব গুলান। তা তু জানিস এই পিথিমী টো কি করে তৈয়ার হলো? বুলছিস, ই মাটি

গুলান তুদের। তা জানিস ই সব? শুন আমার কাছে। তুর বইয়ে লিখে দিস। আর বিচার করে তবে কাম করিস। বুঝলি?[১৯]

কমল মাঝির মুখে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবী সৃষ্টির সময় জলময় ছিল। তাদের স্বর্গের আরাধ্য দেবতা 'ঠাকুরজীউ'(মারাং বুরু) প্রয়োজনের তাগিদে জলজ প্রাণী কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমির, রাঘব বোয়াল, শোল, চিংড়ি মাছ, কেঁচো ও কচ্ছপ একে একে সৃষ্টি করলেন। এরপর তাঁর মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হল তাই তিনি মাটি দিয়ে দুটি মানব-মানবী গড়লেন। এমন সময় আকাশ থেকে দৈব বাণীর মতো 'সিঞ সাদাম' অর্থাৎ সূর্যের ঘোড়া নেমে নির্মিত মানব-মানবী দুটিকে ভেঙে দিয়েছিল। এতে 'ঠাকুরজীউ' খুব দুঃখিত হলেন এবং তিনি মনে মনে স্থির করলেন আর কোনো কিছু মাটি দিয়ে তৈরী করবেন না। অবশেষে একদিন স্নান করতে গিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জমে থাকা ময়লা দিয়ে হাঁস ও হাঁসলী নামে দুটি পাখি তৈরী করলেন। পাখি দুটি 'ঠাকুরজীউ'র ফুঁয়ে প্রাণ পেয়ে আকাশে উড়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে আকাশের পানে উড়তে উড়তে এক সময় পাখি দুটি ক্লান্ত হয়ে যায়, জলমগ্ন পৃথিবীতে কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার মতো জায়গায় না পাওয়ায় আবার তারা 'ঠাকুরজীউ' হাতের তালুতে বসে বিশ্রাম নিতে শুরু করেছিল। এতে 'ঠাকুরজীউ' চিন্তিত হন। এমন সময় হঠাৎ একদিন 'সিঞ সাদাম' অর্থাৎ সূর্যের ঘোড়া স্বর্গ থেকে মর্ত্য জল খেতে নামে। জল খাবার সময় ঘোড়ার মুখে লেগে থাকা ফেনা জলের উপর ভাসতে থাকে এই থেকে জলের ফেনা সৃষ্টি হয়। 'ঠাকুরজীউ' পাখি দুটিকে ফেনার উপর বিশ্রাম নিতে বললেন। পাখি দুটি ফেনার উপর বসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল। একদিন পাখি দুটি 'ঠাকুরজীউ'র কাছে খাবারের প্রার্থনা জানায়। 'ঠাকুরজীউ' এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর সৃষ্টি সমস্ত জলজ জীবজন্তুদেরকে একে একে ডাকলেন এবং গভীর সমুদ্র থেকে মাটি তোলার জন্য সবাইকে একটা করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অধিকাংশ জলজ জীবজন্তুরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অবশেষে কেঁচো ও কচ্ছপের সাহায্য গভীর সমুদ্র থেকে পৃথিবীতে মাটি তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিল। মাটি তোলার পর্ব শেষে 'ঠাকুরজীউ' মাটির উপর মই দিতে নির্দেশ করে। মই দেওয়ার সময় কিছু কিছু জায়গায় মই আটকে যায়, স্থানে স্থানে মাটির স্তূপ সৃষ্টি হয় সেগুলো পরবর্তীকালে পাহাড়, পর্বত নামে খ্যাত। আর ঘোড়ার মুখের ফেনার উপর 'ঠাকুরজীউ' বেনা বীজ বুনলেন। তারপর 'ঠাকুরজীউ' একে একে দূর্বা ঘাস, করম গাছ, শাল গাছ, আসন গাছ, মহুয়া প্রভৃতি গাছের বীজ বুনলেন।

পাখি দুটির মধ্যে স্ত্রী পাখিটি বেনা গাছের ঝোপে দুটি ডিম দেয়। ক্রমে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, সে বাচ্চা দুটি পাখির বাচ্চা নয়, ফুট ফুটে দুটি মানব শিশু(এক ছেলে এক মেয়ে)। পাখি দুটির সমস্যায় হয়। এই মানব শিশু দুটিকে তারা কিভাবে পালন করবে? তাই তারা গানের মাধ্যমে 'ঠাকুরজীউ'র প্রার্থনা করে-

হায় হায় জলাপুরির
হায় হায় নুকিন মেনেয়া

হায় হায় বুসি আকান্ কিন্

হায় হায় নুকিন মেনেয়া’[২০]

বঙ্গানুবাদ-

হায় হায় দুঃখ সাগরে

হায় হায় এই মানব শিশু

হায় হায় জনম নিল যে

হায় হায় এই মানব শিশু।

পাখি দুটির কাতর আর্তনাদে ‘ঠাকুরজীউ’ সাড়া দিয়েছিল। তারা দুই মানব সন্তানকে কিভাবে পালন করবে এ কথায় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়। ‘ঠাকুরজীউ’ পাখি দুটিকে পরামর্শ দিয়েছিল- তোমরা যে যে জিনিস খাবে তার রস তৈরী করবে সেই রসে তুলো ভিজিয়ে ঐ তুলো শিশুর মুখে চুষতে দেবে। মানব শিশু দুটি ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল পাখির ছোট বাসায় তাদের আর জায়গায় হল না। আবার পাখি দুটি বসবাসের জায়গার জন্য ‘ঠাকুরজীউ’র কাছে প্রার্থনা জানায়। ‘ঠাকুরজীউ’ তাদেরকে বললেন- এরপর তোমরা নিজেরা বসবাসের জায়গা খুঁজে বের করে নাও। পাখি দুটি বসবাসের জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তারা ‘হিহিড়ি পিপিড়ী’ দ্বীপে এসে হাজির হয়েছিল। এই দ্বীপটি তারা বসবাসের জন্য উপযুক্ত মনে করে। ‘ঠাকুরজীউ’কে জানিয়ে তারা সেখানে বসবাস করতে শুরু করল। এরপর হাঁস হাঁসলী পাখি দুটি মানব শিশু দুটিকে দ্বীপে রেখে কোথায় চলে যায় হদিস মেলেনি, এ কাহিনি পূর্বপুরুষরা বলে যায়নি। তাই আমরাও জানি না বলে ঊর্ধমুখ করে পাখি দুটির উদ্দেশ্য নমস্কার জানায়।

মানব শিশু দুটির নাম ‘হাড়াম(পুং) এবং আয়ো(স্ত্রী) আবার কেউ কেউ ‘পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুড়ী বলে। এই দুই মানব-মানবী ‘হিহিড়ি পিপিড়ী’ দ্বীপে ‘সন্তুবুকুচ’ ও ‘শ্যামা’ ঘাসের বীজ খেয়ে তারা জীবনধারণ করতে শুরু করে। এরাই হল মানব জাতির আদি পূর্বপুরুষ। এদের ছেলেমেয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যত দিন যায় লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেশ ভরে গেল। লোক সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে একসময় নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বা দম্ভের লড়াই কিংবা উচ্চ-নিচ ভেদাভেদকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়-

> পিঁপড়ার মত পিলপিল করে বাড়ল। দেশ ভরে গেল। তা পরেতে মারামারি লাগালে। এ ইয়ার সঙ্গে ও উয়ার সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠি। তীর ধনুক। তা পরেতে তুরা বন্দুক সন্দুক নিয়ে মার করছিস।[২১]

এখানেই পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি শেষ। কমল মাঝির ধারণা ছিল ভগবান আদিতে যে দুই মানব-মানবী সৃষ্টি করেছিলেন তাদের বংশধররা হল আজকের পৃথিবীর মানুষ। তারপর বহুদিন কেটে গেছে পৃথিবীর বুকে কত যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, চীনের গৃহযুদ্ধ, দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ এবং সর্বশেষে দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের ফলে, জাপানের হিরোসিমা ও

নাগাসাকি'র মত বহু শহর ও গ্রাম চিরতরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, মন্বন্তরের সময় বহু মানুষ শহরের অলিতে- গলিতে, রাস্তার ফুটপাতে অনাহারে মারা যায়। এর মধ্যে লেখকের কমলের সঙ্গে দুইবার দেখা হয়েছে। কমল মাঝি পাড়ার বিবাদকে মেটানোর জন্য কখনো নিজে গেছে, কখনোও বা সোনা মাঝিকে পাঠিয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে কালকেপুর গ্রামের সাঁওতালদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। কমল মাঝির শরীর ভালো না থাকায় সোনা মাঝিকে সে না জানিয়ে পাড়ায় বিবাদ মেটাতে গিয়েছিল। প্রায় মিটিয়ে এনেছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল দুই দল নেশার ঝোঁকে সন্ধ্যাবেলা গালাগালি শুরু করে। সেই থেকেই মারামারির সূত্রপাত হয়। কমল মাঝির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, মাথায় ফেটি বাঁধা অবস্থায় একটা ভাঙা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। অসহায় ক্লান্ত কমল মাঝি চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছিল! লেখক কমলকে ডাকতেই চোখ মেলে হেঁসেছিল- লেখক কমল মাঝিকে জিজ্ঞাসা করার প্রত্যুত্তরে সে জানায়-

> -উঁহু আমি ঝগড়া করি নাই রে! উয়ারা দু দল হয়ে ল্যাই (ঝগড়া) করলে- আমি থামাতে গেলাম। তা মারলে দু দলেই আমাকে। শেষ যখন লহু (রক্ত) পড়ল- তখন থামল। বললাম, সবাই বুড়োবুড়ীর ছেল্যা-পিলা-ল্যাই করিস না! তা বুঝে না। মানে না। বুঝলি, রক্ত পড়লে তবে থামে।[২২]

সোনা সেখানে ছুটে গিয়েছিল, হঠাৎ সেখানে কমল মাঝি সোনার উপর ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কণ্ঠনালীটা প্রচন্ড জোরে চেপে ধরেছিল। সোনা প্রাণপণে কমল মাঝিকে সরানোর জন্য ঠেলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমল মাঝি আছাড় খেয়ে পড়ল একটা পাথরের উপর। পাথরের কোণটা তাঁর বুকের পাঁজরে লেগেছিল। এরপর পাঁচদিন তার জ্ঞান ফেরেনি। কমল মাঝি সেইসব মানুষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল-

> হেসে বলেছিল- তাই পড়ল লইলে আমি বাঁচতাম না। মেরে ফেলাইত। দেখ কেনে এখুন উয়াদের কত লাজ হয়েছে দেখ কেনে! কেউ ছামুতে আসতে লারছে। ওই পিরেতটা যদি না থাকত মানুষের বুকে- তবে যি হড় গুলান (মানুষ) দেবতা হয়ে যেত।[২৩]

অবশেষে কমল মাঝির মৃত্যু হলে সোনা-ই তার ছেলের মতো সৎকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

আলোচ্য গল্পের কথক কমল মাঝির মুখ থেকে গল্প শুনে লেখক আশ্চর্য হয়ে যান। যদিও গল্পটি ছোটদের জন্য লেখা, তবুও গল্পটির মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। গল্পের কথক আদিবাসী অন্ত্যজ সম্প্রদায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, তিনি কোনোদিন ভারতীয় মহাপুরুষ বা মণীষীর (গৌতম বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধী) বাণী শোনেনি। তিনি অতি বাস্তব বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আদি থেকে সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনির সঙ্গে বর্তমান মানব সমাজের ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ান ও প্রতিনিয়ত বিবাদের অনৈতিকতার দিকটি সুন্দরভাবে ব্যাখা

করেছেন। যা লেখককে মুগ্ধ করেছিল। কমল মাঝি তার সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানব সমাজকে এক ছাতার তলায় মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' ছোটগল্পটি ১৯৬৫ সালে *অমৃত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের কথক লেখক। তিনি কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। মাঝে মাঝে উৎসব অনুষ্ঠানে দেশের বাড়িতে আসেন। বাড়িতে বাগান আছে। বাগান পরিচর্যার জন্য দীন-দরিদ্র সাঁওতাল মেয়েদেরকে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সাঁওতাল মেয়েরা ফুলকে খুব ভালোবাসে-

> তারা খাটুক বা না-খাটুক, এসে দাঁড়ালেই তাদের বলি- কি চাই?
> তারা বাংলাই বলে-একটি বিচিত্র টানের সঙ্গে বলে-কেনে-? ফুল !
> বলি-কোন্ ফুল?
> -ওই টো !
> -নে!
> -ছোটবাবু বকবে না?
> -না, আমি বলব।[২৪]

ফুলমণি মেঝান লেখকের বাগানে পরিচর্যার কাজ করে। ফুলমণি নিজের সৌন্দর্যকে জাহির করার জন্য অন্যান্য সাঁওতাল মেয়েদের মতো খোঁপায় ফুল গুঁজেছে-

> সেদিন ফুলমণি বোগেনভেলিয়া ভেঙে খোঁপায় পরে এসে দাঁড়াল- বাবু, বাগানে খাটব, লিবি না? [২৫]

অসহায় ফুলমণি'র একমাত্র মা বর্তমান জীবিত আছে, বাবা বহুদিন আগে মারা গিয়েছে, তাঁর দুই দাদা নিজেদের বৌ নিয়ে অন্যত্রে সংসার করে। ফুলমণির বাবা মারা যাওয়ার পর দুই ভাই এসে দুটো বলদের একটা করে নিয়েছে, ধান তিন ভাগ করে দুই ভাই দুই ভাগ নিয়েছে আর এক ভাগ ফুলমণি ও তার মা'কে দিয়েছে। এখন তার কাছ সংসার চালানোর জন্য লোকের বাড়িতে খাটুনি খাটা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। এক সময় ফুলমণি কিছুদিনের জন্য কলে খাটতে গিয়েছিল। কিন্তু কলের মানুষগুলো বড় বেয়াড়া- মিস্ত্রি, ফিটার থেকে খাজাঞ্চি সবাই তাকে বিরক্ত করত। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল-

> কিছুদিন কলে খাটতে গিয়েছিল কিন্তু ফুলমণি পালিয়ে এসেছে। কলের মানুষগুলো -মিস্ত্রী, ফিটার থেকে খাজাঞ্চী সব উত্যক্ত করত তাকে। বেশী উত্যক্ত করত যে-সব গরুরগাড়িওয়ালারা ধান-চাল বয়ে আনে, নিয়ে যায় ইস্টিশনে, তারা। সে মাকে বলেছিল- তু কলে খাট। আমি ছুটো খেটে খাব। ঝুমনীকে নিয়ে খাটব।[২৬]

ফুলমণির দাদারা দীর্ঘদিন বাড়ি ফেরেনি। তাদের ছোট সংসারে অভাব অভিযোগ নেই, বেশ সুখেই আছে। দুই দাদা সময় মতো মায়ের অসুস্থতার খোঁজ খবরও নেয় না। তাই বাধ্য হয়ে চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকেই ফুলমণিকে পরিস্থিতির চাপে যোগাড় ও টামনার (কোদাল চালানো'র) কাজ শিখতে হয়েছে। কখনও মাটি কাটে, মাটি বয়, চাষের সময় ধান পোঁতে, পৌষ মাসে ধান কাটে চাষের প্রায় সব কাজেই জানে-

সকাল বেলায় টামনা কাঁধে ফেলে, ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে সঙ্গিনীর হাত ধরে গাঁয়ে ঢুকে আমার বাগানের ফটকের সামনে দাঁড়াত- ফুল ভেঙে খোঁপায় পরবে।[২৭]

সমাজের নিয়ম অনুসারে ফুলমণি পুরুষ মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পারবে না। কারণ তার এখনও বিয়ে হয়নি। তাই তাকে মায়ের সঙ্গে কাজ করতে হয়। ফুলমণির গায়ের রঙ কালো হলেও দেখতে অসামান্য সুন্দরী ছিল। দীর্ঘাঙ্গী, মুখখানি মনোহারিনী, তার চোখের সৌন্দর্য যেন কথা বলে। রূপের গরবে গরবিনী ফুলমণি। এ নিয়ে তাঁর আত্ম অহংকারও ছিল- তবে তা সব সময় আত্মরক্ষার তাগিদে সীমাবদ্ধ ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে লেখকের নাতিনী কলেজ ছাত্রী শকুন্তলা এবং নাতি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শ্রীমান প্রশান্ত শঙ্করের সঙ্গে ফুলমণির প্রথম আলাপ হয়। গানের সূত্রে শকুন্তলা তার 'মিতিন' এবং প্রশান্ত শঙ্কর তার মিতে হয়। ফুলমণি ও তার সঙ্গিনী ঝুমরী মেঝান বাগানে কাজ করার সময় ভর দুপুরে সামান্য একটু বিশ্রাম নেওয়ার ফাঁকে কিংবা কাজের অবসর সময়ে তাদের পরিশ্রমকে লাঘব করার উদ্দেশ্য কিংবা নিজেদের মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে-

উপর কুলি-নামো কুলি মিলিন গা-
সিখানে সি জোড়া কদমগাছ।
কদমতলা যেয়ো না রে যেয়ো না-
তুমরো বিয়া হবে না!
তুমরো বিয়া চুড়া হবে না রে হবে না-
কদম্ব গাছে ফুল ফুটিছ!
কদম ফুলে হলুদ রঙে সাদা দাগ-
গায়ে লেগে বিয়া হবে না![২৮]

ফুলমণি সুন্দর হওয়ার সুবাদে অনেক সাঁওতাল ছেলেরা তার সঙ্গে প্রেম করতে চায়, একসময় ফুলমণি এক সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে প্রেম করে। কিন্তু সে ছেলের সঙ্গে মনের মিল না হওয়ার কারণে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে আর কাউকে পাত্তা দেয় না-

...এই দ্যাখ-ছোঁড়াগুলান ছুঁকছুঁক করে- আমি সোন্দর কিনা-খুব ছুঁকছুঁক করে, ভাব করতে চায়। কেউ ট্যাং-টেঙে লম্বা, কেউ এই খাটো, কেউ কুচ্ছিৎ, কেউ সোন্দর! সোন্দর ছোঁড়ার সঙ্গে ভাব করলাম। তারপর দেখলম উ বজ্জাত বটে। লয় তো কুঁড়ে বটে। লয়তো চোর বটে-ছ্যাচঁড় বটে-মাতাল বটে। কেউ ভাল বটে-তা আমার ভাল লাগল না। তখন তাকে ছেড়ে দিলম। ভাগিয়ে দিলম-যাঃ। পালা। আবার একটো দেখতে লাগলম! মনের সঙ্গে মিল চাই তো![২৯]

কয়েকমাস আগে সাঁওতাল পাড়ায় মামুদপুর বাজার থেকে এক স্বাস্থ্যবান সাঁওতাল যুবক এসেছে। মামুদপুরের সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। সে সম্পর্ক সূত্রে সাঁওতাল পাড়ার পূর্বের সর্দার মেঘলাল মাঝির দৌহিত্র, নাম তার বুধন মুর্মু। বর্তমানে সে সাঁওতাল পাড়ায় থাকতে চায়। গ্রামের সর্দার ডগরু মাঝি। সর্দারের প্রথম দেখাতে সুপুরুষ বুধন মুর্মুকে তার ভালো লেগেছিল। স্বাস্থ্য সবল বুধন মুর্মু'র দৈহিক গঠন বলতে, সে একজন জবরদস্ত জোয়ান,

লম্বা বুকের ছাতি, দৈত্যর মতো খাটতে পারে এছাড়াও মাদল বাজায় ও নাচতে পারে। এইসব গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য সে সাঁওতাল পাড়ার প্রত্যেক অবিবাহিতা সাঁওতাল মেয়েদের কাছে একজন আদর্শ পুরুষের প্রতীক। বহু গুণ সম্পন্ন বুধনকে নিয়ে স্বভাবত বয়ঃসন্ধির মেয়েদের কৌতূহলের সীমা থাকে না। তাই সাঁওতাল পাড়ার সব মেয়েরা বুধনের সঙ্গে ঘর করতে চায়। ফুলমণি ও বুধনের প্রথম আলাপ হয় একে অপরের পরিচয় দিয়ে, আর এখান থেকে একে ওপরের প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত হয়-

> ....ফুলমণি বলেছিল –ই বাবা ই কুথা থেকে এল রে! বুধন ফুলমণিকে বলেছিল- সি অনেক দূর বটে হে। মামুদবাজার। সেই মৌরক্ষীকে বাঁধলে যিখানে সিখান থেকে বটেক।– তা তুমি কে বট গা? নামটি কি হে?
>
> -নামটি নিয়ে কামটি কি হে? তুমি কোথাকার কে বট – তুমাকে বুলব কেনে!
>
> -আমি ইখানকারই হলাম। ইখানেই থাকব। মেঘু সর্দারের বিটীর বেটার বেটা আমি। আমার নাম বুধন মুর্মু।
>
> -হ। তা থাক। আমি ফুলমণি বটি।
>
> -তোমার নামটি ভাল বটে।
>
> -সত্যি নাকি?
>
> -হঁ। ফুলের মতুন বট হে তুমি।
>
> -অঃ। মাথার চুলে পরবি নাকি ?
>
> -হঁ। মনটি তাই বটে।
>
> -হঁ। তু খুব লাগর বটিস। ফুল পরবি চুলে! যাঃ পালা! ফুল পরা এত সোজা লয়! যা। যা। লইলে লোক ডাকব আমি। যা! বুধনের বেলা থু থু ফেলতে পারেনি ফুলমণি। শুধু তাড়িয়ে দিয়েছিল।[৩০]

বুধন ফুলমণিকে প্রথম দেখাতে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিল। ফুলমণি বুধনকে ভালবাসলেও বেশি পাত্তা দেয়নি। একদিন ফুলমণি সন্ধেবেলায় গ্রামের দোকানে সরষে তেল ও কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে, বাড়ি ফেরার সময় বুধনের সঙ্গে দেখা হয়। বুধন অন্যমনস্ক হয়ে একটা টিলার উপর বসেছিল, সামনে বিশাল ধু ধু মাঠ, পশ্চিম দিকে বড়বাবুদের বাগান তার পাশে বিশাল অট্টালিকার শুধু মাথা দেখা যায়। সূর্য ডুবে গেছে, আকাশের গোধূলির লাল রঙের আভাসটা শুধু রয়েছে। সেদিকে বুধন একমনে তাকিয়ে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখছে। অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ সাঁওতালরা মদের নেশায় বুঁদ হয়েছে। বুধন মদ খায় নি কারণ, সে এ গ্রামে নতুন এসেছে তাছাড়া তার কাছে মদ কেনার টাকা ছিল না। ফুলমণি ফেরার পথে বুধনের অবাক পানে তাকিয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে জানায় আকাশের লাল রঙের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে! বুধনের কথা শেষ না হতেই ফুলমণি তাকে তাচ্ছিল্য করে খিলখিল করে হেঁসে উঠেছিল-

> আকাশে তারা খোঁজ হে। লাল রঙ গিধড়াতে দেখে![৩১]

পরেরদিন বাবুদের পুকুরে পাঁক তোলার সময় বুধনের ফুলমণির সঙ্গে দেখা হয়। পুকুরের পাড় সমান করে বাগান তৈরী করা হবে। পুকুর পাড়ে তালগাছের গোড়াগুলো তোলার জন্য প্রায় ত্রিশ জন পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে কাজ করছে। অপরদিকে ফুলমণি ও ঝুমরী একজন মাটি কাটছে আর একজন বইছে। কয়েকজন মাঝি তাদের কুড়ুল, টামনা কোদাল নিয়ে গাছের গোড়া গুলো তুলছে। বুধন তাদের মধ্যে একজন, জোর কদমে কুড়ুল চালাচ্ছে। সে একজন দৈত্যর মতো গাছের গোড়াগুলো শাবল লাগিয়ে ঘাড় দিয়ে ঠেলে অনায়াসে একে একে পুকুরের দিকে গড়িয়ে দিত লাগল। বুধনের এই কায়িক পরিশ্রম দেখে সবাই চমকে যায়। ফুলমণির সঙ্গী ঝুমরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং ফুলমণিকেও বলে-

-দেখ্-দেখ্! গতরটো কি হয়ে উঠেছে দেখ্!

ফুল বললে-তু দেখ্!

-এই ছাতি ফুলেছে। বাবারে!”[৩২]

সেই দিন থেকে বুধন সাঁওতাল সমাজে কর্মঠ পুরুষের পরিচয় পায়। আবার সন্ধ্যায় তার নামে বদনামও রটে যায়। বুধন বাবুদের পুকুরে কাজ করে যে টাকা পায়, তার অর্ধেক টাকা হাঁড়িয়া খেয়ে শেষ করেছে। তাই ডগরু সর্দার বুধনকে মদ খেতে নিষেধ করেছে-

তুকে তো সব বিটীর মা-বাপ লিবে রে। মদটো কম খাবি।[৩৩]

সাঁওতাল পাড়ায় বুধনের বদনাম হলেও, অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে বুধনকে নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। পাড়ার সব মেয়েই তার গা ঘেঁষে থাকতে চায়- প্রয়োজনে কথা বলতে চায় কখনও বা তাকে দেখে হেসে নিজেদের মধ্যে ঢলাঢলি করে। বুধন সেগুলোকে দেখে উপভোগ করে। বুধনের সেগুলো দেখতে ভালো লাগে। একমাত্র ফুলমণি আসে না। বুধন ফুলমণিকে কাছে পাওয়ার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করেছে। বুধন যখন পাড়ায় মাদল বাজায় তখন অন্য পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারে, এখন বুধন মাদল নিয়েছে। বুধনের অসম্ভব নাচের পারদর্শিতা দেখতে পাড়ার সবাই আসে। বুধনের হাতে মাদলের আওয়াজ যেমন বের হয়, ঠিক তেমনি তার বুকের পেশী, হাতের পেশীও নাচে। আবার লাফ মেরে সপাটে পিছনের দিকে ঘুরে যায়, তার এই অসাধারণ নাচের কৌশল ও পারদর্শিতা এ পাড়ায় আর কেউ করতে পারে না। বুধনের নাচ পাড়ার সবাইকে ভালো লাগলেও ফুলমণির ভাল লাগে নি, তাই সে বলেছে-

-ধূর, উ কি দেখব! উকে ডাক্, আমার নাচ দেখুক।[৩৪]

একবার বুধন পাড়ায় বাঁদর তাড়ানোর জন্য গাছে উঠেছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে আনন্দ করছিল। ফুলমণি বাঁদর তাড়ানোর শব্দ শুনে একবার বাইরে বেরিয়ে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে সে তাচ্ছিল্যের সুরে জানায়-

উকে ওই মুখপোড়াদের সঙ্গে গাছে বাসা বাঁধতে বল![৩৫]

অবশেষে একদিন এই ফুলমণি বুধনের উপর সমস্ত রকম রাগ, অভিমানের কথা ভুলে গিয়ে বুধনের প্রেমে ধরা দিয়েছিল। প্রিয় মানুষটির প্রতি রাগ অভিমান প্রকাশ করা ভালোবাসার অন্য একটি রূপ যা ফুলমণির ক্ষেত্রে আগাগোড়া ঘটেছে।

আদিবাসী সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'শিকার'। শিকারের কথা উঠলেই প্রত্যেক আদিবাসী যুবক কিংবা বৃদ্ধের রক্তে আনন্দের একটা জোয়ার আসে। শিকারের প্রবল আকর্ষণে তারা বিপদের কথা ভুলে যায়। জীবনের কোন এক কাঙ্খিত আশা মেটাবার জন্য নয়, কিছু পাওয়ার আশায় নয়। তারা তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অধিকার দিয়ে এই প্রাচীন প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এ উৎসব আজীবন পালন করে আসছে। কারণ, শিকার তাদের জীবনে কেবলমাত্র খেলাধূলার অঙ্গ বা উৎসব মাত্রই নয়, জীবনধারণেরও একটি অন্যতম মাধ্যম। বনজঙ্গলে বসবাসের সুবাদে আদিবাসী সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কে অতি অল্প বয়স থেকে শিকারের কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছিল। অনেক সময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বেরিয়ে পড়তে হয় তীর, ধনুক, বর্শা, হাতে নিয়ে বুনো খরগোশ, সজারু, শিকারের আশায়। এই শিকার মাঝে মধ্যে তাদের জীবনে একটা উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। তারা বার, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র দেখে বাৎসরিক শিকার পরবের দিন ধার্য করে। আজও আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে এই চির পুরাতন 'শিকার' উৎসব প্রথা কমবেশি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম, প্রভৃতি রাজ্যে জল জ্যান্ত দেখা যায়। এটা তাদের কাছে ন্যায় বিচারের উৎসব। প্রথমদিকে আদিবাসীরা ন্যায় বিচারের আশায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হত না। আদিবাসী সমাজে, সমাজপতিরা এই বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকতেন। জঙ্গলে শিকারের পর সমাজপতিরা দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর বিচার করেন। তাদের ভাষায় এদের এই বিচার ব্যবস্থাকে 'ল- বির' বলা হয়। 'ল' মানে আইন 'বির' মানে জঙ্গল অর্থাৎ জঙ্গলের আইন।

আলোচ্য ছোটগল্পে উল্লিখিত ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ প্রচুর বৃষ্টি হয়, এক নাগাড়ে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা, চাষের জমির উপর চারিদিকে বাইশ ইঞ্চি জল দাঁড়ায়। ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদ-নদীর জল, নদীর দুই পাড়ের চাষের জমিকে ছাপিয়ে দিয়ে কুলকুল করে প্রবাহিত হয়েছে। সাঁওতাল পাড়ার অবস্থান ঠিক কোপাই এবং বক্রেশ্বর সংযমস্থল কুয়ে নদীর কুলে, নদী গর্ভ থেকে প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে তারা বসবাস করে। তবুও তাদের আশঙ্কায় বুক কাঁপছিল। সারাদেশ বৃষ্টির জলে প্লাবিত করে, বাড়ি ঘর ভেঙে একেবারে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করেছে। সারাদেশ তখন খাদ্যের হাহাকার চলছিল, এই সময় সাঁওতালরা শিকারে বেরিয়েছিল। প্রত্যেক বড় বন্যার পর তারা শিকারে বের হয়। এই সময় গর্তে থাকা জন্তুগুলি ডাঙ্গায় ওঠে আসে। সাঁওতালরা সেই সুযোগে শিকার করে। এই শিকারে বেরিয়ে একদিন সাঁওতালরা আনন্দে হৈ হৈ করে বাড়ি ফিরেছিল। কাঁচা বাঁশের দুই দিক ঘাড়ে

চাপিয়ে একটা ছোট চিতাবাঘ নিয়ে আসছে। বাঘটির দৈর্ঘ্য লেজসুদ্ধ তিন থেকে সাড়ে তিন হাত হবে, এবং উচ্চতায় দুই হাত। এটা বুধন মেরেছে –

> -বুধন? -হ্যাঁ বুধনা মারলেক। লড়াই করেছে হে! হাঁ লেজ ধরে হেঁই বোঁ-বোঁ করে ঘুরায় বাঘটাকে[৩৬]

সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় বাকিরা একে অপরের মুখ চেয়ে শুধুই হাসে শিকারের দৃশ্য তারা বর্ননা করতে পারেনি-

> -তার পরেতে! বাবারে! বাঘটা ধপাস করে পড়ে, সি দাঁত বার করে হাঁকিড়ে বাবারে- তা বুধন ধরলেক বেটার ছামুকার পা দুটোকে, দু হাত দিয়ে লড়ুয়ে মরদের মত ধরলেক-।[৩৭]

বাঘটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে বুধনকে থাবা মারতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বুধন দুই হাতে বাঘের সামনের দুই পা ধরে পালোয়ানের মতোই তার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছিল। বাঘটা সুযোগ পেয়ে বুধনের কাঁধে কামড় বসিয়েছে, বুধনের কাঁধ সহ সারা শরীর রক্ত। আনন্দে বুধন প্রচুর হাঁড়িয়া খেয়েছে, টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে, বাঘের কামড়ে কাঁধের খানিকটা মাংস ঝুলে গেছে তবুও তার একটু ভ্রূক্ষেপ নেই। পাড়ার সকলে তাকে সাব্বাস করেছে। চারিদিকে সাঁওতাল পাড়ার অবিবাহিতা মেয়েরা বুধনের দিকে বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। অপরদিকে বুধন বীরত্ব প্রকাশ করে বলেছে-

> শালাকে ধরলম দুই থাবাতে চেপে। শালা কাঁধে কামড়ালে। লে শালা কামড়া। আমি বুধন বটি। হুঁ। দিতম শালার ছামুকার পা দুখানা মুচড়ে ভেঙে। আমার সঙ্গে পারবে- শালা! –অঃ![৩৮]

সেই দিন ফুলমণি বাড়িতে একা বসে থাকতে পারেনি। বুধনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাই সে জিজ্ঞাসা করেছে-

> -কি হে ফুলমণি লাগছে? কি দেখছ হে? কেমন দেখছ হে বাঘটো? কি দেখছ হে? বাঘের নখ? হুঁ – উ আমি দিব না হে দিব না । আমার বউকে দিব! [৩৯]

ফুলমণি তার উত্তরে বলে-

> সি তু দিস হে! আমি গিধড়া লই। গলাতে তক্তি পরি না! তা তুর কাঁধে রক্ত পড়েছে। ওষুধ লে। লইলে পাকবেক। বুঝবি ঠেলা! জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা![৪০]

শেষ পর্যন্ত ফুলমণি বুধনের পৌরুষত্বের কাছে হেরে গিয়েছে। সাঁওতাল পাড়ার সবাই জানে বুধন ফুলমণিকে বিয়ে করবে।

দীর্ঘ দেড় মাস পর লেখক তার ছোট ভাইয়ের মুখ থেকে বাঘ মারার গল্পটি শুনেছিল। লেখকের ছোট ভাই একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি বিপদের সময় পার্শ্ববর্তী সাধারণ মানুষের সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে, এলাকার সবাই তাকে চেনে। রাত্রি-দিন যে কোন সময়ে সাধারণ মানুষের ডাকে তাদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে ছুটে গেছেন। বাঘের খবর পেয়ে তিনি পরেরদিন সাঁওতাল পাড়ায় গিয়েছিলেন। বাঘটাকে দেখে তাদেরকে থানায় জমা দিতে বলেছিল, এর জন্য বুধন পুরস্কার পাবে এবং বুধনকে চিকিৎসার জন্য

নিকটবর্তী 'Health Centre' ভর্তি করেছিল, সঙ্গে ফুলমণিও এসেছিল। চিকিৎসার পর বুধন হাসপাতালে থাকতে চায়নি। ফুলমণি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে-

বাবু উকে ছেড়ে দে- গাঁয়ে নিয়ে যাই। কি ওষুধ দিবি দে। কি করতে হবে বল্। আমি করব সব।[৪১]

প্রত্যেক দিন ফুলমণি দায়িত্ব সহকারে বুধনকে হাসপাতালে এনেছে, 'ব্যান্ডেজ' পালটানোর সময় তাকে ধরে বসে রয়েছে। প্রথম দুইদিন নিজ হাতে সাগু তৈরী করে দিয়েছিল। এ যেন বুধনের প্রতি ফুলমণির প্রেমের লক্ষণ। প্রথমদিকে ফুলমণি বুধনকে পাত্তা না দিলেও পরে সে নিজেই তার কাছে ধরা দিয়েছিল। বুধন ফুলমণির মন জয় করার পর তার আনন্দের সীমা ছিল না। ফুলমণিকে সে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল এবং ফুলমণিদের বাড়িতে আজীবন সে ঘরজামাই থাকবে। ফুলমণি বুধনকে নিয়ে স্বপ্নের (সংসার) জাল বুনতে শুরু করে। বুধন কাজে গেলে জলখাবার সময় ফুলমণি হাজির হত। চাঁদনী রাতে দু'জন মিলে মাঠে বসে একসঙ্গে আকাশে তারা দেখত। বুধনও মদ খাওয়া কমিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দুই মাসের পর, ফুলমণির মনের মধ্যে সাজানো (কাঙ্ক্ষিত) সুখের সংসার সবই উলট-পালট হয়ে যায়। ফুলমণির দাদার বৌয়ের বোন হাসি মেঝান, ফুলমণির মতো সে সুন্দরী নয়, তবে কলে খেটে, রঙিন শাড়ী পরে, ব্লাউজ পরে, মাথায় সিঁথি কেটে চুল বাঁধে, হাতে রঙিন চুড়ি পরে সে এক বিলাসিনী। তারা ফুলমণির ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। সেই সুযোগে বুধন মদ খেয়ে হাসির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছে। ফুলমণি বুধনকে বকাবকি করলে বুধন নির্লজ্জের মতো হাসছিল। ফুলমণি বুধনকে দাদাদের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে না নিয়ে গেলেও, পরেরদিন বুধন একা চলে গিয়েছিল। মদ খেয়ে হাসির সঙ্গে বুধনের প্রেমের আলাপ হয়েছে। বুধনের এ রকম আচরণকে ফুলমণির পছন্দ হয়নি। তাই সে পরেরদিন একা বাড়ি চলে এসেছিল। দু'দিন পর বুধন বাড়ি ফেরে। ফুলমণি চেয়েছিল হাসির মতো সাজতে কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। এদিকে বুধনও সাপের মতো আস্তে আস্তে খোলস ছাড়ছে, বার বার আমোদপুর পালিয়ে যায় দুই দিন পর ফেরে অর্থৎ বুধন এখন ফুলমণিকে ছেড়ে এই রঙিনী ও বিলাসিনী মেয়েটির প্রেমে পড়ে যায়। ফুলমণি অনেক চেষ্টা করেও বুধনের মনকে ফেরাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ফুলমণি পঞ্চায়েতে নালিশ করে কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। একদিন ফুলমণি জানতে পারে বুধন হাসি'কে 'সাঙা' করেছে। এর আগে হাসির বিয়ে হয়েছিল। কলের মিস্ত্রীদের সঙ্গে কলঙ্ক রটেছে তবুও বুধন তাকে বিয়ে করেছে। পাড়ার সবাই ফুলমণিকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। ফুলমণি পাড়ার লোকের এই অপমানকে সহ্য করতে পারেনি। ফুলমণি প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য একদিন এক ধারালো কাটারি নিয়ে আমোদপুরে তার দাদার বাড়িতে উঠেছিল। পাশের কোয়াটারে বুধন ও হাসি একসঙ্গে থাকে। বুধন ও হাসি ফুলমণির আসার খবর শুনে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ ফুলমণি হাঁড়িয়া খেয়ে দাদা বৌদির সঙ্গে খিলখিল করে হাসছিল। সকলে যখন কালঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন তখন ফুলমণি কোমরে

কাপড় কষে কাটারিটা গুঁজে, খাটকে পাঁচিলের সামনে এনে দেওয়াল টপকে পার হল। অন্যদিকে হাসি আর বুধন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল। ফুলমণির লাফিয়ে ওঠার শব্দে তাদের ঘুম ভাঙেনি। ফুলমণি কোমর থেকে কাটারিটা বার করে সামান্য কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াল, তাদের খাটের কাছে গেল, সে মনে মনে স্থির করল এক কোপে দু'জনকে পার করবে। শেষ পর্যন্ত ধারালো কাটারিটা ফুলমণি নিজের গলায় চালিয়ে নেয়, রক্তের ফিনকিতে বুধন ও হাসি জেগে উঠল। ফুলমণিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফুলমণির চিকিৎসা চলাকালীন খুনের দায়ে বুধন ও হাসিকে অভিযুক্ত করা হয়। ফুলমণি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হওয়ার পর সে নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাদেরকে বাঁচায়।

> আমি উদিগে কাটব বলে এসেছিলাম। ই কাটারিটো আমার। উদিকে কাটতে গেলম, উরা জড়াজড়ি করে ঘুমুইছিল। খুব মদ খেয়েছিলাম আমি। কাটতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে মনে হল- লে-লে-তুর সুখ হোক। তু সুখ কর- খুব সুখ কর। আমি মরব। আমি মরব। বলে মুখটো উপর দিকে তুলে মারলম এক কোপ! সরকারী উকীল জেরা করে বলেছিলেন- তুই বুধনকে বাঁচাবার জন্যে বলছিস।– না। বুধনকে তো আমি মারতে পারতম। আমি মারলম না। মরং রোঙা সাক্ষী আছে। তাকে শুধাও গা![৪২]

ফুলমণির আত্মহত্যার অপরাধে তার বিচার হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের রায়ে লিখলেন-

> সেই অপরাধ করতে এসে সমস্ত সুযোগ পেয়ে এই শিক্ষাদীক্ষাহীন আদিম সমাজের একটি মেয়ে আত্মসংবরণ করে করেছে নিজেকে হত্যার চেষ্টা! সজ্ঞানে সে করেনি। অজ্ঞান এবং প্রমত্ত অবস্থায় করেছে। এ বিস্ময়কর ঘটনা! হত্যা না করার জন্য সে মহনীয়া।[৪৩]

ম্যাজিস্ট্রেটের বয়ান অনুযায়ী তখনও ফুলমণির বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি সেই কারণে, তাকে দুই বছরের জন্য সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষকে একটি সুপারিশও করেছিলেন যাতে একটি সুন্দর হৃদয় সম্পন্ন মেয়ে দুই বছরে উৎকৃষ্ট সম্মানজনক শিক্ষা পায়।

১৯৫৬-১৯৬৪ দীর্ঘ আট বছর পর লেখকের সঙ্গে ফুলমণির দেখা হয়েছিল। এখন ফুলমণি পড়াশোনা করে(রিফরমেটারিতে নার্সিং শিখেছে) একটি হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। এখন ফুলমণি শহুরে বাঙালিদের মতো মান্য বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। লেখক তাকে বিয়ে করার প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে সে বিয়ে করতে রাজি নয়। ফুলমণির সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পর লেখক জানতে পারে যে হাসি মারা গেছে, বুধনেরও মদ খেয়ে হাঁপানি রোগ হয়েছে। তাদের একপাল ছেলেমেয়ে আছে। ফুলমণি প্রত্যেক মাসে বুধন ও তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য টাকা পাঠায়। অন্যদিকে ফুলমণি লেখকের মাধ্যমে জানতে পারে– শকুন্তলা প্রফেসারি করছে। শকুন্তলা মনের মতো ছেলে পায়নি, তাই বিয়ে করেনি। আর প্রশান্ত শঙ্কর ডাক্তার হয়েছে এবং এক ফর্সা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। লেখক শেষে দয়াপরবশ হয়ে

ফুলমণিকে তার নাতির নার্সিং হোমে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ফুলমণি অনায়াসে সে প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' ছোটগল্পে ফুলমণি জন্মসূত্রে সাঁওতাল হলেও মনের গঠনের দিক দিয়ে সে ছিল এক আধুনিক নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারী-ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষায় ব্যর্থ এক সাঁওতাল মেয়ের প্রতিহিংসা পরায়ণতা এবং তা চরিতার্থ করতে গিয়ে আত্মশ্লাঘা ও বিতৃষ্ণায় নিজেকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা এবং আত্মহত্যার অপরাধে জেল হওয়ার পর ফুলমণি জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে এক শিক্ষিতা নার্স রূপে। অরণ্য-নির্ভর এক সাঁওতাল মেয়ে ফুলমণি আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নার্স ফুলমণির মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন গল্পের মূল বিষয় হলেও, তবে সবার উর্ধ্বে সমাজের সকলের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্য এক মহত্বদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

'রাঢ়' অঞ্চলের বিচিত্র পরিবেশের মাঝে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই আঞ্চলিক চেতনা তার সত্তায়, তার সমগ্র চেতনায় জড়িয়ে গিয়েছিল। এরফলে সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকরূপে যখন তিনি তার সাহিত্যের উপাদান খুঁজতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে অবান্তর কল্পনার পাখায় ভর করতে হয়নি, বানিয়ে গল্প বলতে হয়নি। তার চারপাশের ভূ-প্রকৃতি বিচিত্র জনজীবন এবং তাদের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল জীবন্ত প্রত্যক্ষভাবে তার সাহিত্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারাশঙ্কর সমকালীন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে যে সংশয় অনিশ্চয়তা ও নীতিমূলক মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার মূলে দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা আস্তিক্যেবোধের অভাব ছিল। তারাশঙ্কর এই দুই বিষয়কে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে অনায়াসে আরোহণ করেছিলেন। সেগুলোকে তিনি গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর আঞ্চলিক কথাসাহিত্যে উপাদানের সন্নিবেশের বিষয়টি নিছক প্রকরণগত বা পরীক্ষামাত্র ছিল না। তাঁর অস্তিত্বের গভীরে এষণা ও প্রেরণা ছিল। একটা গোটা অঞ্চলকে তার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসহ তিনি সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই তিনি গল্প ও উপন্যাসগুলিতে শুধু বহিরঙ্গের ব্যাখ্যা দিয়ে থেমে থাকেন নি। অন্তরঙ্গের রূপটিও তিলে তিলে নির্মাণ করেছেন। এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক গল্প উপন্যাসগুলির স্বাতন্ত্র্য এবং অনন্যতা। অভিজ্ঞতার গভীরতা স্বচ্ছ সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাঝেও প্রগতি- অনাগত ভবিষ্যতকে স্বাগত জানানো, দেশ-কাল, পরিব্যাপ্ত একটি উদার চৈতন্যদীপ্তি যেভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে ওঠে এসেছে তা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের সমুন্নত মাহাত্ম্যের সাযুজ্য সামীপ্য আমাদের দৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়েছে। আর এখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য হয়ে উঠেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৭ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ১৩৯।

২. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১০ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪২৪, পৃষ্ঠা- ৩৫০।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আমার সাহিত্য-জীবন,* 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি', কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা- ২২।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১।

৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১৭।

৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, চতুর্দশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৮৮।

৭. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২২, পৃষ্ঠা- ১৭।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আমার সাহিত্য-জীবন,* 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি', কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা-১৮৯।

৯. দে, বিশ্বনাথ (সম্পা.), *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা,* সাহিত্যম, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭, পৃষ্ঠা- ৫৩।

১০. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মে ২০১৭, ভূমিকা, পৃষ্ঠা- তেষটি।

১১. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পা.), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (তৃতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা– ১৩৯।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৯।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৬।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৬।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৬।

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৮।
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৯।
২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৯।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২০।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৬।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৬।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬২।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৬।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৮।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬১।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৬।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৮।
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৮।
৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৮।
৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৯।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭২।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭২।

পঞ্চম অধ্যায়:
মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

মহাশ্বেতা দেবীর কর্মের জগৎ বহুমুখী। আকৃতিতে বিশাল এক ভিন্ন জগত, সচরাচর সেই জগত চেনা জগতের বাইরে এক ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি জগতেই বা কেমন? ইতিহাস আর ভূগোলকে সঙ্গে নিয়ে সেই জগৎ যখন ভিন্ন হয়ে ওঠে, অন্য এক জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন সেটাই বা কেমন, আর সেই সৃষ্টির মধ্যে কতটুকুই বা স্রষ্টা ওঠে আসেন? কোথায় তাঁর আন্তরিকতা আর স্বাতন্ত্র্য, যেখানে তিনি অন্যদের তুলনায় আলাদা হয়ে যান। এইসব কৌতূহলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যে জগতের আলাদা এক ঠিকানা যেখানে সমাজের প্রতিটি মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শিক্ষা দেন, আর এখানেই তিনি স্বার্থক হয়েছেন।

কবি বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে জানা একান্তই দরকার। তাই মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর ব্যক্তি জীবনের দিকে আলোকপাত করব। শুধুমাত্র সাল তারিখের উপর ভিত্তি করে নয়, মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে তাঁর সাহিত্য জীবনকে শাখা প্রশাখা বিস্তারের জন্য পুষ্টিদান করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে 'মহাশ্বেতা ঘটক' ও 'মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য' থেকে কিভাবে লেখক মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠলেন তা একদিনের পরিশ্রম নয়, এর পিছনে দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর ১৯২৬ সালে বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় ঘটক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, পরবর্তীকালে তারা সপরিবারে এপার বাংলায় চলে এসেছিল। তাঁর পিতা মণীশ ঘটক প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধুমাত্র পিতা মণীশ ঘটকই নন, তাঁর কাকা ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র জগতের একজন সুনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। ঋত্বিক ঘটক 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' এর মত সিনেমার রূপদান দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁর মা ধরিত্রী দেবীও একাধারে সাহিত্যপ্রেমী এবং সমাজসেবী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন এবং বিভিন্ন রকম ইংরেজি গ্রন্থকেও বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর বড় মামা একজন খ্যাতিনামা অর্থনীতিবিদ ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর পিতামহ ও মাতামহের উভয় দিকই একটা বিদ্যাচর্চা ও পান্ডিত্যের বিশাল খ্যাতি ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাদের একটা পারিবারিক আন্তরিকতা সম্পর্ক ছিল। আর অন্যদিকে রবীন্দ্র স্নেহধন্য কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর মাতা ধরিত্রী দেবীর আপন মামাতো ভাই ছিল। সুতরাং

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর পরিবারের উভয় দিক থেকে শিল্পীজীবনে এক অতি মনোরম সাহিত্যিক পরিবেশ পেয়েছিলেন যা ব্যক্তিগত জীবনে মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠার পিছনে অনেকটা অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। লেখিকার জীবনে বিজন ভট্টাচার্যের অপরিসীম অবদান রয়েছে। কারণ, বিজন ভট্টাচার্যই মহাশ্বেতা দেবীকে আজকের মহাশ্বেতা বানিয়ে তুলেছিলেন।

আজকের মহাশ্বেতা দেবী একদিনে মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠেননি, তার পিছনে প্রতিনিয়ত দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীরা সর্বমোট নয় ভাই বোন ছিল। মহাশ্বেতা দেবী সবার চেয়ে বড় ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত তাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। শুধুমাত্র এই আর্থিক সংকটের কারণেই তাকে ‘ক্লাস এইটে’ পড়ার সময় শান্তিনিকেতন থেকে পড়াশোনা ছেড়ে বাড়ি আসতে হয়েছিল। ভাই বোনের কথা ভেবেই নিজের পড়াশোনা ছেড়ে বাড়ি চলে আসা এর মধ্যে আমরা পরবর্তীকালের মহাশ্বেতা দেবী, আদিবাসীদের ‘দিদি’ ও ‘মারাং দাই’ হয়ে ওঠার পূর্বাভাস পাই।

পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী নিজের আগ্রহের তাগিদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঘুরেছেন। আদিবাসীদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছেন, সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। এভাবেই তিনি বিহার ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মুণ্ডা শ্রেণি মানুষদের কাছে ‘মারাং দাই’(বড়দিদি), হো সম্প্রদায় মানুষের কাছে ‘আজিম’(বড়দিদি) নামে পরিচিত ছিলেন। হাওড়া শিবপুরের লোধা সমাজের হরিজন সমিতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম অন্ন, জল, ভূমি বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবিকার নানারকম প্রশ্ন নিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে শরণাপন্ন হয়েছে এবং যারা একেবারে অক্ষম সহায় সম্বলহীন হাজার দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত তাদের শরিক হয়ে, স্বেচ্ছায় তিনি অতি ব্যস্ততম জনপ্রতিনিধির মতো সব সময় তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর এখানেই তিনি অন্যান্য বাঙালি সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা হয়ে এক স্বতন্ত্র্য সাহিত্যে জগৎ নির্মাণ করেছেন। আদিবাসীরাও সব সময় তাঁকে নিজেদের পরিবারের একজন বলে মনে করত। মহাশ্বেতা দেবী কোনো কারণে অসুস্থ হলে মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, লোধা ও শবর প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় সবাই মিলে দিদির দ্রুত আরোগ্য লাভের কামনা করেছে। এমনকি তাদের আরাধ্য দেবতার কাছে দিদির জন্য শরণাপন্ন হয়েছে। আবার মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসটি ‘জ্ঞানপীঠ’ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলে, মুণ্ডারা ঢাক বাজিয়ে আনন্দ করেছে।

সমাজজীবন ও সাহিত্যে যে একে অপরের পরিপূরক, মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যিক জীবনে তা কতটা প্রযোজ্য তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যকে পর্যালোচনা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। তাঁর সমগ্র জীবন যেমন সংগ্রামময়, ঠিক তেমন সাহিত্যের মধ্যেও ফুটে উঠেছে সেই সংগ্রামর

চিত্র। প্রথম জীবনে তাঁর সেই সংগ্রাম ছিল ব্যক্তিগত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই সংগ্রাম একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতি, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নায্যে অধিকারের লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই কারণে তাঁর সাহিত্যে জীবনকে দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের সময়কাল (১৯২৬-১৯৭০) আর দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল (১৯৭০-২০১৬) পর্যন্ত।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় **১৯২৬-১৯৭০** সাল পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে প্রতি মুহূর্তে প্রচুর লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময় তিনি কোন স্থায়ী কাজ পাননি। এই আত্মসংগ্রামে নিমগ্ন জীর্ণ মানুষটি কখনও পরাজয় লাভ করেছেন, আবার কখনও তিনি সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর জয়ের ভাগটা বেশি ছিল। এই আত্মসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি শ্রম সংযুক্তি ও ত্যাগকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছলেন। তাঁর ‘তৃষ্ণা’, ‘রঙ্গায়ালী’, ‘আশু ডাক্তারের বাড়ি’, ‘পরম আত্মীয়’, ‘ছায়াবাজি’, ‘শান্তি’ ও ‘ননীগোপালের জমা খরচ’ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে সংযুক্তি ও ত্যাগকে তিনি অতি সজাগভাবে ব্যবহার করেছিলেন। যেমন- ‘ছায়াবাজি’ ছোটগল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে ওঠে আসা এক মেধাবী ছেলের জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অতি শৈশব থেকে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে আলাদা খাতির পাওয়ার ফলে সে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, সবাইকে উপেক্ষা করে সে এক আঁতেল এ পরিণত হয়। যার ফলস্বরূপ, বিজয় একদিন একান্ত কাছের লোকজনদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে কুলীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যাদেরকে সে একসময় গুরুত্ব দেয়নি, তারাই একমাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। বিজয় এই ব্যর্থতার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, বাধ্য হয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত সংগ্রামই ১৯৭০ সালের পরবর্তী সময়ে শ্রেণিগত সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি যে শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে কথা বলেছেন তারা হল সমাজের বঞ্চিত, নিরন্ন, অবহেলিত, নিম্ন শ্রেণির মানুষ। তাঁর ‘বেহুলা’, ‘শূন্যস্থান পূর্ণ করো’, ‘বিশ-একুশ’, ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ ও ‘দ্রৌপদী’ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে সংগ্রামেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলোতে সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ মানুষের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ককে দেখিয়েছেন। কারণ, একদিকে রয়েছে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-উদাসীনতা আর অপরদিকে রয়েছে যন্ত্রণা ও ক্ষয় প্রতিরোধের চেষ্টা, তাদের স্বার্থ কায়েম করতে দুই শ্রেণির মধ্যে আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, এতে সংঘাত অনিবার্য। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছেন সমাজের উচ্চবর্ণের শোষণ এবং নিম্নবর্ণের সংগ্রাম এই দুটিই আজীবন চিরন্তন সত্য। এ থেকে মুক্তির জন্য একটি মাত্র উপায় হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রেণিবদ্ধভাবে সংগ্রাম করা। তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয় হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তিনি সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের শ্রেণিদ্বন্দ্বে তিনি সমাজের অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও অবদমিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিনিয়ত

তাদের অভাব অভিযোগের অংশীদার হয়েছেন। 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের কালীবাবু, 'বেহুলা' গল্পের বসন্ত ও 'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' ছোটগল্পে মতিবাবু প্রভৃতি চরিত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কলেজে পড়ার সময় থেকে তিনি নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তখন সারা বাংলায় চলছিল ১৩৫০ এর ভয়ঙ্কর মন্বন্তর। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ তাঁর মনকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তাই গীতা রায়চৌধুরী, অলকা মজুমদার, সুজাতা বসু তাদের সহায়তায় তিনি সমাজের দুর্ভিক্ষের কবলে পীড়িত মানুষের কাছে ত্রাণ কার্যে যোগ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে বস্তিতে বস্তিতে ত্রাণ ও সেবার কাজেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের মতো তাঁর যৌবনও ছিল নানারকম বেদনা ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বিজন ভট্টাচার্যের সাথে বিয়ে তাঁকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। কারণ, বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) একদিকে যেমন তাঁকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল ঠিক তেমনই অন্যদিকে এই সময় চরমদারিদ্রর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার, শ্বশুর-শাশুড়ি, পাঁচ ভাই, তিন বোন সহ সর্বমোট এগারো জনের সংসার। সংসারের সব কাজ সামলেও তিনি লেখক হওয়ার প্রস্তুতিও চালিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বিজন ভট্টাচার্যের লেখা থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিখ্যাত কমিউনিস্টদের লেখা নাটক, ইলিয়া এরেনবুর্গ(১৯১৯-১৯৬৭), আলেক্সি টলস্টয়(১৯০৭-১৯৪৫), ভ্যালেন্টিন কাতাইয়েভ(১৮৯৭-১৯৮৬), ফাদায়েভ, সিমোনভের লেখা ইলফ ও পেত্রভের লেখা লিটল গোল্ডেন আমেরিকা, গোর্কির আত্মজীবনী, গোর্কিকে নিয়ে চেখভের লেখা, আলেকজান্ডার স্যাকটন প্রভৃতি সাহিত্যিকদের লেখা পড়েছিলেন। শুধু পাশ্চাত্য সাহিত্যতিকদের লেখা সাহিত্যেই নয়, স্বদেশীয় সাহিত্যতিকদের লেখা বাংলা সাহিত্যেও তিনি সমান গুরুত্বের সঙ্গে পড়েছিলেন, যেমন- সতীনাথ ভাদুড়ী'র *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (১৯৪৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৫১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* (১৯২৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও গুণময় মান্নার(১৯২৫-২০১০) *লখিন্দর দিগার* (১৯৫০) প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এখান থেকেই তিনি একটা নতুন 'সাহিত্যিক জগৎ' নির্মাণের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে স্থায়ী হয়নি। সেই বৈবাহিক জীবনে তাঁকে অনেক কিছুই শিখিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর প্রত্যহিক জীবনে চলার পথে অনেকটাই কাজে লেগেছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

> তাঁর সঙ্গে(বিজন ভট্টাচার্য) বিয়ে না হলে আমি জীবনের অন্য এই দিকটা দেখতে পেতাম না। সংগ্রাম যে কখনও থামে না তা জানতে পারতাম না। এক স্বছল উদার ও মানবতাবাদী শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হয়েও স্বেচ্ছায় সংগ্রামের জীবন বেছে নিতে পারতাম না।[১]

বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর, ১৯৬৫ সালে অসিত গুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এই বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, অবশেষে ১৯৭৬ সালে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। উভয় বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলেছেন-

> অসিতকে বিয়ে করে দেখলাম ইট ইস নট ওয়ার্কিং। আমি ইকোনমিক সাপোর্ট পাচ্ছি না। আমি যে স্বাধীনতা চাই তাও পাচ্ছি না। আমার জীবন আমারই জীবন।..... বিজনকে ছেড়ে আসার সময় আমি একদম সমাজের কথা ভাবিনি। তখন আমার একটাই দাবি- স্বাধীনতা। আই নিডেড আ ফিড্রম।[২]

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোথাও তিনি আপোশ করতে রাজি নন, বিদ্রোহী সত্তারই পরিচয় বহন করে। ব্যক্তি জীবনের এই ভাঙাগড়া স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যে জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বিজন ভট্টাচার্যকে ছেড়ে আসার পর, একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্য ভীষণভাবে কষ্ট পেতেন, হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। অপরদিকে দ্বিতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর তাঁর জীবনে একটা সংকট মুহূর্ত এসে দাঁড়ায়। তাই তিনি বাধ্য হয়ে মানসিক চাপ কমাতে ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একই সঙ্গে তিনি সাহিত্যকর্ম ও সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মূলত, 'সাহিত্যকর্মী মহাশ্বেতা' ও 'সমাজকর্মী মহাশ্বেতা'য় কোন ভেদ নেই, বরং একে অপরের পরস্পরের পরিপূরক সত্তা। তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে, পত্র-পত্রিকার কলমে লেখার কাজে ও নানারকম সমাজ কল্যাণকর সংস্থা সংগঠনের কর্ণধার হিসেবে সবসময় কর্মব্যস্ত থাকতেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার অন্ত্যবাসী আদি জনজাতির মানুষ, হবু ও আধা-প্রতিষ্ঠিত লেখক, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের জানা-অজানা সমস্ত রকমের মানুষ প্রতিনিয়ত নানারকমের সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হত। আশির দশকের একেবারে শুরু থেকে কার্যত মহাশ্বেতার সাহিত্যকর্ম ও সমাজসেবার মধ্যে আদিজনজাতির সংগঠনের কাজকর্ম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর কাছে 'সাহিত্যকর্ম ও সমাজসেবার' মধ্যে পৃথক অস্তিত্বের কোনো স্থান নেই। তিনি 'Activist' লেখক, সমাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলায় লেখালেখিতে তাঁর মনঃসংযোগ ব্যহত হচ্ছে এবং লেখার মানেরও কিছুটা অবনমন ঘটেছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছিল। তিনি তা অস্বীকার করেন, তার পরিবর্তে যুক্তি দেখান, কখনো বিরক্ত প্রকাশ করেন, আবার কখনোও সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। নিপীড়িত-নির্যাতিত, পিছিয়ে পড়া মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হলে তিনি বিরক্ত হতেন না, ক্ষমতানুযায়ী প্রভাব-প্রতিপত্তি, শ্রম-অর্থ দিয়ে সেই সব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। এ প্রসঙ্গে কথাকার ও সাহিত্য সমালোচক অভিজিৎ সেন বলেছেন-

> পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই, মেদিনীপুরের লোধাদের অধিকার অর্জনের জন্য লাগাতার লড়াই, মিথ্যা খুনের দায় থেকে আদিবাসীদের খালাশ করে আনা, হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে অধিকারের লড়াই জেতা এবং কায়েমি স্বার্থের মুখোশ খুলে দেওয়া, এধরনের ছোটবড় অসংখ্য কাজে সারাদিন ব্যস্ত তিনি।[৩]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভাব অভিযোগের কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাদের উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত দিনে ১৪-১৫ ঘণ্টা নিরলসভাবে কাজ করতেন। এভাবেই তাঁর সময়টা হয়ে উঠল জীবনের একটা 'টার্নিং পয়েন্ট'। এই সময় থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন পেশাভিত্তিক লেখক হয়ে উঠলেন। একদিকে তিনি যেমন কোয়ালিটি রাইটিং (সমাজ বাস্তবতা) মনোযোগ দেন, তেমনই অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এইসব নানা অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে একেবারে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি নতুন একটা না দেখা সাহিত্যে জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন, যা এতদিন কেউ জানত না, জানতে আগ্রহ প্রকাশ করত না এই সব নানা অনুভূতি, ক্ষোভ ও দুঃখই তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল। তিনি একই সঙ্গে বাইরের জগতের দারিদ্রর সঙ্গে লড়াই আর অন্যদিকে নিজের ভিতরকার আমিত্বের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই দুই চরম দারিদ্র'র সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত যে পেশায় স্থায়ী হয়েছিলেন, সেখানে সমাজের নিচুতলার মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে দীর্ঘ (১৯৬৪-১৯৮৪) ১৮ বছর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এই কলেজটি মূলত গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য। যারা দিনের বেলায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যর বাড়িতে কাজ করত। কলেজটির ভালো পরিকাঠামো ছিল না, বর্ষাকালে প্রায় জল পড়ত, তবুও তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি নাক উঁচু স্বভাব ত্যাগ করে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। কারণ, সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। এই ভালোবাসার টানে তাঁকে অন্য কোথাও যেতে দেয়নি। দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসার আর এক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তারই সম্পাদিত বর্তিকা পত্রিকায়। তিনি বর্তিকা পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একেবারে নিচের তলায় অবস্থিত মানুষ সম্পর্কে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী সমাজের দরিদ্র অসহায় মূক আদিবাসীদের মুখ থেকে প্রতিবাদের ভাষা আদায় করে বর্তিকা-র প্রাণসঞ্চার ও বর্তিকা-কে নতুন সাজে, নতুন রূপে ও আঙ্গিকে সজ্জিত করেছিলেন। পত্রিকায় স্থান পায় সমাজের অবহেলিত নিম্নস্তরের মানুষের মুখের কথা, অব্যক্ত ভাষা, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, সদ্যস্বাক্ষর মৃৎশিল্পী, বিভিন্ন কারিগর থেকে অতি সাধারণ বর্গাদার-ক্ষেতমজুর-তাঁতি-জোলা-জেলে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের আত্মকথা, ক্ষোভ-ব্যথা-বঞ্চনার কাহিনি ও আদি জনজাতির মানুষের অপোক্ত হাতের লেখা, পরিচয় হিসেবে জীবন্ত হয়ে ওঠে তাদের ভিন্ন মুখ, ভিন্ন স্বর। এছাড়াও তিনি বন্ধুয়া মজদুর, ইঁটভাটার শ্রমিক, তে-

ভাগা আন্দোলনের ইতিহাস, পুরুলিয়ার শবর-খেড়িয়া উপজাতি, বন্দিমুক্তি, নারীমুক্তি, কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন, বন্ধ কলকারখানার সমস্যা, ডাইনি প্রথা বিষয়ক সংখ্যাগুলো সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার এক-একটি জীবন্ত দলিল। ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে যাঁর মহৎ ও অকপট বিস্তার, এক সন্তানের মা থেকে সর্বজনীন মাতৃত্বের পরিমন্ডলে একাত্মকরণ তাঁর সৃষ্টিতেও অমোঘ হয়ে উঠতে দেখা যায়। পশ্চিমবাংলার দরিদ্র-নিঃস্ব, সর্বহারা, শোষিত, পতিত ব্রাত্যজনের প্লাটফর্ম হিসেবে তথা তাদের অস্ফুট রুদ্ধ কণ্ঠের একমাত্র প্রতিবাদী মঞ্চরূপে মহাশ্বেতা দেবীর বর্তিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এই সব তথাকথিত যৎ সামান্য শিক্ষা পাওয়া মানুষ প্রচুর গ্রাম সমীক্ষা লেখে, সমাজকে তারা কী চোখে দেখে সেই সব কথা, তাদের অভিজ্ঞতাতে উপলব্ধির কথা ইত্যাদি। বর্তিকা'র মণীশ ঘটক সংখ্যা, তেভাগা ও কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের অপর দুটি সংখ্যা, বন্ধ কল-কারখানা সংখ্যা, মুসলমান সমাজ নিয়ে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা, আদিবাসীদের ডাইনি সংখ্যা, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, আরো নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলি মূল্যবান স্মারকরূপে পাঠকের দরবারে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। সদ্য শিক্ষিত লোধা মেয়ে চুনি কোটালও বর্তিকা পত্রিকার লেখিকা ছিলেন। চুনি কোটালের আত্মহননের পর নানা কাগজে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ পায়। বর্তিকা পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তী(১৯৫১) বলেছেন-

> ব্যক্তিগত জীবনে উনি নবারুণের মা। অকালপ্রয়াত চুনী কোটালেরও মা, খেড়িয়া-শবর-লোধাদের মা, মুণ্ডা সমাজের মাতৃসমা মারাং দাই(বড়দি) তিনি। মুরগি মায়ের মত ডানার নিচে মহাশ্বেতা আগলে রাখেন দলিত সংগঠনগুলিকে। কষ্টে থাকা আদিবাসী মানুষদের জন্য ছুটে বেড়িয়েছেন, এর মধ্যে একটা সংগ্রামী মাতৃত্বও কাজ করেছে।[৪]

১৯৮৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী স্বেচ্ছায় কলেজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। এরপর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ এবং একই সাথে আদিবাসীদের উন্নয়নকল্পেও নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তিজীবনে তো নিজে সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় প্রান্তিক এলাকার আদিবাসীদের অন্তরের দুঃখ কষ্ট নিজের হৃদয় দিয়ে খুব সহজে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আদিবাসীদের জীবনের অভ্যন্তরে ঢুকে তিনি আদিবাসী সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন। সেই জন্য তিনি সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের 'মারাং দাই' আর খেড়িয়া ও শবরদের 'মা'। অনেকে আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানারকম গবেষণা করে ডিগ্রী নিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন, ভালো জায়গায় চাকরিও পেয়েছেন কিন্তু কিভাবে তাদের উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা যায়, সেই কথা অনেকে ভাবেন না। সেই সব উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতিকে বাজারের কেনা পণ্যের মতো কেনা বেচা করতে শুরু করেছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র আদিবাসীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে মাথায় নিয়ে তাদের সুবিধা অসুবিধা জানার জন্য তিনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, পালামৌ ও দুমকা

প্রভৃতি পাহাড়ি এলাকার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি নিজে ঘুরে দেখেছেন। তাদেরকে একত্রে সংগঠিত করার জন্য নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় নানারকম সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সংগঠনগুলি হল-

১	সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা
২	পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা
৩	পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি(পুরুলিয়া)
৪	পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি(পুরুলিয়া)
৫	পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি(মেদিনীপুর)
৬	কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ(সিংভূম)
৭	মাঝগেড়িয়া আদিবাসী গাওতা সুসার বাইসি(বাঁকুড়া)
৮	দলিতজন মুক্তি সংগঠন(শিবপুর হাওড়া)
৯	সান্তাল সমাজ লাহান্তি বাইসি(মুর্শিদাবাদ)
১০	পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি(কাঁচরাপাড়া)
১১	ভারতের আদিম জাতি(মধ্যমগ্রাম)
১২	পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর কল্যাণ সমিত
১৩	মুক্ত সমাজ সাঁওয়ার জামদা(ওড়িশা)
১৪	আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিত
১৫	চব্বিশ পরগনা আদিবাসী কল্যাণ সমিতি(সোনারপুর)
১৬	বহরমপুর পৌর হরিজন কর্মী-মজদুর সংঘ
১৭	পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যাণ সমিতি

তিনি সবসময় চাইতেন অবহেলিত অসহায় মানুষরা সংগঠিত হোক, নিজেদের বঞ্চনার কথা সবার সামনে তুলে ধরুক, নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিক। তিনি জানতেন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে বা অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল হলে কোনোদিনই সুবিচার মিলবে না। তাই সুদূর গুজরাতের বরোদাতে গিয়ে আদিবাসী জীবন ও সাহিত্য সেবার জন্য ড. ডি. এন ডেভির সঙ্গে ‘আদিবাসী অ্যাকাডেমি’ গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে একদিকে আদিবাসী সাহিত্য চর্চা করা হয়,

অন্যদিকে সমাজ সেবা ও তাদের সংগঠিত করার কাজও করা হয়। সাহিত্য লেখার কর্মসূত্রে তাঁর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেমন যাতায়ত ছিল, ঠিক তেমনই তাঁর লেখার বিষয়বস্তুও শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে আবদ্ধ নয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের বিষয়বস্তুও তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কর্মজীবনের এইসব চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। এভাবেই তাঁর সাহিত্যে ধীরে ধীরে কখনও ভারতবর্ষের আবার কখনও বা বিশ্বের দর্পণ হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য সাওঁতাল, লোধা, শবর, মুণ্ডা ও খেড়িয়া প্রভৃতি আদিজনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর আত্মিক যোগ বা তাদের প্রতি সহমর্মিতা তাঁকে এক আলাদা জগতের বাসিন্দায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ, তাঁর সৃজনশীলতার বিস্তীর্ণ পরিসরে আদিবাসী সমাজ জীবন ও তাদের প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশে তিনি অন্যান্য লেখকদের তুলনায় অনেকটা আলাদা। মেদিনীপুর জেলার লোধা ও পুরুলিয়া জেলার খেড়িয়া শবরদের দুঃসহ জীবনযাত্রার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন ও ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন, 'লোধাদের বক্তব্য'(বর্তিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৮২), 'লোধা শবরদের কথা কতটুকু জানি'(যুগান্তর ১৯৮২) 'শবর উৎসব সমিতি' (বর্তিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩), 'লোধারা ত্রাসের থেকে বাঁচতে চায়'(১৯৮৩), 'শবরমেলা'(১৯৯৬), 'মুক্তির মেলা'(১৯৯৬), 'খেড়িয়া শবর এগোচ্ছে'(১৯১০), প্রভৃতি রচনায়। লোধা ও শবর দুটি সম্প্রদায়েই আদিবাসী জনজাতি। এরা মূলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একেবারে প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করে। সাধারণত লোধা-খেড়িয়া-বিরহড় প্রভৃতি আদিজনজাতির মানুষেরা সমাজে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এরা উঁচুতলার সভ্য মানুষের চোখে ঘৃণিত, সভ্য মানুষের কাছে নির্যাতিত। লোধারা অশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার জন্য সমাজে সমস্ত শ্রেণির মানুষের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত লোধাদেরকে নানা অজুহাতে ধ্বংস করার চেষ্টা চলেছে। এই দীর্ঘ চার বছরে ৩৪ জন লোধা নিহত হয়। তাই বাধ্য হয়ে লোধারা গণহত্যা বন্ধ ও লোধারা প্রকৃত অপরাধী কিনা তা নিয়ে প্রশাসনের কাছে বিচারের দাবি তোলে। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ সালে 'ক্রিমিনাল ট্রাইব্‌স অ্যাক্ট ১৮৭১' অনুযায়ী পরাধীন ভারতের বহু অরণ্য আদিবাসীগোষ্ঠী জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' (১৮৭১-১৯১০) জাতি বলে ঘোষণা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের লোধা (মেদিনীপুর), খেড়িয়াশবর(পুরুলিয়া) ও ঢোকারো(বীরভূম) 'অপরাধপ্রবণ' বা 'নোটিফায়েড' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। অবশেষে ১৯৫২ সালে এরা 'বিমুক্ত' বা 'ডিনোটিফায়েড' ঘোষিত হলেও, দুর্ভাগ্যর বিষয় আজও কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ ও সমাজের চোখে এই সব জনজাতিরা জন্ম অপরাধী বলে নির্যাতিত, উপেক্ষিত ও নিহত হয়। মহাশ্বেতা দেবী এর বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন। কোনো জাতি নির্বিশেষে অপরাধী হয় না, তা তিনি বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে সমাজে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। এইসব জাতি আদিম অরণ্যর মতো নিষ্পাপ ও সরল প্রকৃতির,

বরং তাদের এই সরলতা ও দারিদ্রর সুযোগ নিয়ে সমাজে যারা তথাকথিত 'নিরাপরাধ' বলে চিহ্নিত সেই সব ব্যক্তিরাই বিভিন্নরকম 'অপরাধমূলক' কাজের সঙ্গে জড়িত।

মহাশ্বেতা দেবী দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক চেহারা দুচোখ ভরে দেখেছেন, কিন্তু রাজনীতির নগ্ন চেহারার সঙ্গে তিনি কখনো নিজেকে জড়াতে চাননি। একই সঙ্গে আপসও করেননি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সবসময় দেশের মূল ও স্থায়ী সমস্যা সমূহের সমাধান হয় না। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিহীনকে ভূমি দান, ভূমিদাস প্রথা বন্ধ করা, বর্গাদারকে বর্গা রেকর্ড করে তার প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা আদিবাসীর হাত থেকে জমি চলে যাওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি। এগুলি একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন আইনকে বলবৎ করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। মহাশ্বেতা দেবী দেশের আর্থ সামাজিক পটভূমি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটাও উপলব্ধি করেছিলেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নিজেদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তিনি আদিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পেরেছিলেন বলেই, তাঁর গল্প উপন্যাস নিচ্ছক গল্প নয় এক- একটা সমাজজীবনের সত্য ঘটনা। প্রত্যকটি গল্প উপন্যসেই তাঁর সমাজ জীবনের বাস্তব দলিল। তাঁর 'ক্ষুধা', 'স্তনদায়িনী', 'গিরিবালা', 'দ্রৌপদী', 'চিন্তা', 'রিপোর্ট', 'ভাত', 'আজীর' ও 'অপারেশন? বসাই টুডু' প্রভৃতি ছোটগল্প একেবারে সমাজ বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে ওঠে এসেছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে তিনি দু চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, অন্তরে যা বিশ্বাস করেছেন সেগুলোকে এক এক করে তাঁর কলমের আঁচড়ে বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাছে কর্মজীবন ও সাহিত্যসেবা কোন কিছু আলাদা বিষয় নয়।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

১. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা:

প্রচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম প্রথা দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষের কাছে পেশাগত এবং বিত্তগত অসাম্যর একটা পরিচয় ছিল। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যর পার্থক্য দেখা যায়। আর্য জাতির প্রচীনতম গ্রন্থ 'বেদ' থেকে আমরা এই ধারণার পরিচয় পাই। সেখানে সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত মানুষদের বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা জানি যজন, যাজন, অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণদের বৃত্তি, দেশের জন্য যুদ্ধ ও রাজ্য শাসন করা ক্ষত্রিয়দের কাজ, দেশের বাইরে এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ বৈশ্যরা করত, আর শূদ্ররা এই তিন বর্ণের মানুষদেরকে সেবা করত। এই বিভাজন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিল না। যে সম্মান প্রথম তিন বর্ণের মানুষরা পেতেন, শূদ্ররা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। শূদ্রদের সামাজিক অধিকার টুকুও সংকটপূর্ণ ছিল। আর্যরা

আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে শূদ্ররা আদি অধিবাসী হিসেবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের উন্নতমানের যুদ্ধ কৌশলের কাছে তারা হেরে গিয়েছিল। তাই তারা বাধ্য হয়ে দেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুই দিকই দুর্বল ছিল। এই দুর্বলতার কারণে, তারা চিরকাল সমাজের উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা শোষিত, অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হন। একদিকে জাতিগত সমস্যা অন্যদিকে আর্থিক সংকটের দাপটে বিভিন্ন শ্রেণি বিভক্ত সমাজকে দারিদ্রর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আজও ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজ মুক্তির স্বপ্ন দেখে। প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে মহাশ্বেতা দেবীর জীবনবোধ শানিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের মূল তখনও এ দেশের মাটিতে গভীরে প্রোথিত রয়েছে। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল, পরে যখন বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে রূপান্তরিত হল তখন তারা স্বদেশকে সমৃদ্ধ করতে এদেশের বুকে নানারকম শোষণ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মহাশ্বেতা দেবী এই পরাধীন ভারবর্ষের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনজীবনের ভয়াবহ সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত (১৯৩৯-১৯৪৫) অর্থনৈতিক মন্দা তার প্রভাবে সাধারণ মানুষের কঙ্কালসারময় জীবনচিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে দেশের জনজীবনের উপর হতাশা অবক্ষয় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। দেশের মানুষের জীবনে দুর্বিষহ হওয়ার কারণ গুলি হল-

১. ১৯৪১ সালে জাপানী আক্রমণ।

২. ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা।

৩. ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশের মন্বন্তর।

৪. ১৯৪১-১৯৪৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।

৫. ১৯৪৬ সালে নৌবিদ্রোহ, মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

৬. ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মাউন্ট ব্যাটনের ভারত বিভাগ, স্বাধীনতার প্রস্তাব ঘোষণা ও পাকিস্তানের সৃষ্টি।

৭. ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। দেশবাসী স্তম্ভিত ও মর্মাহত। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা।

৮. ১৯৪৭-৫৩ সালে উদ্বাস্তু স্রোত বহিরাগতদের আগমণে দেশের অভ্যন্তরে প্রবল জনাধিক্য।

৯. ১৯৬২ সালে চিন ভারত যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা।

১০. ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ।

১১. ১৯৬৪-৬৬ সালে খরাজনিত আর্থিক সংকট ও বিপর্যস্ত জনজীবন।

১২. ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন।

১৩. ১৯৬৭ সালে নকশাল আন্দোলন শুরু।

১৪. ১৯৬৮ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

১৫. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।

১৬. ১৯৭২ সালে নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা, জনজীবনে ভয়াবহ আতঙ্ক।

১৭. ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ভারতের অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র, অশিক্ষা, ধর্মীয়-সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার প্রভৃতি উন্নতির পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ(১৯৩৯-১৯৪৫) এবং ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত(১৯৪৭) হওয়ায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারায়। প্রধান সমস্যা হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল। আপাতকালীন সংকট জনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার(১৯৫১-১৯৫৬) খসড়া কমিশন কর্তৃক পেশ করা হয়।

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়(১৯৫১-১৯৫৬):

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেশি পরিমাণে গুরুত্ব পায়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার সাফল্যও আসে। কিন্তু এ পরিকল্পনায় মাত্র ৪৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা সম্ভব হয়। দেখা যায়, দেশের সর্বসাধারণের জনশিক্ষা-স্বাস্থ্য বা নিম্নবর্গের দারিদ্র - দূরীকরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

২. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়(১৯৫৬-১৯৬১):

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধ্যাপক পি.সি. মহলানবিশ মডেল অনুসরণে রচিত। এই পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় 'কৃষি ও সেচ' প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'শিল্প ও পরিবহণ' উন্নয়নের বিষয়টি বেশি পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করে। শিল্প ও খনিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করা হয় ২০ শতাংশ, এতে শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়। উন্নয়ন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুন্নয়নের বিষয়টিও সুপরিস্ফুট- যেমন মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ভোগ্য দ্রব্যর অভাব, বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে অবনতি এবং আয় বন্টনের অসমতা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার সমাপ্তিতে দেখা যায়, বেকারত্বের সংখ্যা ৯০ লক্ষ পৌঁছায় এরফলে সমাজের সাধারণ মানুষের আর্থিক বিপর্যয় বা সংকট বেড়ে গিয়েছিল।

৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র(১৯৬১-১৯৬৬):

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য স্বয়ম্ভরতা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের প্রসারসাধন করা। এছাড়াও রয়েছে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আয় ও সম্পদ বন্টনের অসাম্যতা হ্রাস, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টন ইত্যাদি। উক্ত পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করেনি। তৃতীয় পরিকল্পনার অসাফল্যের প্রধান কারণ গুলির মধ্যে অন্যতম হল- ১৯৬২ সালে ভারত চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ ও ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে ভয়াবহ খরা প্রভৃতি। এইসব কারণের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক মানদন্ড দ্রুত অবনমন ঘটে।

১৯৬৬ সালে ভারতের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যুদ্ধ, খরা, মুদ্রাস্ফীতি ও টাকার মূল্য হ্রাস ইত্যাদি কারণে অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। এরফলে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত রেখে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। উক্ত তিনটি বছরের পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃধি পায় এবং ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে 'সবুজ বিপ্লব' ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রভূত উন্নতিতে দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যপক উন্নতি ঘটে।

৪. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়(১৯৬৯-১৯৭৪):

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নতুন কৌশল ও শিল্পের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং টেকনিক' গৃহীত হয়েছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। অসফলতার কারণ হিসেবে ব্যপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়েছিল। এছাড়াও ১৯৭১-১৯৭২ সালে পূর্ব পাকিস্থানের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্থানের ভারত আক্রমণে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরফলে জনসাধারণের দরিদ্রতা ভয়াবহ আকার নিয়েছিল।

৫. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৪-১৯৭৯):

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদিত হলেও, বাস্তবে কার্যকর হয়নি। রাজনৈতিক সংকট এর প্রধান কারণ ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে তিনটি আর্থিক বছরের(১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭) জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর পূর্ব গৃহীত পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। জনতা সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের প্রত্যেক মানুষকে দরিদ্র থেকে মুক্ত করা। জনতা সরকারের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম হল ভূমিবন্টন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও আবশ্যিক দ্রব্যাদির ভর্তুকি দেওয়া প্রভৃতি।

৬. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-১৯৮৫):

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের হার ব্যপক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি হল, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রযুক্তি বিদ্যায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন, দারিদ্র-বেকারত্বের অবসান ও গ্রামীণক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর যে গুরুত্ব আরোপিত তা অভিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছায়নি। ইস্পাত, কয়লা, খাদ্য শস্য ও সিমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়নি বরং আগের তুলনায় অধোমুখী।

৭. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮৫-১৯৯০):

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, স্বয়ম্ভরতা, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পরিকল্পনাগুলি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এরফলে বেকার সমস্যা আরো বেড়ে যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জহরলাল নেহরু আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি আদিবাসীদের উন্নয়নকে সামনে রেখে ‘পঞ্চশীল নীতি’ ঘোষণা করেন। এই পাঁচটি নীতি হল-

১. আদিবাসীদের উন্নতিতে তাদের নিজেদের সৃজনশীল মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, বাইরে থেকে কিছু চাপ চাপানো যাবে না।

২. বন-জঙ্গল ও জমির উপর আদিবাসীদের স্বত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে।

৪. আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে অতিরিক্ত প্রশাসনের চাপ চাপিয়ে ভারাক্রান্ত করা যাবে না।

৫. আদিবাসীদের উন্নতির মাপকাঠি কেবল খাতায় কলমে পরিসংখ্যান বা টাকা পয়সার ব্যয়ের পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যাবে না, গুণগত সকলের চারিত্রিক বিকাশ হবে উন্নয়নের মাপকাঠি।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে ‘পঞ্চশীল নীতি’ ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে থাকল। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসংস্থান, উদ্বৃত্ত জমি-বন্টন তপশিলিভুক্ত উপজাতিদের সাহায্য প্রদান, পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সাবকেন্দ্র গঠনের কাজে আংশিক সাফল্য লাভ করেছে। এক সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন, শিল্পায়নে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি। একদিকে ধনী সম্প্রদায় যেমন

অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনই অন্যদিকে গরীবরা আরো গরীব হয়েছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনযাত্রার মান আদৌ উন্নতি হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে দেশের নিম্নবর্গ মানুষরা নানা জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা হয়েছিল। বেকারত্বের দহনের জ্বালায় তরুণ সমাজ যন্ত্রণাক্লিষ্ট, প্রতিনিয়ত হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। দেশের অর্থনীতি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। দেশের তরুণ সমাজ বা নিম্নবর্গের সুবিধা দান বা উন্নয়নের বিষয়সমূহ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত করার কথা বলা হলেও তা কার্যকর হয়নি। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষাম্য ও চাকুরীর রুদ্ধপথ তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বা নিশ্চিত জীবনের প্রত্যাশাকে অবলীলায় গ্রাস করে। উন্নয়নের পথে তারা কেন বাধাপ্রাপ্ত, কেন তাদের জীবনমান বা প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বিধ্বস্ত তথা অনিশ্চিত অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সব প্রশ্নের সদুত্তর মুখ্যত জটিল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার গভীরে নিহিত ছিল। মহাশ্বেতা দেবী নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তর(১৯৪৩), দুর্ভিক্ষ, মানুষের মৃত্যু-মিছিল, কোলের মধ্যে শিশু মৃত্যু, ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার ভয়াবহ খুন খারাপি ও মানুষের বর্বরোচিত পশু সুলভ আচরণ। এই সাম্রাজ্যেবাদের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, বিদ্রোহী নাবিক, কমিউনিস্ট দল, যুব-ছাত্রসমাজ ও আজাদ বাহিনীর সেনাদল সাবাই মিলে এক গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণবিদ্রোহের প্রতিরূপ আদিবাসীদের বিদ্রোহের গুরুত্বও কম নয়, চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৭০ ও ১৭৮৯), খাসি বিদ্রোহ (১৭৮৩), জাঠ বিদ্রোহ (১৮০৯), ভীল বিদ্রোহ (১৮১৮), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-১৮৩২), ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২), নাগা বিদ্রোহ (১৮৩৯), কোন্দ বিদ্রোহ (১৮৪৬), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৬) ও মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার আদিবাসীদের জন্য নতুন নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এর ফলে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুফল হতে আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়।

ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। ভারতের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি-কৃষকের যথাযোগ্য উন্নয়ন ব্যতীত 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অবান্তর। কার্যত দেশ বা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিসংস্কার প্রাথমিক ও প্রধান শর্ত। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তথাকথিত 'সমাজবাদ' একেবারে নিচের স্তরে পিছিয়ে পড়া মানুষ তথা নিম্নবর্গদের কাছে পৌঁছায়নি। প্রকৃতপক্ষে ভূমিসংস্কার ব্যতীত ভারতের অর্থনীতির বিকাশ ও বিস্তার করা অসম্ভব।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের অবিভক্ত কংগ্রেস জনগণকে নানারকম প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতি সচেতন ছিল। তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম ছিল 'জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন' করা। স্বাধীনতা লাভের পর তারা প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেস আমলে জমদারি- প্রথার 'বিলোপ নীতি' ঘোষিত হলে সে সম্পর্কে তাদেরকে নানারকম সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের দাবি এবং

সেই অর্থের অভাব, মুদ্রাস্ফীতির শঙ্কা প্রভৃতি নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে ১৯৫২ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারি প্রথার বিলোপসাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। সরকারের ভূমি সংস্কার সম্পর্কে প্ল্যানিং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল ১. খাজনা নিয়ন্ত্রণ ২. প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা ৩. মালিকানার অধিকার। ভারতের প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম কাজ হল দেশের উদ্বৃত্ত জমির উপর কৃষকদের মালিকানা প্রদান ও তদের মধ্যে জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি (S.C) ও তপশিলি উপজাতি(S.T) সম্প্রদায়রা অধিক গুরুত্ব পায়। ভূমিসংস্কারের ফলে একদিকে যেমন 'জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন' করা হয় তেমনই অন্যদিকে ভারতের কৃষি-অর্থনীতিতে সংকটও ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৫৩-১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এরফলে খন্ডিত কৃষি জমির পরিমাণ দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সেই খন্ডিত ক্ষুদ্রাতায়ন জমিতে চাষাবাদ যেমন- কষ্টসাধ্য তেমনই কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত ও সঙ্কুচিত। স্বভাবতই সমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সাধারণ কৃষক পরিবার। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিয়েছিল, এরফলে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়। আবার সেখানেও তাদের কাজ মেলে না, তবুও তারা কাজের সন্ধানে পাগলের মতো শহরের উপকণ্ঠে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র তথা সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মপ্রবাহ গুরুত্ব পায়। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলিও নিজ নিজ ভূমিকা পালনে তৎপর ছিল। সমাজের নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলাতে বামফ্রন্ট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলি হল- ১. কৃষকের স্বার্থরক্ষা ২. শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ৪. নিম্নবর্গের মজুরি বৃদ্ধি ৫. গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ৬. গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ ৭. উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ ৮. উন্নয়নের কাজে সাধারণ বা নিম্নবর্গের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- ১. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন (১৯৫৫) ২. পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন (১৯৫৭)। পশ্চিমবাংলার অন্যতম 'তে-ভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬) কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক নতুন দিশা দিয়েছিল। এর পূর্বে জমির মালিক খুশি মতো বর্গাদারকে উচ্ছেদ করত। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী 'পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন' (১৯৫০) পাস হয়। সুতরাং বর্গাদারদের স্বার্থ সুদৃঢ়, স্থায়ীকরণে ও বিবিধ ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ উদ্দেশ্যে আইন পাস হয়। ভূমিসংস্কার ফলে কৃষি ও কৃষকের ব্যাপক উন্নতি হয়। আমাদের দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ আইনের দ্বারা ভূমিসংস্কারের কাজ সহজ সাধ্য নয়। জমির উর্ধ্বসীমা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত রোধ করা সম্ভব কিন্তু একেবারে বিলোপসাধন অসম্ভব। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারের ফলে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিল। সেগুলি হল- ১. জমির ঊর্ধ্বসীমার বহির্ভূত উদ্বৃত্ত

জমি সরকারকে প্রদান করা। ২. প্রদত্ত জমির যথাযথ বন্টন; ৩. অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষির নাম নথিভুক্তকরণ; ৪. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে বাস্তু জমির স্বত্ব দান; ৫. স্বত্বলিপি রচনা ইত্যাদি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পিছনে কৃষি ও শিল্পায়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ষাট ও সত্তর দশকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার শিল্প ও শ্রমশক্তির ভূমিকা যথেষ্ট অগ্রবর্তী ছিল। অপরদিকে বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গার সাফল্যও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সরকার ভাগচাষিদের অধিকার নথিবদ্ধ করায় তাদের জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে কিছুটা নিশ্চয়তার স্পর্শ পায়। ভাগচাষিদের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির ফলে কৃষির সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে সেচ ব্যবস্থা, বন্যার প্রকোপ থেকে মুক্তি, বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আজও তাদের জীবন থেকে অনেক দূরে।

কৃষকের উন্নয়ন স্বার্থে ‘তে-ভাগা আন্দোলন’ এর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই পরবর্তী পর্যায়ে সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে প্রায় সত্তর দশকের শেষের দিকে কৃষকদেরকে জাগরণ হতে দেখা যায়। এটি ‘নকশালবাড়ি আন্দোলন’ ও আন্দোলনকারীরা ‘নকশাল’ নামে খ্যাত। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথমত শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকার আদিবাসী কৃষকরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, পরে দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ও বেরুবাড়ি অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকরা এই আন্দোলনে যোগদান দিয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, বিহার ও ওড়িশার শোষিত বঞ্চিত ভূমিহীন কৃষকদের প্রতিবাদী ভূমিকার প্রভাব এই আন্দোলনের পশ্চাতে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ধনী জোতদার ও চা-বাগান মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করা। নকশালদের তাত্ত্বিক আদর্শের মূল ভিত্তি করে ভারতের জনগণের দুর্দশার মূল কারণরূপে চিহ্নিত করা যায়- ১. মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ ২. সোভিয়েত রাশিয়ার পুঁজিবাদ। এ দুটিই ভারতীয়দের চরম শত্রু। এতদ্ব্যতীত দেশের জনগণের চরম শত্রু রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে- ১. জমিদার শ্রেণি ২. আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি। এই শত্রুদেরকে সমাজ থেকে উচ্ছেদের উপর নির্ভর করে সমাজের ‘সমাজতন্ত্র’(Socialism) প্রতিষ্ঠা তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যথার্থ সাফল্য নির্ভরশীল। দেশের কৃষক শ্রেণি-ই বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার। নকশাল আন্দোলনের প্রভাব দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। নকশাল আন্দোলনের নেতৃবর্গরা ‘চিন-বিপ্লব’ এর কাঠামোকে অনুসরণ করে এবং বিদ্রোহের সুরে ঘোষণা করে ‘চিনের চেয়ারম্যান তাঁদের চেয়ারম্যান’ বিপ্লবের শত্রু শ্রেণি শত্রুকে খতম করাই একমাত্র লক্ষ্য। এরফলে ১৯৭১-১৯৭২ সালে ‘রেডবুক’ এ হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করে। বিপ্লবে নবাগত তরুণদের কাজ হল- জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ ও মণীষীদের মূর্তি ভাঙা। বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের

মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাদের যুক্তি দেশের সম্ভ্রান্ত নায়কদের ঐতিহ্য থেকে নিম্নবর্গের দিকে দৃষ্টি ফেরানো অর্থাৎ 'সিধু-কানহু-বীরসা' প্রভৃতি বিদ্রোহী আদিবাসী নায়কদের তথা তাঁদের সংগ্রামী ও প্রতিবাদী ঐতিহ্য র প্রতি শ্রদ্ধা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন চারু মজুমদার। এরা সমাজে সন্ত্রাসবাদী দল নামে পরিচিত। অবশেষে ১৯৭৭ সালে নকশালপন্থীর কার্যকলাপে জনসাধারণের কাছ থেকে সমর্থন হারায়। অপরদিকে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন হয়ে বামফ্রন্ট প্রথমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুগঠিত ও কার্যকর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তোলে। অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে পঞ্চায়েত কর্তৃক দুর্বল বা দুর্বলতর মানুষের শ্রম মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়াও সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েত থেকে নানা ধরনের ঋণদানের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর' নানান কার্যক্রম গ্রামীণ নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির অন্যতম সহায়ক। সেই অনুসারে ২০০৩-২০০৪ সালের আর্থিক বছরে 'ল্যাম্পস'(লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি) তপশিলী উপজাতিদের নিয়ে প্রথম শুরু করে কিছু সংখ্যক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী প্রকল্প। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। এরফলে আজও আদি জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষ আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল নয়, তাঁরা নিরন্ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত। এইসব অসহায় মানুষ ও অভুক্ত কালো মানুষের কান্নায় যখন কেউ সাড়া দেয় না, সহানুভূতি দেখায় না, তাদের সংকটের কথা শুনেও সংকোটমোচনের জন্য প্রশাসনিক তরফ থেকে কেউ এগিয়ে আসেন না, তখন তারা বঞ্চনা আর অবহেলার অভিঘাতে জর্জরিত হয়। তাই বাধ্য হয়ে এই সহজ-সরলপ্রাণ মানুষরা ক্ষুব্ধ হয়। তাদের রক্তে বেজে ওঠে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আদিম সুর।

প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের রাজনৈতিক জটিলতায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই বিপর্যস্ত। একসময় দেশভাগের ক্ষত, ছিন্নমূল রক্তাক্ত জীবন, বেকারত্ব, জটিল রাজনীতি দেশবাসীর জীবনকে যেমন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, ঠিক তেমনই অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরের কৃষি-ভূমিব্যবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শিল্পের উন্নয়নে সংকট, শ্রমিক-কৃষক, ক্ষেতমজুর শ্রমজীবী মানুষ, পার্বত্য-আরণ্যজাতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনও দুঃসহ, তাদেরকে আর্থিক মুক্তির বিষয়ে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালের শিল্প-সংস্কৃতিতে দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থানরত মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে জীবনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি ও নিম্নবর্গের ছেঁড়া-খোঁড়া জীবনের চরম অবক্ষয়িত নগ্ন রূপেই সৃজনশীল সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালীন সাহিত্যিকদের লেখনিতে সমাজের নিচের তলার মানুষের যে বিপর্যস্ত রূপ ধরা পড়েছে, সেখানে মহাশ্বেতা দেবীর সৃজনশীল চেতনায় তাঁর চালচিত্র অধিকতর গতিময়। যারা সমাজে শোষণে নিপীড়নে জর্জরিত, অবহেলিত

সেই সব আদি জনজাতি মানুষের কঠিন প্রতিবাদী মুখ তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যে পরিসরে বহু ব্যপ্ত রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর সৃজনশীল চেতনা ও নিম্নবর্গের জীবনের রূপকার হিসেবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে বহু বিচিত্র চরিত্র, যারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে উঠে আসে, তারা অন্ধকারেও আলোর পথ দেখায়, সমাজের ধ্বংসের বুকেও আশা জাগায়। মহাশ্বেতা দেবীর অনুপ্রেরণায় শোষিত নিম্নবর্গরা বাঁচার তাগিদে আন্দোলনে মুখর। তাঁর কাছে চরিত্রের আর্থিক মুক্তি অপেক্ষা তাদের সংগ্রামই জীবনের মূল প্রতিপাদ্য। এখন তাঁর গল্পগুলিতে কিভাবে আদিবাসীদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের অর্থনৈতিক সংকট উঠে এসেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

'সাঁঝ সকালের মা' ছোটগল্পের কাহিনিবৃত্তে উঠে এসেছে সমাজে যারা যাযাবর বৃত্তি নিয়ে জীবনের কঠোর সংগ্রামময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাদের অস্তিত্ব সচরাচর আমরা দেখতে পাই না, যাদের সমাজে অস্তিত্ব থেকেও সমাজ ছাড়া, মানববন্ধনে বাঁধা থেকেও বাঁধনহারা সেইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবিকা নির্বাহের এক বিচিত্র রকমের পরিচয় পাওয়া যায়। জটেশ্বরী জাতিতে মেদিনীপুরের 'পাখমারা' যাযাবর সম্প্রদায়ের মেয়ে। একসময় মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি, ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম, তমলুক ও পাঁশকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতের হত দরিদ্র তেলেগু জাতির আবির্ভাব ঘটত। তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ ছিল, ভিক্ষাবৃত্তি, বিচিত্র সাজসজ্জা, রঙিন কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো জামা-পায়জামা, মাথায় লাল ফেট্টি, তাতে পাখির নানা রঙের পালক গোঁজা, গলায় বড় বড় রঙ বেরঙের পুঁতির মালা, হাতে তামার বালা ও এক বড় ছুরি, বালায় সেই ছুরি বাজিয়ে তেলেগু ভাষায় নাচ ও গান বেঁধে যে সামান্য পরিমাণ আয় হত তা দিয়েই তাদের অভাবের সংসার চলত। মহাশ্বেতা দেবী এই সম্প্রদায়কে 'পাখমারা' বলেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী 'পাখমারা' সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনি তুলে ধরেছেন। 'পাখমারা' সম্প্রদায়রা দেশত্যাগী হয়। এই জনজাতির জাতিগত পরিচয়, বসতি, ঘর-গৃহস্থালি, জীবনযাপন, খাদ্য, বিশ্বাস- সংস্কার-প্রথা, পোশাক-সাজসজ্জা, উৎপত্তি বা পুরাণকাহিনি, উৎসব ও বিবাহ ইত্যাদির পরিচয়, লেখিকার অভিজ্ঞতায় ছোটগল্পে বর্ণিত হয়েছে। 'পাখমারা' সম্প্রদায়ের সঙ্গে জটেশ্বরী চরিত্রের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। যেমন- আদিম জাতি মহাভারতে কথিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাণ বিদ্ধকারী জরা ব্যাধের বংশধর, বাংলায় 'পাখমারা' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মহাভারতে শবর, চন্ডাল, ব্যাধ, কিরাত ও নিষাদ প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'শবর' অর্থ চন্ডাল-ব্যাধ-কিরাত-নিষাদ প্রভৃতি জাতি। এদের 'শবরবাসে' জন্ম। 'শবরবাস' শব্দের অর্থ অবৈদিক বা চন্ডালের দেশ। এছাড়াও অভিজ্ঞতায় পাখমারা সম্প্রদায়ের বর্ণগত শ্রেণি সংকটের রূপ পাওয়া যায়। পাখমারা সম্প্রদায়রা

তাদের সমাজের বাইরে বিয়ের রীতি প্রচলন নেই। জরা ব্যাধের বংশধর জটেশ্বরী ব্যাধ সমাজ ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাদের সমাজের সমস্ত রকম প্রথা-রীতি ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে গৃহসুখের আশায় এক ভিন্ন জাতের পুরুষ উৎসব কান্দোরিকে বিয়ে করেছিল। উৎসব জাতিতে বেদিয়া। জটেশ্বরীর সুখের সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ছেলে জন্মের পর উৎসব চোলাই মদ খেয়ে মারা যায়। জটিশ্বরীর জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে, অল্প বয়সে শিশুসন্তান নিয়ে তার বৈধব্য, বাঁচার তাগিদে আপন সমাজে ফিরে যাবার অদম্য প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও বহু অনুসন্ধান করেও সেই যাযাবর সমাজকে খুঁজে পায়নি।

অবশেষে তার ছেলে সাধনকে নিয়ে যাদবপুর রেল লাইনের প্ল্যাটফর্মে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। প্রতি মুহূর্তে জীবনের চলার পথে হোঁচট খেয়েছে, বার বার কঠিন পরিস্থিতি লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সে সমাজ-জাত, ধর্মকে ভাঙতে ভাঙতে সতত বিপর্যয়ের মুখে তাই বাধ্য হয়ে নিজে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য কুলি লাইনের হনুমান সন্ন্যাসীর কাছে পরামর্শ নিয়েছে। সে সন্ন্যাসীর নিকট থাকতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি। সন্ন্যাসীকে ছেড়ে চলে যাবার সময় সন্ন্যাসী প্রদত্ত লাল চেলি ও একটা ছোট ত্রিশূল জটির জীবনকে বদলে দিয়েছিল। জটি সেই লাল চেলি ও ত্রিশূল নিয়ে নিজেকে দেবী ভেবে পথের ধারে আশ্রয় নিয়েছিল। জটির কাছে সারাদিন প্রচুর ভক্তের ভিড় হত। জটি পূজা পেত এবং তাদের রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ হিসেবে মাদুলি দিত, বিনিময়ে একপালি চাল নিত। সাধনের ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত নিজে না খেয়েও ছেলেকে ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিল। জটি দীর্ঘদিন ধরে না খাওয়ার ফলে তার শরীরের নাড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারাও শেষ পর্যন্ত তার রোগ ধরতে পারে নি। জটি অনাহারে মারা গিয়েছে তা মৃত্যুর পর জানা যায়। জটি মৃত্যুর পূর্বে ছেলেকে বলে গিয়েছিল ঘটা করেও যেন তার শ্রাদ্ধ করে।

জটি ব্যাধ থেকে কান্দোরি, কান্দোরি থেকে 'জটি ঠাকুরানি' হয়ে ওঠার প্রবণতা তার একান্তই নিজস্ব ভাবনা, কেউ জিজ্ঞাসা করলে সাধন যেন জটির পরিচয় দেয়- মা জটি কেবল তার 'সাঁঝ সকালের মা' সে আর জটি কান্দোরি নয়, জটি ঠাকুরনি, এ সবই জটির বেঁচে থাকার অদম্য প্রয়াস মাত্র। জটেশ্বরী কান্দোরির জটি ঠাকুরনি ওঠার মূলে রয়েছে, এক শ্রেণি থেকে আর এক উচ্চ শ্রেণিতে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করে সমাজে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। জটি নিঃস্ব সর্বহারা অবস্থা থেকে একটা স্থায়ী স্বচ্ছল অর্থনীতিতে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল কারণ, উৎসব কান্দোরি মারা যাওয়ার পর জটি একাকী ভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এছাড়া তার কাছে কোনো উপায় ছিল না। সামাজিক অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নারীলোলুপ গুন্ডা-মস্তানদের হাত থেকে নিজেকে ও ছেলেকে রক্ষার জন্য 'জটি ঠাকুরনির' রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। সমাজের শ্রম শোষণকারীদের বিধিব্যাবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর একার পক্ষে প্রতিবাদ করার কোনো উপায় ছিল না। এই সহায় সম্বলহীন নারীর

পাশে সমাজের কুল-মান-গোত্র-পরিচয়হীনতায় কেউ তার কাছে ছিল না। তাই জটি ঠাকুরনি নিজস্ব ভাবনায় বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

সাধন কান্দোরির মনিব সাধনকে ভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না। সাধন নির্বোধ, অপরিণত, এইসব অশিক্ষিত ও সহায় সম্বলহীন মানুষকে সামান্য লোভ দেখিয়ে ঠকানো যায়–

> শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।[৫]

সাধন চিরকাল বোকা বা নির্বোধ থাকে না, যখন উচ্চবর্গের শোষণ-লাঞ্ছনা, প্রতারণা বুঝতে শেখে, তখন তাদের তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়, ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আদিকাল থেকে বর্ণশাসিত সমাজে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের দাপটে, তাদের শোষণ অত্যাচার অনুশাসন সমাজকে রক্ষা করে না বরং বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সাধন মায়ের শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকে দান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত কিছুই দিতে পারে নি। শ্রাদ্ধের চাল নিজেই রেঁধে খেয়ে নিয়েছে, তাই পুরুত রেগে গিয়ে বলেছে-

> শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া। এ শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা![৬]

যে সাধন নির্বোধ, বোকা হাবা, সে আর নির্বোধ নয়, যথারীতি পুরোহিতের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ প্রতিফলিত হয়েছে-

> কেন নষ্ট হবে, আমি হাতি দিই নাই? গরু দিই নাই? সোনা-রূপা, বস্তা দিই নাই? কোন শালা আমার মায়ের ছরাদ নষ্ট করে শুনি?[৭]

মহাশ্বেতা দেবীর ‘এম.ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ’ ছোটগল্পে নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক সংকট, তাদের সমাজে বাঁচার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিপরীতে তাদের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই দেখা যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লখিন্দর, বসাই টুডুর মত নয়। লখিন্দর সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মজুরি থেকে বঞ্চিত। লখিন্দর দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ‘Minimum Wage’ লাভ করে ঠিক তার অবচেতন থেকে উঠে আসা এক দিবা স্বপ্নের মতো। আলোচ্য ছোটগল্পে বর্ণিত গৌর নস্করকে আদি জনজাতিরা দেবতা জ্ঞানে বিশ্বাস করে। গৌর নস্কর প্রভূত সম্পদের অধিকারী, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, আত্মরক্ষার্থে তার দুটি বেআইনি বন্দুক সবসময় শোবার ঘরের দেওয়ালে শোভা পায়। লখিন্দরের ধারণা ভারত স্বাধীন হলেও সমাজের নিম্নবর্ণ আদিবাসীরা গৌর নস্করের চোখ রাঙানি ও বন্দুকের নলের সামনে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সমকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলায় জোতদার, জমিদাররা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। জোতদার, জমিদারদের হাতের মুঠোয় আইন, আদালত ও পুলিশকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। গৌর নস্কর চাষের সময় ক্ষেতমজুরদেরকে ন্যায্য মজুরি দিত না। এই পরিস্থিতিতে লখিন্দর, বসাই ও সোমরা টুডু জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির

দাবিতে সামিল হয়েছিল। অবশেষে এই ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে ছিচরণের বাবা প্রাণ হারায়। সোমরা টুডু বসাইয়ের কাছে তার তীব্র ক্ষোভের কথা জানায়-

> খেতমজুরের হকের তরে কমনিস বাবুরা লড়াছে। দেখাছি। সরকার তাদেরে মদত দেয় নাই। পুলুস তাদের ধরা করাছে। মোদের তুমি অ্যানেক গাল দিলা হে। লৌয়ে আগুন বয় বয়সের আগুনে।[৮]

গল্পে গৌর নস্করের মতো জোতদার তথা শোষকের বিরুদ্ধে বসাই মঘাইরা লড়াই করে, আর্থ-সামাজিক পট-পরিবর্তনের এক রক্তঝরা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করে। কালগর্ভে নিয়মের পরিবর্তে অনিয়ম শক্তি বেশি শক্তিশালী, রক্তের সঙ্গে যাদের মাটির সম্পর্ক তারাই আসলে দলিত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর চেতনায় সময়ের বুকে ইতিহাসের পথ ধরে দলিত সংগ্রামী মানুষদের জয় হয়। মহাজন গৌর নস্করের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ে বসাই-লখিন্দর বুক পেতে গুলি খায়। এভাবেই তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আদিবাসীদের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার অভিমুখে এক রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি করে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'জগমোহনের মৃত্যু' ছোটগল্পে বিহারের বুরুডিহা গ্রামের ভূমিবিবরণ, 'ম্যানগ্রাফ' বা মানব বিবরণের মধ্য দিয়ে সমাজের বর্ণগত ও অর্থনৈতিক সংকট স্পষ্ট দেখা যায়। ভূমির সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কিন্তু সমাজের শ্রেণি বৈষম্য, নানা শ্রেণির দ্বন্দ্ব, তাদের হিংসা, শোষণ প্রভৃতি নানা কারণে ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হয়েছে। বুরুডিহা গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। পারশনাথ ও বারানসি দাস দুইজন মিলে বুরুডিহা গ্রামের নিম্নবর্ণজাত মানুষের জমি নানা কৌশলে কেড়ে নিয়েছিল। গ্রামের সমস্ত অসহায় মানুষ এই দুই ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পারশনাথ ও বারানসি দাস দুইজন মিলে বুরুডিহা গ্রামে হনুমান মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসেছিল। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই সৎ ও পূণ্যকর্মের অধিকারী তা বুরুডিহা গ্রামের নিম্নবর্ণরা বিশ্বাস করত। বুরুডিহার ব্রাহ্মণ এই সব ব্রাত্য জাতিগুলিকে ভাগ করে এবং বিভিন্ন রকম নিয়ম জারি করে নিজেদের শোষণের পথকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল। উচ্চবর্গের দ্বারা অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে না কিন্তু স্বজাতের মানুষকে অপরাধের সাজা দিতে ক্ষেত্রপাল দেবতা ও সূর্যদেবের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করে এমনকি পাহাড় থেকে নিচে আছড়ে মারতেও দ্বিধাবোধ করে না। হিন্দু দেবতাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, সংস্কারবশত হনুমান মিশ্রের মন্দির সংলগ্ন কুয়ো থেকে জল নিতে তারা দ্বিধাবোধ করে। আদিজনজাতির প্রতি উচ্চবর্ণের উপেক্ষা বা ঘৃণাই তাদের সংস্কারের দাস করে তোলে। মিশ্রজি ওরাঁও, মুণ্ডা ও হো প্রভৃতি আদিজনজাতিকে ঘৃণা করে, তাদের স্রষ্টা সিংবোঙ্গা দেবতার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে। আদিজনজাতি চিরকালই সমাজে শিক্ষা-দীক্ষাহীন, অজ্ঞ, সমাজের জাতপাত সম্পর্কে উদাসীন ছিল। সমাজে উচ্চবর্গ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মূল লক্ষ্যই ছিল আদিজনজাতিদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা।

গল্পে মূলত বুরুডিহা-পালানি দোসাদ-রবিদাস-গঞ্জু প্রভৃতি নিম্নবর্গ অন্ত্যজ ও আদিজনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। দীর্ঘকাল ধরে জোতদারদের চোখ রাঙানিতে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে নি। ব্রিজভূষণ ছত্রী পঞ্চায়েত শাসনের মাথা, এলাকায় তার প্রবল দাপট, কুয়ো, প্রাইমারি স্কুল সব কিছুই নিজের অধিকারের আয়ত্তে রেখেছে। হনুমান মিশ্রের উপস্থিতিতে গোটা অঞ্চল জুড়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উৎকট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছত্রী ও ভূঁইহাররা মিশ্রজিকে দেবতা সমতুল্য মনে করে। হনুমান মিশ্র ও ব্রিজভূষণ ছত্রী মতো কুচক্রী শোষককে পঞ্চায়েত অফিস, B.D.O ও থানা প্রভৃতি প্রশাসনিক তরফ থেকে মদতপুষ্ট। এরফলে গ্রামের আদিজনজাতিরা সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত। ব্রিজভূষণ তার হীন প্রবৃত্তি ও কুকর্মের কথা হনুমান মিশ্রের কাছে স্বীকার করেছে-

> আমার পঞ্চায়েতি মেঁ এক হি নীতি। সরকার ইস্কুল ভি করেছে। কিন্তু আমি বলে দিই, লিখাই-পড়াই করে তোদের কোনো লাভ নেই। কে মরা জানোয়ারের চামড়া ছুলবে, কে জুতো বানাবে, কে কুলি-কাম করবে, সব ভগবান ঠিক করে তবে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। পড়াঁই করে তোমরা করবে কি? তোমরা পড়তে এলে উঁচু জাতের মাস্টার পড়াবে না, ছাত্রও পড়বে না। দেওতা! এসব জায়গা জংলা জায়গা। শহরের বাতাস এখানে আসে না। রাজার মতো থেকে যান, কিছু চিন্তা করবেন না।[৯]

গল্পে সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য ঝুঝার গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষক বালকৃষ্ণ সিং। হনুমান মিশ্র বা ব্রিজভূষণের বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব, প্রতিটি পাবলিক অ্যাক্টের পিছনে হীন মনোবৃত্তি, নিজের স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতা তাদের পূর্ব পরিকল্পিত কার্যকলাপ বালকৃষ্ণ সিং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ভালাতোড় থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন সদস্য তথা প্রাইমারি ইস্কুলের শিক্ষকের এরকম আচরণ ব্রিজভূষণের আদৌ পছন্দ হয়নি। তাই সে সুযোগ খুঁজে তাকে শায়েস্তা করার জন্য। এক সময় ঝুঝার গ্রাম কলেরার মোড়কে জর্জরিত, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষকে ইঞ্জেকশান দিতে আসা জিপ গাড়ি ব্রিজভূষণের কথা অনুযায়ী সেই গ্রামকে উপেক্ষা করে চলে যায়। বালকৃষ্ণ কারণ, জানতে চাইলে ব্রিজভূষণের বক্তব্যে ফুটে উঠে আদিবাসীদের প্রতি তার প্রচন্ড ঘৃণা-

> যে সূঁচে বর্ণহিন্দুকে ইঞ্জেকশান দেবে, সেই একই সূঁচে অছুত ও আদিবাসীকে? নহী নহী মাস্টারসাব। য়ে হো নহী সকতা। পোড়া স্বাধীনতার পর বর্ণহিন্দু এই অছুত ও আদিবাসীদের চাপে লোপ পেতে বসেছে। থাকার মধ্যে আছে এই রক্তের পবিত্রতাটুকু। দেহে রক্ত থাকতে তা নষ্ট হতে দেবে না ব্রিজভূষণ।[১০]

ব্রিজভূষণ রক্তের পবিত্রতা রক্ষার কথা বলে নিজের সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে, একই সঙ্গে গঞ্জু-দোসাদ-ধোবিদের সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ইঞ্জেকশান দেবার ব্যবস্থা না করে তাদের ধ্বংসের কথাই শ্রেয় বলে মনে করেছে। এভাবেই শিক্ষা-দীক্ষাহীন, সহজ সরল, অজ্ঞ, সংস্কারাছন্ন আদিবাসী সমাজকে প্রতি পদে ঠকায়, তাদেরকে নানারকম প্রতারণার জালে

জড়িয়ে দিয়ে সবসময় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কথায় ভাবে। 'হায়জা' তাড়াতে মিশ্রজির যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের প্রসাদ তারা পাবে না, তবুও তাদেরকে চাঁদা দিতে হয়। বালকৃষ্ণ 'হায়জা' প্রতিরোধ করতে গিয়ে 'ইঞ্জেকশান' আনতে রাঁচি যায়, কিন্তু সে আর ঝুঝার গ্রামে ফিরে আসেনি, এতে সারা গ্রামবাসীর মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। তারা ছত্রীজি-মিশ্রজির হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে প্রায়শ্চিত্ত পূজা পাঠায় মিশ্রজিও ক্ষমাসুন্দর হেসে বলেছে-

> মিশ্রজী ক্ষমাসুন্দর হেসে স্বয়ং চলে আসেন ঝুঝার। সকলকে প্রসাদী পেঁড়া ও পচা পেঁপে দেন। বলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষমা করতেও জানে রে।[১১]

আদিবাসীরা উপলব্ধি করেছিল ব্রাহ্মণত্ব-ই সুপ্রীম ফোর্স, সেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দাপট থেকে তাদের মুক্তি নেই। প্রাইমারি শিক্ষক বালকৃষ্ণ সিং নিম্নবর্ণীয় গঞ্জু-দোসাদ-ধোবি ও আদিবাসীদের অধিকার সচেতন করে তুলতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায়। সমাজে গঞ্জু-দোসাদ-ধোবি ও আদিবাসীরা চরম দারিদ্রর মধ্যে বাঁচে, উচ্চবর্গরা তাদের শ্রম শোষণ করে, মিশ্রজি সোমরা গঞ্জুর জমি কেড়ে নিতে চায়। গঞ্জুরা সমাজের অস্পৃশ্য পতিত জাতি, উচ্চবর্ণ তাদের শত্রু, জমি, ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে সর্বহারায় পরিণত করে।

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে বর্ণশাসিত সমাজের অপধ্বস্ত চেহারা ও ব্রাহ্মণের দাপট নিজের চোখে দেখেছেন। হনুমান মিশ্রের চাচেরা ভাই একমাত্র কুন্দন আদিবাসী নিম্নবর্ণের গঞ্জু রমণী ঝালোদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে, কিন্তু সেইসব জারজ সন্তানদের স্কুলে পড়িয়ে তাদের মাথায় তোলার অধিকার দেয়নি। কুন্দনের ঔরসে গঞ্জু রমণী ঝালোর গর্ভে জারজ সন্তান এতোয়ার'র জন্ম হয়। এতোয়ার গ্রামের স্কুলে পড়ে এবং 'অছুত বৃত্তি' পায়। শিক্ষকদের পরামর্শে ভালাতোড়ের বড় স্কুলে পাঁচ ক্লাসে পড়লেও এতোয়া অছুত বৃত্তি পাবে। কুন্দনরা কখনো নিম্নবর্ণের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশোনায় উৎসাহ দিত না, তাদেরকে 'ভৃত্য' বা 'দাস' এ পরিণত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ঝালো কুন্দন মিশ্রর কাছে এতোয়ারকে ভালোতোড়ে পড়ানোর আবেদন করে, ফল উলটোহয়েছিল, কুন্দন মিশ্র ঝালোকে জাত্যভিমানে আঘাত করে-

> আরে ছোট জাতের ছেলে পড়াই করে করবে কি? এতোয়া বলে আমি ওকে পালানির স্কুলে যেতে দিলাম। এর আগে কোন্ গঞ্জু কোন্ দোসাদ কোন্ ধোবির ছেলেকে স্কুলে যেতে দিয়েছ?[১২]

স্কুলের শিক্ষক মহাশয় এতোয়ারকে উঁচু ক্লাসে পড়তে উৎসাহ দিয়েছিল, এতে কুন্দনের শিক্ষকের প্রতি রাগ হয়, সেই শিক্ষককে তাড়াবার নানারকম চক্রান্ত শুরু করে। কুন্দনের ছেলে গোপাল ও গোবিন পাশ করতে পারেনি, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে গ্রামের স্কুলে পড়ে থাকবে আর অবৈধ জারজ সন্তান এতোয়ার শহরের বড় স্কুল ভালাতোড়ে পড়বে এটা সে মেনে নিতে পারেনি। অবশেষে প্রান্তরের পিপাসিত মনোলিথ পাথরের নিচে এতোয়ার রক্তাক্ত দেহ পাওয়া

যায়, তার অপরাধ গঞ্জুর গর্ভজাত নিম্নবর্ণীয় সন্তান হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করতেই তার লেখার আঙ্গুল(তর্জনী ও বুড়ো আঙুল) কেটে দেওয়া হয় এবং রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। এভাবেই লেখিকা উচ্চবর্ণের হীন, অনৈতিক কাজকর্মগুলো তুলে ধরেছেন। আসলে এতোয়ার মরে যাওয়ার পর, তাদের সমাজের অন্তস্তলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বীজ বপন করে দিয়েছিল। সেই প্রতিবাদের বীজ ঝালোর মধ্যে অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। ঝালোর মাতৃহৃদয় পাষাণ, শ্মশান থেকে গঞ্জু টোলি, সেখান থেকে আবার শ্মশান, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু, গঞ্জু টোলির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক থমথমে পরিবেশ এর মধ্যে ঝালোর প্রতিবাদ বিস্ফোরিত হল –

> ঝালো তার শুকনো লালা চোখ, ভীষণ মুখ নিয়ে কুন্দনের বাড়ির কাছারি ঘরে ঢোকে ও এক মুঠো ছাই কুন্দনের মুখে ছুঁড়ে মারে। বলে, তোর বেটার ছাই। ছেলেকে মেরে ল্যাংটো হয়ে দাইয়ের কাছে স্নান করে গদিতে বসেছিস? মাথা কামাবি না? অশৌচ করবি না? না করলি, তোকে নির্বংশ করব, তুই নির্বংশ হবি।[১৩]

আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক যেমন বর্ণশাসিত সমাজের ক্ষত, শ্রেণি বৈষম্যর সংকট বর্ণনা করেছেন ঠিক তেমনই অপরদিকে তাঁর কলমের আচঁড়ে অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্যর চিত্র পাওয়া যায়।

'ঘন্টা বাজে' ছোটগল্পে আদিজনজাতির ওপর ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যায়। আদিবাসীদের টাকার বিনিময়ে কৃষি অর্থনীতির রুপান্তর যা কোম্পানি সরকারের শোষণের পথ প্রশস্ত করার এক কাহিনি। আদিবাসী সমাজের মূল শত্রু হল বাবু সম্প্রদায়। আদিবাসীদের উপর অর্থনৈতিক শোষণের জন্য সরকারি প্রশাসন বাবু সম্প্রদায়দেরকে সাহায্য করে। গল্পে উল্লিখিত মাঝিপাড়া, সিংপাড়া ও ডোমপাড়ার দরিদ্র মানুষরা মহাজন মিশ্রিলালের শোষণের ফাঁদে পা দিয়েছিল। মিশ্রিলাল দরিদ্র মানুষদেরকে কর্জ ধান ও চড়া সুদে ঋণের টাকা দেয়। এক টাকায় সাত টাকা সুদ। নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে না পারলে ধান, চাল ও জমি সব কেড়ে নিত। বিরহা গ্রামের বাসিন্দা বলরাম কিস্কু ও গিরি মাঝির ঋণের বোঝা কোন দিনই হালকা হয় না। নিজেদের অধিকার আদায় করতে অক্ষম। তাই কাছারির দারোগা, নায়েব, মহাজন, ভূঞা রাজা, ও আড়তদার প্রভৃতি শোষকদের চক্রান্তে বার বার প্রতারিত হয়েছে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় সরোজ ভূঞা তেরঙা ঝান্ডা তুলে ঘোষণা করে 'ইংরেজরাজ' খতম, এতে আদিবাসীরা সবাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বলরাম কিস্কুর নাতি লবারাম কিস্কু সরোজ ভূঞার কথায় উজ্জীবিত নয়। বলরাম এক ইংরেজ ফৌজকে হত্যা করে নদীর চরে পুঁতে দিয়েছিল। অপরদিকে রামরাম ও গিরি মাঝি ভূঞা রাজার মাথা কেটে উৎসব পালন করে। অবশেষে ধরা পড়ে দুজনের ফাঁসি হয়েছিল। এই দুই বিদ্রোহী বীরের কারণে ১৮৫৬ সালে বিরহা গ্রামটি শ্মশানে পরিণত হয় এবং সাঁওতাল, সিং ও ডোমরা জমি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা ও

অন্ত্যজ ডোমেদের নিয়ে গড়ে ওঠা বিরহা গ্রামে সিদো-কানহুর 'হুল' প্রশাসনিকের হস্তক্ষেপে উঠিয়ে দেওয়া হয়, এতে আদিবাসীরা আরো সর্বস্বান্ত হয়। কোন রকমে তারা দেড় টাকার মজুরিতে জঙ্গল কাটাইয়ের কাজে নিযুক্ত থাকল। সত্তর দশকে শুরু হয়ে যায় ভূমি আন্দোলন, কিন্তু সেই আন্দোলন বিরহা গ্রামে পৌঁছায়নি। ভূমিসংস্কার অফিস থেকে বহুকষ্টে সনাতন, ভরত, নিতাই ও দুলালচাঁদ সামান্য কিছু জমি পেয়েছিল।

জোতদার নব ভূঞা বিরহার আদিবাসী মজুরদেরকে ১২ আনা মজুরি দেয় কিন্তু বহুলা ও পিপল এলাকায় মজুরি পাঁচ সিকা। নব ভূঞা সরজমিনে বহুলা ও পিপল এ গিয়ে জানতে পারে নকশালদের কথা তারা 'নরপিশাচ' গ্রামীণ প্রান্তিক চাষি, খেতমজুরদের মধ্যে খুঁটি গেড়ে বসেছে। জমি মালিককের মুণ্ডপাতই তাদের নিশানা। আদিবাসী তিন সন্তান সুবল, তপা ও সদনরা সকলকে জানায়, সরকারি আইনে ক্ষেতমজুরি রোজ তিন টাকা দশ পয়সা। বহুলা, পিপল ও গোলগ্রামের মানুষ এই ন্যায্য মজুরি আদায় করেছে। এবার বিরহাতেও এ দাবি আদায়ের পালা। এভাবেই জোতদার ও মহাজনরা বিরহা গ্রামের আদিবাসীদেরকে চড়া সুদে ঋণ ও সরকারি ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

'ফারকাটি' ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদেরকে জোতদার ও মহাজনের কর্তৃক শোষণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাজনরা গ্রামের দরিদ্র সাঁওতালদেরকে চাল ও টাকা ঋণ দিত। তাদের ঋণ নেওয়ার পরের পরিস্থিতি খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। মহাজন ভাদ্র মাসে ধান কর্জ দিত আর অঘ্রাণ-পৌষ মাসে নিতে আসত। দরিদ্র সাঁওতালদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল মহাজনের গোরুর গাড়িতে তুলে দিতে হত। এই ঋণ থেকে তারা কোনোদিনই মুক্তি পেত না।

নলপুরের ভূমিমালিক উদয়বাবুর কাছে রাম মাঝি পাঁচ টাকা ধার নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তার জমি ও বলদ সব কেড়ে নিয়েছিল। তবুও রাম মাঝির ঋণ পরিশোধ হয়নি, বিনিময়ে তাকে সারা বছর উদয়বাবুর বাড়িতে বেগার খাটতে হয়েছিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে রাম মাঝি বলে, রইল তোমার বেগার। উদয়বাবু দাবি করে এখনও তার এক টাকা ঋণ বাকি আছে। সেই এক টাকা ঋণ তার ছেলেকে শোধ করতে হবে। সে সময় ভগনাডিহির সিধু-কানু 'হুলমাহা' বা মহাবিদ্রোহের ডাকে উদয়বাবু হাঙ্গামা বাধাতে সাহস পায় নি। বৃক্ষ মাঝি কথায় রাম মাঝি সিধু-কানুর 'হুলমাহা'র কথা না জেনে প্রথমে উদয়বাবুর বিরুদ্ধে 'হুল' বা বিদ্রোহ শুরু করেছিল। গল্পের শুরুতে 'হুলমাহা'র কর্মকান্ডের প্রস্তুতি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। 'হুলমাহা' শুরু, কেবল পাতুনির সাঁওতাল সমাজ নয়, সমাজের নিম্নবর্ণীয় সকল স্তরের মানুষ কামার, কুমোর, হাড়ি, বাগদি, সবাই যোগ দিয়েছিল। চারিদিকে 'হুলমাহা', বিদ্রোহীদের আক্রমণ, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। তাই ভীত সন্ত্রস্ত উদয়বাবু ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিশ্বাসঘাতক মহাজন উদয়বাবু আবার পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে

ছুঁড়তে নলপুরে আবির্ভাব হয়েছিল। অন্যদিকে বৃক্ষ মাঝির দলবল রয়েছে। বৃক্ষ মাঝি ক্রোধে মত্ত, বাবার এক টাকা ঋণ সে 'ফারকাটি'(পরিশোধ) করবে।

> এক কোপে বাবুর দুই পা কাটে বৃক্ষ, বলে এই লে! চার আনা শোধ হল। সন্তাল বেগার খাটে এক কুড়ি বছর, ঋণ আর শুধে না। কোমরে কোপ দেয়, বলে, এই লেঃ, আট আনা শুধলাম।...কাটলাম দুই হাত, বারো আনা শুধলাম। এবারে মাথা কাটলাম, এবারে বাবু। উদয়বাবু। ফা-র-কা-টি! তামাম শোধ![১৪]

বিদ্রোহীদের বিশ্বাস সমাজের শীর্ষে শোষক-উৎপীড়কের প্রতিভূ জোতদার উদয়বাবু ও তার ভাই মতিনবাবুর জুলুমবাজিতে সাঁওতাল সমাজ আজ কাঙাল হয়েছে। এভাবেই আদিবাসীসমাজ মহাজনদের কবলে পড়ে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সিধু-কানুর 'হুলমাহা'র ফলে সমস্ত জুলুমের অবসান ঘটবে, শোষিত আদিম জনজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় মানুষের বিশ্বাস – 'সকল জুলুমের ফারকাটি হবে'।

'প্রেতোৎসব' ছোটগল্পটি বাস্তবে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ঝাড়গ্রাম রাজকলেজের কুঁয়ো থেকে একটি মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গল্পের পটভূমি রচিত হয়েছ। উজির রাজাবাবু রাজাপুর গ্রামের জমিদার শ্রেণির প্রতিভূ। অশোক কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। অশোকের দৃষ্টিতে রাজাবাবু শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। অশোক আদিবাসীদের একান্ত আপনজন, প্রতিনিয়ত তাদের উন্নতির কথা ভাবে। অশোকের চেষ্টায় ভূমিহীন আদিবাসী সাঁওতাল রমণী মণি সরকারের পক্ষ থেকে খাস জমি পেয়েছে। প্রহ্লাদও খাস জমি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে জমির মালিক রাজাবাবু। প্রহ্লাদ নিজের জমিতে চাষ করে রাজাবাবু খামারে ফসল তুলে দিত। প্রহ্লাদ রাজাবাবুর মাহিন্দার তাই তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারত না। অশোক এই সব শোষিত বঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা শেখায়। লোধা, বিরহড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় রাজাবাবুদের দল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যপক দাপট দেখাত। দরিদ্র আদিবাসীদের স্বার্থ যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে জোতদার মালিক শ্রেণির স্বার্থ ষোলো আনায় পূর্ণ। এ কারণে জোতদার মালিক শ্রেণির সঙ্গে শোষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজাবাবুর মাহিন্দার প্রহ্লাদ চরণবাবুর বউকে 'ডাইন' বলার অপরাধে মাতঙ্গ তার গালে একটা চড় মেরেছিল। অশিক্ষিত আদিজনজাতির মানুষ চরণবাবুর বউ 'ডাইন' সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সমাজে ডাইনের বিষয় নিয়ে চলে রাজনৈতিক খেলা, যারা শিক্ষিত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'ডাইন' র অস্তিত্বকে স্বীকার করে।

রাজপুর গ্রামের বাসিন্দা গোকুল, ফণী, মতিরাম, ক্যাতা, ও বেলুনচাঁদ প্রায় ১৭ জন ভূমিহীন আদিবাসী প্রজা রাজপুরের রাজাবাবুর কাছে ভূমি প্রার্থনা করে। রাজাবাবু প্রথমে অজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষগুলিকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করে। পরে তাদেরকে 'ডাইন' অপবাদ দিয়ে গ্রাম

থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিল। অনেকে রাজাবাবুর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। রাজাবাবু আদিবাসীদের চরম দারিদ্রর সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। তিনি গ্রামের সকলকে ডেকে খোদনের উপর 'ডাইন' চিহ্নিত করার ভার দেন। খোদন সোমরাই এর মা, বৃদ্ধাকে 'ডাইন' চিহ্নিত করে। সোমারাই প্রতিবাদে সরব হয়েছিল। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ রাজাবাবুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। রাজাবাবুর বশ্যতাকে তারা মেনে নিয়েছিল। অপরদিকে ভরতের প্রতিবাদকে শ্রদ্ধাও জানিয়েছে-

> আজ আমাদের মধ্যে বাবা তিলকা মাঝি নাই, সিদো-কান্হু নাই, বুকে সাহস দেয় কে? আমাদের পাশে কে আছে?[১৫]

সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে সংহতি বা জোটবদ্ধতার অভাব দেখা দিয়েছে, তাদের নেতৃত্ব দানের কোনো বলিষ্ঠ নায়ক বা প্রতিবাদী নেতা নেই, আন্দোলন নেই, শ্রেণি সংগ্রামের চিহ্নমাত্র নেই- সে কারণে রাজাবাবু গোকুল, বেলুনচাঁদ, উদ্ধবকে ৩০০ টাকা জরিমানা করলে তারা সে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে। গল্পে রজনী, মণি, সোমরাই, লখিন্দর ও গোপালীরা জানে তাদেরকে চিরকাল রাজাবাবুর গ্রামে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষিত সমাজে তাদের ঠাঁই নেই। বাস্তবিকই সমাজের বুকে রজনীর মতো প্রতারিত ও নির্যাতিত সাঁওতাল স্ত্রী লোকের ঠাঁই নেই। রাজাবাবুর চক্রান্তে আদিবাসী সাঁওতাল যুবক বলাই মুর্মু রজনী অপহরণ কান্ডে জড়িয়ে পড়ে। বলাই মুর্মু ভালো মানুষের মুখোশ পরে একজন প্রবঞ্চক চরিত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। সাঁওতাল যুবক বলাই মুর্মুর কথায় বিশ্বাস করে রজনী স্বামীসঙ্গ লাভের আশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে দিগম্বর রজনীকে ডাইনির মেয়ে বলে পরিত্যাগ করেছে। থানায় রজনীর নামে নিখোঁজ ডায়রি করা হয়েছিল। অবশেষে তাকে ঝাড়গ্রামের এক পাতকুঁয়ার মধ্যে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায়। রজনীর এ রকম মর্মান্তিক পরিণতির জন্য রাজাবাবু ও বলাই মুর্মু উভয়েই দায়ী ছিল। রাজাবাবু বা বলাই মুর্মুর মতো প্রতারক-প্রবঞ্চক চরিত্র তাদের কু-কর্মের জন্য শাস্তি পায় না। এভাবেই আদিবাসীসমাজ অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে প্রশাসনের কাছ থেকে সুবিচার পায় না।

মহাশ্বেতা দেবীর 'কুড়োনির বেটা' ছোটগল্পে আদিজনজাতি লোধা সম্প্রদায়ের চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও শোষণ- নির্যাতনের এক চিত্র পাওয়া যায়। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র লোচন দিগার। লোধা সমাজে লোচন দিগার সৎ, জ্ঞানীজন ও বনচণ্ডী দেবী মাহাত্ম্যর কথাকার ছিলেন। সে অর্থনৈতিক অনটনের কারণে, মহাপাত্র বাবুদের বাড়িতে দিন মজুরের কাজ করে। লোচন দিগার ও তার স্ত্রী কুড়োনি দুজনেরই ইচ্ছা ছিল তাদের ছেলে জুড়ন একদিন বাবুদের ছেলেদের মতো বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে পড়তে যাবে। লোধাদের উপর 'অপরাধপ্রবণ' জাতির কলঙ্ক আরোপিত হলেও লোচন দিগার আদৌ চুরি ডাকাতি করে না। লোচন চাঁদবিলায় পিসির বাড়ি গিয়ে প্রবল শীতে আগুন জ্বালাতে বাবুদের পালা থেকে চারটি

খড় নিয়েছিল। সেটাই তার চৌর্যবৃত্তির নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। চোর চোর রব তুলে তাকে পিটিয়ে মারা হয়। অসহায় কুড়োনি ছেলে জুড়নকে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসে। মহাপাত্রবাবু বাড়ির মুনিষ সনাতন কিস্কু। মহাপাত্রবাবুরা ষড়যন্ত্র করে সনাতনকে মৃত লোচনের বাড়ির বর্গাদার বানায়। কুড়োনি সনাতনকে প্রশ্ন করে-

> তুমি আড়াইশো টাকায় আমার ঘর কবে কিনলে? মাঝি?[১৬]

সনাতন কিস্কু একজন সৎ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। অসহায় কুড়োনির প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে-

> জুড়নের মা! খাতায় তো আমি বর্গাদারও বটে, তবে বর্গা-ভাগ পাই না। ওই কথাটা বাবুর ছল! স্বনামে কিনতে পারে না। তাই খাতায় দেখায় আদিবাসী সনাতন আদিবাসী লোচনের জমি নিল। তবে এটা বুঝি ওর ছল! ও তোমার ছেলেকে নেবে, আর তোমাকে কব্জা করবে। হাঁ, তাই হবে। আর কিছু নয়।[১৭]

অপরদিকে কুড়োনির রূপে মুগ্ধ মহাপাত্রবাবু সুযোগ বুঝে তাকে নিজের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ দিয়েছিল। কুড়োনি বুকের কষ্টকে চেপে রেখে সংসারের অভাবের তাড়নায় জুড়নকে দুমুঠো ভাতের লোভে বাবুদের বাড়িতে গরু চরানোর কাজে পাঠায়। কুড়োনি তার ছেলে জুড়নকে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। চরণবাবু খিয়াসল গ্রামের মাস্টার, তার কথায়, এস.টি এলাকার স্কুলে, এস.টি ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে। জুড়ন চরণের স্কুলে পড়াশোনা করলে বাবুর বাড়ির কাজ করবে কে? বাবুর গিন্নি তা মেনে নিতে পারেনি, বাবু ও তার গিন্নি কুড়োনির উপর রেগে যায়, বাবু জুড়োনকে গালি দিতে শুরু করে-

> গভীর অস্বস্তিতে বাবু জুড়নকে দাঁত খেঁচায়, শালা গরিব দেখে দয়া করলাম, তাতে আমাকেই কলা দেখাবে? .....চিরকাল কাটল আমাদের এঁটো খেয়ে, নয় আমাদেরটা চুরি করে, আজ আর লেখাপড়া না শিখলে হচ্ছে না। শালা তোদের মত লধা এ-জেলায় বছরে বিশটা কাটা পড়ে। তাতে শিক্ষা হয় না।[১৮]

লোধাদের রক্তের ধারায় চৌর্যবৃত্তির ধারণায়, বাবুরা বিনা অপরাধেও লোধা আদিবাসীদেরকে চোর অপবাদ দিয়ে তাদের নিধন করে। জুড়নের বাবা শীতে আগুন পোহাতে সামান্য খড়ের আঁটি নিয়েছিল, তাতেই সে চোর, বাবু তাকে খুন করে। মহাপাত্র বাবু জুড়নকেও কাঁসার থালার চুরির অপবাদ দিয়ে মেরে আধমরা করে দিয়েছিল। কুড়োনি ছেলের কাছে ছুটে যায়, চরণও নিজের দলবল নিয়ে ছুটে যায় শেষ পর্যন্ত বাবুরা গাড়ি করে জুড়নকে বাঁচানোর জন্য শহরের হাসপাতালে নিয়ে যায়। যাবার আগে কুড়োনি বুঝিয়ে দেয় যে মুখ বুজে মার খাবার দিন শেষ হয়ে আসছে। জুড়নকে কোলে নিয়ে কুড়োনি বসে থাকে, কিনে আনা নতুন হ্যারিক্যানটি জুড়নের পাশে রাখে, জুড়ন পড়বে। জুড়ন বাবার মতো মরবে না, ওর মায়ের স্বপ্নকে পূরণ করবে। এভাবেই অসহায় কুড়োনিকে স্বামীহারা, উচ্চবর্গের শোষণ ও নির্যাতনের কবলে পড়ে, অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘শালগিরার ডাকে’ ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনের দুটি পর্যায় পাওয়া যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামপ্রধান সুন্দ্রা মাঝির দ্বারা সমাজ পরিচালিত হত। সুন্দ্রা মাঝির মৃত্যুর পর তার ছেলে তিলকা মাঝিকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এভাবেই তাদের সমাজে প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয় আর অন্যদিকে একই সাথে নতুনদের নেতৃত্বে নতুন কালের সূচনা হয়। তিলকা মাঝি আদিবাসী সমাজের স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী, সে কারো চোখ রাঙানিতে ভয় করে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশি শোষকের ছল-চাতুরি, শোষণ ও প্রতারণা তার চোখে ধরা পড়ে। পাহাড়িয়া জাতি কোম্পানি সরকারের সিপাইয়ের চাকরি নিয়ে যে কাজ করে তা তিলকার চোখে ন্যায়সঙ্গত নয় বরং সমগ্র আদিবাসী সমাজের পক্ষে মর্যাদা হানিকর, অদূর ভবিষ্যতে পাহাড়িয়া জাতির সমাজ ধ্বংসের সংকেতবাহী। তিলকা মাঝি আদিবাসীদের নিয়ে কোম্পানি সরকারের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাই তিলকা মাঝি বাধ্য হয়ে কয়েকশো আদিবাসী লড়াকু যুবকদের নিয়ে তিলকপুরের জঙ্গলে কোম্পানি ফৌজের বিরুদ্ধে সে ‘হুল’(বিদ্রোহ) ঘোষণা করে। কয়েকদিন ধরে কোম্পানির প্রশিক্ষিত সৈন্যর আগ্নেয়াস্ত্রর সঙ্গে আদিবসীদের তীর, ধনুক, লাঠি, টাঙ্গির লড়াই চলেছিল। অবশেষে কোম্পানির উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রর কাছে আদিবসীরা হেরে যায়। কোম্পানির ফৌজ তিলকাকে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে ক্ষত-বিক্ষত করে এবং শেষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তিলকার মনে বিদ্রোহের যে বীজ অঙ্কুরিত ছিল তা কোনোদিনই মরে যায় নি। এভাবেই কোম্পানি আদিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন আর সংগ্রামী চরিত্রগুলিকে এক কাঙ্খিত লক্ষ্য পৌঁছে দিয়েছেন যা আর্থ-সামাজিক পট-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

‘তারপর’ ছোটগল্পে কুরুরাজ দিগার(লোধাশবর) শ্রীচরণ শৎপথী এর ‘বান্ধা মুনিষ’। **১৮৭১** এ ব্রিটিশ সরকার আরোপিত লোধাদের ‘অপরাধপ্রবণ জাতি’র কলঙ্ক মুছে যায় নি। তাই কারণে-অকারণে মালিক তাদের মাথায় চৌর্য বৃত্তির দায় চাপিয়ে কঠোর শাস্তি দিত। কুরুরাজের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম হয়নি। শ্রীচরণ শৎপথী কুরুরাজকে চোরের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চরম শাস্তি দিয়েছিল। মালিকের হাঁস, মুরগি হারিয়ে গেলে কিংবা অন্য কিছু জিনিস চুরি হলে, সব কিছুতেই কুরুরাজের দোষ হত। এরকমই একদিন কুরুরাজকে দোষী সাব্যস্ত করার পর মালিক বেদম প্রহার করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কুরুরাজ দিগারের ছেলে সনাতন দিগার, গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনা সামান্য হলেও লোধা সমাজের বুকে সনাতনের পড়াশুনার কৃতিত্ব দৃষ্টান্তযোগ্য ছিল। মনিবের অত্যাচারে তার বাবার অকাল মৃত্যুকে সে চোখের সামনে দেখেছে। এরপর থেকে সনাতনকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। কুরুরাজের মনিব সনাতনের স্কুল পাঠকে কখনই ভালো চোখে দেখে নি। সনাতনের স্কুলে পড়াশোনা দেখে কুরুরাজের মনিব প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়। কুরুরাজকে বলে-

আমার অন্নদাস হয়ে তোর জীবন কাটল, তা ছেলের জীবন কাটত না নাকি? তো' বেটার খুব বাড় বেড়েছে।[১৯]

কুরুরাজের বিশ্বাস ছিল স্কুলমাস্টার দীননাথ মান্ডি একজন আদি জনজাতির মানুষ, পূর্বের ন্যায় এ মাস্টার তার সনাতনকে নিশ্চয় শ্রমদাসে পরিণত করবে না। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি, কুরুরাজ শ্রীচরণ শৎপথীকে চিনতে পারে নি, লোধা, ভূমিজ ও সাঁওতাল জনজাতি গোষ্ঠীর ছেলে বাগালের জন্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু তার লক্ষ্য আলাদা সে বাঁধা মুনিষ কুরুরাজের ছেলে সনাতনকে চিরকাল বাগাল করে রাখতে চায়। মালিকের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি, কারণ তুলসীবাবু মাসিক ২৪০ টাকা দিয়ে সনাতনকে 'জঙ্গলরক্ষীর' কাজে নিযুক্ত করে। শেষ পর্যন্ত সনাতনের এ কাজ টিকে থাকে নি। লোধাদেরকে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। বনের কাঠ ও কেঁদপাতা সংগ্রহ করে তাদের অভাবের সংসার চলে। তুলসীবাবু তার বাবার মতো নয়, সে লোধাদেরকে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে চায়। তুলসীবাবু 'ল্যাম্পস'র মাধ্যমে(লার্জ সাইজ মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি) লোধাদের কাছ থেকে কেঁদপাতা কেনার ব্যবস্থা করে। তুলসীবাবু-ই সনাতনকে জঙ্গলরক্ষীর কাজে লাগায় এবং সনাতনও খুব দ্রুত বনের সঙ্গে একাত্মা লাভ করে। সনাতন তার বাবার মুখে শুনেছে, অরণ্য তাদের ক্ষুধা মেটায়, কাঠ ও পাতা দেয়। তাই লোধাদের মধ্যে কেউ বন ধ্বংস করে না, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ ধ্বংস করে তারা হল ঠিকাদার। খড়গপুরের বিড়ি পাতার ব্যবসায়ী দালাল সনাতনকে সাবধান করেছিল। 'ল্যাম্পস' যেখানে এক বাণ্ডিল বিড়ি পাতার দাম দেয় 'দেড় টাকা' সেখানে দালাল মনোহর দাসের দর সাত টাকা। মনোহর একজন লোভী, অসৎ ব্যবসায়ী চোরা কারবারেও তার সিদ্ধ হস্ত ছিল। বনভূমির অদূর থেকে রাস্তায় লরিতে 'কেঁদ বা বিড়ি পাতা' বস্তা বোঝাই দেখে সনাতন চিন্তিত। মনোহর দাসের অন্যায় চৌর্যবৃত্তি দেখে সনাতন রাতের অন্ধকারে বাধ্য হয়ে লণ্ঠন ফেলে তার কাছে ছুটে গিয়েছিল। মনোহর দাস সনাতনকে বলেছিল –

আয় শালা লোধা!-মাথায় লাঠির বাড়ি পড়ে। শালা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়েছে।[২০]

জঙ্গলরক্ষী সনাতন মনোহর দাসকে বাধা দেওয়ার অপরাধে তার মাথায় ভয়ঙ্কর লাঠির আঘাত পড়ে। পরের দিন সনাতন কর্মরত অবস্থায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিল। সনাতনের পরিবর্তে নতুন এক গার্ডকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়। সে সনাতন দিগারের পথ অনুসরণ করেনি। কিন্তু বনের মধ্যে দুর্নীতি কমেনি, প্রকাশ্য দিনের বেলায় গাছ কাটা পড়ে, অরণ্য সম্পদ ধ্বংস হয়। গার্ডের উপস্থিতে সংরক্ষিত বন কাটতে অসুবিধা না থাকলেও অষ্টমীর দিন বন রক্ষীহীন সন্ধ্যায় সনাতন বন থেকে গোসাপ শিকার করলে তুলসীবাবুর অভিযোগের ভিক্তিতে থানায় তার ডাক পড়ে। সনাতন দিগার বনে বেআইনিভাবে প্রবেশের অপরাধে তাকে প্রথমে থানার দারোগা প্রচুর মারে এবং পরে অন্যত্রে চালান করে। সনাতন দিগার বাবার মৃত্যুতে অম্বরীশ বাবুর কাছে সাতাশ টাকা ধার নিয়েছিল। গার্ডের চাকরিতে গিয়েও সেই টাকা

নগদ অর্থে শোধ করতে পারেনি। নগদ অর্থে ঋণ টাকার শোধ করার সামর্থ্য না থাকায় সারা বছর বাবুদের বাড়িতে ভাতুয়া হিসাবে কাজ করে। এভাবেই মহাজন ও জমিদার শ্রেণির লোকেরা সমাজের নিম্নবর্ণের আদিবাসীদেরকে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ফেলে তাদের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালাত।

'হুলমাহার মা' ছোটগল্পে আদি জনজাতি সাঁওতালদের 'বেগার প্রথার' সংকটজনক পরিস্থিতির এক বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার জন্য দিকু সমাজের শোষণ-পীড়ন নীতিকে দায়ী করা হয়েছে। আলোচ্য ছোটগল্পে মহনির বাবা ছটরায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে দিকু বা দেকো মনিব তিরপুর সাহার বাড়ির 'বান্ধা বেগার' অর্থাৎ বিনা বেতনে মনিবের বাড়িতে আজীবন তাকে খাটতে হবে। এক সময় সে কাজ করতে গিয়ে মনিবের ধানবোঝাই গাড়ির 'জোয়াল' নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। অমানুষিক কষ্টের ফলে ছটরায়ের মুখে রক্ত ওঠে এবং শেষে মারা যায়। মনিবের এরকম অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোটা সাঁওতাল সমাজ সংগ্রামের পথকে বেছে নিয়েছিল। এখন তারা দিকু ও তাদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তিরপুর সাহা প্রথমে মনিব ছিল তারপর শোষক জমিদারের চেহারা নেয়, আবার কখনো আদিবাসী সাঁওতালদের দারিদ্রর সুযোগ নিয়ে বেগার খাটিয়েছে। সাঁওতাল সমাজ জমির পত্তনিদার ছাড়া আড়তদারদের শোষণ ও প্রতারণায় বিধ্বস্ত। তিরপুর সাহা ছটরায়ের মৃত্যুর পর বারহেটে গিয়ে ফাঁদ পাতে, সেখানে তিনি পত্তনিদার থেকে আড়তদার হন। ভোমর তার কাছে ভূষা কালির টিপসই দিয়ে কিছু টাকা কর্জ নিয়েছিল। সেই টাকা সময় মতো শোধ করতে না পেরে ঋণের বোঝা পাহাড় জমতে থাকে। তিরপুর সাহা তার শোষণের কায়দা পাল্টালেও শোষকের ভূমিকা থেকে এতটুকু সরে যায়নি। তার ছেলে মহনও বাবার মতো সাঁওতাল সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তারে সচেষ্ট হন। মহনির ছেলে ছটরায় (মাতামহের নাম অনুসারে মহনি তার ছেলের নাম রাখে) কিনা মহনের 'বান্ধাবেগারির' কাগজে টিপছাপ দিয়ে এসেছে। তাতে মহনি দুঃখে দিশাহারা হয়েছিল। সিধু, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব ভায়েরা মহনির দুঃখে সান্ত্বনা দিয়েছিল। তারা দিকুদের আধিপত্য, শোষণ, নির্যাতন মানতে নারাজ। তাদের সমাজে প্রচলিত 'বান্ধাবেগার' জমিদার, মহাজনেরা আদিবাসী মানুষের জমি হরণ, ঋণের দায়ে ভিটে মাটি আত্মসাৎ এগুলি বঞ্চনা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। ছটরায়ের 'বান্ধবেগার' হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। এভাবেই আদিবাসী সমাজ জমিদার ও মহাজনদের ছল চাতুরতায় পা দিয়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে।

'সমাজবাদ ববুয়া' ছোটগল্পে সাঁওতাল সমাজের জংলি বেসরা ছাতনা পাড়ার খাতাদার প্রহরাজ মহান্তির অধীনে আসানসোলের কয়লাখাদানে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে জংলি বেসরা সুরেন সিং ভূমিজের কাছে পরামর্শ নিয়েছিল। সুরেনের সম্মতিক্রমে জংলি বেসরা আসানসোলের সনা কয়লাখাদানে কাজ করতে শুরু করেছিল।

গল্পে কয়লাখাদান শ্রমিকের শ্রম শোষণকারী ঠিকাদারদের সমাজবিরোধী একচেটিয়া দাপট বা জুলুমের নগ্ন চেহরা পাওয়া যায়। সাউ-সামন্তবাবুরা কয়লাখাদানের শ্রমিকের যোগানদারের কাজ করে। খাতাদার বা দালালদের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার শ্রমিকরা কাজ পায়। কোম্পানির খাতায় একজন শ্রমিকের মজুরি ২০-২২ টাকা লেখা হত, কিন্তু ঠিকাদার ও ঠিকাদারের মস্তানরা সেই টাকার উপর ভাগ বসাত, শ্রমিকরা মাত্র ৪-৫ টাকা হাতে পেত। কয়লা খাদানে কাজ করেও জংলি বেসরা খাতাদার কাছ থেকে কেবল চাল ছাড়া কিছুই পায় নি। জংলি বেসরাদের বাঁধনা পরবের সময় মদ, মাংসের প্রয়োজন হয়। তাই জংলি বেসরা সহ অন্যান্য খনি শ্রমিকরা দফাদার মুকুটলালের কাছে টাকা চেয়েছিল। মুকুটলাল জানায়, খাতাদারকে তাদের মজুরির সমস্ত টাকা দিয়েছে। দফাদার মুকুটলালের মিথ্যা ছলনাতে শ্রমিকরা ক্রুদ্ধ। তাদের ন্যায্য মজুরির দাবি নিয়ে দুপক্ষের ঝগড়া হয় তাতে জংলি বেসরা প্রচন্ড মার খেয়েছিল। জংলি বেসরা নাকি লেবারদেরকে খেপায়, সেই অজুহাতে তাকে থানায় আটকে রাখা হয়। অবশেষে জংলি বেসরাকে থানা থেকে হাসপাতাল ও জেলে প্রচন্ড প্রহারে তার অঙ্গের বিকৃতি হয়েছিল। তাই সে নিরুপায় হয়ে চা দোকানে কাজ করে। খাদানের শ্রমিক থেকে চা দোকানের কাজ ও শিবুবাবুর হয়ে গেনুয়ার হাটে সবজি কিনে টাউনে নিয়ে আসা - এভাবেই জোতদার, ঠিকাদার, দফাদার, খাতাদারদের দাপটে জংলির বার বার বৃত্তির পরিবর্তন ঘটেছিল, শোষকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ে জীবনীশক্তিকে মূল হাতিয়ার করে সে এগিয়েছিল। এই সব কারণে জংলি বেসরাকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘চোর’ ছোটগল্পে ‘সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প’র জন্য ঝাড়গ্রাম শহর সংলগ্ন কয়েকটি খাল, পতিত প্রান্তর, ধানক্ষেত জমিকে বেছে নেওয়া হয়। প্রথমে সাঁওতালরা শালগাছের জায়গায় ইউক্যালিপটাস এর বনসৃজন প্রকল্পকে মেনে নেয়নি। এর বিরুদ্ধে কৃষ্ণপদ হাঁসদার নেতৃত্বে সাঁওতালরা তির-ধনুক নিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঠে জোটবদ্ধ হয়েছিল। অপরদিকে জঙ্গলবাবু দালাল কেবলচাঁদ রোহতগী বনসৃজন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য সুযোগ খুঁজে। জঙ্গলবাবু শ্রমিকদের মজুরির নয় টাকা ষাট পয়সা থেকে নয় টাকা তিরিশ পয়সা কেটে নিয়ে শ্রমিকদেরকে মাত্র তিরিশ পয়সা দিত। এভাবেই জঙ্গলবাবু শ্রমিকদেরকে আর্থিকভাবে শোষণ করেছিল।

অসীম ধৈর্য নিয়ে কেবলচাঁদের মামা ধুনিচাঁদ লোধাশবর গ্রামে থাকতে শুরু করে। ধুনিচাঁদ লোধা ও শবরদেরকে চুরি করতে উৎসাহ দিত। সেই চুরি করা দ্রব্য সামগ্রী তাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে সে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লাভ করত। সহজ সরল, দারিদ্র, অসহায় লোধাশবররা ধুনিচাঁদের অন্যায় অবিচার, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত না। বর্তমানে ধুনিচাঁদ পূর্বের মতো লোধাদের কাছ থেকে চুরির মাল পায়নি, তাই সে

অখরাজ কোটালের কাছে আক্ষেপ করে, জানায়- মনা তাদের সমাজে সবাইকে সচেতন করে দিয়েছে। মনা নিজে চুরি থেকে বিরত, অন্যদেরকেও চুরি করতে নিষেধ করেছে। চুরির অপরাধে তার বাবাকে পিটিয়ে মারা হয়। মনা লোধা সমাজকে অপরাধপ্রবণতা, জোতদার ও মহাজনদের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছে সে মানুষের মতো বাঁচতে শহরের কাঠ গুদামে কাজ করে।

সমাজের জোতদার মহাজন ধুনিচাঁদ লোধাদের চুরি করতে উৎসাহ দিত। তাই তারা সংসারের অভাব অনটনের জ্বালায় চুরির মতো হীন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করত না। তাদের কাছে কমদামে কিনে বাজারে বেশি দামে বিক্রি করত, এর মধ্যে থানার দারোগা বাবু কিছু অংশ ভাগ পেত। অথচ চুরি ডাকাতি প্রতিরোধের ক্ষমতা দারোগার হাতে রয়েছে। আবার চুরি করার দায়ে ধরা পড়লে তাদেরকে জেলে যেতে হত কিংবা গণপিটুনি খেয়ে অনেক সময় মারা যেত। অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লোধাদেরকে অপরাধ জগতে ঠেলে দিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করত না। অবশেষে মনা ধুনিচাঁদ ও দারোগার চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ে। ধুনিচাঁদের সাইকেল কিনে তার কপালে জোটে চুরির অপবাদ। প্রচুর অর্থের অধিকারী ধুনিচাঁদের হাত থেকে দরিদ্র নিঃস্ব লোধাদের রেহাই নেই। এভাবেই ধুনিচাঁদের চক্রান্তে লোধারা অর্থনৈতিক সমস্যায় ভুগছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর 'মকর শবর' ছোটগল্পে পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর সমাজের নানান সমস্যা, আর্থিক বিপর্যয়, তাদের প্রতি উচ্চবর্গের অবহেলা ও শোষণের চিত্র পাওয়া যায়। খেড়িয়া শবর ইংরেজ শাসকের চোখে 'অপরাধপ্রবণ' জাতি রূপে চিহ্নিত ছিল। কোনো চুরির মতো অপরাধ ঘটনা সংগঠিত হলে, থানায় রেকর্ড ভুক্তদেরকে ধরে নিয়ে আসা হত। সেই তালিকায় মকর শবরের নাম- মকর শবর, পিং বাবু শবর, নিবাস সাবুইজোড়।

মকর শবরের জীবনের কাহিনি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত-প্রাক্ বিবাহ পর্ব, বিবাহ পর্ব ও বিবাহ-উত্তর পর্ব। প্রাক বিবাহ পর্বে মকরের প্রতিবাদী মুখ ভিন্ন ছিল। গোকুলবাবু খেড়িয়া শবরদের উচ্ছেদের বাসনায় লোকজন নিয়ে যখন উপস্থিত হয়েছিল, অপরদিকে মকর শবরও তার প্রতিবাদী স্বর নিয়ে প্রস্তুত ছিল। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মকররা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিবাহ পর্বে মকর ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবন জটিলতায় বিধ্বস্ত। তার জীবনের প্রথম পর্বের স্ত্রী রেবতী বিয়ের পাঁচ বছর পরেও সন্তানাদি না আসায় সে মকরকে ত্যাগ করে। দ্বিতীয় বিয়ে ভুতির সঙ্গে অনুরূপ কারণে ভুতিও ছেড়ে অন্যত্রে চলে যায়। মকরের তৃতীয় স্ত্রী কুমারীর সন্তান না হওয়ায় সুখী দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানে কিষ্ট সিং মাস্টার মকরের ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। ডাক্তারবাবুর পরীক্ষায় জানা যায় মকরকে 'ভ্যাসেকটমি' করা হয়েছে। মকর স্বীকার করে, মাখনবাবুর কথায় শুধুমাত্র একশো টাকার লোভে নয়াগড় হাসপাতালে গিয়ে 'অপারেশন' করেছিল। ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত

এমারজেন্সির সময় দালালরা টাকার লোভ দেখিয়ে আদিবাসীদের জোর করে 'ভ্যাসেকটমি' বা 'নির্বীর্যকরণ' করত। মাখনবাবুও সুযোগ বুঝে অজ্ঞ মকরকে 'ভ্যাসেকটমি' বা 'নির্বীর্যকরণ' এর ফাঁদে জড়িয়ে দিয়েছিল। মকর বিবাহের উত্তর পর্বে চরম আর্থিক সংকটে দিশাহারা ছিল। এখন তার স্ত্রী কুমারীও সঙ্গে নেই। বর্তমানে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দু-মুঠো অন্ন দরকার। তাই সে সাবুইজোড় ও বানাডির এলাকার মরা বাবলা গাছের গোড়া তুলে চা-দোকানদার শ্রীমন্তকে দিত, বিনিময়ে সে পাঁচ টাকা পেত। একদিন বানাডির লোকেরা মকরকে একা পেয়ে প্রচন্ড প্রহার করে এবং থানায় দিয়েছিল। আবার গোকুলবাবু মকরকে দশ টাকা জরিমানা করেছিল। এভাবেই মকর শবরকে চরম আর্থিক সংকটের মুখে সম্মুখীন হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন' ছোটগল্পে আদিবাসী মুণ্ডা, ওঁরাও, ও কোল প্রভৃতি জনজাতির অর্থনৈতিক শোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা ছোটনাগপুর পালামৌ অভয়ারণ্য অঞ্চলে বসবাস করে। জঙ্গলে গাই, মোষ ও ছাগল চরায়, জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৩১ সালে কোল বিদ্রোহের পর উত্তমচাঁদের পূর্বপুরুষরা ছোটনাগপুর পালামৌ অভয়ারণ্যে অঞ্চলের সমস্ত জমি আদিবাসীদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। এই ঝুঝার গ্রামে বসবাসকারী প্রায় ১৭টি পরিবারের সর্বমোট ৭৬ জন লোক উত্তমচাঁদের কাছে বেঠবেগারির ডান্ডাবেড়িতে বাঁধা ছিল। তাদের উত্তমচাঁদের কাছে বেঠবেগারিতে হতদরিদ্র অবস্থায় দিন কাটছিল। আদিবাসীদের নিরক্ষরতা, সরলতা ও দারিদ্রর সুযোগ নিয়ে উত্তমচাঁদ নিজের ধন সম্পত্তি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছিল। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ঝুঝার গ্রামের পূর্তি মুণ্ডা মন্ত্রীসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্তি মুণ্ডা নির্বাচিত হওয়ার পর ঝুঝার গ্রামের আদিবাসীদের বোঝাতে থাকেন বেঠবেগারি বেআইনি-

> বেঠবেগারি বেআইনি, তা জান? আমাদের জেনে লাভ কি? না দিলে মহাজন ধার দিবে না।[২১]

আদিবাসীরা পরক্ষণে যুক্তি দেখায় বেকার না খাটলে মহাজন উত্তমচাঁদের কাছে ঋণ পাবে না। পূর্তি মুণ্ডার সহায়তায় রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য উত্তমচাঁদকে শাসিয়ে বেঠবেগারি বন্ধ করে দিয়েছিল।

> পূর্তি মুণ্ডার সামনে উত্তমচাঁদকে ছেলেরা বলে, এ বছর থেকে এ অঞ্চলে কোনো আদিবাসী বেঠবেগারি দেবে না। যদি কারুকে বাধ্য করা হয়, যাতে আইনের মারফত প্রতিকার পায়, তা আমরা দেখব।......যুবকদল বলে গেল, বারো বছরের বেশি কাল এরা জমি চষেছে। আধা ভাগে এদের হক।[২২]

ঝুঝার গ্রামের লোকেরা নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমগ্রী হাট থেকে সংগ্রহ করে। হাটের সমস্ত দোকান উত্তমচাঁদের নিয়ন্ত্রণে চলে। উত্তমচাঁদ আদিবাসীদের উপর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হাটে নুন বেচা বন্ধ করে দিয়েছিল। নুন ছাড়া সমস্ত খাবার বিস্বাদ তাই ঝুঝারবাসী বিস্বাদ আলুনি ঘাটো খেতে পারবে না। নুন ছাড়া তাদের জীবন অচল হয়ে যায় তাই তারা নুনের বিনিময়ে উত্তমচাঁদের কাছে বেগার খাটতেও রাজি হয়েছিল। আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের নুন

বন্ধ করে দেওয়ায় তাদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে এবং এই সামান্য পরিমাণ নুনের জন্য অনেকর মৃত্যু হয়। এভাবেই উত্তমচাঁদ ঝুঝার গ্রামের আদিবাসীদেরকে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চরম বিপদে ফেলেছিল।

'তীর' ১৯৯৩ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষে ছোটগল্পটি 'খাইখালাসি' প্রথার বিরুদ্ধে এক আদিবাসী আন্দোলন। এক সরকারি আইনে বলা হয়েছিল যে- ১. ১১. ১৯৬৫ সাল থেকে আদিবাসীদের জমি শুধুমাত্র আদিবাসীরাই কিনতে, দান, বন্ধক বা খাইখালাসি বন্ধক নিতে পারবে। এই খাইখালাসি প্রথা অনুযায়ী জমি সাত বছর পর্যন্ত বাঁধা রাখা যায়। এটি ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় আধিকারীকের সামনে দলিল হবে। এই সাত বছরে যদি ঋণের টাকা উশুল না হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে আধিকারীকে জানাতে হবে তিনি জমি মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য হবেন। তবুও আদিবাসীদের জমিকে রক্ষা করা যায় নি। বাস্তবে তার ফল উলটো হয়েছিল, শালচাঁদ মুর্মু, হরিচরণ মুণ্ডা ও কোড়া জাতির লোকেরা সরকারের সুযোগ সুবিধার কথা জানত না। তারা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে জমির বিনিময়ে টাকা লেনদেন করত। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চন্দ্রকান্ত বেরা তাদেরকে সাদা কাগজে টিপসই করিয়ে টাকা দিত। মহেশ সিংসর্দার বা উপেন সিং মুণ্ডা নামক কোনো এক ভুয়ো আদিবাসীর নামে জমি বাঁধা দিল, শালচাঁদরা তা জানতেও পারত না। এভাবেই শালচাঁদ মুর্মুর মতো লোকেরা দালাল শ্রেণি মানুষের কাছে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নিজেদের জমি হারাত।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রাখদার' ছোটগল্পে শবর জনজাতির উপর প্রশাসনিক অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায়। শবর জাতির সহজ, সরল ও দারিদ্র সুযোগ নিয়ে সমাজের তথাকথিত নিরাপরাধ বলে কথিত শ্রেণির লোকেরা তাদেরকে অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করত। ছোটগল্পে উল্লিখিত পুরুলিয়ার রাজনওয়াগড় গ্রামে খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত বয়স্ক বুধন শবরকে যখন চোর অপবাদ দিয়ে সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্দয়ভাবে মেরে ফেলে, প্রশাসন উদাসীন। শবর জাতি মারা গেলে প্রশাসনের ক্ষতি হয় না। মহাশ্বেতা দেবীর প্রচেষ্টায় প্রতিবাদ স্বরূপ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি মামালা করে। মামলায় সমিতি কেস জেতে ও বুধনের স্ত্রী শ্যামলী ক্ষতিপূরণ পায়। এই প্রথম খেড়িয়া শবরকে মারলে প্রশাসনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। শবররা চুরি করতে জানে না, বরং যারা তাদের অপরাধী বলে চিহ্নিত করে প্রকৃত পক্ষে তারাই অপরাধী। এই সভ্য সমাজে তথাকথিত যারা সভ্য জাতি বলে নিজেদেরকে দাবি করে, তারাই সমাজের অনৈতিক কাজ হাসিল করতে শবর জাতিকে ব্যবহার করে। যে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে শবররা বাস করে সেই জঙ্গলও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। সমাজে তারা ব্রিটিশ সরকারের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 'অপরাধপ্রবণ' জাতির কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকে। এভাবেই তাদেরকে প্রশাসনিক অত্যাচার ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনি' ছোটগল্পে আদিবাসীদের সামাজিক আচারসর্বস্বতা, অন্ধসংস্কারের বশীভূত শিক্ষা-দীক্ষাহীন নিম্নবর্ণীয় সমাজ জীবনের ক্ষয়িষ্ণু ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে। মুরহাই গ্রামবাসী ডাইনি শঙ্কায় সন্ত্রস্ত। ডাইনি সম্পর্কে নানা ঘটনা, গুজবের ঘটনাবর্তে দেখা যায় মুরহাই গ্রামে ডাইনির সন্ধান পাওয়া গেছে। গভীর রাতে চারিদিক ব্যপ্ত ডাইনির আকাশচেরা বীভৎস আর্তনাদ শোনা যায়। গ্রামে জীবন্ত ডাইনি ধরা পড়ল। রামরিক ধোবির ছেলে পরসাদ বরম গঞ্জুর বিধবা বোন মানির সঙ্গে অবৈধ প্রণয় হয়। অন্ত্যজ আদিবাসীদেরকে মহাজন ও জোতদারের অত্যাচার বংশ পরম্পরায় সহ্য করতে হয়েছে। গাঁওবুড়ো পরসাদ ও মানিকে শাস্তি দেয় নি, দু'জনকেই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল। পরসাদ ও মানি কিছুকাল সংযত থাকার পর প্রেমের টানে ও জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে তোহরির দিকে চলে যায়। রাঁচি কিংবা ধানবাদে আশ্রয় নিয়েছিল। এই দুই জীবন্ত ডাইন-ডাইনিকে দেখেও কিছু বলে না পহানের বউ, পরসাদ ও মানির পালাবার ঘটনা কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

কুরুডার বুকে প্রকৃত ডাইনির আবির্ভাব, পরসাদ ও মানি কুরুডার নদীর বুকে অন্ধকারে পাথরে বসে এক যুবতী ডাইনির টাটুই পাখির কাঁচা রক্ত মাংস ভক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। যুবতীটির ভীষণ হিংস্র চোখ তাদেরকে দেখে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে আর্তনাদ করেছিল। গাঁওবুড়ো বিপদ বুঝে গ্রামবাসীদের নাগরা বাজিয়ে সতর্ক করে। অপরদিকে পহান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেওতা হনুমান মিশ্রের কাছে পরামর্শ নিয়েছিল। হনুমান মিশ্র পুলিশ প্রশাসন ও জোতদার, মহাজনদের উপর সর্বাত্মক প্রভাব রয়েছে। হনুমান মিশ্রের নির্দেশে ডাইনিকে পুড়িয়ে হত্যা করা নয়, তাকে পুড়িয়ে মারার পরিবর্তে গ্রাম থেকে তাড়ানোই শ্রেয়। ডাইনি দুর্বার গতিতে মুরহাই থেকে কুরুডি, হেসাডি দিকে ছুটে চলে যায়। মিশ্রজীর প্রতি পহানের সন্দেহ হয় 'ডাইনি- ডাইনি রব' উঠেছে, ডাইনিকে না মেরে তাড়ানোর পিছনে নিশ্চয় কিছু চক্রান্ত রয়েছে।

পহান ও গ্রামের ছেলেরা জোট বেঁধে কুরুডা-হেসাডি-মুরহাইয়ের গ্রামে ডাইনিকে খোঁজে। অবশেষে ছেলেরা ঢাই গ্রামে ডাইনির সন্ধান পায়। অন্ত্যজ আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, জীবনযাত্রা-সংস্কার বিষয়ে গবেষণারত মাথুরকে ডাইনি তাড়া করে। মাথুর বুঝতে পারে সে ডাইনি নয়, এক আদিবাসী স্ত্রীলোক। লাঠি পাথর হাতে সশস্ত্র মানুষের তাড়া খেয়ে মেয়েটি জঙ্গলের আশ্রয় ছেড়ে নদী পার হয়ে, বাঁচার তাগিদে নিজেকে এবং গর্ভের সন্তানকে নিয়ে দূরে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। টুরা গ্রামের মুণ্ডা প্রধান পহান এক নগ্ন মেয়েটিকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখল। তার দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে নাড়িতে বাঁধা এক নবজাতক শিশু আছে। আসলে মেয়েটি পহানেরই বোবা মেয়ে সোম্‌রি। সোম্‌রি টাহাড়ের হনুমান মিশ্রের বাড়িতে গোহাল ঝাড় দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। পহানের সামনে স্পষ্ট হয়ে

যায়, হনুমান মিশ্রের গুজব রটানোর পিছনে ডাইনি সম্পর্কিত চক্রান্তের কাহিনি। সে কথা মাথুরকে স্পষ্ট করে বলে পহান-

> বছর ঘুরে গেছে। আজ পাঁচ মাস হয় তার সংবাদ নাই। মিশ্রজি বলে সেথা হতে কোথা চলে গেছে। কত খুঁজেছি, পাই নাই। পরে জেনেছি ঠাকুরের ছেলে ওরে নষ্ট করে। শুধাতে যেতে জুতা খেয়ে এসেছি। ডাইনি, ডাইনি, ডাইনির কথা তুলে দিল ঠাকুর! তা কখনো জানি নাই আমার সোম্‌রি ডাইনি। কখনো জানি নাই।[২৩]

আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ স্বীকার করে সোম্‌রি ডাইনি নয়, হেসাডির পহান উপলব্ধি করে, ক্ষুধার্ত সোম্‌রি পাখির কাঁচা রক্ত মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনি' গল্পে আদিবাসী মুণ্ডা সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সমাজজীবনে ডাইনি প্রথার ভয়াবহ রূপকে উন্মোচিত করেছেন।

উল্লিখিত মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের প্রায় সমস্ত মানুষরাই কমবেশি তীব্র অর্থসংকটে পড়ে প্রতিনিয়ত দারিদ্র'র সঙ্গে লড়াই করে কোনরকমে বেঁচে আছে। তারা নিজেদের সাধ্য মতো লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে। লেখিকা সেই সব লড়াইয়ের চিত্রকে গল্পের মাধ্যেমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

২. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের ধর্মীয় জীবন:

আদিবাসীরা বেশির ভাগই প্রকৃতি পূজারী, প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। মহাশ্বেতা দেবীর বেশ কিছু ছোটগল্পে বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো ছোটগল্পে ধর্ম বিশ্বাসী আদিবাসীরা ধর্মকে বড় করে দেখেছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ধর্ম বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়ে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে আদিবাসীরা ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও বেশ কিছু ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের বিচিত্র প্রকার ধর্মাচার গল্পের বিষয় হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'তারপর' ছোটগল্পে মেদিনীপুর জেলার লোধাশবর আদিবাসীদের সংস্কার, দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা, উৎসব ও তাদের বিপর্যয়ের কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার চারপাড়িয়া গ্রামের কুরুরাজ দিগারের ছেলে সনাতন দিগার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা ছিল। সনাতন দিগারের বাবা কুরুরাজের কথায় জানা যায়- তারা পূর্বে ছিল 'বনবাসী ব্যাধ' তাদের সর্দার কালকেতু ব্যাধ। মহাভারতে 'নিষাদ' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নিষাদ' এক অর্থে মৎস্যজীবী, আবার মাংস বিক্রেতাকেও 'নিষাদ' বলা হয়েছে। নিষাদের অপর নাম 'লুব্ধক' বা 'ব্যাধ'। 'শবর' জাতি বলতে চন্ডাল-ব্যাধ কিরাত ও নিষাদেরকে বোঝায়। লোধারা কালকেতু ব্যাধের গোত্রভুক্ত বলে দাবি করে। হিন্দু দেবদেবীর সাথে অনার্য লোধাদের দেবদেবী 'অরণ্যচণ্ডী' বা 'বনদেবী'র মিল নেই। হিন্দুরাজার চণ্ডীপূজার দিন রাজার

লোকেরা নীল গন্ধরাজ পায় না। কালকেতু ব্যাধ নীল গন্ধরাজ নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে উদ্যত, কিন্তু হিন্দু রাজার মন্দিরে ব্যাধজাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ, এই অপরাধে রাজার পুরোহিত কালকেতুকে 'খড়মপিটা' করেছিল। এভাবেই গল্পে সমাজের উচ্চবর্ণের দাপটে লোধা শবরদেরকে ধর্মীয়ভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'অর্জুন' নামক ছোটগল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বিশাল একটা অর্জুন গাছ। বানডিঙ্গির গ্রামের আদিবাসীদের কাছে অর্জুন গাছ এক আদর্শের প্রতীক। একদিন অর্জুন গাছের উপর গ্রামীণ নেতা বিশাল মাহাতোর দৃষ্টি পড়ে। বিশাল গাছটি কেটে দেবার জন্য সে কেতু শবরকে চাপ দেয় বিনিময়ে কিছু টাকা দিতেও রাজি ছিল। প্রথমে কেতু শবরের টাকার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও বিশাল মাহাতোর প্রলোভনে পা দেয় নি। কারণ-

> ওই গাছ জমিদারি আমলে বানডিহি জঙ্গলের শেষ প্রতীক। গাছটি দেখলে কেতুদের এখনো অতীতকে মনে পড়ে। যখন জঙ্গলের মতো জঙ্গল ছিল, যখন শবররা ছিল বনজীবী। বাইরের মানুষ দেখলে যখন ওরা ত্রাসিত খরগোশ বা খেড়িয়ার মতো বনের পেটে ঢুকে যেত, সেসব দিনের কথা। বৃদ্ধরা গাছটিকে বড় মানে, দেবাংশী গাছ।[২৪]

অবশেষে কেতু শবর বিশাল মাহাতোর কাছ থেকে গাছ কাটা বাবদ ১০ টাকা ধার নিলেও, বনমালী, দিগা ও পীতাম্বর শবরদের কাছে গাছ কাটার বিষয় নিয়ে পরামর্শ নিয়েছে। কেতুর মতই অন্যান্য শবরদের টাকার লোভ থাকলেও তারা গাছ কাটার পক্ষে মত দিতে পারে না। গাছটি সম্পর্কে তাদের মনে নানারকম স্মৃতি জাগে-

> বিয়েতে পরবে হোথা মেয়ে ঢোল ধামসা বাজাই, মানসিকের চুল ফেললে হোথা পুঁতে দিতে দেই। ওষধি বৃক্ষ হে, দিগার নানা তা জানত। পীতাম্ব অস্ফুটে বলে, সাঁওতালরা বাধনা জাগরণে গরু নাচাতে আসে। ওই গাছটি যখন, তরুণ ছিল, ওর নীচে পূজা দিয়ে সবাই শিকার পরবে যেত। এমন বার্ধক্যে বা ওর রূপ কত। শাদাটে গা মাথাটি অপশে পূর্ণচাঁদের মায়ায় গাছ আর জ্যোৎস্না যেন এক হয়ে যায়। চৈত্র-বৈশাখে দেখো, ছায়া ছড়ায়।........কতকাল আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে হে।[২৫]

প্রকৃতিগতভাবে শবররা সহজ সরল হলেও বারবার অন্যর কাছ থেকে ঠক্কর খেয়ে কিংবা জেলে গিয়ে অনেকটায় সচেতন হয়েছে। দিগা শবর নানারকম কৌশল অবলম্বন করে বিশালবাবুর কাছ থেকে ১০০ টাকা নিয়ে গাছ কাটার আশ্বাস দিয়ে তাকে ভোটের মিটিং এর জন্য টাউনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। গাছ কাটা বাবদ প্রাপ্ত টাকা দিয়ে তারা অর্জুন গাছের চারপাশে পাথর দিয়ে থান বাঁধে, পূজা করে। গাছটিকে তারা গ্রামদেবতা বলে ঘোষণা করে। সকলকে তারা জানিয়ে দিয়েছিল যে, দিগা শবর গ্রামদেবতার কাছ থেকে স্বপ্ন পেয়েছে। চারিদিক থেকে দলে দলে সাঁওতাল, খেড়িয়া ও ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীরা পূজা দেওয়ার জন্য আসে। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে সাঁওতাল, খেড়িয়া ও শবরদের ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর 'বড়াম মায়ের থানে' ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বড়াম' মা সাঁওতালদের হেমব্রম গোত্রের এক জাগ্রত দেবতা।

গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ভৈরব হেমব্রম তার নাতি রতন হেমব্রমকে ‘বড়াম’ মায়ের মাহাত্ম্যর গল্প শোনায়। সে এক অতীতকালের গল্প বলে, একদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টির সময় ‘বড়াম’ মায়ের কৃপায় সাঁওতাল সমাজ রক্ষা পেয়েছিল। তাই সাঁওতালরা জাগ্রত ‘বড়াম’ মায়ের পূজা উপলক্ষে মহা সমারোহে উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সবাই ‘বড়াম’ মায়ের থানে মুরগি, আতপ চাল ধুপ-ধুনো দিয়ে পূজা করে। সাঁওতাল সমাজের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীতে রতনের চরিত্র চিত্রণ রয়েছে। ধর্ম-বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে এতদিন তাদেরকে চেপে রাখা হয়েছে, সচেতন না করে অন্ধকারে রাখা হয়েছে- এই সত্য ঘটনা রতন ও তার বন্ধুরা ভালোভাবে জানত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক রতন ও তার বন্ধুরা যুক্তি ও কৌশল দিয়ে ধর্মকে বিচার করেছে। সাঁওতালদের ধর্ম-বিশ্বাসের পাশাপাশি রতন হেমব্রম ও তার বন্ধুদের ধর্ম-অবিশ্বাসের প্রসঙ্গও ‘বড়াম মায়ের থানে’ গল্পে রয়েছে। তাই রতন যুক্তির উপর ভর করেই নিঃসংকোচে ‘বড়াম মায়ের’ বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। এভাবেই আলোচ্য গল্পে বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব মিলিয়ে সাঁওতালদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘সংরক্ষণ’ ছোটগল্পে শবর জাতির অস্তিত্ব সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাদের আরাধ্য দেবদেবীর কাছে করুণ আর্তির প্রসঙ্গ রয়েছে। গল্পে বার বার ভ্রান্ত সরকারি নীতি ও সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে যতই প্রাচীন অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে ততই আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। অরণ্যর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন বনদুর্গা। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য দেবী বনচণ্ডীর কাছে আর্তি জানায় প্রাচীন অরণ্য ফিরিয়ে দেবার। এক লোধা সেপাই এর আর্তির থেকে জানা যায়-

> বস্তুত ও যে আষাঢ়ার জঙ্গলে ঢুকেছে তা সেপাই বুঝতে পারেনি। ঘন ঘন শ্বাস টেনে ও শুধু ইউক্যালিপটাসের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর, চোখ কচলে ও চারিদিকে চেয়ে ছিল। নেই, অরণ্যে ফেরা এক লোধাকে বনাঞ্চলে ঢেকে নেবে এমন গাছ নেই। নেই সেই মহান অর্জুন, বিশাল শাল, পিয়াল, কোঁচ, ধ, আসান বনকাঁঠাল, মহুয়ার বন যেখানে সেপাই একদা শিকারে আসত। বনতল যেন বাবুদের আপিসবাড়ি, যেন ঝড়গ্রামের পথ। নাই ঝাটিবন, ওষধি গাছ, লতা। সেপাই আতঙ্কে দিশাহারা হয় ও দৌড়তে থাকে। ঋজু, সুসংবদ্ধ। উদ্ধত গাছের সারি যেন অপেক্ষমাণ সেনানী। লধা যাবে কুথা? হা মা বড়ামচণ্ডী! হা মা শীতলা! বনচণ্ডী মা গো! শারদ শিশির সিক্ত প্রসন্ন প্রভাতে তোমার শবর সন্তান যায় কোথা? এ বন কে কাটল, কবে কাটল? কত বৎসর মাথায় আঘাত, ভোমা মেরে থাকি, ভুলে যাই সব, চোখে সব আবছা, জঙ্গলটা চুরি হই গেল মা গো! তুমিও অক্ষ্যামতা? তবে সেপাই কোথা যায়? সে যে এখনকার লধা হয়ে থাকতি চায় নি। পুরনো দিনের লধা হতে চেয়েছিল। সে যে জানত, জঙ্গল লোধাদের ছেড়ে দূরে যাক, আষাঢ়েতে সব ঠিক আছে।[২৬]

উদ্ধৃতাংশে শবরদের জীবনে এক ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শবরদেরকে দেবী বনচণ্ডী আর রক্ষা করতে পারছে না। এছাড়াও লোধারা বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

বড়াম মায়ের পূজা করে। মুণ্ডাদের 'সিংবোঙ্গা' আরাধ্য দেবতা হলেন 'সিংবোঙ্গা'। বাৎসরিকের প্রতিটা উৎসব অনুষ্ঠানে তারা 'সিংবোঙ্গা'র উদ্দেশ্য সাদা মোরগ পূজা করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'সিংবোঙ্গা'ই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। সিংবোঙ্গার পরেই 'জাহের এরা' এবং 'চণ্ডী বোঙ্গা'র স্থান। দেশে কৃষি ফসল, চাষ আবাদ ভালো হওয়ার জন্য 'জাহের এরা' এবং বন জঙ্গলে শিকারে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চণ্ডী বোঙ্গার পূজা দিয়েছিল। নদী ও জলাশয়ের দেবতা হল 'ইকিড় বোঙ্গা', পাহাড় পর্বতের দেবতা হল 'বুরু বোঙ্গা', ছোট নদীর দেবতা হল 'নাগে এরা' প্রভৃতি দেবদেবী তাদেরকে নানারকম বিপদ থেকে রক্ষা করে। মুণ্ডাদের গ্রাম পুরোহিত 'পহান' এ সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশ্য পূজা দেয়। প্রতিটি মুণ্ডা পরিবারেই নিজস্ব 'অড়াঃ বোঙ্গা' গৃহদেবতা রয়েছে। এ সমস্ত দেবদেবী ছাড়াও শ্মশানে 'শ্মশান বোঙ্গা' কলেরার দেবী 'হায়জাবুড়ি' ও বসন্তের দেবতা 'চেচক বুড়ো' প্রভৃতি দেবতা রয়েছে। শুধু মুণ্ডা সমাজে নয় কোল, ভূমিজ, সাঁওতাল, ওঁরাও, হো, বিরহড় ও মাহালি প্রভৃতি উপজাতির কাছেও 'সিংবোঙ্গা' আরাধ্য দেবতা হিসেবে পূজিত হন। এভাবেই আলোচ্য গল্পে আদিবাসীদের ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন গল্পে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের ধর্ম-বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তার বিষয়বস্তু এক ধরনের অলৌকিকতা ও অন্ধসংস্কারের বিশ্বাস রয়েছে। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে আদিবাসীর বিশ্বাসের উপর মাথা নুইয়ে জীবনযাপন করেছে। বর্তমানে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। আলোচিত ছোটগল্পগুলিতে আদিবাসী মানুষদের অন্ধ-অটল-বিশ্বাসের ভিত্তি মূলে আঘাত হানার সাহস দেখিয়েছেন।

৩. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা:

বর্তমানে আমাদের জীবনের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বাংলা ছোটগল্পে চিত্রিত পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনুসন্ধানে দেখা যায়, আদিবাসীদের মধ্যে খুবই সীমিত সংখ্যক লোক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছে। অধিকাংশ আদিবাসী রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে অনেকটা দূরে সরে থাকতে চায়। আদিবাসী কেন্দ্রিক বাংলা ছোটগল্পগুলির মধ্যে সামান্য কিছু ছোটগল্পে আদিবাসীদের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পূর্ব যুগ থেকে বর্তমান সময়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিনিয়ত কমবেশি আদিবাসী সম্প্রদায়কে নানারকম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অংশীদার হতে হয়েছে। কখনো আদিবাসী সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, আবার

কখনোও তারা জমি দখলের বামপন্থী আন্দোলনের শরিক হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে সব ছোটগল্প রচিত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল-

ক. রাজনৈতিক অসচেতনতা ও অত্যাচারের পর্ব, এই পর্বে আদিবাসীরা রাজনীতির জগতে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহৃত হয়েছে। অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাদের মূল্য নেই। তাই রাজনৈতিক নেতারা সুযোগ বুঝে আদিবাসীদের উপর নানারকম দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালায়।

খ. রাজনৈতিক সচেতনতার পর্ব, এই পর্বে রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসা কিছু আদিবাসী লোকজন যথেষ্ট সচেতন। তারা নিজের মতো করে রাজনীতিকে সময়ের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ও সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

গ. প্রতিবাদের পর্ব, এই পর্বে গল্পগুলোতে আদিবাসীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়েছে। তারা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলিতে কমবেশি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি খুব সচেতনভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়।...স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী, কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবনকালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারণ ঘটবে বলে আশা নেই, তাই সাধ্যমতো মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।[২৭]

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর অনেকটা বছর কেটে গেছে, কিন্ত ভারতের আধা-ফিউডাল ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। যে রাজনৈতিক দলই আসুক না কেন এদেরকে অবহেলার পাত্র বলে সরিয়ে রেখেছে। এর ফলে যেমন জমিদারি প্রথা বিলোপ হয় নি, তেমনই জমির পরিমাণও পরিবার পিছু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। তাই আজও ভূমিহীন কৃষকরা জমিদার, মহাজনদের শোষণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। ভারতবর্ষের এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এক বিপুল জনসংখ্যাকে চরম দরিদ্রতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। সেই সব আদিবাসী অন্ত্যজ আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষরা অত্যাচারী জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের কাছে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, তারা বাধ্য হয়ে বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবী একবিংশ শতাব্দীর আদর্শে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে এক অবিচল অনড় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ লেখকগোষ্ঠী যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে আপোষের পথে, সমাজের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের রোমান্টিক সুখ, দুঃখ কাহিনী নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন, তখন মহাশ্বেতা দেবী সামাজিক সাংস্কৃতিক এই সমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে ওঠে সমাজের লাঞ্ছিত, অবহেলিত আদিবাসী মানুষের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর রচনায় বারবার ওঠে এসেছে আদিবাসী মানুষের কথা যারা দীর্ণ, জীর্ণ এবং শীর্ণ যাদের তিনি নিজেই বলেছেন-'The voiceless section of Indian society'. আজও তারা বিবর্তিত সমাজ ও আধুনিক সভ্যতার অন্তরালে রয়ে গেছে, আর সেইসব প্রায় অচ্ছুৎ এবং অপাংক্তেয় মানুষদেরকে তিনি অন্ধকারাছন্ন অন্তরাল থেকে আধুনিক সভ্যতার আলোকে আনতে চেয়েছেন। তিনি শুধু দায় সারা লেখার জন্য লেখেন নি, তাদের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্বও আছে। তিনি জানিয়েছেন-

> তিনি দায়বদ্ধ সেইসব ভাষাহীন মুখে মানুষের যারা শুধু 'নিরক্ষর স্বল্প স্বক্ষর ও অনুন্নত নয়, যারা মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্নও.....।"[২৮]

তাই তাঁর প্রত্যকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প গুলির মূল সুরই হল, আদিবাসীদের দুঃখ যন্ত্রণা ও হাহাকার। সভ্যতার সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই যারা ভূমিসংলগ্নে বসবাস করেছে, পাহাড়ের কোলে গাছ কেটে পরিষ্কার করে চাষবাস করেছে, বন জঙ্গলের ফল, মূল খেয়ে জীবনধারণ করেছে, আজকে তারাই সভ্য সমাজের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বহু বছর কেটে গেছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি দিক থেকে ব্যপক উন্নতিও ঘটেছে, কিন্ত বাস্তবে আদিবাসী মানুষদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। একদিকে যেমন ধনি শ্রেণি বিত্তবান হয়েছে, তেমনই অন্য দিকে দিন দিন নিজেদের শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিম্নবিত্তরা চরম দরিদ্রতার দিকে পা বাড়িয়েছে। তাই তারা আজও উচ্চবর্গের সমাজ অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে অবস্থান করে। যারা মধ্যবিত্তে উঠতে গিয়ে ক্ষমতা যখন আত্মনির্মাণের জন্য নতুন সংস্কৃতিকে মূলধন হিসাবে স্থির করে, তখন আঞ্চলিক অর্থনীতির দিকে তারা ফিরেও তাকায় না। মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত বহুমুখী বিনিয়োগ পরিকল্পনাগুলোও আর সমাজকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। আজ তাই বাজার অর্থনীতির কাছে মানুষের সম্পর্ক ও মানুষের অধিকার দুই-ই বিক্রি হয়েছে, অবশ্যই এর পিছনে প্রখর রাজনীতির সমর্থন রয়েছে। এভাবেই নিম্নবর্গ তাদের লোকসংস্কৃতি জাতীয় স্মরণভান্ডার থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে থাকে। তাই নিম্নবর্গের মানুষরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে এই প্রখর রাজনীতির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে অপারগ, তখন এই নিম্নবর্গ সর্বহারা মানুষদের নিজস্ব কোনো গ্রাম থাকবে না, কোনো দেশ থাকবে না, কোনো নৈতিক জাতীয়তাও থাকবে না। তারা দেশের জল-স্থল-সংস্কৃতির একান্ত আপনজন হয়েও দেশজ সংস্কৃতি থেকে নির্মমভাবে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। এভাবেই তারা বংশ পরম্পরায় সংস্কৃতির

বেড়াজাল থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়, এর বিরুদ্ধে যখন তারা প্রতিরোধে সরব হয়, তখন রাষ্ট্র এদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে ভাবতে শুরু করে। এরই ফলে রাষ্ট্রের চোখে প্রতিরোধের পন্থাগুলো সন্ত্রসবাদ কার্যকলাপের তকমা পায়। তখন এরা হয়ে ওঠে নকশালপন্থী, আর নকশালপন্থীর পরিচয় দিয়ে এদের উপর রাষ্ট্র প্রশাসনিকভাবে নানারকম অত্যাচার অবিচার শুরু করে। এই নকশাল আন্দোলনকে অবলম্বন করে মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন, তা সত্তর দশকের এই নকশাল আন্দোলনের অন্যতম এক জীবন্ত দলিল। তিনি শুধু নকশাল আন্দোলনকেই আলোকপাত করেননি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শহীনতা প্রশাসনিক সন্ত্রাসের ভয়ংকর রূপ, অর্থনৈতিক শোষণের নগ্ন চেহারা, বন জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তীব্র প্রতিবাদের আগুন ঝরিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ ছোটগল্পটি তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নিম্নে আলোচনা করা হল-

মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ ছোটগল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। ঝাড়খণ্ডের বন, বাদাড়ে সাঁওতাল সম্প্রদায় দ্রৌপদীর সুনেতৃত্বে গড়ে ওঠা নকশাল গণঅভ্যুত্থানের কাহিনী’। আন্দোলনকারীদের উপর প্রশাসনের নানারকম পাশবিক অত্যাচার এবং পরিশেষে অত্যাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাঁওতালদের প্রতিরোধের এক জীবন্ত দলিল হল ‘দ্রৌপদী’ গল্পটি।

> একটা বিশেষ সময় তার জ্বালা আর যন্ত্রণা নিয়ে...... মহাশ্বেতার লেখনীতে রূপ পায়। সাহিত্য ইতিহাস নয় কিন্ত কখনো কখনো সাহিত্য ইতিহাসকে ধারণ করে নিজের মধ্যে। শিল্পী হিসেবে মহাশ্বেতা তাঁর অনেক ছোটোগল্পের মধ্যেই সেই গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। সত্তর দশকের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস খুঁজতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তাঁর লেখার সাহায্য নেবে।[২৯]

গল্পের শুরুতে দেখা যায় একটা টানটান উত্তেজনা, হতাশা, রুদ্ধশ্বাস, টেনশন, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত ও অতিদ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তনে গল্পটি এক ভিন্ন মাত্র দিয়েছে। যা প্রত্যক পাঠককে গায়ে কাঁটা দেয়। গল্পে দেখতে পাই এক প্রশাসনিক হুলিয়া জারি করা হয়েছিল-

> নাম দোপ্দি মেঝেন্, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্ মাঝি(নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষত চিহ্ন (দোপ্দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা...।[৩০]

আদিবাসী সম্প্ররদায়ের সাঁওতালরা দৈনন্দিন জীবনে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বেশিরভাগ সময়েই তাদেরকে পাহাড় কিংবা পাহাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতে দেখা যায়। কারণ বন, জঙ্গলের ফল, মূল, কাঠ, পাতা, মধু সংগ্রহ করে এবং বাজারে বিক্রি করে সামান্য পরিমাণ আয় দিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা আর্থিকভাবে স্বছল না থাকার জন্য শিক্ষার আলোকে অনেকদিন পর্যন্ত আসতে পারেনি। যেখানে শিক্ষা নেই, বৈদ্যতিক আলো নেই, সেখানে শুধু দারিদ্র, অপমান ও অবহেলা আছে। সেখানে সরল গ্রামবাসীর দল পুরুষানুক্রমে

অবহেলিত, নির্যাতিত, রক্তে ঘামে মহাজনের ঋণ শোধ করতে তারা নিঃস্ব, তাই দুল্‌না বলছিল-

> আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেয়।[৩১]

তারা অধিকাংশই জানে না যে তাদেরও সমাজে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার আছে। অন্যান্যদের মতো তাদের খেয়ে পরে বাঁচর অধিকার আছে। তাই তাদের কাছে নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার, আচরণ, ছাড়া অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ফলস্বরূপ তাদের ছেলে মেয়েদের নামকরণের ক্ষেত্রেও পৌরাণিক দেবদেবীর নামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। আদিবাসী সাঁওতালরা ছোটলোক, তাই মেয়েদের নাম কি করে 'দ্রৌপদী' হয় বা আদৌ তা হওয়া উচিত কি না তাই নিয়ে দুই প্রশাসনিক ব্যক্তির আলোচনাকে মহাশ্বেতা দেবী অত্যন্ত সচেতনতার সহিত সুন্দরভাবে শ্লেষকে ফুটিয়ে তুলেছেন-

> সাঁওতালীর নাম দোপ্‌দি, ক্যান? আমি যে নামের লিস্ট লইয়া আসছি তাতে ত এমুন নাম নাই? লিস্টিতে নাই এমুন নাম কেউ থুইতে পারে।[৩২]

দ্রৌপদী মেঝানকে ধরার জন্য প্রশাসন চিরুণী তল্লাশী শুরু করে দিয়েছে, এমনকি তার নামে প্রশাসন ফতোয়া জারি করেছে। জীবিত অবস্থায় কেউ ধরে এনে দিতে পারলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সে একশত টাকা বকশিস্ পাবে। কেননা দ্রৌপদী মেঝান প্রশাসনের চোখে-

> মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওআন্টেড ইন মেনি... ড্যসিয়ের দুলন্ ও দোপ্‌দি দাওয়ালী কাজ করত, বিটুইন বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়া রোটেট করে ঘুরত। ১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটি গ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিন গান করা হয় তখন এরা দু'জনও নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। বস্তত এরাই মেইন ক্রিমিনাল। সুর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিশের হাতে সারেন্ডার না করাতেও। এবং অপারেশন বাকুলির আর্কিটেক্ট ক্যাপটেন অর্জন সিং প্রভাতে লাশ গণনা করতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীকে না পেয়ে তাৎক্ষনিক ব্লাডসুগারে আক্রান্ত হয়ে পুনর্বার প্রমাণ করে বহুমুত্র সত্যি দুশিন্তা ও উদ্বেগের ব্যাধিও বটে। বহুমুত্র বারোভাতারি। তার এক ভাতার অ্যাংজাইটি।[৩৩]

দ্রৌপদী মূলত লড়াকু নারী, তাই তার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ রয়েছে। বাকড়াঝাড় থানার অন্তর্গত ঝাড়খানী জঙ্গলের চারপাশে যে সব নৃশংস হত্যার কাজ, বন্দুক অপহরণ, থানা আক্রমণ এগুলির সবই নেতৃত্বের কেন্দ্রমূলে রয়েছে দ্রৌপদীর কলাকৌশল। তাই তাকে খতম করতে রাষ্ট্রশক্তি তথা সেনানায়কের দ্বারা সর্ব শক্তি প্রয়োগে প্রয়াসী হয়। ইতিপূর্বে বাকুলির অপারেশন চালানোর সময় ক্যাপটেন অর্জন সিংহ ব্যর্থ হন। শুধু ব্যর্থ নয় পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির দ্বারা লালিত পালিত কালো কালো জংলী মানুষদের প্রতি তার একটা ভয় জন্মায়-

নেংটি পরা কালো মানুষ দেখলেই সে'জান লে লি' বলে আসন্ন হয়ে ঘনঘন জল ফেরায় ও জল খায়।[৩৪]

আদিবাসীদের মুর্হুমুহু আন্দোলনকে পাল্লা দিতে না পারার জন্যই অর্জন সিংহের বহুমুত্র শুরু হয়। অর্জন সিংহ যেমন যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে পারদর্শী ছিলেন ঠিক তেমনই উগ্র রাজনৈতিক সম্পর্কেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। এমনকি শিখ সেনানায়ক 'এলেম'র চেয়েও কোন অংশে কম ছিলেন না। এলেম অর্জন সিংহকে শিখ জাতির গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করেন এবং পরে বুঝিয়ে দেন প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংহের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী অসাধারণ শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করে এক অভ্রান্ত লক্ষ্য পৌঁছে যান, প্রকাশ ভঙ্গির বিশিষ্টতায়। সেনানায়ক এলেম শিখ জাতির সমর প্রতিভার গুণগান শুনিয়ে অর্জন সিংহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং শেষে বুঝিয়ে দেয় সমর প্রতিভায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে বন্দুকের নলের উপরে বেশি করে আস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও উগ্র হিংস্রতা দিয়ে কিভাবে হিংস্রতাকে জয় করা যায় তার নানারকম কলাকৌশলের শিক্ষা দেয়। কারণ প্রশাসন যাদের নির্মূল করতে নেমেছেন তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করা। তাদের শ্লোগানই হল 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। তাদের দমন করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তবে যাই হোক প্রশাসন 'আর্মি হ্যান্ডবুক' কেতাবে লেখা জরুরী বিষয় গুলি যোগ্য সেনানায়ক অর্জন সিংহকে, শিখ সেনানায়ক এলেম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শন মাত্রে নিধন করাই হল সেনামাত্র পবিত্র কর্তব্য দোপ্‌দি ও দুল্‌না উক্ত যোদ্ধাদের ক্যাটেগরিতেই পড়ে, কেননা তারাও টাঙি-হেঁসো-তির-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে নিধনকার্য চালায়।[৩৫]

বহু যুবক যুবতী একই সঙ্গে থানার পর থানা আক্রমণ চালায় এবং মুহূর্তে মধ্যে ঝাড়খানী জঙ্গলে তারা বিলীন হয়ে যায়। এরফলে প্রশাসন খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বাকুলি ঘটনা থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর দ্রৌপদী ও দুল্‌ন মাঝি ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশ ধারণ করে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে সকল জোতদার, জমিদারদের বাড়িতে কাজ করেছে, এমনকি শহরেও তারা কুলি মজুর হিসাবে কাজ করতে গিয়েছে। সেই কাজের সুবাদে তারা অতি শীঘ্রই কার্যকলাপ বিষয়ে তাদের সংগঠনকে খবর দিতে পেরেছে এবং নিজেদেরকে সগৌরবে সংঠনের 'র‍্যাংক অ্যান্ডফাইল' সেনা হিসাবে ঘোষণা করেছে। অবশেষে প্রশাসনের সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঝাড়খানী জঙ্গলকে ঘিরে ফেলে, আর্ম বাহিনী ভেতরে ঢুকে পলাতকদের খুঁজতে শুরু করে। অপরদিকে কার্টোগ্রাফার বনের ম্যাপ আঁকতে থাকেন ও সেনারা পাহাড়ি ঝরণা গুলিতে পাহারা দেয়। প্রশাসনের তল্লাশকালে, বিশ্বাসঘাতক খেঁজিলাল দুখীরাম ঘড়ারী এক সাঁওতাল যুবককে চাটাল পাহাড়ের উপর উপুড় হয়ে জল খেতে দেখতে পায়। খেঁজিলাল দুখীরাম ঘড়ারী

সঙ্গে সঙ্গে সেনাদেরকে খবর জানায় এবং তারা মুহূর্তে মধ্যে গুলিবিদ্ধ করে। আগ্নেয়াস্ত্র ৩০৩ এর আঘাতে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সে শুধু দু হাত তুলে ভীষণ জোরে গর্জন করে 'মা-হো' বলে রক্ত বমি করে মারা যায়।

মৃত্যুপথ যাত্রী দুলন্ মাঝির মুখ থেকে উচ্চারিত 'মা-হো' শব্দ নিয়ে প্রশাসন ভীত সন্ত্রস্ত। আদিবাসী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নিয়মিত গবেষণা চালাতে শুরু করে। এই গবেষণা কর্ম সম্পর্কে চালাতে মহাশ্বেতা দেবীর সূক্ষ্ম শ্লেষ ধরা পড়ে, প্রশাসন বিদ্রোহী আদিবাসী সাঁওতালদের সম্পর্কে কতখানি ভীত ও সন্ত্রস্ত তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'মা-হো' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কি? এটা কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থীদের শ্লোগান না অন্য কিছুকে বোঝায়? এ নিয়ে প্রশাসন মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। প্রশাসন যে কতখানি ভীরু কাপুরুষ, অপদার্থ তা এই শব্দের অর্থ খোজার মধ্যে থেকে বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত সেনানায়ক, চমরু কাছ থেকে শব্দটির অর্থ জানা যায়-

> উটি মালদ'র সাঁওতালরা সেই গাঁধিরাজার সময়ে লড়তে নেমে বলেছিল বেটে! উটি লড়াইয়ের ডাক। প্রশাসনের অভিজ্ঞ ধুরন্ধর সেনানায়ক জানেন 'কোনো চেনাজানা পদ্ধতিতেই খচড়াদের নিকেশ করা যাবে না। তিনি মড়ির টোপ দেখিয়ে শিকারকে টেনে আনতে বলেন'।[৩৬]

দুলন্ মাঝির মৃতদেহ নিতে কেউ আসে নি, আগেই তারা প্রশাসনের প্রলোভনটা জানতে পেরেছিল। জঙ্গলের অতি দুর্গম পথ প্রশাসন কিংবা সেনানায়কদের কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সেই দুর্গম পথ চেনাবার ব্যাপারে প্রশাসনকে সাহায্য করেছিল খেঁজিয়াল দুখীরাম ঘড়ারী। আর শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদী'ই দুখীরাম ঘড়ারীর বিশ্বাসঘাতকতা কলাকৌশলকে ভেস্তে দিয়েছিল-

> খোঁজিয়াল দুখীরাম ঘোড়ারী অসংসারীর মতো দুলন্ সংশ্লিষ্ট বকশিস না নিয়েই কার যেন হেঁসোতে গলা দেয়।[৩৭]

দ্রৌপদী মেঝেনের তল্লাশী চলতে থাকে। প্রশাসন ঝাড়খানী জঙ্গল বেলটে দ্রৌপদীর নামে অপারেশন শুরু করেছে। প্রথম ফেজে পলাতকরা জঙ্গলের টোপোগ্রাফি না জানায় পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায়, কিন্তু পরবর্তী স্টেজে তারা মুখোমুখি সংঘর্ষে ধরা না পড়ায় প্রশাসনের কপালে ভাঁজ পড়ে যায়। তারা কোনো একজন বিশ্বস্ত ক্যুরিয়ারকে পেয়েছে সে যে দ্রৌপদী হতে পারে তা তাদের বিশ্বাস ছিল। দ্রৌপদী সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রশাসনের ভীতকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একই সঙ্গে সমাজের জমিদার, মহাজন, জোতদার শ্রেণিরাও সন্ত্রস্ত। একা দ্রৌপদী মেঝানেই প্রশাসনের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাই প্রশাসনের একমাত্র কাজ, যে করেই হোক দ্রৌপদীকে ধরা। দ্রৌপদীকে ধরা যে সহজ কাজ নয় তা প্রশাসন ভালভাবে জানে। এ ধারণাও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্রৌপদীকে ধরা গেলেও, তার সাহায্যর হাত ধরে তাদের সংগঠনের বাকি সদস্যদের ধরতে সে সাহায্য করবে না। বসাই টুডু'র বউয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে তার বজ্রকঠিন দৃঢ়তার পরিচয়ের

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার নামে প্রশাসন অতি ব্যস্ত। ওর নামে বখশিস্ ঘোষণার কথাও তার কাছে অজানা নয়। তাই তাকে বাধ্য হয়ে ছদ্মনাম নিয়ে বনজঙ্গলের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। দ্রৌপদীর ছদ্মনাম একমাত্র মুসাই টুডু ও তার বউ ছাড়া আর কেউ জানে না। মুসাই টুডু'র বউ-ই দ্রৌপদীকে খবর দিয়েছিল-

> ইবার সাজসাজন্ খুব স-ব নতুন পুলুস...দ্রৌপদী কি ভেবে নিল। তারপর বললো ঘর যা। কি হবে জানি না, মোরে ধরলে তুরা মোরে চিনবি না।[৩৮]

এদিক থেকে বিচার করলে দ্রৌপদী নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একেবারে পাকা পোক্ত মেয়ে। সে সংগঠনকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে জানে, তাই পরবর্তীকালে নেত্রীর অভাবে যাতে সংগঠন ভেঙে না পড়ে তারই বজ্রকঠিন নির্দেশ দিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রশাসন ভাবছে দ্রৌপদীকে হাতের কব্জায় নিয়ে আনতে পারলে আন্দোলনের অন্যান্য সাদস্যরা সহজে ধরা পড়বে। তাদের এই ধারণা দ্রৌপদী মেঝান সম্পর্কে যে, কতখানি ভ্রান্ত তার পূর্বাভাস মেলে তার বজ্রকঠিন সিদ্ধান্তে। এত দিনে সে শুনে অনেকটা শিখেছে কেমন করে নির্যাতনের সাথে পাল্লা দিয়ে মোকাবিলা করতে হয়। যদি নির্যাতনের পরিমাণ অতিমাত্রায় হয়, যখন শরীর ও মন ভেঙে পড়ে, তখন দ্রৌপদী নিজের জিভকে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতেও রাজি ছিল। স্বনামে ডাকলে দ্রৌপদী সাড়া দেয় না, এখন তার নাম 'উপী' মেঝান। হঠাৎ সে শুনতে পায়, দ্রৌপদী বলে পিছন দিক থেকে কে যেন ডাকছে। দ্রৌপদী নিজেকে সবসময় সন্দেহের ভয়ে আত্মগোপন করে রাখে। তাই তাকে সবসময় খুবই সতর্কে থাকতে হয়েছিল। 'দ্রৌপদি' নামে ডাক শুনার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে ফেলে আসা অনেক কাজ কর্ম মুহূর্তে চোখের সামনে জীবন্ত ছবির মতো ভাসতে থাকে। জোতদার মহাজন সূর্য সাউ বি.ডি.ও সাহেবের সাথে ষড়যন্ত্র করে দু বছরে নিজের বাড়িতে দুটো টিউবওয়েল ও তিনটে কুয়োঁ খুঁড়িয়ে নিয়েছে। প্রচন্ড খরায় বীরভূমে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। খাওয়ার জল থেকে শুরু করে চাষবাসের জলের জন্য সবাইকে সূর্য সাউয়ের কাছে শরণাপন্ন হয়েছিল। অবশেষে সূর্য সাউ গ্রামের লোকজনদের জল দেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে গ্রামের সমস্ত লোকজন তার বাড়ি ঘেরাও করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই সূর্য সাউকে নিহত হয়েছিল। দুল্না বলেছিল-

> আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়ে ছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই। দোপ্দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।[৩৯]

মহাশ্বেতা দেবীর লেখার বাস্তব জীবনেরই পূর্ণাঙ্গরূপ। জীবনের সেই রূপ প্রায়শই বঞ্চনার শোষণে অত্যাচার সমস্তরকম বাধাকে কাটিয়ে উপরে ওঠে। জোতদার সূর্য সাউয়ের বাড়িতে সন্ত্রাস ঠেকাতে পুলিশ প্রশাসন ছুটে এসেছিল, কিন্ত তার আগেই দ্রৌপদী আর দুলনা কাজ সেরে ঝাড়খানী জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। দুলনা ও দ্রৌপদী দুজন মিলে সুখের সংসার করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রশাসনের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত সুখের সংসার বাঁধতে পারেনি। দুলনা মাঝির

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন জোতদার, পুলিশ প্রশাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই আশা ভরসা নিয়ে দ্রৌপদী আপ্রাণ লড়েছে। দ্রৌপদী লড়াই শুরু করেছিল জোতদার কৃষকের শোষক সূর্য সাউয়ের চোখ উপড়ানোর মধ্যে দিয়ে। আবার পুলিশ তার নামে নোটিশ দিয়েছে, দ্রৌপদী সেটা জানতে পেরেছে। সে ভেবে নিয়েছিল কোনোরকমে একবার ঝাড়খানীর জঙ্গলে ঢুকে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত। জঙ্গলে দ্রৌপদী একা যেতে চায় সঙ্গে কাউকে নিতে চায় না, তাড়াতাড়ি জঙ্গলে গিয়ে বাকিদেরকে সতর্ক করে দিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর সমস্তরকম কলাকৌশল ব্যর্থ হয়। সন্ধ্যা ছয়টা সাতান্নতে দৌপদী মেঝান 'অ্যাপ্রিহেনডেড' হয়। পুলিশ ক্যাম্পে তাঁকে নিয়ে যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। কেউ তার গায়ে হাত দেয় নি। সাতটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয়-

ওকে বানিয়ে এস। ডু দি নীডফুল।[৪০]

এরপর থেকে শুরু হয় দ্রৌপদীর উপর নানারকম পাশবিক অত্যাচার, এই বানিয়ে নিয়ে আসা ব্যাপারটা যে কি, মর্মান্তিক, কি অমানুষকিতার পরিচয় দেয় তা লেখিকার নির্বাচিত শব্দ, যথাযথ বাক্য বিন্যাস, অসাধারণ সংযমে এক ভয়ংকর জ্বলন্ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন-

নড়তে গিয়েও বোঝে এখনও ওর দুহাত দু'খুঁটোয় এবং দুপা দু'খুঁটোয় বাধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপর নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে 'জল' বলে ওঠে সেই ভয়েও দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্ত স্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?..ঘোলাটে চাঁদের আলোয় চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিক মতো বানানো হয়েছে এবার ওকে সেনানায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কতজন? চার-পাঁচ-ছয়-সাত তারপর দ্রৌপদীর হুঁশ ছিল না। .....আবার বানিয়ে নেবার প্রকিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমাতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তারপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে নামে।[৪১]

দ্রৌপদীকে বড় সাহেবের তাঁবুতে নিয়ে আসার হুকুম হয়। এ অবস্থাতেও দ্রৌপদীর ভয় নেই, নির্ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছে-

কুথাক যেতে বলছিস?.... বলে, চল্ যেছি আমি।[৪২]

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়ায়, এবং সারা শরীরের কাপড় ছেঁড়ে ফেলে প্রখর সূর্যের আলোয় উলঙ্গ হয়ে বড় সাহেবের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে বড় সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ, উরুও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত, স্তনও দুটি ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় রয়েছে। কোমরে হাত রেখে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সাহেবের কাছে চলে এসে বলে-

তুর সাধানের মানুষ দোপ্দি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?[৪৩]

দ্রৌপদীর কালো শরীরের উপর চাপ চাপ রক্ত দেখতে আরও বীভৎস লাগছিল। দ্রৌপদী বড়ই দুর্বোধ্য, সেনানায়কের আরও কাছে চলে আসে এক অদম্য হাসি নিয়ে। হাসতে গিয়ে ওর ক্ষত

বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে, যে রক্ত নিজের হাতের চেটোতে মুছে ফেলে, আকাশ চেরা তীক্ষ্ণ গলায় বলে-

কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু ?"[৪৪]

অত্যন্ত ঘৃণার সহিত দ্রৌপদী সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটিতে রক্ত মাখা থুথু ফেলতে থাকে-

হেথা কেউ পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্-?"[৪৫]

প্রশাসনের কাছে, এদের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের পরিণাম হিসাবে সংশোধনাগার নয়, বরং সামরিক জওয়ান দ্বারা ধর্ষিত হওয়া। এভাবেই নকশালপন্থীর তকমা লাগিয়ে সাঁওতাল মেয়েদেরকে ধর্ষণ করাটা তাদের কাছে জলভাতের মতো মনে হয়েছে। এখন আর সেনানায়কের কাছে দ্রৌপদী দাঁড়াতে ভয় পায় না। তার দুই মর্দিত স্তন দিয়ে সেনানায়কে ঠেলতে থাকে, এই প্রথম দেখা যায় সেনানায়কে নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়।

আলোচ্য ছোটগল্পে সত্তর দশকের সেই জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা নিখুঁতভাবে বর্ণনা রয়েছে। সেই সময়ের ঘটনা নিয়ে অনেক লেখকের প্রচুর গল্প রয়েছে। কিন্ত 'দ্রৌপদী'র মতো খুব কম গল্প পাওয়া যায় যা একই সঙ্গে সময়ের সাক্ষী হতে পেরেছে, আবার অন্যদিকে সময়কে অতিক্রম করে বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করতে পেরেছে। গল্পে যখন দ্রৌপদীকে নগ্ন ও ধর্ষণ করা হয়, তখন এর মধ্যে দিয়ে শুধু কিছু ব্যক্তি মানুষের মাংসল খিদেই ধরা পড়ে না, একই সঙ্গে রাষ্ট্র নিজেও নগ্ন হয়ে যায়। তথাকথিত স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক দেশের শাসন ব্যবস্থায় ধর্ষণ নামক নক্কারজনক কাজের জন্য কঠিন সাজা রয়েছে, তাহলে দ্রৌপদীকে যারা এক সঙ্গে গণধর্ষণ করল, তারাই আবার দেশের বিশেষ প্রতিরক্ষা বাহিনী অর্থাৎ রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসন জনপ্রতিরোধের মুখে অস্ত্রের নল ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়েছে, গল্পে আমরা তারই পরিচয় পাই। দ্রৌপদী তাঁর সম্ভাব্য হত্যাকারীর সামনে নির্ভয়ে নিজের নগ্ন দেহকে একটি অস্ত্রের মতো করে এগিয়ে দিয়েছে। অত্যাচারিত হওয়া ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে অত্যাচারীকে ভয় পেতে বাধ্য। আর এখানে তারই প্রতিফলন দেখি, বিমর্দিত রক্তাক্ত স্তন দুটিই হয়ে উঠেছে দুর্জয়, সাহসিকতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম চেতনার প্রতীক। আর এখানেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'দ্রোপদী'র জয়।

'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের ঘটনাস্থল হল বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলার অরণ্যভূমি অঞ্চল। গল্পের সময়কাল ১৯৭০-১৯৭৬ সালের পশ্চিমবাংলার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী ভূমিকা, প্রতিবাদের বাস্তবমুখ, জীবনের ক্ষয়িষ্ণু বিপর্যস্ত রূপ মূর্ত হয়েছে। গল্পের কাহিনির দুটি ধারা রয়েছে মাতো ডোমের কাছে চরসার দুর্গম জঙ্গলে মৃতপ্রায় বসাই টুডুর আশ্রয় নেবার সংবাদ পেয়ে সি.পি.আই(এম) এর কমরেড কালী সাঁতরা তার সঙ্গে দেখা করতে যায়। অপর ধারাটি হল কালীর চেতনায় ১৯৭০ সালে বসাইয়ের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি, যা 'ফ্লাশ ব্যাক' এ দেখা যায়। সেখানে বসাইয়ের জীবন, কালী

সাঁতরার জীবনের ইতিবৃত্ত ও বামপন্থী রাজনীতির অভিমুখ, গতিপ্রকৃতি ও আদর্শের সংবাদ জানা যায়। সত্তরের দশককে 'মুক্তির দশক' বলা হয়, নকশালবাড়ি আন্দোলনের শ্লোগান, সংগ্রামের গতি-পরিণতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে বঞ্চিত শোষিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, মুক্তি প্রতিষ্ঠার তীব্র বাসনা ফুটে উঠেছে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে বসাই টুডু চরিত্র সৃষ্টিতে মহাশ্বেতা দেবীর মন্তব্যটি হল-

> নকশালবাড়ির ঘটনাবলি এবং তার প্রেক্ষাপটের উল্লেখ এখানে মুখ্যত আমার কাহিনিগুলির পটভূমির প্রয়োজনে হলেও, অনস্বীকার্য যে এ দেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মতো ঘটনা। বসাই টুডু-দ্রোপদীরা এসব ঘটনারই আপাত ফললাভ, যদিও সংগ্রামে তারাই সমাজ-বদল ঘটায় এবং পরিণামে নাম ও স্থানিক অবস্থান ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে কাল ও দেশের প্রতীক। অবশ্য কোনো আন্দোলনই হয়তো পন্থা ও পরিণামে শেষ সত্য নয়; একমাত্র ইতিহাসই তার মূল্য-নিরূপক। আর চলমান সংগ্রামী মানুষ তাই সর্বদেশে-কালে নিজেদের গড়া সমস্ত পথ ভেঙে নতুন পথ গড়ার স্বপ্ন দেখে এবং শপথ নেয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিপথে সে করণেই প্রতিনিয়ত উত্তরণের সত্যই সত্য নামে চিহ্নিত হয়।[৪৬]

বসাই টুডু'ই গল্পের নায়ক ও আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনের নেতা। গল্পে আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল সি.পি.আই(এম) দলের সমর্থক কালী সাঁতরা। মহাশ্বেতা দেবী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বসাই-কালী চরিত্রের কাটাছেঁড়া করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দিনবদলের আশায় উন্মুখ, সত্তরের দশকে মধ্যবিত্তের চেতনায় স্বপ্ন ভাঙা দুর্বার হয়ে ওঠে। কালী সাঁতরা কমিউনিস্টদের মতাদর্শে বিশ্বাসী অপরদিকে বসাই টুডু কৃষক, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের একজন সক্রিয় নেতা। বসাই কিষাণ সভাকে ঘৃণা করেছে, কমিউনিস্টদেরকে ভালো চোখে দেখেনি। কারণ, সে জানে এরা কেউ সাঁওতাল ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে কথা বলে না। কালী সাঁতরা ও বসাই টুডু উভয়েরই মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন পথ রয়েছে। তবুও বসাইয়ের প্রতি কালী সাঁতরার এক অস্বাভাবিক দুর্বলতায় আছন্ন। বসাই চরিত্রটি হল নকশাল কিংবা নকশালের ঊর্দ্ধ্বে এক আদর্শায়িত জগতে বিচরণকারী এক স্বতন্ত্র সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। বসাইয়ের সংগ্রাম হল কৃষক মজুরদের স্বার্থ রক্ষা করা। স্বার্থ রক্ষা করতে সে গ্রামের জোতদার, জমিদার এবং তাদের মদত পুষ্ট পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে একা লড়াই করেছিল। সামান্য পরিমাণ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে জোতদার, জমিদারদের চোখে তার চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। সরকারি আইনে ক্ষেতমজুর বৃদ্ধি পেলে পার্টি তা বাস্তবে রূপায়িত করতে আগ্রহ দেখায় না। কমিউনিস্ট পার্টির উদাসীনতা ও দায়বদ্ধতাহীনতা দেখে বসাইয়ের পার্টির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে যায়। বসাই যখন ক্ষেতমজুরদের নিয়ে আন্দোলনে ব্যস্ত, হঠাৎ তখন সেই সময় কালী সাঁতরাকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে তার কাছে পাঠানো হয়। কালী সাঁতরা আগেই জানে, পার্টির নীরবতার বিরুদ্ধে বসাইয়ের অভিযোগ মিথ্যা নয়। পশ্চিমবাংলার বুকে

সেই সময় প্রায় ৩৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর সরকারি রেটে মজুরি থেকে বঞ্চিত, সেদিকে সরকারের চিন্তা নেই। বস্তুত, 'সাচাই' বসাই 'সাচাই কমরেট' কালী সাঁতরার 'পূর্ণতর সত্তা'। 'একটি অ্যাকশন অপারেশন' এ বসাই টুডুর সম্পর্কে সব কিছু জানার জন্য কালী সাঁতরার নাম পুলিশের কাছে লাল কালিতে 'মার্ক' করা হয়েছে। কালী সাঁতরা সি.পি.আই(এম) পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। সে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থ তাই পরিবারের লোকজনদের কাছে সম্মান পায় না। সারাজীবন পার্টির জন্য সততার সহিত কাজ করেও, পার্টির লোক তাকে সম্মান দেয় নি। তাই বসাই পার্টির উপর ভরসা না করে, ব্যক্তিগত আদর্শ ও দায়বদ্ধতার কথা মনে করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপরদিকে কালীর মনে পার্টির বিরুদ্ধে নানারকম ক্ষোভ থাকলেও সে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। অবশেষে কালী বসাইয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। পিয়াসোলের হরিধন সর্দার মিনিমাম ওয়েজের(Minimum Wage for Agricultural Labourers) সরকারি অর্ডারের বিরুদ্ধে 'ইনজাংশন' জারি করে। সেনাদল ও পুলিশের আগে কালী বেতুল কাওরার সহায়তায় চরসার জঙ্গলে পৌছে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে আহত বসাই মারা গেছে। হরিধন সর্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে গিয়ে বসাইয়ের পায়ে চোট লাগে, সেই ক্ষত ধীরে ধীরে বেড়ে যায় এবং শেষে মারা যায়। বসাইয়ের এই পঞ্চম মৃত্যুও আরো বেশি করে রহস্যঘন হয়ে ওঠে। এর পূর্বে চারটি অপারেশনে বসাই কখনো হয়েছে বসাই, দুলনা, মুসাই বা অন্য কেউ, তারা সবাই এক একটি অপারেশনে নিহত হয়েছে। পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ঘোষিত হলেও বসাই এক রাতে আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়। বসাইকে গোর দিলেও, সে আবার ষষ্ঠ বসাই হয়ে ফেরার হয়েছে। আদিবাসীরা বসাইয়ের নাম করে সংগ্রামকে চালিয়ে যেতে চেয়েছে। লেখিকা বসাই টুডুদের লড়াইয়ের আমৃত্যুকে দেখিয়েছেন-বসাইদের মৃত্যু নেই-যতদিন না তারা নিজেদের অধিকারকে কায়েম করতে পারছে-

> বসাই ধর্মরাজের মতোই অমোঘ ও প্রতিহিংস্র। মাতোকে সে ভীষণ শাস্তি দিতে পারে। ভয়ে বিবশ হয়ে মাতো কালী সাঁতরার কাছে যায়। কালী সাঁতরা প্রৌঢ়, রেজিমের লোক, কৃষক আন্দোলনে একদা বসাইয়ের সহকর্মী, 'জিলা বার্তা' নামক ধ্যাবড়া-ছাপা সাপ্তাহিকের সম্পাদক।[৪৭]

বসাই বুঝতে পেরেছে কমিউনিস্ট পার্টি জোতদারী কারবার শুরু করেছে। একদিন যে সামন্তবাবুকে সে 'কমরেট' বলে সম্মান দিয়েছে, সেই সামন্তবাবু আজকে গাড়ি-বাড়ি, ছেলের চাকরি নিয়ে বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। এছাড়া পার্টির তারকবাবু, লক্ষণবাবু ও সূর্য সাউ সবাই সামন্তবাবুর মতোই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তাই বসাইয়ের আক্ষেপ- 'তুরা মর, আমু বড় হই?' এ ক্ষোভ বসাইয়ের নিছক আক্রোশ নয়, যুক্তি নির্ভর তা কালী সাঁতরাও মেনে নিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে দার্জিলিং- জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষেতমজুরের স্বার্থে 'Minimum Wage' আইন বিধিবদ্ধ হলেও কিষাণ সভা জেনেও উদাসীন। বসাই প্রথম থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে অন্যদিকে নকশালদের আদর্শেও বিশ্বাসী নন।

নকশালদের জোতদার খুন, মূর্তি ভাঙা, প্রশাসনকে হটিয়ে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা ও সেখানে সন্ত্রাসরাজ তৈরী করা, এ সব বসাইয়ের আদর্শ সম্মত নয়। আদিবাসী সমাজের ক্ষোভ কমিউনিস্টদের ফ্রন্টের উপর কারণ, তারা জোতদারদের স্বার্থকে বাঁচায়, আবার কৃষক আন্দোলনও মদত দেয়, নির্যাতিত ক্ষেতমজুর বা আধিয়ার ভাগ চাষিদেরকে পুলিশি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করে, তাই তারা (সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও এবং বাউরি প্রভৃতি আদিজনজাতি) বাধ্য হয়ে বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। তখনই আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণি মানুষরা প্রশাসনের চোখে নকশালি হয়ে উঠেছে। বসাইয়ের নেতৃত্বে আন্দোলনের ভিন্ন মাত্রা পায়। বসাইয়ের বিদ্রোহের পথ নকশালদের মতো সশস্ত্র বিদ্রোহ নয়, উগ্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নয়, বসাইয়ের চিন্তা চেতনার ভিন্ন পথ, ভিন্ন মুখ সম্পর্কে কালী সাঁতরা ধন্দে পড়ে যায়। বসাই বিনা রক্তপাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল।

গল্পে বসাই টুডু নকশাল রূপে চিত্রিত হলেও কেবল কয়েকটি গুণের জন্য 'বসাই' চরিত্রটি আলাদা,তাঁর সমাজ সচেতনতা, শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মের ব্যপ্তি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। বসাই একজন ক্ষেতমজুর হয়ে ক্ষেতমজুরের স্বার্থ বা অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক কর্মীরূপে নিয়োজিত হয়েছিল। সে কমিউনিস্ট নয়, নকশালও নয়- সে এক নতুন পথের পথিক। বসাইয়ের বিশ্বাস যে বাবুদের পার্টিতে কাজ করার সঙ্গে আদিবাসীদের পার্টি করার মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। ১৯৪৩ সাল থেকে বসাই কিষাণসভার সঙ্গে যুক্ত। সে 'নালিতাবাড়ি কনফারেন্স', বর্ধমানের 'হাট গোবিন্দপুরের কনফারেন্স', প্রভৃতি সম্মেলনে যোগ দিয়ে দেখেছে 'কিষানসভা' ক্ষেতমজুর শ্রেণিকে দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনা, সময়ে-অসময়ে এদেরকে মদত দিতেও নারাজ।

> ......বীরু পাঠক কেনী, যে মোর কাজে মদত দিবু, আমু তার সাথের সাথী। এখন শুন- .... হ্যাঁ কালীবাবু, তারপর বর্ধমানে, মেদিনীপুরে খেতমজুর পার্টি হলু, কিন্তু যখন দেখলু কিষানসভা, খেতমজুর দলরে ফেলে দিলু পাপগর্ভের ছেলার মত, কুন্ অ সময়ে মদত দিল নাই, তখন হথে লিজের কথা ভাবতে লাগলাম।[৪৮]

বসাই তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, একটা নতুন আলোর পথ সন্ধান করেছে, সে পথ কমিউনিস্ট বা নকশালদের আদর্শে তৈরী নয়, ক্ষেতমজুরদের দ্বারা নির্মিত স্বতন্ত্র এক পথ। সে পথে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় থাকবে না। বসাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস আছে সেই পথ দিয়ে শোষিত নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব।

'অপারেশন বাকুলি' ছোটগল্পটি নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। বাকুলি সহিংসতার পূর্বে জোতদার সূর্য সাউ ও রোতোনি সাউরা তৎকালীন সরকারের সহায়তায় আদিবাসীদের উপর নানারকম অত্যাচার করেছিল। ১৯৭৩ সালে বসাই টুডু, দ্রৌপদী মেঝেন, দুলনা মাঝি প্রভৃতি নকশাল আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বাকুলি জঙ্গলের বুকে জোতদারদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছে তা সূর্য সাউ ও তাঁর ভাই রোতোনি সাউরা স্বপ্নেও ভাবতে

পারেনি। বসাই টুডু সূর্য সাউকে কোপ মেরে নিহত করে। অপরদিকে রোতোনি সাউ দাদার মৃত্যুর খবর শুনে প্রতিকারের আশায় বসাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে-

> ওরা সূর্য সাউকে ধরে, তোলে। গোরু খুলে ফেলে, গাড়িতে তাকে বাঁধে। টেনে নিয়ে যায় কানালের ধারে। বলির পশুর মতো ফেলে, ও বসাই কোপ মারে। তারপর বহু হাতে বহু কোপ। রোতেনি, সূর্যের ভাই দৌড়ায় থানায়।[৪৯]

ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের নেতৃত্বে 'বাকুলি অপারেশন' শুরু হয়ে যায়। মেশিনগানের টার্গেটে -এ কে পুরুষ, কে নারী, কে শিশু সে হিসেব থাকে না –

> ভারতের গর্বস্থল জওয়ানরা ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের নেতৃত্বে বাকুলির চড়কপাটা বসার থান পাকুড় গাছটি ঘিরে ফেলে। পাকুড় গাছছটির নীচে ওরা জমায়েত হয়েছিল। অর্জন সিং প্রথম আদেশ দেয় 'ক্লোজ কানাল অ্যাপ্রোচ।'......সমগ্র জায়গাটি কর্ডন করে হেভি মেশিনগান চালানো হয়। জওয়ানরা তখন কান্না শুনে বোঝে, শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরা ও শিশুরাও আছে। কিন্তু তখন আর থামা সম্ভব ছিল না। এ রকম অপারেশনে যা হয়, প্রথমে জওয়ান বা পুলিশ বন্দুককে চালায়। পরে আগ্নেয়াস্ত্রই তাদের চালায়। যন্ত্র-যন্ত্রের কোনো বিবেচনা উদয় হতে পারে না। মেশিনগানই যখন কিলার, তখন টার্গেটের মধ্যে কে পুরুষ, কে নারী, কে শিশু সে হিসাব করা সম্ভব নয়। মেশিনগান মাউন্টেড গান মেকানিক্যাল লোডেড অ্যান্ড ফায়ার্ড, ডেলিভারিং কন্টিনিউয়াস ফায়ার।[৫০]

ভয়াবহ গণহত্যায় লাশের পর লাশ পড়ে থাকে। সমুখ সংঘর্ষে এক মাচার উপর অর্জন সিংহের গুলিতে বসাইয়ের সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাকে শনাক্ত করে কালী সাঁতরা। চরসার বুকে যে বসাইকে কালী শনাক্ত করেছিল, এ সে বসাই নয়। এ নিয়ে কালী বসাইয়ের তৃতীয় মৃত্যু দেখে, সে মৃত্যু বসাই নামে মুসাইয়ের মৃত্যু, নকশাল আন্দোলনের সংগ্রামী মুসাই বসাইয়ের নাম নিয়ে সূর্য সাউকে হত্যা করে। এই মুসাইয়ের স্ত্রীর রান্না ভাতই কাপড়ে বেঁধে দ্রৌপদী মেঝেন বাকুলি থেকে 'অপারেশন ঝাড়খানি ফরেস্ট' এ আত্মগোপন করে, সেখানেই পুলিশের গুলিতে দুলনা মাঝির মৃত্যু হয়। এভাবেই প্রশাসনিকের সহায়তায় ও জোতদার জমিদারদের রাজনৈতিক দাপটে আদিবাসীদেরকে অত্যাচারিত হয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নুন' ছোটগল্পে ঝুঝার গ্রামের মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে আংশিক রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে মুণ্ডা আদিবাসীরা ছোটনাগপুরের পালামৌ অভয়ারণ্য বসবাস করত। মুণ্ডারা কঠোর পরিশ্রমী ও সহজ সরল ছিল। তারা লেখাপড়া জানত না, তাই দালালদের কাছে প্রতিনিয়তই প্রতারিত হত। ১৮৩১ সালে কোল বিদ্রোহের পর বেনে উত্তমচাঁদের পূর্বপুরুষরা ঝুঝার গ্রামের অধিবাসীদের দলিল, পাট্টা সমস্ত কিছুই দখল করে নেয়। পরে উত্তমচাঁদ সেখানে অবাদে রাজত্ব চালায়। রাজনৈতিক নির্বাচনের সময় সরকার বা রাজনৈতিক নেতারা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিকেই মনোনীত করে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিও নিজের সম্পত্তি ও প্রভুত্ব কায়েম রাখতে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বা শাসনের চাপে সাধারণ মানুষকে করায়ত্ত করে নির্বাচনে জয়লাভ করে। জয়লাভ করার পর আদিবাসীদের নামে আসা

সমস্তরকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিজেরা ভোগ করে। নিজেদের ভোটের যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তা মুণ্ডারা উপলব্ধি করতে পারে নি-

> স্বাধীনতার পর তৃতীয় নির্বাচন অবধি তো ওদের অস্তিত্বই সরকার জানত না। ভোট দিচ্ছে ওরা চতুর্থ নির্বাচন থেকে। ভোটের সময়টা ভালো। উত্তমচাঁদ বলে, সেই জঙ্গল হতে ভোট দিতে আসবি? যা, একটা করে টাকা নিয়ে যা বাপ সকল, মায়েরা! আমিই ভোট দিয়ে দিব।[৫১]

ভারতের পঞ্চম বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তারা নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝত না। ১৯৭৭ সালের ষষ্ঠ নির্বাচনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর দল সর্বত্র প্রচার চালায়। রাজনৈতিক ধারণা সবার কাছেই পৌঁছে যায়। এরফলে আদিবাসী মানুষরাও নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝেছিল। তাই নির্বাচনের সময় সামান্য অর্থের মোহে অন্ধ না হয়ে সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্য তারা সাধারণ শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিকে জয়ী করে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ঝুঝার গ্রাম থেকে পূর্তি মুণ্ডা নির্বাচিত হয়। ভোটের পর নতুন মন্ত্রীসভায় পূর্তি মুণ্ডাকে নেতা করে। পূর্তি মুণ্ডা নির্বাচিত হওয়ার পর সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘ঘন্টা বাজে’ ছোটগল্পে আদিবাসীদের উপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে উল্লিখিত পিপল গ্রাম থেকে তিনটি ছেলে রাজীব, বরুণ ও রবি বিরহাতে যায়। সেখানকার আদিবাসীদেরকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে। রাজীবের বক্তব্য, বিরহার আদিবাসীরা যেন খাস জমি দখলের অধিকার না ছাড়ে, সে জমির দখল রেখে তাদের নামে ‘রেকর্ড’ করতে হবে- খাস জমি একমাত্র ভূমিহীনদের অধিকার থাকবে। মূলত রাজীব, বরুণ ও রবি নকশালপন্থী। বিরহা গ্রামের তাদের অন্যতম সদস্যরা হল ভরত, সনাতন ও দুলাচাঁদ, তারা নকশালপন্থীদের প্রশাসনিক বিরোধিতা কার্যকলাপের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই নকশাল তরুণদের কার্যকলাপের আদর্শ হল- লড়াই করে জমির দখল রাখতে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে, যে জমির দখল নিতে আসবে তাকে মারতে হবে। পুলিশ, মিলিটারি গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পিপল গ্রামে নকশালদের খোঁজে তল্লাশি চালায়। ভরত সিংয়ের ছেলে সুবল সিং মুণ্ডা সাহস করে পুলিশের সামনে গ্রামের খাস জমির প্রসঙ্গ তোলে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পুলিশ অফিসার বিজিত গুপ্ত তাকে নানারকম সুযোগ সুবিধার কথায় প্রলোভিত করে চক্রান্তের জালে জড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যান্য আদিবাসীদের কাছ থেকে সুবলকে আলাদা করে এবং পুলিশ অফিসার বিজিত গুপ্ত সরাসরি তাকে জানিয়ে দেয়- ডোম, বাউরিদের কথা ভাবি না। ওরা তো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে না, তুমিও এদের কথা ভেবো না, ওরা মুণ্ডা নয়। পুলিশ অফিসার বিজিত গুপ্তের নির্দেশে পিপল ও বহুলায় নকশাল সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যচার, মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠনের কাহিনি, ঘরে অগ্নি সংযোগ ও নৃশংসভাবে গুলি চালানো প্রভৃতি ঘটনার খবর বিরহা গ্রামে পৌঁছায়। দুই সাঁওতাল যুবক তপা ও সদন পুলিশের গুলিতে মারা যায়, পুলিশের চোখে তারা

নকশাল যুবক। পুলিশ অফিসার বিজিত গুপ্ত প্রভাস ভূঞার সহায়তায় বিরহা গ্রামে নকশাল সমর্থকদেরকে ধরার তল্লাশি চালায়। যেহেতু বিরহা গ্রামের আদিবাসীরা খাস জমির দখল ছাড়ে না, তারা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরির লড়াইয়ে সামিল। বিরহা গ্রামের ভেতর জঙ্গলে নকশালদের গোপন আস্তানার খবর পেয়ে সন্দেহবশত পুলিশ-মিলিটারি জঙ্গলে ও গ্রামে আগুন জ্বালায়, বহু নিরীহ মানুষ মারা যায়। পুলিশ-মিলিটারির আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুকের সাথে আদিবাসীদের অসম তীর-ধনুক, টাঙ্গি-বল্লমের লড়াই শুরু হয়। অবশেষে আদিবাসীরা প্রশাসনের কাছে হেরে যায়। সুবল গ্রামে ফিরে আসে, গ্রামবাসীরা সুবলকে আর বিশ্বাস করে না, তার দেওয়া কৈফিয়ৎ তারা গ্রাহ্য করে না। তীব্র ক্ষোভে-দুঃখে অপমানে সুবল গভীর জঙ্গলে ঘন্টার শিকলে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুণ্ডা সন্তান সুবল আদিবাসীদের শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও নকশাল সম্পর্কে পুলিশের ষড়যন্ত্র তার ধারণার বাইরে ছিল। সে অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের মানুষ যা আদিবাসী চরিত্রের বিপরীতমুখী। তাই তার মৃত্যু আদিবাসী সমাজে সহানুভূতি পায় না। আলোচ্য গল্পে কংগ্রেসি আমলের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তন ও নকশাল আন্দোলনের রক্তাক্ত দিনের অবসান প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে বিরহা গ্রামের অনেক মানুষ হারিয়ে গেছে, সেই ঘন্টা সুবলের মৃত্যুর প্রতীক বিপদের সংকেত বহন করে। প্রশাসনিকের সব জায়গায় (ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত অফিস) বিরহা গ্রামের বাসিন্দারা নায্যে বিচার পায় না। পঞ্চায়েত প্রধান নব ভুঞা রাজনৈতিক নির্বাচনে হেরে গেলেও, ভূঞা সম্প্রদায়ের দখলে থাকা খাসজমি কেউ কেড়ে নেয় নি। অপরদিকে আদিবাসীরা সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আদিবাসীরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দু'দিক থেকেই শোষিত হয়েছিল।

৪. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতি:

লোকসংস্কৃতি বলতে কোন একজন ব্যক্তি বা মানুষের সংস্কৃতিকে বোঝায় না, একদল মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকেই বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডবসবাসকারী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাত্রার নানারকম ক্রমবিবর্তন এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে। এক কথায় বলতে গেলে, সংস্কৃতি হল ক্রমবিবর্তমান সভ্যতারই উৎকর্ষের ফল। এ উৎকর্ষ কেবলমাত্র জীবনযাত্রার দিকটিই প্রতিফলিত করে। সংস্কৃতি মূলত অনুশীলন নির্ভর তা বংশ পরম্পরায় বহমান। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে অর্থাৎ আদিম সমাজে মানুষ যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, প্রকৃতিতে যখন মাঠের ফসল পেকে উঠে কিংবা বসন্তে প্রখর সুর্যের আলোয় শাল, পিয়ালের পলাশ, বনজঙ্গলকে রাঙিয়ে তোলে অথবা হঠাৎ আকাশ থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে এতে আদিম মানুষেরা কত-ই

না আনন্দ পেত। এই আনন্দ বেশির ভাগ স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যর মাধ্যমে প্রকাশ পেত। পরবর্তী পর্যায়ে আদিম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ নৃত্য করত, তারা নাচত বিশেষ করে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে। শিকার যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আদিম মানুষ উদ্দীপিত হওয়ার জন্য নাচত, বিভিন্ন পশুপক্ষীর গলার স্বরকে নকল করত। আর এভাবেই আদিম অধিবাসীর বংশধররা আজও শিকার সংস্কৃতিকে অখন্ডভাবে বজায় রেখেছে।

লোকসংস্কৃতির বিষয় বৈচিত্র্যর উপর ভিত্তি করে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, সেগুলি হল-

১। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

আদিবাসী লোকসমাজে বসবাস ও তার পার্শবর্তীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলে। সেগুলি হল- ঘরবাড়ি, খাদ্যপানীয়, পরিধান, প্রসাধনদ্রব্য, কৃষি ও শিকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

২। বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

এক কথায় বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকপ্রথা, লোক অনুষ্ঠান, লোক উৎসবের সমষ্টিকেই বোঝায়। বিশ্বাস কেবল মানুষের মনে ধারণা মাত্র। যেমন- 'আমে ধান তেঁতুল বান'। লোকবিশ্বাস রয়েছে- যে বছর আমের ফলন বেশি হয়, সে বছর ধানের উৎপাদন বেশি হয়। আর তেঁতুল বেশি হলে সে বছর বন্যা হয়।

৩। খেলাধুলা কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

আদিবাসী লোকসমাজে প্রচলিত খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে 'খেলাধুলা কেন্দ্রিক' লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। তাই খেলাধুলা কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যেমন- লুকোচুরি, কানামাছি, ডাংগুলি, হা-ডু-ডু ইত্যাদি।

৪। বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

এটি মূলত স্মৃতিবাহিত ও শ্রুতিনির্ভর লোকসংস্কৃতি। ধারাটি বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে রচিত, মুখে মুখে প্রচলিত। যেমন- ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, গীত, গীতিকা কথা, রূপকথার কাহিনী ইত্যাদি।

৫। অঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

আদিবাসী লোকসমাজে অঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক লোকনৃত্য গুলিকে লোকসংস্কৃতির অঙ্গ রূপে ধরা হয়। যেমন- কালীকাচ, গাজন, রাক্ষস নৃত্য, বাউল ও ফকিরি নৃত্য, পাতা ও কাঠি ইত্যাদি।

৬। অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি:

অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে, আদিবাসী লোকসমাজে প্রচলিত অঙ্কন বা লিখন শিল্পকে বোঝায়। যেমন- আলপনা, দেওয়াল চিত্র, মাটির ঘট বা সরার উপর অঙ্কিত চিত্র, পটচিত্র ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পের পরিসর বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। তাঁর গল্পের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন রকম উপাদান। গল্পে আদিবাসী জনজীবনের সেই লোকসংস্কৃতির উপাদান কতখানি রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল-

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের প্রায় বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়, একেবারে মাটির কাছাকাছি বসবাস করা ভূমিপুত্রদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার কথায় তাঁর কলমের ডগায় ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সমকক্ষ করে তোলার জন্য সংবিধানে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৭৫ বছর পরেও দেখা যায় 'আদিবাসী পঞ্চশীল নীতি' ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে। একথা সত্য আদিবাসীদের উন্নয়নের নাম করে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, বাস্তবে সেই টাকা আড়ম্বর আর প্রশাসনে ব্যয় হয়েছে কাজের কাজ কিছু হয়নি। দেশের মোট জনসংখ্যার ছাব্বিশ শতাংশ হয়েও এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় বরাবরই সমস্ত রকম প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই আজও তাদের কাছে অনাহার, অর্ধাহার, নিত্যসঙ্গী হয়ে রয়েছে। পেটের জ্বালা মেটাতে গিয়ে বনজ ফলমূল, পাতা, জীবজন্ত এমনকি অনেক সময় অতি নিকৃষ্ট মানের খাবার খেয়েও তাদের দিনপাত করতে হয়। আজও তাদের বাঁচার ন্যূনতম উপাদান জোটে না। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও স্বাধীনতার স্বাদ আজও বুঝতে পারল না, চির বঞ্চিতই রয়ে গেল। প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত নিপীড়িত, এই সব সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া, শবর, ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতির প্রতি মমত্ববোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে মহাশ্বেতা দেবী বার বার তাদের কাছেই ফিরে গেছেন। সেই সব চিরন্তন বাস্তব সত্য চরিত্রগুলোই তাঁর সাহিত্যে এক এক করে ফুটিয়ে তুলেছেন। একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে কোন সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে সেই সম্প্রদায় যা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারে না। হোক না সে আদিবাসী জীবন অথবা উন্নত নাগরিক জীবন। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনকে বাস্তব সম্মতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাই সঙ্গতভাবে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে আদিবাসী জীবন কখনও পরিপূর্ণ নয়। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে আদিবাসী সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন- *অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা, কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্চির জীবন ও মৃত্যু, ব্যাধখন্ড* প্রভৃতি।

ছোটগল্পগুলিতেও তাঁর আদিবাসী সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় মণিমুক্তের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে উপন্যাসের তুলনায় খুবই কম। আমরা তাঁর ছোটগল্প গুলিতে আদিবাসী সংস্কৃতিকে দুভাবে পাই-

ক. সরাসরি তিনি কোন আদিবাসী সংস্কৃতি, কোন প্রচলিত প্রথা, কোন সংস্কার কিংবা কোন কুসংস্কারকে অবলম্বন করে হুবুহু গল্প লিখেছেন। যেমন- 'শেষ শামানিন', 'শেষ ঝোক্‌তা', 'শিকার', 'বাঁয়েন' প্রভৃতি এ ধরনের গল্প।

খ. আদিবাসী কেন্দ্রিক প্রায় সব গল্প গুলিতে কমবেশি করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতির কথা। যা অনেক সময় ঐ গল্পের মূল ভাবটি দ্যোতিত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

আদিবাসী সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'শিকার'। শিকারের কথা উঠলে প্রত্যেক আদিবাসী যুবক কিংবা বৃদ্ধের রক্তে আনন্দের একটা জোয়ার আসে। শিকারের প্রবল আকর্ষণে তারা বিপদের কথা ভুলে যায়। জীবনের কোন এক কাঙ্খিত আশা মেটাবার জন্য নয়, কিছু পাওয়ার আশায় নয়। তারা তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অধিকার দিয়ে এই প্রাচীন প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই এ উৎসব পালন করে। কারণ শিকার তাদের জীবনে কেবলমাত্র খেলাধূলার অঙ্গ বা উৎসব মাত্র নয়, জীবনধারণেরও একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল। বনজঙ্গলে বসবাসের সুবাদে আদিবাসী সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কে অতি অল্প বয়স থেকে শিকারের কৌশল শিখতে হত। অনেক সময় তাদেরকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তীর, ধনুক, বর্শা, হাতে নিয়ে বন্যজন্তু শিকারের আশায় বেরিয়ে পড়তে হয়। এই শিকার মাঝে মধ্যে তাদের জীবনে একটা উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। তারা বার, ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র দেখে বাৎসরিক শিকার পরবের দিন ধার্য করে। এই প্রথা এখনও বিহারে দেখা যায়। এটা তাদের কাছে ন্যায় বিচারের উৎসব বলে। প্রথমদিকে আদিবাসীরা ন্যায় বিচারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে যেত না। আদিবাসী সমাজে সমাজপতিরাই এই বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকতেন। শিকারের পর সমাজপতিরা দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর বিচার করে। তাদের ভাষায় এদের এই বিচার ব্যবস্থাকে 'ল- বির' বলা হয়। 'ল' মানে আইন 'বির' মানে জঙ্গল অর্থাৎ জঙ্গলের আইন।

বাৎসরিক শিকার পরবে বিশেষত পুরুষরা অংশগ্রহণ করে। কিন্ত তা প্রত্যেক বারো বছর অন্তর একবার মেয়েদের সুযোগ আসে। মেয়েদের এই শিকার পরবকে 'জানী পরব' বলা হয়। এই 'জানী' পরবের দিন পুরুষেরা সারাদিন মদ্যপান, নেশাভাঙ, সিদ্ধি পান করে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকে। অপরদিকে প্রত্যক বাড়ির মেয়েরা পুরুষের মতো তীর ধনুক, বর্শা, নিয়ে পশু শিকারের উদ্দেশ্য বের হয়। সজারু, খরগোশ, তিতির, যা পায় সেদিন তাই শিকার করে।

সবাই মিলে এক সঙ্গে বনভোজন করে, মদ খায়, মনের আনন্দে গান গায় ইত্যাদি। তাদের কাছে এই শিকার খেলার উৎসব আজকের নয়, হাজার হাজার বছরের পুরনো এক প্রথা, পুরুষেরা যা যা করে মেয়েরাও ঠিক তাই করে। এভাবে দিন গত হলে সন্ধ্যার সময় তারা ফিরে আসে নিজের নিজের ঘরে। সেদিন জঙ্গলের পবিত্রতা ছিল, শিকারেরও প্রাচুর্যও ছিল।

এই 'জানী পরব'কে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবী 'শিকার' গল্পটি রচনা করেন। শিকারকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আক্ষরিক অর্থে তা গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। এই শিকার আসলে পশু শিকার নয়, মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়ার শিকার, মানুষের লালাসার বিরুদ্ধে শিকার। এক কথায় বলতে গেলে নারী শক্তির দ্বারা অশুভ শক্তির বিনাশ। তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই এই গল্পটি সমাজের বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। শিকার গল্পটি যাকে কেন্দ্র করে রচিত মেরী ওঁরাও লেখিকার মনন জগৎ থেকে কল্পিত চরিত্র নয়, একেবারে বাস্তবের মাটি থেকে উঠে আসা এক জীবন্ত চরিত্র। লেখিকার বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি-

> সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বারবার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রী লোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। যখন লাপরা যেতাম, দেখতাম ফর্সা মেয়েটি দেহাতী ঢঙে (সামনে আঁচল দিয়ে) হলুদ বাড়ি পরে এক বিশাল মোষের পিঠে দিব্যি আরামে বসে আছে, আখ চিবোচ্ছে, কিংবা ভুট্টার খই। তোহ্‌রি বাজারে দেখছি পান চিবোতে চিবোতে ফলও শাক সজীর দরাদরি করছে। বিড়িও খাচ্ছে, প্রচুর তর্ক করছে এবং জিতে যাচ্ছে। কি ব্যক্তিত্ব! পরে জানলাম পছন্দের মুসলিম ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্য জানী পরবের দিনে ও কি করেছিল।[৫২]

গল্পের নায়িকা মেরী ওঁরাও, বয়স ১৮ বছর, মুখের আকৃতি চ্যাপ্টা। মেরীর মা ভিকনি ওঁরাও, পিতা অস্ট্রেলিয়ান হওয়ায় অন্যাদের তুলনায় সে দীর্ঘাঙ্গী এবং গায়ের রঙও তামাটে ফর্সা। মেরীর গায়ে অস্ট্রেলিয়ান শ্বেতাঙ্গ রক্ত বইছে, তাই সে ওঁরাও সমাজে জারজ সন্তান। ওঁরাওরা ওকে নিজেদের রক্তের বলে মেনে নিতে পারেনি। গায়ের রঙ মুণ্ডা সমাজের কঠোর রীতিনীতি আদিবাসী যুবকদের কাছে প্রতিরোধের দেওয়াল গড়ে তোলে। মেরীর মুণ্ডা মেয়েদের সাথে নীবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তাদের অনুষ্ঠানে নাচতেও অদ্বিতীয়। কুরুডার যে কোনো ওঁরাও বাড়িতে অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবে মাটির চাটুতে আটার পিঠে ভাজতে পারে, সকলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। তাই বলে, সে ওদের মতো করে জীবন কাটাতে চায় না, মেরীর জীবন তাদের তুলনায় একটু আলাদা অন্যান্য ওঁরাওদের মতো নয়, সে প্রয়োজনের তাগিদে সিনেমা দেখতেও যায়, যা ওঁরাও সমাজের বাকি লোকজনরা অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যেতে পারে না। মেরী চায় একটু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। মেরীর কথায়-

> ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফরসা কাপড় পরব না, অমন জীবন আমি চাই না।[৫৩]

মেরীর এই চরিত্রের বিপরীতে আর একটি চারিত্রিক দিক তার ফুটে উঠেছে। যে মেরী প্রসাদজীর বাগানে সারিকা ও আমরুদ, ক্ষেতের সবজী নিয়ে ট্রেনে করে তোহ্‌রি বাজারে যায়, সামান্য মুনাফার জন্য বোঝা বোঝা মাল টানে, পয়সা বাঁচাতে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তেল, ঘি, মশলা কিনে নিয়ে আসে। অপরদিকে প্রসাদজীর বাড়ি থেকে গুড়, বাদাম, মশলা, লবণ চুরি করতে দ্বিধাবোধ করে না, তার কাছে সেটা অতি গৌরবের কেন না সে নিজের জন্য চুরি করে না, যাদের পান্তা ভাতে লবণের স্বাদ মেলে না, সেই সকল ওঁরাওদের মুখ চেয়ে চুরি করেছে। মেরী ওঁরাওদের মতো দারিদ্রসুলভ জীবন যাপনে একান্ত পছন্দ না হলেও, অন্তরের অন্তস্থল থেকে ওঁরাও সমাজের একজন হবার আকাঙ্খা অনুভব করত।

> খুব খুশি হতো ও। ওর তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে যদি কোনো সাহসী ওঁরাও ছেলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত।[৫৪]

কিন্ত বাস্তবে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই বাধ্য হয়ে যৌবনের তাড়নায় নিজে পছন্দ করা মুসলিম ছেলে জালিমকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। জালিমও জাত ধর্ম ভুলে গিয়ে জীবনের বাকি সময়টা মেরীর সাথে কাটানোর সংকল্প গ্রহণ করে। পাড়ার ছেলেরা যখন মেরীকে মুসলমান বিবি বলে হাস্য কৌতুক করত, তখন তার সমস্ত রাগ মা ভিকনি'র উপর পড়ত। মেরীকে যেন তার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। জন্মের সময় যদি তার মা তাকে মেরে ফেলত তাহলে তার সামাজিক পরিচয় নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সমাজের কাছে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে হত না। মেরীর উক্তির মধ্যে ধরা পড়ে সেই ক্ষোভ –

> বড় সাহেব! ঔরতের পেটে বাচ্চা দিয়ে চুহার মতো ভেগে যায়। আমার মা হল বদমাশ। যখন দেখলি গোরা মেয়ে, তখনই তো মেরে ফেলবি? তাহলে কি এত ল্যাঠা হত?[৫৫]

মেরী দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী। তাই তার জীবনের চলার পথে বহুবার বহুজন প্রণয়ী হতে চেয়েছিল। কিন্ত মেরী তাদেরকে প্রত্যাখান করেছে। তেমনই এক ঠিকাদার তশীলদার সিং কুরুডাতে শালগাছ কিনতে এসে মেরী ওঁরাও এর দিকে তার লালাসার হাত বাড়ায়। মেরীর উদ্দাম যৌবন তশীলদার সিং এর মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল-

> কয়েকদিন বাদে, মেরী যখন মোষের পিঠে চড়ে অন্য গোরু-মোষ তাড়িয়ে ঘরে ফিরছে, তসিলদার এসে দাড়াঁল। বলল, কি খুবসুরৎ রে! তোকে হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে।[৫৬]

অবশেষে একদিন তসিলদার সিং ধৈর্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে তোহ্‌রি হাট থেকে ফেরৎ মেরীর হাত চেপে ধরে। মেরী প্রথমে ঘাবড়ে গেলে শেষে নিজেকে সামলে নেয়। অবশেষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে মেরী একদিন তাকে 'জানী' পরবের দিনে আসতে বলে। আসন্ন হোলির প্রাক্কালে তশীলদারকে শিকারের জানোয়র বলে মনে হয়। পূর্ব নির্ধারিত 'জানী' পরবের দিন যখন ওঁরাও মেয়েরা শিকারের যাবে তখনই তশীলদারের জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে। তাই মেরী ঐ বিশেষ দিনে তসিলদারকে বুরুতে আসতে বলে। তসিলদারও পূর্ব পরিকল্পিত মেরীর মনের কথা বুঝতে না পেরে, সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। মেরীর লাল শাড়ি ও

তসিলদারের লাল জামা চলন্ত পলাশ গাছের মতো মেরীর প্রতি লুব্ধ তসিলদার নিজেকে সঁপে দিতে চায়। তারপর সেই বিশেষ মুহূর্ত-

> মেরী সাদরে তসিলদারের মুখে হাত বোলাল, ঠোঁটে চুমকুড়ি খেল। তশীলদার চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোঁট লালামাখা, দাঁতে ঝিলিক, মেরী দেখছে, দেখছে, মুখটা বদলাতে বদলাতে এবার? এবার? হাঁ জানোয়ার হয়ে গেল। অব লে মুঝকো? মেরী হেসে ওকে জড়াল, মাটিতে শোয়াল, তসিলদার হাসছে, মেরী দা-টা ওঠাল, নামাল, ওঠাল নামাল।...মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও।...অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোন ভয় এলো না, কোনো জানোয়রের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড়ো জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।[৫৭]

গল্পে মেরী একদিকে যেমন 'জানী' পরবের মাধ্যমে শিকারের প্রাচীন আচার আচরণের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছে, ঠিক তেমনই অন্যদিকে নিজস্ব সমাজের ধর্মকে পাঠকের সামনে তুলে পুনরাবিষ্কারও করেছে। শিকারের নাম করে সমাজের অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে। শিকারের পর মেরীর যেন পুনর্জন্ম লাভ করল-

> নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল।[৫৮]

এরপর মেরী সবার সাথে হাত ধরে নাচতে থাকে এ যেন আদিবাসী সমাজ জীবনের উজ্জ্বল নিদর্শন। রাতের অন্ধকারে নাচতে নাচতে ছুটে চলে যায়, ওর শুধু জালিমকে চাই। তারার আব্ছা আলোয় রেললাইন দেখে, মাঠের পর মাঠ পথ চলতে ওর আর ভয় নেই, কারণ সে যার জন্য ভয় করত সেই জানোয়ারকে মেরে ফেলেছে। জঙ্গল থেকে রেললাইন যেন ইতিহাসের অমোঘ যাত্রা পথ, সংস্কারময় অন্ধকার গলিপথ থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রার লক্ষণ।

সঙ্গীতের ইতিহাস মানবজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই ইতিহাস আজকের নয়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সঙ্গীত হল মানব মনের জমে থাকা আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম মাধ্যম। আদিম মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে নাচ ও গানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জমে থাকা আবেগ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে আনন্দ অনুভূতি প্রকাশ করেছে। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটে থাকা নানা অভিজ্ঞতা ও কাহিনী গান করে শোনাত। পাথরে পাথর দিয়ে, কাঠের উপর কাঠ দিয়ে অথবা কাঠ দিয়ে তৈরী ঢাল প্রভৃতির উপর পাথরের আঘাতে নাচের ছন্দকে রক্ষা করত।

সাধারণত গল্পে গানের ব্যবহার থাকে না। মহাশ্বেতা দেবী অতিবাস্তব বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর ছোটগল্পে গান ব্যবহার করেছেন। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে গানের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। গান না জানলে আদিবাসী সংস্কৃতি অনেকটা অজানায় থেকে যায়। আগে

আদিবাসীদের নিজস্ব কোন লিখিত সাহিত্য ছিল না, তাই যখন যা ঘটত তাই নিয়েই তারা গান বাঁধত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ভালবাসা, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়– এ সকল স্মৃতি তারা গানের মাধ্যমে ধরে রাখতে চায়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শিকার' গল্পটি যে জীবন সংগ্রামের ইতিহাস, তা গান শুনে জানা যায়। 'শিকার' গল্পটিতে গানের ব্যবহার মাত্র দুবার রয়েছে, প্রথম গানটি গেয়েছে সোম্‌রি আর দ্বিতীয় গানটি সকলের সম্মলিত গলায় আবহসঙ্গীতের মতো গাওয়া হয়েছে।

১. হোলিতে আগুন রে হোলিতে আগুন
তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেকো' না-[৫৯]

২. হে হরম্‌দেও,
এমন হোলি বছর বছর হোক-
এমনি শিকার বছর বছর করি-
মদ দিব তোমাকে
মদ দিব-[৬০]

গল্পে গান দুটোকে কেন্দ্র করে হোলির দিন 'জানী পরব'-বে ওঁরাওদের উৎসব জমে উঠেছে। জানী পরবে-এ মদ, গান, আর নাচ এই তিনটি জিনিস থাকে। এছাড়া গানটির মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি ওঁরাও সমাজে পালা পার্বণের সময় তাদের আরাধ্য দেবতাকে মদ উৎসর্গ করে।

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে তিনবার গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। জটিশ্বরীর স্বামী উৎসব কান্দোরি জটিকে নিয়ে গান বাঁধত ও গান গাইত। গল্পে ব্যবহৃত কান্দোরির কণ্ঠে গানগুলি হল-

১. ও নীল শাড়ি, আঙা মেয়ে
দেখ চেয়ে
তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।।[৬১]

২. ও পাখি ধ রে কি হবে সখি
মোর প্রাণপাখি
এনে ফেলে দিব তোর পায়ে
হা তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।।[৬২]

৩. ওরে তোর মিছে ভয়।
পিরীত ফাঁদে ধরা দিতে কেন এত ভয়![৬৩]

প্রত্যেকটি গানে উৎসব কান্দোরির জটিকে উপলক্ষ্য করে গাওয়া। গানগুলোর মধ্যে দিয়ে উৎসবের জটির প্রতি পূর্বরাগ প্রকাশিত হয়েছে। গানের অর্থ বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত জটি উৎসবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। জটি জাতিতে নিচু জাত(জরা ব্যাধের বংশধর) হলেও সে এক ভিন্ন জাতের বেদিয়া উৎসব কান্দোরিকে বিয়ে করেছিল। গানের মাধ্যেমে দুটি

ভিন্ন জাতের হৃদয়কে একত্রিত করতে পেরেছিল। এখানেই গল্পে গানের ব্যবহার স্বার্থকতা লাভ করে।

'দৌলতি' ছোটগল্পে মুনাবর সিং সেওরা গ্রামের নাগেসিয়া, পারহাইয়া, ভূঁইয়া, দুসাদ, ধোবি, গঞ্জু, ওঁরাও এবং মুণ্ডাদের এক এক করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। এই আদিবাসীরা অশিক্ষা ও দারিদ্রর বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে দাদন নিতে হয়েছিল। সময় মতো তারা মহাজনের ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায়, সেই ঋণের টাকার বিনিময়ে মহাজনের কাছে আজীবন 'ভাতুয়া' থাকতে হয়। মুনাবর সিং একজন সরকারি অফিসার তাই সে সরকারি আইনকে তোয়াক্কা না করে বেআইনি কাজগুলি করে যায়। এছাড়াও সরকারি অফিসার হওয়ার সুবাদে আইনের ফাঁক-ফুঁকর গুলি তার জানতে বাকি নেই। গল্পে আদিবাসীদের উপর মুনাবর সিংয়ের শোষণের চিত্রটি লেখিকা গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন-

> ঋণের জোরে, ঋণের জোরে।
> দুই টাকা দশ টাকা একশো টাকা
> দশ সের গম পাঁচ টাকা সের
> ধার দেয় মুনাবর আমাদের
> ....
> ঋণ দিয়ে ও সরকার বনে গেছে
> আর আমরা বনে গেছি কামিয়া
> আমাদের মুক্তি নাই।[৬৪]

সহজ সরল নিরীহ আদিবাসীরা কিভাবে মনিবের অর্থনৈতিক শিকারের ফাঁদে পড়ে তাই গানটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ফারকাটি' ও 'দৌলতি' ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের জোতদার-জমিদার ও মহাজনের কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছবি পাওয়া যায়। গল্পে ব্যবহৃত গানের মধ্যে দিয়ে তাদের সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ন্যুনতম মজুরির দাবিতে আন্দোলনের কথা জানা যায়-

> পীর পৈতির ছেলেরা কথায়
> কহলগাঁও থেকে জামতাড়া
> পাকুর থেকে দেওঘর
> শত শত গ্রামের হাজার হাজার ছেলেরা কোথায়?
> হুলমাহা তাদের নিয়েছে, হুলমাহা....হুলমাহা.....হুলমাহা
> সিদু কানহুর গান কারা গেয়েছিল?
> ....
> কারা হেসে হেসে 'হুলমাহা' বলে ফাঁসি গলায় নিল?
> হুলমাহা তাদের ডেকে নিয়েছে, হুলমাহা....হুলমাহা.....হুলমাহা[৬৫]

দুটি গল্পের প্রেক্ষাপট এবং সময় আলাদা হলেও গান দুটির ভাব মোটামুটিভাবে এক। গান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আদিবাসীরা নিজেদের স্বাধিকার অর্জন করতে গিয়ে হাজার হাজার

সাঁওতাল যুবক অসময়ে তাদেরকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে মৃত, আবার কেউ বা পুলিশের খাতায় হারিয়ে গিয়ে পরোক্ষভাবে মৃত। আদিবাসীরা সুখের কথা নিয়ে যেমন গান বাঁধে তেমনই তাদের দুঃখের কথা নিয়েও গান বাঁধে। এ বিষয়টা মহাশ্বেতা দেবী ভালোভাবে জানতেন, তাই তার বহু গল্পে আদিবাসীদের বঞ্চনার কথা, সংগ্রামের কথা তিনি অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন।

এভাবেই আদিবাসীরা আদিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। যা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ভান্ডারে অমূল্য সম্পদ। আজকে যেমন অরণ্য ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বনভূমির পরিমাণ কমে গেছে ঠিক তেমনই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতিতে আদিবাসীদের 'লোকসংস্কৃতি' খাটো হতে হতে পশ্চিমি দুনিয়ার সংস্কৃতির কাছে কেনা পণ্যর মতো বিক্রি হয়ে গেছে।

'অন্ন, অরণ্য, অন্ন, অরণ্য' ছোটগল্পটি অনেকটাই বাস্তব, পরবাস্তব, লৌকিক ও অলৌকিক সমস্ত ঘটনা নিয়ে রচিত। গল্পের অন্যতম চরিত্র ভাতুয়া মেয়ে অন্নবালাকে অরণ্য দেবী 'বাঘজাই' এর দূত হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী ইউক্যালিপটাসের জঙ্গলকে শহরের চিন্তাক্ষম, বুদ্ধিমান বাবু যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্নবালার মতো দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্নবালার ধিক্কারে ইউক্যালিপটাস গাছগুলি নিজেরাই দালাল অন্নদাপ্রসাদ কয়ালের গুদামে চাল লুট করতে যায়, আদিবাসীদের M.R. Shop এর চাল বিক্রি না করে, রেশনের চাল অন্নদাপ্রসাদ নিজের গোলায় তোলে এবং চড়া দামে আবার আদিবাসীদের কাছেই বিক্রি করে দিয়েছিল। জানালার বাইরে অন্নদাপ্রসাদ নিঃশব্দে গর্জন শুনতে পায়-

> অন্নদে! অন্নদা! অন্নদাকে দিতে হবে, দিতে হবে সমাজ অরণ্য জিন্দাবাদ। এবং সে দেখে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছ সকল ডালপালা ও ডগাকে বলিষ্ঠ হাত হিসেবে ব্যবহার করে ধমাধম গুদামের জাত ভেঙে ফেলেছে....।[৬৬]

দখলদারি! নিকাল যাও! দখলকারিরা নিকাল যাও! শালমহুলের এই ধিক্কার শুনে ইউক্যালিপটাসরা শূন্যে ওঠে এবং ফরেস্ট বাংলোর নির্দিষ্ট একশো বিঘায় গিয়ে বসে যায়। অন্যদিকে অন্নবালার দুঃখ দেখে রিজার্ভ ফরেস্ট চলে আসে ইউক্যালিপটাসদের জঙ্গলে নিজেদের মধ্যে পরস্পর স্থান বিনিময় করে। স্বয়ং বনদেবী বলেন-

> বন আমি সির্জে দিচ্ছি বাছা সকল !-বাঘুত-বড়াম ও বাসুলি সে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন নিজেদের। এবার এ সংবাদ বাতাস টেলিগ্রাফ পাঠায় জামবণী, নারায়ণগড়, শালবনী দিকে দিকে। বাসুলি জঙ্গল ফিরে এসেছে, বলে লধ, কোড়া, মাহালি, সাঁওতাল, মুণ্ডা নানা জাতি সাঁ সাঁ করে এসে পড়ে। ......অদৃশ্য আড়াল থেকে শোনা তরুণীদের হাসি, শিশুর কান্না, জলের কলতান, ধামসা মাদলের বাজনা, ফুটন্ত ভাতের বাস নাকে আসে। অরণ্য সংসার যেন।[৬৭]

এভাবেই এক লৌকিক কাহিনি ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী অরণ্যর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। আদিবাসী সমাজ এবং অরণ্য উভয়েই উভয়ের কাছে নির্ভরশীল। একের স্বার্থ নষ্ট হলে অপরের অস্তিত্বও বিনষ্ট হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়।

'লাইফার' গল্পে সাঁওতালদের জাতিগত সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র মাগন একদিন স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করে জেলে চলে গিয়েছিল। যাবজ্জীবন কারাবাসের পর সে নিজ সমাজে ফিরে যেতে পারে নি। কেননা ততদিনে সাঁওতালরা জীবিকার সন্ধানে অন্য জায়গায় চলে গেছে। এরফলে মাগন অসহায়। মাগন সাঁওতাল অপরাধমূলক কাজের জন্য সাঁওতাল সমাজ তাকে বিচ্যুত করলেও, তার মনের মধ্যে সাঁওতাল সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারকে ভুলে যেতে পারেনি। তাই সে সাঁওতাল জাতির সঙ্গে সকল অপরাধ ভুলে মিশে যেতে চেয়েছিল। স্নানের ঘাটে নিম তেলের গন্ধ পেয়ে সে উত্তাল হয়ে ওঠে-

> নিম তেলের গন্ধ। নিমবীজ পেষা তেলের কটু ও তীব্র গন্ধ, চেনা গন্ধ! মাগন মাথা ঠেকায়, পাথরে মুখ ঘষে। কোন্ সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ স্নান করে গেছে বাঁধের জলে।[৬৮]

শেষ পর্যন্ত মাগন সাঁওতালদের দলে মিশে যায়। এভাবেই গল্পে তার জাতিগত সংস্কারের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। জাতিগত সংস্কার তাদের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ।

সার্বিকভাবে বিভিন্ন গল্পে আদিবাসীদের যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে সাধারণ জীবন-জীবিকার আশ্রয় হিসেবে আদিবাসীগোষ্ঠী নানান ধরনের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছে। জীবিকার বাহন হিসাবে আদিবাসীগোষ্ঠী সংস্কৃতির ধারক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতির মান অর্থের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে শিল্পের সূক্ষ্মতায় উন্নীত হয়েছে। এখানেই আদিবাসীগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বরূপটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, অমর মিত্র, *শিল্পসাহিত্য* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৯।

২. মহাশ্বেতা দেবী, 'এক অকল্পিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', কল্যাণ মিত্র, *আমার সময়,* মে ২০০৯, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০০৯।

৩. সেন, অভিজিৎ, 'মহাশ্বেতা : প্রবাহিণী নদীর নাম', অজয় গুপ্ত (সম্পাদিত),*মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৭ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৪।

৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় 'সেই প্রথম দিনটা', *গল্প সরণি,* মহশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা', ষোড়শ বর্ষ; ১৪১৮, পৃষ্ঠা-১০৮-১০৯।

৫. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (৯ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৪২৭।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৩।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৩।

৮. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (৮ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৪৩৯।

৯. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১০ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩২৮।

১০. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৩২৯।

১১. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩১।

১২. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩৪।

১৩. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩৯।

১৪. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১৩শ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫১১।

১৫. গুপ্ত, অজয় (সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (একাদশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৮১।

১৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (চতুর্দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৫০।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫০।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৩।

১৯. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১৭শ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৭২।

২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৭৬।

২১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৫১।

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫১।

২৩. গুপ্ত, অজয় (সম্পাদিত),*মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১০ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৭১।

২৪. মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, 'অর্জুন' প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রঃলিঃ, পৃষ্ঠা-৫৮১।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮১-৫৮২।

২৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত),*মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (২১তম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৪২৮।

২৭. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত),*মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (৮ম খন্ড), 'অগ্নিগর্ভ ভূমিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ আগস্ট, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩২৫।

২৮. মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প, ভূমিকা, প্রতিক্ষণ, ১৯৯২।

২৯. *কোরক* মহাশ্বেতা সংখ্যা, 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্পে শিল্প ও বাস্তবের মেলবন্ধন', ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৩।

৩০. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর গল্প সমগ্র,* (২য় খন্ড), দেজ পাবলিশিং, মে ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৮০।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮২।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮২।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৪-১৮৫।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬।

৪০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৯।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৯।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৯।

৪৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র* (৮ম খন্ড), 'অগ্নিগর্ভ, 'ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩২৪।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৮।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৯।

৪৯. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র* (১০ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫১৩।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১৩-৫১৪।

৫১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৫০।

৫২. ঘোষ, নির্মল 'মহাশ্বেতা দেবীর অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ' করুণা প্রকাশনী, পৃ-১১৫।

৫৩. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-২২৬।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৮।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২২৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩১।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭, ২৩৮।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৬।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৭।

৬১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা-৬১।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬১।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।

৬৪.

৬৫. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১৩শ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫১২।

৬৬. মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, 'অর্জুন' প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রা. লি., পৃষ্ঠা-৫৮১-৫৮২।

৬৭. পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৬১০।

৬৮. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র* (১৩শ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১২২।

ষষ্ঠ অধ্যায়:
ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭) একেবারে চারের দশকের শেষের দিকে জঙ্গলমহলের(পশ্চিম মেদিনীপুর) একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকাল গ্রামে কেটেছে সেই সময় গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের আদবকায়দা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় নগরবাসী হলেও তাদের প্রতি গভীরভাবে নাড়ির টান অনুভব করেন, যা আজও সময়ে অসময়ে তাঁকে বিচলিত করে তোলে। সেই সব চরিত্রগুলো তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে ভিড় করেছে। ভগীরথ মিশ্র বিশ শতকের কথাসাহিত্যকদের মধ্যে এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক। তিনি মূলত গ্রামীণ ধারার সাহিত্যিক, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার তাঁর গল্পে উপন্যাসে এক ভিন্ন মাত্রা এনেছেন। এই ভিন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন-

> একদিকে কোলকাতা ভিত্তিক নাগরিক প্রেম উপাখ্যানের ছড়াছড়ি। পড়তে পড়তে মনে হতো, এদেশের সব মানুষই বুঝি মহানগরীতেই জন্মায়, বাস করে এবং তারা বুঝি কেবল প্রেম করার জন্যই জন্মায় এবং বেঁচে থাকে। অন্যদিকে বামপন্থী কিছু লেখক উপন্যাস ও ছোটগল্পের শরীরকে পুরোপুরি রাজনৈতিক কাঠামোয় গড়তে চেয়েছেন। তাঁদের প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাসেই মুখ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল স্রেফ ধনী-দরিদ্রের লড়াই, রাষ্ট্রের নিপীড়ণ আর বিপ্লবের বন্দনা গান। পড়তে পড়তে মনে হতো, মানুষের জীবনে বুঝি রান্নাঘর, বৈঠকখানা, খিড়কিপুকুর, বাবা-মা, ভাইবোন, নারী, প্রেম, দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু নেই, কেউ নেই। সে বুঝি ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানাতেই জন্মায় এবং সেখানেই লড়াই করতে করতে মরে যায়। এমন এক বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে, সত্তর দশকে এলেন এক ঝাঁক তরুণ কথা শিল্পী যাঁরা বাংলা সাহিত্য নতুন করে গতি সঞ্চার করলেন।[১]

ভারতের চিরবঞ্চিত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষ বিশেষত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের সমাজ, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি প্রধানত সাঁওতাল, শবর, লোধা, খেড়িয়া, লোহার প্রভৃতি উপজাতি মানুষদের জীবনযাত্রা ও তাদের প্রতি শোষণ বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন। এই সব আদিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, পুলিশি সন্ত্রাস, নানারকম বৈষম্য বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী শক্তির মধ্যে দিয়ে নির্মম এক চাবুক মেরেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে নূন্যতম ভাত-জলের একান্ত প্রয়োজন, তাও যখন আদিবাসীরা পায় না তখন কি চরম দুর্দশায় না তাদেরকে ভুগতে হয় তা তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

ভগীরথ মিশ্র সত্তর দশকের সাহিত্যিক। তিনি তাঁর ছোটগল্পের সীমিত সাধ্যের মধ্যে সমসাময়িক সময় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন বলে, তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অনেকটা ভিতর

থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। গল্পের বিষয় নির্বাচনে তিনি যেমন রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন, আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মনোজগতের নিখুঁত বিশ্লেষণ ও জমিদার শোষণকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই শাশ্বত সত্যকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে তাঁর সত্তর দশকের মার্কসীয় জীবন দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি সত্তর দশকের লেখকদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে লিখেছেন-

> সমাজের হাজারো অনাচার, ভ্রষ্টাচার যাবতীয় অসঙ্গতি, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জুলুম এবং তাঁর ফলে মানুষের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে তিলতিল বদলে যাওয়া, তাদের জীবনচর্যায় তুমুল ও জটিল ভাঙচুর, তাদের অন্তর্গত প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ এবং সবকিছু মিলেমিশে মানুষ, তার আচার-আচরণ মূল্যবোধ(হীনতা) তার প্রেম-অপ্রেম, যৌনজীবন, তার ব্যাক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক বিপন্ন কোড(code) গুলি ব্যাক্তির মানসলোকে কিভাবে ভাঙছিল গড়ছিল, কীভাবে তৈরি করছিল এক স্বাতন্ত্র মানসলোকের রূপরেখা সত্তরের এইসব উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পীদের কলমে আমরা তা মূর্ত হতে দেখলাম।[২]

ভগীরথ মিশ্র তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংকলনগুলি হল—*জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প* (১৯৮৪), *লেবারণ বাদ্যিকর*(১৯৮৬), *কাকচরিত্র* (১৯৯৪),*চিকনবাবু* (১৯৯৬), *নির্বাচিত গল্প* (১৯৯৬),*ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প* (১৯৯৬), এবং *মিডফিল্ডার* (১৯৯৯)। এই গল্প সংকলনগুলিতে প্রায় ৩০০টি ছোটগল্প রয়েছে। ছোটগল্পে আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের রূপ চিত্রনে পটভূমির গুরুত্ব কম নয়। অধিকাংশ ছোটগল্পের মূল বিষয়বস্তু হল তাদের সমাজের টানাপড়েন। লেখক তাঁর ছোটগল্পে এই ধরণের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে মূলত পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও দুই মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চল ও অরণ্য প্রকৃতির প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করেছেন। শহরের জনপদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ নেই, মানুষগুলির খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান খুব নিম্নমানের, ভৌগোলিক অবস্থানে ঘর-বাড়ি বেঁধে এরা থাকে, এক কথায় তা মনুষ্যবাসের অযোগ্য। গৃহপালিত পশুদের মতো নোংরা পরিবেশে, অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে ঘেঁষাঘেঁষি চালাঘরে তারা দিনপাত করে। সেই সব মাথা গোঁজার ঠাঁই এ কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায় না। প্রান্তিক মানুষরা কুকুরকুন্ডলী পাকিয়ে কোনোরকমে রাতটুকু কাটায়, ঘরগুলির সবসময় কাদা চিটচিট করে, সর্বত্র যেন স্যাঁতস্যাঁত দুর্গন্ধময় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বর্তমান সমাজ যত এগিয়ে যায় জটিলতার পথও আরও বেশি করে বিস্তৃতি লাভ করে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের জায়গাটা ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর দিকে এগিয়ে যায়। এরফলে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশের শিকড় ক্রমশ শিথিল হয়ে আসে। অন্যদিকে ছোটগল্পের পরিসরও দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে আসে। তাই বাধ্য হয়ে সংবেদনশীল গল্পকারের আখ্যান বিষয়ক ধারণাও ক্রমশ

বদলে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর *‘ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প’* নামক সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন-

> সেই শৈশব, কৈশোর থেকেই চলছে আমার চলতে চলতে দেখা, আর দেখতে চলা, সচেতনে, অবচেতনে, অচেতনে। শৈশবের সরলতার কৈশরের বিস্ময়ে। আর শৈশব-কৈশরের থেকেই কালই বুঝি এক সোনার পাতে মোড়া সিন্দুক। তাঁর থেকে কিছুই হারায় না, ফুরায় না, চুরি যায় না। শৈশব-কৈশোর সব কিছুই দেখে যায় সামান্যই বোঝে, বাকিটুকু সিন্দুকে জমিয়ে রাখে বড়ো হয়ে বুঝবার জন্য। গ্রাম থেকে মহানগরীতে আবার গ্রাম। ৬৪-৭০ এর উত্তাল রাজনীতি রাতভর জলসার আসর দিনগুলো প্রতিদিন রং বদলায়। প্রতিটি পদক্ষেপে তালবদল লয়বদল মুদ্রাবদল। চোখ দুটি অক্লান্ত। তাঁর নিজের কাজে নিরলস। খুঁটে খুঁটে তুলে নেয় পথের দু ধারের মণিমুক্তো গুলি এমনকি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুটিও, যত্ন করে সাজিয়ে রাখে সিন্দুক। সেই আহরণ প্রক্রিয়া এখনো অবধি সজীব সক্রিয়। সেই আহরিত সামগ্রীগুলি যখন ভেতরে তোলপাড় তোলে সারা শরীরগুলোতে থাকে, তখন লিখি, লিখে হালকা হই। দেখা গুলি কখনোই সরাসরি আনতে পারিনে গল্পে যা আসে তা শুধুই দেখার নির্যাসটুকু। গল্প কেবল কাহিনী নয় কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে আরো কিছু। একটা পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি। পরিশীলিত দর্শন।[৩]

অতএব বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণি মানুষের সমাজজীবনের চালচিত্র চিত্রণে যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন, তেমনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ভীক সত্যরূপকে উদ্ঘাটনে স্বতন্ত্র এক বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ভগীরথ মিশ্র তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে দুই সাহিত্যিকের শিল্পভাবনাকে সমন্বয় সাধন করেছেন।

ভারতবর্ষ একটি কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিপ্রধান দেশের কেন্দ্রে আছে জমি। এই জমির বেশিরভাগ অংশ হল- বেনামী, খাস, বে-দখল সরকারি জমি, কোনো জায়গায় আবার ভাগ চাষি থাকতে পারে। ছয় ও সাত দশকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে জমি উদ্ধারের আন্দোলন শুরু হয়। বর্গা জমির রেকর্ডের মধ্য দিয়ে জমির দাবিদার নিয়ে নতুন আইন তৈরি হয়। জমিদারদের জমির উপর অধিকার বজায় রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। এই সময়ের বেশিরভাগ ছোটগল্পের বিষয় হল জমি ভিত্তিক কৃষি সম্পর্ক। সাত ও আটের দশকে এই ভূমি আন্দোলনের উপর লেখা ভগীরথ মিশ্রের অনেক ছোটগল্পে দানা বেঁধেছে, জোর করে জমি দখলে রাখার কাহিনি। জোতদার, জমিদাররা গায়ের জোরে ভাগচাষির হাত থেকে জমি কেড়ে নিতে চায়। ভগীরথ মিশ্র সচেতনভাবে জোতদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষিদের লড়াই এবং পুলিশের অত্যাচারের কাহিনি ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। এ সব বিষয়গুলো নতুন নয়, তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকে চেনা রাষ্ট্র এবং তার পুলিশ বিগত দশকগুলিতে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূমি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অনেক আধুনিকতা অর্জন করেছে। অনুরূপভাবে ভূমি আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে সাত ও আট দশকে অনেকগুলো ছোটগল্প লেখা হয়েছে। যেমন- মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ এবং ‘ভাতুয়া’ গল্পে জোতদার জমি নিজের অধিকারে রাখার নানা কৌশল আছে। অভিজিৎ সেনের

‘আইনশৃঙ্খলা’ গল্পে অনুর্বর জমি অগভীর নলকূপ খননের ফলে জোতদার অতি সুকৌশল প্রয়োগ করে ভাগচাষিদের হাত থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিতে চায়, আর ‘মৌরসীপাট্টা’ গল্পে খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিযোগিতা। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ফড়িং হইল পক্ষী’, অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘মৃন্ময়ী অপেরা’, মনি মুখোপাধ্যায়ের ‘গণতন্ত্র’ ও ‘গোপাল কাহার’ প্রভৃতি ছোটগল্পে ভূমি আন্দোলন ও জোতদার জমিদারকে কেন্দ্র করে রচিত। কৃষিপ্রধান দেশে ভূমিকে কেন্দ্র করে সাতের ও আটের দশকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জোতদার জমিদারের জমি দখল রাখার অপচেষ্টা আর ভাগচাষিদের প্রাপ্য পাওনা আদায়ের দাবি নিয়ে ভূমি আন্দোলনের পথে ধীরে ধীরে সচেতন হয়েছে। সমাজসচেতন শিল্পী ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে সেই প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। যেমন- ‘হুলমারার ভমরা মাঝি’ ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজীবনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই সামগ্রিক জীবন সংকটের একটা বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘ভমরা’ মাঝি। ভমরা মাঝি হুলমারা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। নিজস্ব সম্বল শুধুমাত্র বাস্তুভিটে ছাড়া কিছু ছিল না। তাই সংসারের হাল টানতে গিয়ে তাকে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে হয়েছিল। ভমরা মাঝিকে সমাজের বাবু শ্রেণির মানুষদের কাছে হাত পাততে হয়েছে কিন্তু সব আশা তার ব্যর্থ হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কুবিহারীর ১৫ কাঠা শোলজমিন ভাগে চাষ করতে রাজি হয়েছে। সে জমিও কিছুদিন পর বঙ্কুবিহারী ভমরা মাঝির কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল-

> উহার পন্দরো কাঠা শোলজমিন ভাগে করথম মুই। ত, গেল সনে বঙ্কাদা সিট্যা কেড়েকুড়্যে লিল্যাক। বঙ্কাদা বইল্লেক অরে ভমরা, জমিনটা দে। উয়াতে মুই বোরোচাষ করি। মুই বলল্যম উ তো বত্জমিন দাদা। উয়াতে তো বোরোধান হব্যেক নাই-।[৪]

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে জমিদার অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন প্রস্তাবিত হয়। সে সময়কার সরকারের ঔদাসিন্যতার জন্য আইন দুটি কার্যকরী হয়নি। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বড় রকমের পরিবর্তন আসে। ঐ বছরের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর অত্যন্ত স্বনামধন্য হরেকৃষ্ণ কোঙার (১৯১৫-১৯৭৪)’র ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে তখন ভূমিসংস্কার আইনের ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্ত বাস্তবে কিছু কাজ হয়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই আইন অনুযায়ী সারা রাজ্যের বহু জোতদার জমিদারের কাছ থেকে ৩৫০০০০ একর জমি উদ্ধার হয়েছিল। এই জমি ভূমিহীন কৃষক, খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর যাদের বসবাসের জায়গা ছিল না, তাদেরকে জমি বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও কোঙার মহাশয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী থাকার সময় সমস্যাটি সমাধানের জন্য ভূমিহীন কোন পরিবার যে জমিতে বাস করছে, সেই জমি সর্বাধিক ৮ শতক পর্যন্ত অধিকৃত করা হবে। এই মর্মে তিনি ১৯৬৭ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অর্ডিন্যান্সটি আইনে রূপান্তরিত হয়নি। আবার ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট

সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি ভূমিহীনদের বসবাসের জন্য 'দি ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ হোমস্টেড ল্যান্ড অ্যাক্ট ১৯৬৯' আইন প্রণয়ন করেন। যাদের বসবাসের জায়গা ছিল না বা জোতদার-জমিদারের জমিতে বাস করত, তারা বিভিন্ন সময়ে মালিক কর্তৃক ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার পেত, প্রতিবাদ করলে বা অধিক মজুরি চাইলে তাকে তুলে দেওয়া হত। এরফলে সপরিবারে তাদেরকে খোলা আকাশের নীচে পথের ধারে আশ্রয় নিতে হত। এই আইন অনুযায়ী তারা সবাই বসবাসের জন্য একটা জায়গা পেয়েছিল। আবার ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী(১৯১১-২০০০) মহাশয় ভূমিরাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর গতিশীল পরিচালনায় ভূমিসংস্কারের কাজে আবার নতুন করে জোয়ার ফিরে আসে। এরফলে গ্রামের ক্ষুদ্র চাষিরা সরকারের পক্ষ থেকে জমি ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে থাকে। যেমন- বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ভূমিসংস্কারের আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বহু জমিদার তাদের ভাগ চাষিদের কাছে জমি হারিয়েছিল। ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষিপ্রযুক্তির ব্যপক উন্নতি, সম্প্রসারিত সেচের কারণে রাজ্যে খাদ্য স্বনির্ভরতা লাভ করে এবং অনেকখানি জমিরও সমবন্টন হয়েছিল।

গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ভমরা মাঝি ভূমিসংস্কারের আইন অনুসারে ভাগ জমির উপর স্বত্ব থাকার ফলেও তাকে শেষ পর্যন্ত জমিদার বঙ্কুবিহারী আইচ জমি কেড়ে নিয়েছে। জমিদারের চোখ রাঙানিতে ভমরা মাঝি জমির উপর তার অধিকারের কথা ভুলে গিয়েছিল। এভাবে ভমরা মাঝি জমিদারের কাছে অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। ভমরা মাঝির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, সেই সুযোগে সমাজের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে সময়ে অসময়ে শুধু তাকে বাজারের কেনা পণ্যর মতো ব্যবহার করেছে। এলাকার কাজের দাবি নিয়ে যখন রাজনৈতিক নেতারা বছরের বিভিন্ন সময়ে মিটিং মিছিল বার করে, তখন ভমরা মাঝিও কিছু পাওয়ার আশায় সপরিবারে রাজনৈতিক ঝান্ডা হাতে নিয়ে মিছিলে সামিল হয়েছে। মিছিল শেষে রাজনৈতিক নেতারা নিজের মত করে বক্তৃতা দিয়েছে, সাধারণ মানুষদেরকে সাহায্যর আশ্বাস দিয়েছে, অন্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে শেষ পর্যন্ত সব মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে, রাজনৈতিক নেতারা সবসময় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

> আজ যে ল্যতাটি বড় বড় বাখান দিলেন সরকারি আপিসে চুরি-চামারির কথা তুলে, তাকেই দেখি সইন্ঝা পহরে মাথায় জিয়ারের গম চাপিয়ে অন্ধকারে বনবাদাড় ভাঙছেন অবলীলায়। ভালো-খ্যারাব এসব বলা ভারি শক্ত এযুগে।[৫]

ভমরা মাঝি অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ তাই রাজনৈতিক নেতাদের কৌশল সহজে বুঝে উঠতে পারেনি। ফলস্বরূপ তাকে একরাশ হতাশা নিয়ে সপরিবারে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। এভাবেই ভমরা মাঝিকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে প্রতারিত হয়েছে—

মিছিল টিছিল হল। বাবুরা মাইক হাকড়ে বক্তিতা করলেন। কাকে যেন বাখান টাখান দিলেন জোর গলায়। কিন্ত কাজের কাজ হল না কিছু। লৈতন বিডোসাহেবটি য্যান পাঁকাল মাছ। গলায় মধু ঢেলে বললেন গম-চাল, দানা-পানি বলতে কিছোটি নাই ইষ্টকে। মিঠা কথায় কাম সারলেন তিনি মিছিল গেল ভেঙে। চিকনবাবুরা সব চলে গেলেন যে যার ধান্দায়। শালা ভমরা মাঝি, সারাদিনের ভুখা পেটটি লিয়ে বুড়া আঙুল চুষে চুষে ঘরে যা![৬]

অবশেষে ভমরা মাঝি খালি হাতে বাড়ি ফেরার পথে বাবুদের আয়োজিত কৃষিমেলায় হাজির হয়েছিল। কৃষিমেলায় বাবুদের অভিজাত সুলভ আচার-আচরণে তাদের কাছে সে নিজেকে বেমানান বলে মনে করেছে, সারি সারি খাবারের দোকান সাজানো রয়েছে, কিন্তু কিনে খাওয়ার মত তার সামর্থ্য ছিল না। তাই সে এক পরোটার দোকানের কাছে গিয়ে শুধু কষা মাংসের ঘ্রাণ টুকু নিয়েছে।

'ছ্যা ছ্যা, শেষকালে লোকের আঁইঠা রুটি কুড়িয়ে খেলি রে ভমরা? ছ্যা ছ্যা। তুই মানুষ না কুকোর রে?[৭]

শেষ পর্যন্ত ভমরাকে তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে হয়েছে তার বিনিময়ে কপালে জুটেছে চরম অপমান আর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাকে পুলিশের হাতকড়া পরতে হয়েছে, স্থান হয়েছে তার ৮/৮ ফুট ছোট একটি তালাবন্দী ঘরে, কাকুতি মিনতি করার পরেও সে ছাড় পায়নি। এভাবে ভমরা মাঝির জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময় জেলের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অভিজিৎ সেন তাঁর 'আইন-শৃঙ্খলা' গল্পের মিল পাওয়া যায়। গল্পে উল্লিখিত আখিরা গ্রামের অন্যতম সফল চাষি টুইলা বর্মন ও তার স্ত্রী কুশলী বর্মন। এরা জাতিতে সাঁওতাল না হলেও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, ভমরা মাঝির লড়াইয়ের সঙ্গে তাদের অনেক মিল পাওয়া যায়। টুইলা বর্মন নাগর নদীর তীরবর্তী এলাকার জমিগুলো আধিস্বত্বে চাষ করত। প্রথমদিকে এই জমিগুলো অনুর্বর ও চাষের অযোগ্য ছিল। উঁচু নিচু বালির ঢিপি, শিয়ালকাঁটা, জংলা, এর মতো বিভিন্ন রকম ঝোপঝাড়ে ভরতি ছিল। দীর্ঘদিন ধরে টুইলা বর্মন ও তার বাবা হাঁড়িপা বর্মন রক্ত ঘাম মেশানো কঠোর পরিশ্রমে পরিত্যক্ত জমিগুলো চাষের উপযোগী জমি করে তুলেছিল। জমিদার সুশীল মণ্ডল চাষবাসের খরচাপাতি না দিয়েও জমির অর্ধেক ফসলের দাবি করে, টুইলা বর্মন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। এ থেকে তাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত শুরু হয়, ক্ষমতার জোরে সুশীল মণ্ডল টুইলা বর্মনের বাড়িতে ডাকাত ঢুকিয়ে সমস্ত কিছু লুট করে নেয়, এতে শেষ নয়, তার স্ত্রী কুশলী বর্মনকে নির্লজ্জের মতো ধর্ষণ করে। অবশেষে টুইলা বর্মনকে হত্যা করে। তবুও তার টুইলা বর্মনের প্রতি ক্ষোভ কমেনি, সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য কুশলী বর্মনের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছিল।

জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে আধিয়ার তার স্বত্ব হারায় আইন এমন কথা বলে।[৮]

ভমরা মাঝির প্রতিবাদ প্রতিরোধ সঙ্গে অভিজিৎ সেন এর 'আইন-শৃঙ্খলা' গল্পটি বিষয়ের দিক থেকে সমগোত্রীয়। জোতদার ও বর্গাদারের জমিকে কেন্দ্র করে সংঘাত। সরকারের কৃষিক্ষেত্রে

দৃষ্টিপাত অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থা ও ঋণ দান এ কৃষিতে ব্যপক উন্নতি হয়েছিল। এর ফলে জোতদারদের কৃষি জমির উপর লোভ বেড়ে যায়। তাই তারা আধি উচ্ছেদ করার নানারকম কৌশল অবলম্বন করে, তারই শিকার দুই গল্পের নায়ক টুইলা বর্মন ও ভমরা মাঝি। ভমরা মাঝি এই সংগ্রামে সহজে পরাজিত হয়েছে কিন্তু টুইলা বর্মন কঠিন লড়াই করেছে, জীবন দিয়েছে আর লড়াইকে অব্যাহত রাখতে তার নবজাতক শিশুকে লড়াইয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আধিয়ার মাঝে রেখে গিয়েছিল।

আলোচ্য গল্পে ভমরা মাঝির অস্তিত্বের প্রবল সংকট দেখা দিয়েছিল কারণ, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে জমি ছিল। সেখান থেকে তাকে উৎখাত করা হয়েছিল। ভমরা মাঝির বাস্তব জীবন সংকটের জন্য জমি কেড়ে নেওয়ার কারণকে দায়ী করা যায়। জমি কেড়ে না নিলে সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারত। ভমরা মাঝিকে রাজনীতির ঝান্ডা ধরতে আসতে হতো না, দিনের শেষে তার পরিবারের জন্য দু মুঠো ভাত জোগাড় করতে অসুবিধা হতো না। এভাবে শয়ে শয়ে কৃষক পরিবার ভমরা মাঝির মতো কৃষককে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে। অপরদিকে প্রশাসনিক আইন বাবুদের পক্ষ অবলম্বন করে লাল ফিতায় ফাইলে বন্দী থাকল। জোতদাররা ও জমিদাররা প্রয়োজনে সরকারি প্রশাসনিক আইনকে কিনতে পারে, বিক্রি করতে পারে, আইনের চোখে যে সবাই সমান, তা তারা অর্থের অহংকারের নেশায় সব ভুলে যায়। গল্পকারের এই গল্পে সেই সমাজ বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আদিবাসীদের ব্যপক উপস্থিতি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) *কল্লোল* -এর কালে এই নিম্নবর্গের মানুষের কাহিনি বাংলা কথাসাহিত্যে এসেছে। যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, বাউরি ও নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়কে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা গেছে। এই সব আদিবাসীদের প্রতিবাদী চেতনা ছয়ের দশকের শেষের দিকে দেখা যায়। ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে সেই আদিবাসী মানুষদের অসহায় চিত্র ফুটে ওঠে। সমাজজীবনে টিকে থাকার জন্য, পেটের জ্বালায় রুজি রোজগারের জন্য যে আর্তনাদ, লেখক তাঁর গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভগীরথ মিশ্রের 'দৃষ্টি' নামক ছোটগল্পে কৈলাস শিকারী জাতিতে শবর, চোখে দেখতে পায় না, ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক দিন তাকে হাতিশোল গভীর জঙ্গলের পথ পেরিয়ে কোচডিহি, পলাশপাথর ও পঁচাপানি গ্রামগুলোতে ভিক্ষা করতে যেতে হয়। কৈলাস শিকারী অন্ধ হলেও পথ চিনতে তার অসুবিধা হয় না। একদিন কৈলাস শিকারী ভিক্ষা করে বাড়ি ফেরার পথে, বাউরি পাড়ার ছেলেরা তাকে ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। বাউরি পাড়ার বজ্জাত ছেলেদের ছেলেদের অত্যাচারে কৈলাস শিকারী নিরুপায় হয়ে তাদের দেওয়া

সমস্তরকম প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। কাতর গলায় সে শুধু প্রাণভিক্ষা চায়। তবুও তার রেহাই মেলেনি, অত্যাচার চলতে থাকে যতক্ষণ না তাদের মজা লুটা সাঙ্গ হয়—

> কেউ ছৈতার (ছ' হাতি কাপড়) কাছা খুলে দেবে। কেউ কোমরে বেদম ক্যারেকুটু দেবে। চুল ধরে ঝাঁকুনি মারবে কেউ। কেউ বা ভিক্ষার ঝুলিতে হাত সেঁধাবে কৈলাস নিরুপায়।... কাতর গলায় শুধু প্রাণভিক্ষে চাইতে থাকে সে। নিজের 'জন্ম দেওয়া বাপ' বলে ডাকতে থাকে সবাইকে। বজ্জাত ছেলেরা যা প্রস্তাব দেয়, সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় বিনাবাক্যে।[৯]

সেদিন কৈলাস শিকারী জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাওয়া লৈতন লোহারের উপস্থিতিতে বেঁচে গিয়েছিল। লৈতন লোহার ঝড়েশ্বর লোহারের স্ত্রী, স্বামী অসুস্থতার কারণে কাজ করতে পারে না। লৈতনকে বনের কাঠ বিক্রি করে সংসার চালায়। ঝড়েশ্বর লোহার স্ত্রীর সংসার চালানোর অভিজ্ঞতাকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখে। ফলস্বরূপ লৈতনকে স্বামীর কাছ থেকে নানারকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়-

> শালী, তলপেট ক্যানে উঁচা লাগে রে?' কুতকুত করে দেখতে থাকে ঝড়েশ্বর, 'ফের বাধালি নাকি?[১০]

একদিন কৈলাস তার অভাবী সংসারের কথা ভেবে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিল। রাতে তার জ্বর এসেছিল, ভিক্ষে করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। ঘরে এক দানাও খাদ্য নেই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে বাউরি ছেলেগুলো আজকে জ্বালাতে সাহস পাবে না। কিন্তু কৈলাসের ফেরার পথে বাউরি ছেলেগুলো পিছু ধরে। কৈলাস নির্ভয়ে পদ্মদীঘি পার হয়ে যায়। বনকাটির ডাঙা পেরিয়ে হাতিয়াশোল জঙ্গলে ঢুকে যায়। কৈলাস ধীরে ধীরে কোচডিহি ও পচাপানির দিকে এগিয়ে যায়। আবার দুপুরের সময় কৈলাস সেই রাস্তা দিয়ে ফিরছিল। লৈতন কৈলাসের জন্য জঙ্গলের ধারে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করে। লৈতন সঙ্গে থাকার কারণে বাউরি ছেলেগুলো কৈলাসকে ছিনতাই করতে পারেনি। দু'জনে মহুল গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়। দীর্ঘ দিনের জমে থাকা সুখ-দুঃখের কথা একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান হয়। অবশেষে দুজনে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে পথ চলতে শুরু করে। কৈলাস পথ চলতে চলতে লৈতনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। লৈতনের ছেলেকেও সে নিজের ছেলের মর্যাদা দিতে চেয়েছিল।

> 'আয়, এক হাঁড়িতেই খাই। শুকরাটাও থাইক্‌বেক আমাদের পাশ। ধইর‍্যে লে, উ আমারই ব্যাটা।' একটুখানি ঘনিষ্ঠ হয় কৈলাস, কি লাভ উই পাষোণ্ডের সন্‌সারে দগ্ধে দগ্ধে-। লৈতন জবাব দেয় না। দিগন্তের গায়ে চোখ বিঁধিয়ে বসে থাকে।[১১]

শেষ পর্যন্ত লৈতন কৈলাসের কথায় রাজী হয়নি। লৈতনও কৈলাসের মনের কথা বুঝতে পারে। কৈলাসের বাইরের চর্মচক্ষু অন্ধ হলেও, অন্তরের চোখ দিয়ে সে সংসারের সমস্ত কিছু দেখতে পায়। নিজে দারিদ্র জীবনযাপন করলেও, প্রতিনিয়ত নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। ছোটগল্পটিতে আদিবাসী শবরদের দারিদ্রসুলভ সাংসারিক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগীরথ মিশ্রের 'লাবণের বয়স' নামক ছোটগল্পে লাবণ শিকারী জাতিতে শবর। লাবণ শিকারীর বয়স চল্লিশ আর স্ত্রী পারুলের বয়স সতেরো, তাদের দু'জনের মধ্যে বয়সের একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। লাবণ শিকারী ও পারুল তুরকীর মেলায় যাওয়ার পথে দাগাশোলের শাল-মহুয়া জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি সংকীর্ণ পথে তীব্র গতিতে গরুর গাড়ি ছুটিয়েছে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান লাবণ শিকারী মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে পারুলকে দেখে আর ভুবনভোলানো ভঙ্গিতে হাসে। দাগাশোলের জঙ্গলটা বেশ বড় আর ঘন ছিল। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকেই জঙ্গল, এর মাঝখান দিয়েই লাল টক্টকে উঁচু নিচু পাহাড়ি প্রশস্ত পথ। পারুল দূর থেকে দেখতে পায় মেলা বেশ জমে উঠেছে। মেলার পাশে ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের তলায় সাধুদের নাম সংকীর্তন চলছে, একটু তফাতে মেলা বসেছে। মেলাতে সার্কাস, ম্যাজিক, ঢাউস নাগর-দোলা যেন আকাশ ছুঁতে চায়, এছাড়াও রাস্তার দুই দিকে রয়েছে তোলা আঁচের আগুনে তেলেভাজার কড়াই, পাশে ফুলুরী-বেগুনী আর পাঁপড় ভাজার স্তূপ। ফুলুরী-বেগুনী আর পাঁপড় ভাজার গন্ধে লাবণের মন স্থির থাকতে পারছে না। অবশেষে মেলা প্রবেশের মুখে লাবণ দুটো আইসক্রিম কিনে একটা পারুলকে এগিয়ে দেয়। পারুলের হাত ধরে মনের আনন্দে সারা মেলা ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়াতে চাইলে, লাবণ তাকে দাঁড়াতে দেয়নি-

> চল্ চল্। দাঁইড়্যে কি হব্যেক? কত্তো কি দেইখ্‌বার আছে! পারুল হাসে। নাচার হয়ে ফের হাঁটতে শুরু করে।[১২]

মেলার অপর প্রান্তে একটা মণিহারি দোকান দূর থেকে ঝিলিক মারছিল। পারুল মণিহারি দোকান থেকে দুই জোড়া বকফুল কানের দুল কেনে। এরপর দুইজনে নাগরদোলায় ওঠে, বিদ্যুৎ গতিতে উপর নীচ হতে থাকে। খানিক বাদে নাগর-দোলা থামল, দিন দুপুরে প্রচন্ড সূর্যের তাপ তাই পারুল একটু বিশ্রাম নিতে চায়। দু'জনে মেলায় কিছু খাবার খেলেও তাদের ক্ষিদে মেটেনি। তাই লাবণ ছুটে গিয়ে তেলেভাজা ও জিলিপি কিনেছে ও পাশের পাথরকুঁয়া থেকে এনামেলের বদ্‌নায় জল ভরেছে, খাওয়ার পর দু'জনের চোখেমুখে তৃপ্তির ছাপ দেখা যায়। লাবণের গয়না কিনে দেওয়া, জিলিপি খাওয়া, ও নাগর-দোলায় ওঠা সবকিছুর মূলে তার সতেরো বছরের পারুলকে অন্য এক রোমান্টিক জগতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। লাবণের চল্লিশ বছর বয়স এখনও নিটোল স্বাস্থ্য ও অটুট তেজ রয়েছে। কিন্তু পারুল দশ বছর ধরে অসুস্থ। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতায় শরীরের যাবতীয় মাংস ঝরিয়ে দিয়েছে, শরীরের যাবতীয় মাংস, মেদ, প্রফুল্লতা ও একই সঙ্গে মনের কমনীয় ভাব হারিয়ে ফেলেছে। পারুল নানারকম রোগব্যধিতে আক্রান্ত তার খিটখিটে মানসিকতা দিয়ে লাবণকে সব সময় বয়সের খোঁচা দেয়। যেমন- ঠান্ডা লেগে লাবণের দাঁতের মাড়ি ফুললে পারুল হরু মাস্টারের উদাহারণ দেয়। হরু মাস্টারের বয়স এখন সত্তর, দাঁতের দুপাটিই বাঁধানো আছে। বাড়ি ফেরার পথে গরুর গাড়িটি পাশে দাঁড়িয়ে দুজনে মউল গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিল। লাবণ পারুলের কোলে মাথা রাখে,

পারুল একটু মমতায় লাবণের মাথায় চুলে বিলি কাটতে শুরু করে। হঠাৎ পারুল লাবণের মাথায় একটা সোনালি চুল আবিষ্কার করে। এখানেই পারুলের চরম উৎফুল্লতা লাবণের প্রতি ভালোবাসার আবেগ মুহূর্তে মুছে ফেলে দিতে চায়। অবশেষে লাবণ স্পষ্ট বুঝতে পারে-

> ...ঝটিতি বুড়ো হয়ে যাওয়া ছাড়া এ জীবনে পারুলের কাছাকাছি পৌঁছানোর আর অন্য কোনও উপায় নেই।[১৩]

লাবণ শিকারী তুরকীর মেলায় তার দুই মেয়ে চাঁপি ও বাসীকে অন্যর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজে গরুর গাড়িতে করে পারুলকে নিয়ে এক রোমান্টিক জীবনে পাড়ি দিয়েছিল। মেলায় লাবণের আচরণে আধুনিকতার বিলাস বহুল জীবনযাত্রার ছোঁয়া নেই, একেবারে প্রান্তিক এলাকার খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। ভগীরথ মিশ্র একেবারে সাদামাটা গ্রাম্য জীবনের ছবিতে, প্রান্তিক মানুষের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত তোবড়ানো মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রেম আখ্যানের এক নিপুণ তুলি এঁকেছেন।

ভগীরথ মিশ্রের ‘রাবণ’ নামক ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র রাবণ মাঝি জিজাবাই স্কুলে পড়ে। রাবণ মাঝি পড়াশুনায় খুব মেধাবী ছিল। কিন্তু এলাকার জমিদার সতীকান্ত সিংহ বাবুর স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাবণ মাঝি একজন ধূর্ত-লম্পট, সুযোগসন্ধানী, অত্যাচারী শোষক সত্তায় পরিণত হয়। প্রহরাজের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। প্রহরাজ রাবণের গুড় পাহারাদারের কাজ করে। গতরাতে দুষ্কৃতির দল তাকে তেঁতুল গাছে বেঁধে সারা শরীরে খেজুর গুড় মাখিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। সেই রাতে প্রহরাজ বিষ পিঁপড়ার কামড়ে মারা যায়। প্রহরাজের মৃত্যুতে রাবণ একটু বিচলিত হয়নি। অন্যদিকে রাবণ মাঝি এক গ্রামীণ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জমিদার সতীকান্ত সিংহের গুণ কীর্তন করেছে-

> বাঘও আড়াল করে খায়, কিন্তু সতীকান্ত সিংহবাবু কদাচ সেই আড়াল খানও রাখত না। দিনে-দুপুরে শতচক্ষুর সুমুক দিয়ে ছাতি ফুলিয়ে সে রক্ষিতার বাড়ি যেত। সিংহবাবু বংশের বড়কর্তাকে ঠেকাবে, অমন ছাতির পাটা কার?[১৪]

এই সুযোগে জমিদার সতীকান্ত সিংহের লোলুপ দৃষ্টি রাবণের বড় দিদির উপর পড়েছে। জমিদার সতীকান্ত সিংহের লোলুপ দৃষ্টি কেউ এড়াতে পারেনি। যদি কেউ জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তার পরিণতি খুব করুণ হয়। এক সময় রাবণের বাবা জমিদার সতীকান্ত সিংহের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিল। ফলস্বরূপ রাবণের বাবার সমস্ত জমির ফসলকে গবাদি পশুর দিয়ে মুহূর্তে উজাড় করে দিয়েছিল-

> মাত্তর বিশটা পাহাড়িয়া গরু নেমে পড়ল আমাদের জমিনে। মনের পুলকে খেতে লাগল সবুজ ধানের গাছ। গোছায় গোছায়। জমিনের চৌহদ্দি ঘিরে আলের ওপর খাড়া রইল লগদীর দল। হাতে তাদের তেল মাখানো লম্বা লাঠি। ... ঐ অবস্থায় বাবা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিংহবাবুর পায়ের

তলায়। আছাড়ি- পিছাড়ি খেয়ে মড়াকান্না কাঁদতে লাগিলেন। ... কে আর সেধে সিংহবাবুর কোপে পড়তে চায়। [১৫]

অবশেষে রাবণের বাবা ভিটে মাটি হারানোর দুঃখে মারা যায়। কিছুদিন পরে জমিদারের নির্দেশে তাদেরকে ভিটে মাটি ছাড়তে হয়েছিল। জমিদারের রোষে সপরিবারকে পথে বসতে হয়েছিল। এমনকি সামান্য দু'মুঠো পান্তা ভাতের আশায় সপরিবারে বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে দ্বিধাবোধ করল না। জমিদারের প্রবল দাপটে রাবণ ও তার পরিবারকে এক চরম দুর্দশায় পড়তে হল। এইসব ঘটনার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনর্বিবেচনা করে, শেষ পর্যন্ত রাবণের দিদিকে লম্পট জমিদার সতীকান্তের আস্তানায় ঠাঁই নিতে হয়েছিল। দিদির এই অসহায়ত্বের করুণ অবস্থার কথা ভেবে রাবণ অজান্তে এক মর্মবেদনা অনুভব করেছিল—

শেষ অবধি সতীকান্ত সিংহবাবুর দুয়োরেই মাথা খুঁড়তে হলো দিদিকে। এমনিতে পেটের জ্বালার তুল্য জ্বালা নাই এই দুনিয়ায় মানুষের ইহকাল-পরকাল ভুলিয়ে দেয় – ঠাঁই নিতে হতোই, কোথাও না কোথাও ...দিদির কাছে, এ হলো অচেনা দহর বদলে এক চেনা দহ।[১৬]

লেখক উপনিবেশোত্তর চেতনার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এমনই এক অস্বস্তিকর এক বাস্তব ঘটনাকে গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজও বহু নারী এভাবে জমিদারদের অত্যাচারে লালসার শিকার হয়। অর্থের অহংকারে জমিদাররা নরখাদকে পরিণত হয়েছে। টাকার বিনিময়ে তারা খেটে খাওয়া গরীব মেয়েদের যৌবনকে কিনে নিতে চায়। জমিদাররা নিজের বংশের মর্যাদাকে কলঙ্কিত হতে দেয় না। এর জন্য তারা অন্যর জীবন নিতেও পিছপা হয় না। অবশেষে একদিন রাবণের কাছে তার দিদির মৃত্যুর খবর আসে-

দিদিকে মেরে ওরা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দড়িতে। সে নাকি সতীকান্ত সিংহবাবুর হাজার হাজার পীড়াপীড়িতেও পেট নামাতে রাজি হয় নি। ফলে সিংহবাবু- বংশের মর্যাদা রাখতে মরতে হলো দিদিকে।[১৭]

রাবণ তার দিদির উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গোপনে জমিদারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। যে বয়সে রাবণের স্কুলে পাঠ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই শিশু বয়সে তাকে চোখের সামনে একের পর এক অত্যাচারিত হওয়ার করুণ দৃশ্য দেখেছে। লুকিয়ে গুড় খাওয়ার অপরাধে শক্তিচাঁদ রাবণের মুখে গরম গুড় ঢেলে দিয়েছে। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে তাকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাবণ জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত হলেও সে গোপনে মনে মনে মালিক হওয়ার স্বপ্নে মশগুল ছিল। একদিন বাস্তবে তার স্বপ্নও পূরণ হয়। রাবণ মালিক হওয়ার পর মুহূর্তে তার মানসিকতাও পালটে যায়। অত্যাচারী লম্পট জমিদার সতীকান্ত সিংহের সমস্ত চরিত্রগুণ তার মধ্যে দেখা যায়। প্রহরাজের বৌকে গ্রাস করার উদ্দেশ্য সে প্রহরাজকে রাতভর বিষ পিঁপড়ার কামড়ে মেরে ফেলেছিল। রাবণ গোপন

সূত্রে জানতে পারে প্রহরাজ বৌকে নিয়ে বাড়ি যাবে। তাই সে তার পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রহরাজকে হত্যার এক অদ্ভুত কৌশল নির্মাণ করেছিল-

> ...আমাকে বাঁইধল্যে ক্যানে রাবণদা? বাঁইধ্‌লে ক্যানে? অমনি রে। ভয় পাস্‌ নাই। বলতে বলতে ওর পরনের লৈতাখানা খুলে নিয়ে চরচর করে দু'টকরা করে ফেলি। এক টুকরা ওর মুখের মধ্যে ভালো করে গুঁজে দিই। ওপর টুকরো দিয়ে ওর মুখখানা ঠেসে বেঁধে দিই। এবার অন্য দড়িগাছা দিয়ে অকে পা থেকে গলা অবধি গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আচ্ছাটি করে বাঁধি।[১৮]

রাবণের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হয়। আপাত দৃষ্টিতে রাবণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হলেও সামান্যতম নৈতিকতাবোধ ছিল। সতীকান্ত সিংহবাবু বার বার বলতেন, যে কোনো অবস্থায় সংযম হারাতে নেই। যে নারীর স্বামী শীতের রাতে নরক যন্ত্রণায় আসন্ন মৃত্যু পথ যাত্রী, সেই সুযোগে তার সঙ্গে সহবাস করা মহাপাপ। রাতের অন্ধকারে নিজের দৈহিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে অপকর্মের খবর হয়তো কেউ জানল না! রাবণ জানে, পাপ নিজের বাপকেও ছাড়ে না! নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য প্রহরাজকে হত্যা করেছে ঠিক কিন্তু জোর পূর্বক নারী নির্যাতন যে মহাপাপ! সে পাপকে খুব ভয় করত। প্রকৃত পক্ষে রাবণ নরখাদক হলেও তার মধ্যে একটুখানি মানবিকতার আভাস পাওয়া যায়।

সরকার আইন প্রয়োগ করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করেছে, কিন্তু সমাজে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষরা জমিদার কিংবা বুর্জোয়াদের শোষণের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমাজের একেবারে নীচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তারা স্বজন পোষণের খাতিরে আইন কানুনগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখায়। আইনের চোখে যে সবাই সমান অর্থের দম্ভে তারা ভুলে যায়। এভাবে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এক সতীকান্ত সিংহ ও হাজার রাবণ মাঝির জন্ম হয়।

ভগীরথ মিশ্রের 'বাঘের ডাক' নামক ছোটগল্পে বিন্দো ভক্তা জাতিতে খেড়িয়া, জমিদার মহাপাত্রবাবুদের বাড়িতে তিন পুরুষ ধরে পেটভাতুয়া হিসাবে কাজ করছিল। সপরিবারে শুধুমাত্র দুবেলা খাওয়ার আশায় বিনা বেতনে বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। সমাজে বিন্দো ভক্তার মতো লোকেদেরকে সারাজীবন বাবুদের সম্পত্তি বৃদ্ধির যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে হয়। বিন্দো ভক্তা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময় মহাপাত্রবাবুদের ক্ষেতের কৃষি ফসলে পাহারা দেয়। মহাপাত্রবাবুরা শুধু সম্পত্তির মালিক হয়। বিন্দো ভক্তার মতো ভাতুয়ারা বড় অসহায়, মহাপাত্রবাবুদের নিয়মের বেড়াজাল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। মহাপাত্রবাবুরা

এলাকায় বিশাল জমির মালিক, তাদের মোট জমির পরিমাণ সাঁইত্রিশ বিঘা। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী বিন্দো ভক্তা মহাপাত্রবাবুদের কাছ থেকে সতেরো বিঘা জমি ভাগ পেয়েছিল। সরকারি খাতায় বিন্দো ভক্তার নামে জমি থাকলেও বাস্তবে সে জমির মালিক নয়। মহাপাত্রবাবুদের চোখরাঙানিতে ভূমি সংস্কার আইন সরকারি অফিসে লাল ফিতার বাঁধনে আবদ্ধ। এভাবে মহাপাত্রবাবুরা সুকৌশল ও অর্থের দম্ভে বিন্দো ভক্তার মতো একাধিক চাষির নামে জমিকে সরকারি খাতায় স্বচ্ছতা বজায় রেখে ভোগ দখল করেছে। বিন্দো ভক্তা মহাপাত্রবাবুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাই সে একদিন অবচেতন মনের অন্তরালে শ্রেণিস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একসময় বিন্দো ভক্তা মহাপাত্রবাবুদের একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। দীর্ঘদিনের বাবুদের উপর ক্ষোভকে উগরে দিতে চেয়েছিল-

> বারো মাস পাট খেতে খেতে মহাপাত্তদের এষ্টেটে বাঁধা রয়েছে বংশ পরম্পরায়। পেটভাতুয়া সম্বচ্ছরের মহিন্দর। বউ সম্বচ্ছরের বিনে মাইনের ঝি। ছেলেগুলো রাতদিনের বেগার। টুকচাক জমিন ছিলো, তাও বাপের আমল থেকে টিপছাপ করা রয়েছে বাবুদের সিন্দুকে। এতে খেটেও শোধ হল না আসলটাই কেমন করে বাড়ীর ছেলের মতো পুষলেন বাবুরা জিগাতে বড় সাধ হচ্ছিল তার।[১৯]

প্রান্তিক এলাকায় বসবাসের কারণে আদিবাসীরা কোনোদিন সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের মনোভাবকে প্রকাশ্য আনতে পারেনি। এর জন্য আদিবাসীদেরকে রাজনৈতিক চেতনায় একত্রিত হতে হবে।

অবশেষে ছোটগল্পটিতে জোতদার, জমিদার ও রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর বিন্দো ভক্তা সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়, বিপুল জনসমর্থনের আনন্দে সে এক নাগাড়ে বাঘের ডাক ডেকে যায়। আজ দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত, শোষিত ও নির্যাতিত বাঘেরা মহাপাত্রবাবুদের উপর থাবা বসাতে ছুটে আসছে। শেষ পর্যন্ত বিন্দো ভক্তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের জয় হয়েছে। এভাবে খেড়িয়ারা গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ভগীরথ মিশ্রের 'চিকনবাবু' নামক ছোটগল্পে ধন কুড়া, ভৈরববাঁকি, ভালুকসিনি ডুংরি ও কুসুমতলা আদিবাসী গ্রামে গবেষক হিরণ্ময়ের গবেষণা সংক্রান্ত বিচরণ ভূমি। হিরণ্ময়কে দেখে শবররা নকশাল বলে সন্দেহ করেছিল। প্রথম দিনে ধনকুড়ার খেড়িয়াপাড়ার শবররা হিরণ্ময়কে চিলমারি ডুংরিতে কেঁদ গাছের তলায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল। হিরণ্ময়ের জ্ঞান ফেরার পর তাদের পাড়ায় থাকতে চায়। কয়েকদিনে পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বয়েস অনুপাতে যথাযোগ্য সম্পর্কও পাতিয়ে নিয়েছে। সে শবর পাড়ায় বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল খুলতে চায়। এ জন্য রানিবাঁধ বাজার থেকে সিলেট-পেন্সিল, বই-খাতা কিনে এনেছিল। শবর পাড়ার

মহুলতলায় স্কুলও চলতে থাকে, অন্যদিকে নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা সংক্রান্ত বই পড়ে, আপন মনে লেখালেখি শুরু করে। আবার কখনো ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে গাঁয়ে কিংবা পাড়ায় ঘুরে শবরদেরকে একত্রিত করতে চায়। সরকারি মজুরি সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে চায়-

> আদিবাসী খেতমজুর, বুনো-জংলি মানুষের কাছে সে হিরুদা, হিরাদা,...এক অতি আপনার জন। সকলেই তাকে দেবতাজ্ঞানে সমীহ ও ভক্তি করে।[২০]

নিশাকর দাস খাতড়ার জোতদার। সে রাতের কারিগর, প্রতি মুহূর্তে শারীরিক কৌশলে ও বাহাদুরি দেখিয়ে সমস্ত কাজ করতে চায়। এর জন্য তাকে পুলিশের হাতে বহুবার মারও খেতে হয়েছে। একদিন নিশাকরের সঙ্গে দ্বারিক দাসের কথোপকথনে চিকনবাবুর প্রসঙ্গ ওঠে। দ্বারিক জানায় চিকনবাবু শবর পাড়ার ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে মহুলতলায় একটা স্কুল খুলেছে, পাড়ায় গিয়ে শবরদের সরকারি মজুরি সম্পর্কে সচেতন করে। নিশাকর দ্বারিকের কাছে চিকনবাবু সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায়-

> কবে আইল্যাক? কুন্ দিগ্ থিক্যে আইল্যাক? সাথে কে ছিল্যাক? কখন কুথায় যায়? কাকে কি বলে...?[২১]

কিছুদিন পর নিশাকর দাস ধন কুড়ায় এসে চিকনবাবুর পরিচিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। চিকনবাবুর মতো শহরের কিছু শিক্ষিত ছেলেরা নিজের স্বার্থে গ্রামে আসে। চিকনবাবুরা গরীবের বন্ধু, বড় লোকের শত্রু, আমাদের দিকে এরকম কিছু ছেলে এসেছে, রাতের বেলায় এরা মেটালা, দাঁড়শোল ও পাটপুরের জঙ্গলে মিটিং করে। গ্রামের সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ে সংগঠন গড়তে চায়। চিকনবাবু তাদের একজন-

> শহর থিক্যে কিছো পড়ালিখা ছগ্রা আইছে গাঁইয়ে। উয়ারা গেরিবের বন্ধু। বল্লোকের যম। আমাদ্যার দিকেও কিছো আঁইছে। লুকাঁই লুকাঁই থাকে। ঘোর জঙ্গলে মিটিন্ করে রাইতের বেলায়। মেটালা, দাঁড়শোল, পাটপুরের দু-দশজনা লুকাঁই-চুরাঁই যায় সে মিটিনে। অনেক ভালো ভালো কথা কয় ছগ্ রাগুলান। গেরিব মানুষকে লিয়ে সংগঠন গইড়ছে উয়ারা। তুমাদ্যার চিকন বাবুটা মালুম লিচ্ছে সেই একোই ডালের পাইখ।[২২]

নিশাকরের মুখে চিকনবাবু সম্পর্কে একথা শোনার পর জমিদার দাশু রায়ের ভয় হয়েছিল। দাশু রায়ের নির্দেশে গ্রামে সবাই নকশালদের বিরুদ্ধে (চিকনবাবুদের বিরুদ্ধে) অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে। এর ঠিক দুই মাস পর বর্ষায় চাষের কাজ শুরু হল। এই সুযোগে চিকনবাবু একদিন গভীর রাতে আদিবাসীদের নিয়ে জঙ্গলে একটা মিটিং ডাকে, মিটিং-এ চিকনবাবু জানায় জোতদারের কাছে সরকারি রেটে মজুরি দাবি করতে হবে, না দিলে কেউ কাজে যাবে না, এটা তোমাদের ন্যায্য দাবি। চিকনবাবুর কথায় খেড়িয়াপাড়া, ধনকুড়া ও চালকিগড়ের খেতমজুররা সাতদিন কাজ বয়কট করে। বাধ্য হয়ে জোতদার দাশু রায় খেতমজুরদের

আধাআধি দাবি মেনে নেয়। অবশেষে ধনকুড়া, খেড়িয়াপাড়া, চালকিগড়ের আদিবাসী মানুষরা বুঝতে পেরেছিল জোট বাঁধার সুফল।

ধনকুড়ার জমিদার দাশু রায় শুধু অর্থ-বৈভব নয়, ঋণ-কর্জের ফাঁদ নয়, আরও অনেক ছলাকলার কৌশল জানত। এমনকি রানিবাঁধ থানার পুলিশ প্রশাসনও তার হাতের মুঠোয় ছিল। যে কোন সময় ধনকুড়া ও খেড়িয়াপাড়ার আদিবাসীদেরকে চুরি-ডাকাতির মামালায় জুড়ে দিত। এইসব কারণে দাশু রায়কে সবাই ভয় করত। দাশু রায় জানত, আদিবাসীরা হল বোবার জাত, সাদা কাগজে টিপ দেয়, জলের মতো সোজা হিসাবও বুঝতে পারে না। চোখের সামনে সব লুট হয়ে গেলেও চুপচাপ বসে থাকে। দাশু রায়ের দুইটা বউ থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী পাড়ার সাঁওতাল, খেড়িয়া, দিনমজুর ও খেতমজুর মেয়েদেরকে দেখলে তার লোলুপ দৃষ্টির লোভ সামলাতে পারে না। অতএব ধনকুড়া ও খেড়িয়াপাড়ায় দাশু রায়ের হাতে এঁটো হওয়া মেয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এরপর দাশু রায়ের, খেড়িয়াপাড়ার সহদেব শবরের মেয়ে কোকিলা শবরের উপর নজর পড়েছিল। দাশু রায় কোকিলা শবরকে খামার বাড়ির কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। সহদেব শবর জমিদারের কথায় তার মেয়েকে পাঠাতে রাজি হয়েছিল। একমাত্র হিরণ্ময় কোকিলাকে জোতদারের বাড়িতে পাঠাতে নিষেধ করে। কারণ, হিরণ্ময় দাশু রায়ের কুকর্ম সম্পর্কে জানত। এর জন্য সহদেব শবরকে দাশু রায়ের কাছে অপমানিত হতে হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়তে পাড়ার লোকেরা সবাই সহদেবকে ভয় দেখিয়েছিল-

> ...সহদেবিয়া রে, তুই ইবার মইর্‌লি। সাপের লেজে পা দিয়েছু, তুয়ার আর নিস্তার নাই। চিকনবাবু আর ক-দিন! উড়া পাইখ, এই আছে, এই নাই। দেখিস, দাশু রায় তুয়াকে ইমন আছুল্যাটি দিবেক! দেখিস, খাঁকি তুয়ার ঘরে আইল্যাক বলে। উয়ারা তুয়াকে ধইরে লিয়ে গিয়ে পাছায় হুড়কা সেঁধাবেক, শালা, তুয়ার বগলে লাঠি ধরাবেক... ।[২৩]

ধনকুড়ার খেড়িয়াপাড়ার শবররা ভয়ে কাঁপছে। কারণ ছোটবেলা থেকে শুনেছে খেড়িয়া, শবররা জনম চোর, তাদের আদি পুরুষরা এই পেশায় নিযুক্ত ছিল। বিলাতি সাহেবরা সেইসব কথায় লিখে গেছে। তাই খেড়িয়া, শবররা চোর অপবাদে বার বার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে যেতে হয়। সহদেব শবর হিরণ্ময়ের পরামর্শে কোকিলাকে খামার বাড়ির কাজে যেতে নিষেধ করেছে। এর জন্য খেড়িয়াপাড়ার সবাই চিকনবাবুর নামে গালিগালাজ করেছে। দাশু রায়ের নির্দেশে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাতের অন্ধকারে খেড়িয়াপাড়াকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের ভয়ে খেড়িয়াপাড়ার পুরুষরা সবাই জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। সহদেব তখনও পালাতে পারেনি, ঝোপড়ির কোণে একা বসে ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপছিল। অন্যদিকে হিরণ্ময়ের সঙ্গে বড়বাবুর কথা কাটাকাটি চলছিল। হিরণ্ময় হেরে যাওয়ার পাত্র নয়, অনর্গল বিলাতি ইংরেজি ভাষায় কথা বলছিল, বড়বাবু জনা তিনেক আসামীর সঙ্গে সহদেবকেও গ্রেপ্তার করে। এ খবর শুনে দাশু রায়ের শিবির আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। হিরণ্ময় ঘণ্টাখানেক পরে আশেপাশের

গ্রামের শ পাঁচেক লোককে সঙ্গে নিয়ে রানিবাঁধের থানাকে ঘিরে ফেলে এবং গ্রেপ্তার হওয়া সকলকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। হিরণ্ময় সেদিন থেকে পার্শ্ববর্তী আদিবাসী গ্রামের মানুষজনের চোখে নায়ক হয়ে ওঠে।

দাশু রায় হিরণ্ময়ের আদিবাসীদের উপর সংগঠন শক্তি দেখে ভয় পেয়েছিল। এরপর আদিবাসীদের নকশাল নামাঙ্কিত সংগঠন জোতদারদের মাথা কাটবে, প্রথমে দাশু রায়ের নাম রয়েছে। দাশু রায় অপরাবোধের জন্য নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছে। খেড়িয়াপাড়ার কচিকাঁচা মেয়েদেরকে দেখে এখন আর তাকায় না। সহদেবের সঙ্গে দেখা হলে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। নিজের কুকর্মের জন্য আপসোস করে-

> ...'কী কইর‍্যে যেন রইটে গেছে, আমিই নাকি পুলিস এনেছিল্যম তুয়াকে বাঁধতে। বিশ্বাস কর সহদেব(সহদেবিয়া নয়), আমি ইয়ার বিন্দুবিসর্গও জানি নাই। আমি উসবের সাতেও নাই, পাঁচেক নাই।'[২৪]

হিরণ্ময় একদিন ভৈরববাঁকি নদীর পাড়ে এক সভা ডাকল। সভায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রাচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। হিরণ্ময় সভায় অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দেয়, সামনে ধান কাটার মরশুম চলছে খেতমজুরদেরকে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছিল। সবাই একজোট হয়ে আন্দোলন করলে নিশ্চয় মজুরি বৃদ্ধি পাবে। এতদিন বর্গাদাররা তোমাদেরকে ফসলের আধা ভাগ দিয়েছে, তোমাদের ন্যায্য পাওনা তিনভাগ, মালিক মাত্র একভাগ পাবে। অনেক আলোচনার পর সভায় উপস্থিত সবাই হিরণ্ময়ের বক্তব্যকে সম্মতি জানায়। হিরন্ময় আন্দোলনের জন্য একটা সংগঠন তৈরি করে। প্রথমে সে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে থাকতে রাজী ছিল না পরে অবশ্য রাজী হয়েছিল-

> 'তুই যদি থাকিস তো একশোবার বুঝে লিব। আমাদ্যার কাজ আমরা না বুঝে লিলে, কুন্ চদুর ব্যাটা বুঝব্যেক! কিন্তু তুই ইখ্যেনে থাইক্‌বি, কথা দে। আমরা বুঝে লিচ্ছি লিজেদের কাজ।'
> আচ্ছা, না হয় থাকলাম।'[২৫]

জনসভা থেকে হিরণ্ময়ের ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, দরজাতে টোকা দিতে, কোকিলা দরজা খুলে হিরণ্ময়ের পিছনে কয়েকজন সাহেবী পোশাক পরা মানুষকে দেখতে পায়। হিরন্ময় অনেক রাত করে বাড়ি ফেরায় কোকিলা অভিমান করেছে। এতে হিরণ্ময়ের লেশমাত্র অনুশোচনা নেই। হিরণ্ময় কোকিলাকে ধীর গলায় আলো জ্বালতে বলে। আই-বি অফিসারদেরকে বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতর থেকে তার গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইল বার করল। কোকিলা জানতে চাইলে জানায়, এরা গোয়েন্দার দল, আমার খোঁজে কলকাতা থেকে এসেছে। হিরন্ময় এক এক করে তার সমস্ত কাগজপত্র খুলে দেখায়- 'ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রাশন', 'পি এইচ ডি'র পারমিশন লেটার', গাইড ডঃ ভৌমিকের 'কনসেন্ট লেটার',

‘থিসিসের সিনোপসিস’, ওপরের ‘ক্যাপশানে টাইটেল বিহেবিয়ার‍্যাল প্যাটার্ন অব্ দ্য আন – অরগানাইজড্ কমন মাস, অ্যান্ড দেয়ার সাসেপটিবিলিটি প্র্যাকটিস– ক্রিটিক্যাল স্ট্যাডি।’

আলোচ্য ছোটগল্পে লেখকের সমসাময়িক ঘটনাগুলোর একটা জীবন্ত দলিল। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজের শ্রেণি বিন্যাসে আদিবাসীদের অবস্থান কোথায়, তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, জমিদারি উচ্ছেদ আইন, বর্গা ব্যবস্থা, খাসজমি উদ্ধার, খেতমজুরদের সরকারি রেটে বেতন বৃদ্ধি ও ভূমিসংস্কারের কর্মসূচী রূপায়নে সফলতা অর্জন করলেও আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অপরবর্তিত রয়ে গেছে। হিরণ্ময়ের মতো বামপন্থা আদর্শে বিশ্বাসী কোনো সংবেদনশীল গবেষক গবেষণা সংক্রান্ত কাজে যদি এ অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় না আসত, তাহলে ধনকুড়ার জোতদার দাশু রায়ের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ পীড়নের বেড়াজাল থেকে সমাজের সহদেব শবররা কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারত না। হিরণ্ময় দাশু রায়ের বিরুদ্ধে গ্রামে স্কুল, আলোচনা সভা, সমিতি গড়ে তুলে আদিবাসীদেরকে ঐক্য সচেতনতাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে অনেকটা সফল হয়েছিল। ধনকুড়ার খেড়িয়াপাড়ার আদিবাসী শবররা সরকারি রেটে মজুরি দাবি করতেও সক্ষম হয়েছিল। এই সব আদিবাসী মানুষদের চেতনা সঞ্চারে মূল সমস্যা হল, তাদেরকে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির মধ্যে দিয়ে সচেতন স্তরে নিয়ে যাওয়া। হিরণ্ময়ের ক্ষেত্রে তা অনেকটা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এদিক দিয়ে বিচার করলে হিরণ্ময় সফল হয়েছিল।

ভগীরথ মিশ্রের ‘বানের জল’ নামক ছোটগল্পে ধনু মাঝি, জাতিতে সাঁওতাল কুঁকড়াখুপীর বাসিন্দা। আদালতে তার নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল। সরকারের আইন অনুযায়ী পুলিশ তাকে জেলে নিয়ে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ধনু মাঝিকে প্রত্যেক দিন দুপুর পর্যন্ত থানা ঝাঁট দেওয়া এবং বাগান পরিচর্যায় বেগার খাটতে হবে। এছাড়াও বড়বাবুর কোয়াটারে গাছে জল দেওয়া, কাপড় কাচা ও তার সঙ্গে থানার যাবতীয় ফাইফরমাস কাজ করতে হয়। প্রথমে ধনু মাঝি একা এতগুলো কাজ করতে পারত না। কাজের চাপে খাওয়ার সময়ও পেত না, চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখত। তার কেসটা প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে চলছে। মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয়। আবার কোন সময় থানার বাবুরা জিপে করে তাকে মেদিনীপুরে নিয়ে যায়। সেখানে সরকারি উকিলের ঘরের বারান্দায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে, থানার বড়বাবু জিপে করে ফেরার পথে বস্তা বস্তা আলু, পেঁয়াজ, পটল ও অন্যান্য সব্জি, ধনুকে দিয়ে মাল বওয়া-বওয়ি তোলা-নামানোর কাজে বেগার খাটায়। থানার বড়বাবুদের কাছে বেগার খাটতে খাটতে তার সংসার প্রায় তলিয়ে গিয়েছিল। তাই ধনু মাঝির অবস্থা দেখে ঝড়েশ্বর নিজের অনাগত ভবিষ্যৎ চোখের সম্মুখে দেখতে পেয়েছিল। একদিন হঠাৎ শংকর মেদিনীপুরের কোর্টে ধনু মাঝির কেসের খবর তুলতে

বাবুরা নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া চাওয়ি করতে শুরু করে। ধনু মাঝির কেস নাকি প্রমাণাভাবে চার বছর আগে ডিসমিস হয়ে গিয়েছে। কোর্টের বাবুরা তাকে সে কথা জানায়নি। শংকর কোর্টে গিয়ে ধনু মাঝির কেসের কথা না তুললে সারা জীবন কোর্টে তাকে হাজিরা দিয়ে যেতে হত।

> থানার বাবুরা বলল, 'যাহ্‌ শালা। কাল থেকে আর আসবি নে থানায়। তুই খালাস হয়ে গেলি।'[২৬]

ধনু মাঝি জেল থেকে মুক্তি পেয়েও চোখে মুখে খুশির প্রতিক্রিয়া নেই। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে বুকে একটা চাপা দুঃখ নিয়ে থানা থেকে বেরিয়েছিল। লেখক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপর সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

ভগীরথ মিশ্রের 'ফসল কাটার গান' নামক ছোটগল্পের পটভূমিতে বাঁকুড়া জেলার আগুনকুমারী গ্রামে আদিবাসী সাঁওতালদের শোষিত জীবনযাত্রার এক বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামের জমিদার নিশিকান্ত পাল। সুরধনী, চাঁদনী ও সুবাসী নামক মেয়েরা দারিদ্র'র তাড়নায় চাষের সময় জমিদারের বাড়িতে কাজ করে। চাষের কাজে সারাদিন হাড় ভাঙুনি পরিশ্রম করেও তারা ঠিক মতো মজুরি পায় না। পূর্বে দাদন নেওয়ার বিনিময়ে তাদেরকে জমিদারের কাছে বেগার খাটতে হয়। জমিদার মাঠে কাজের তদারকি করার সময় আদিবাসী মেয়েদের উপর তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। জমিদার নিশিকান্ত পাল দোতালার বারান্দা থেকে চন্দনীকে লালসার চোখে দেখছিল-

> ভেজা কাপড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে ক্ষীর জমা নিটোল বুক। ছেলের জন্য ক্ষীর জমানো শুরু করে দিয়েছে চন্দনী। ওর রূপখানাই এখন অন্যরকম। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাপড়-চোপড় লেপটে গেছে সারা শরীরে। সমস্ত প্রত্যঙ্গের খাঁজভাঁজ এখন ভীষণ স্পষ্ট। নিশিকান্ত চোখ ফেরাতে পারেনা।[২৭]

সুরধনী দলের সবাই জমিদারের কুচরিত্র সম্পর্কে জানে। জমিদারের চিরকাল চন্দনীর উপর নজর ছিল। আশ্বিন-কার্তিক মাসে কামিন-মজুরদের চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে সংসার চালাতে হয়। এই সময় জমিদার কামিন-মজুরদেরকে চড়া সুদে দাদন দেয়। অভাবের তাড়নায় সবাই জমিদারের বাড়িতে দাদন নিতে হাজির। সবার শেষে চন্দনী মান্ডির দাদনের হিসাব হয়, আগের বছরের তার বকেয়া দাদন বাকি নেই। শুধুমাত্র দুটো মজুরি বাকি আছে। জমিদার চন্দনীকে বাকি মজুরির উপর সুদ নিতে চায়। চন্দনী নিরুপায় হয়ে জমিদারের সুদ বিষয়ক প্রস্তাবে রাজী হয়। চন্দনীর সম্মতিতে জমিদার হাসতে শুরু করে। জমিদারের এরকম আচরণ দেখে চন্দনী রেগে যায়। আবার পরক্ষণে চন্দনী পরিবারের কথা ভেবে শান্ত হয়েছিল। চন্দনীর পরিবারে আজ সবাই অনাহারে আছে। দাদনের ধান নিয়ে গেলে, তবে পরিবারের

জীবন বাঁচবে। চন্দনী পরিবারের অন্ন সংস্থানের কথা ভেবে জমিদারের অশ্লীল কথাগুলোকে মুখ বুজে সহ্য করেছে-

> হাঁক পড়ল ফের, 'ও চন্দনী, একজোড়া তাল কার গাছতলা থিকে কুড়ালি রে?' চন্দনী মনে মনে কুঁকড়ে যায়। বাঁ হাতের বিহনগোছা মাটিতে ফেলে দিয়ে লৈতার সংক্ষিপ্ত আঁচল নিয়ে টানাটানি জোড়ে বুকদুটো লুকোবার জন্য।যতই টানে, ভিজে আঁচল ততই লেপটে যায় বুকের বুকের সঙ্গে। নিশিকান্তর ঠোঁটে আঠালো হাসি। মনখানা যেন ভুয়াশ গাছের কোটরে বাঁশমুগরা সাপ।[২৮]

জমিদার নিশিকান্ত পাল আদিবাসী মেয়েদেরকে যেমন অমানুষিক শোষণে খেতমজুর খাটায়, তেমনই আবার নানারকম ছলাকলার আশ্রয় অবলম্বন করে, তাদের দারিদ্রর সুযোগ নিয়ে যৌন নিপীড়নও চালায়। সুরধনীর দলেরা যখন মাঠে উপাসী শরীর নিয়ে হাঁটুর নীচে কাদায় দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতো কৃষি জমিতে ধান রোয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই সুযোগে নিশিকান্ত নারী লোলুপ দৃষ্টিতে নারীদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উঠানামাকে উপভোগ করে।

'ফসল কাটার গান' গল্পে আর একজন জোতদার শৈলেশ, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলেশ ডাক্তার তার 'ডিসপেনসারিতে ডেলিভারি'র কাজে সহায়তার জন্য বিধবা সুরধনী বেশরাকে কাজে নিয়োগ করেছে। পচাডহরা গ্রামের সুরধনী বেশরা এক সময় দেখতে রূপবতী ছিল। এলাকায় সুরধনী বেশরার ধাই হিসাবে নামডাক রয়েছে। সুরধনী বেশরা একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে শৈলেশ ডাক্তারের রক্ষিতায় পরিণত হয়। শৈলেশের মৃত্যুর পর সুরধনীর চরম আর্থিক সংকটের সুযোগে নিশিকান্ত পচাডহরা স্কুলের ফাঁকা ঘরে রাতের অন্ধকারে তাকে জোরপূর্বক ভোগ করেছিল-

> সেই সন্ধেতে নির্জন ইস্কুলের পেছনে সুরধনীকে গিলে খেয়েছিল নিশিকান্ত। কাক-পক্ষীও জানতে পারেনি। অল্পসল্প চেল্লাচিল্লি জুড়েছিল প্রথম দিকে। কিন্তু ঐ নির্জন ইস্কুলঘরে ঐ আওয়াজ ডুবে গিয়েছে পুরোপুরি।[২৯]

অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে কোনো একদিন নিশিকান্ত তার শ্যালক মন্মথের সঙ্গে কথোপকথনের সময় নিজের কুকর্মের কথা গর্বের সহিত জানায়। কৃষি জমিতে বসে দু'জনে কর্মরত সুরধনীদেরকে লালসার চোখে দেখতে থাকে। নারী লোলুপ লম্পট নিশিকান্ত সুরধনীকে দেখিয়ে বলে-

> 'মালটি কেমন দেইখ্‌লি বটে?
>
> মন্মথ হাসে, 'জব্বর চিজ।'
>
> 'বয়েস অনুপাতে ফিগারখান ভালো।' নিশিকান্ত বাঁ' চোখ টিপে বলে, 'শালীকে একদিন একলাটি পেইয়্যেঁ 'থিরাপী' দিছল্যম। উয়ার পর থিক্যে শালী আর পাশটি ভিড়ে না।'[৩০]

নিশিকান্তের প্রবল দাপটে গ্রামের খেটে খাওয়া আদিবাসী মানুষদেরকে রাজনৈতিক পার্টির মিটিং থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। রাজনৈতিক পার্টির লোক আদিবাসী পাড়ায় রাতে এসে মিটিং করেছে। ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী পার্টির নেতারা প্রত্যেক আদিবাসীকে জমি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। নিশিকান্ত ষড়যন্ত্রের গোপন খবর জানতে পেরে আদিবাসীদেরকে হুমকি দেয়-

> শুনছি নাকি পার্টির লেতারা তুয়াদের পাড়ায় এইসে মিটিং কইচ্ছে রাতে? ঠিক বটে?
>
> লা-কাড়ে না সুরধনী। মাথাটা 'না' বলবার মুদ্রায় দোলায় বার দুই।
>
> থির পলকে ওর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকে নিশিকান্ত। ওর মাথা নাড়ানোর সত্যতা যাচাই করবার চেষ্টা করে। বলে, 'সব বন্ধ কইরে দুবো। দাদন-কর্জ খাটলি-বাটলি...সব। ভিটা মাড়াতে দুবো নাই।[৩১]

নিশিকান্তর মতো জোতদার, জমিদাররা অর্থের দম্ভে সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অর্থের বিনিময়ে সবকিছু কিনে নিতে চায়। এভাবে জোতদার, জমিদাররা সরকারি আইনকে তোয়াক্কা না করে প্রান্তিক এলাকার খেটে খাওয়া মানুষদের উপর নির্বিচারে শোষণ ও যৌন নিপীড়ন চালায়। সেই সব অত্যাচারিত মানুষদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না।

ভগীরথ মিশ্রের 'বনসাই পাল ও পুজো/৯২' নামক ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের দারিদ্রপূর্ণ জীবনযাত্রার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। গল্পে উল্লিখিত দুর্গা পুজোর অষ্টমীর দিন আদিবাসী সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্য শহরে ঢুকছে। জঙ্গল কিংবা গ্রাম থেকে আসতে তারা পুরোপুরি ক্লান্ত, ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে, পিছনে কয়েকটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসছে। এরা কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে, মাথায় একটা বড় কাঠের বোঝা নিয়ে ছুটছে, কাঠের বোঝায় খানিকটা গতি কমেছে, কখনো আবার মা কিংবা দিদির তাড়া খেয়ে ছুটছে। পুজোর প্যান্ডেল ছাড়িয়ে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তবুও পিছনে ফেলে আসা পূজা মন্ডপে লাউডস্পিকারের বাজনো চড়া সুরের গান তাদের কানে ভেসে আসে। সবার কাছে একটাই আশঙ্কা আজকের দিনে শহরের বাবুরা কাঠ কেনার ঝামেলায় যেতে চায় না। অথচ তাদের কাছে আজকের দিনে কাঠগুলো বিক্রি হওয়া খুবই জরুরী। এর সঙ্গে সরাসরি পেটের যোগ রয়েছে, কাঠ বিক্রি না হলে সপরিবারে উপোস থাকতে হবে। এইসব নানা প্রশ্ন তাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে খেতে জীবিকার তাগিদে শহরতলির একেবারে নিম্নবিত্তদের এলাকার দিকে ছুটে চলেছে। একসময় সাঁওতাল মেয়েদের কাঠের বোঝাগুলি মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। প্যান্ডেলে ছুটির মেজাজে বসে থাকা বাগচী, ভাদুড়ী, বর্ধনরা সবাই অলস চোখে দেখছিল। এই দৃশ্য দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল, রোজ জঙ্গল কেটে কাঠ বিক্রি করা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতি। এমনই করে দেশে বনজঙ্গলে গাছের পরিমাণ হ্রাসের মুখে, বনজঙ্গলের গাছপালার সঙ্গে

বৃষ্টিপাতের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। এমন করে হয়তো একদিন তারা পুরো জলবায়ুটাকে পরিবর্তন করে দেবে। বনজঙ্গলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বনজঙ্গলের শুকনো কাঠ কেটে বিক্রি করে। আবার অনেক আদিবাসী পরিবারকে বনের শুকনো কাঠের উপরে নির্ভর করে। তাই জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষরা দু'মুঠো ভাতের জন্য বনের শুকনো কাঠ কাটে। এতে জোতদার বাবুদের হিংসা হয়, অন্যদিকে কাঠের চোরা চালানকারী ঠিকাদাররা মাইলের পর মাইল গাছপালাকে কেটে লরীতে করে অন্য রাজ্যে চালান দেয়, তখন বাবুদের হিংসা হয় না, পরিবেশের ক্ষতি হয় না, জলবায়ু পরিবর্তন হয় না। এভাবে প্রশাসন দায়িত্বে থাকা বাবুরা আইনের ভয়ে আদিবাসীদেরকে দমিয়ে রাখতে চায়।

ভগীরথ মিশ্রের 'নাবাল' নামক ছোটগল্পে নাবাল হল এক সুজলা সুফলা দেশ। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের জলবায়ু রুক্ষ প্রকৃতির হয়। সুখেন মুড়া পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আমঝরণা গ্রামের বাসিন্দা, গত বৈশাখ মাস থেকে বৃষ্টি হয়নি, আকাশের রঙ ঘন তামাটে, প্রখর রোদে ডিহি-ডুংরি পুড়ে যাওয়ার উপক্রম শুরু হয়েছে। শ্রাবণ মাসে দু এক ফোঁটা বৃষ্টি হলেও অধিকাংশ কৃষি জমিতে জল নেই। এর মধ্যে কিছু সম্পন্ন চাষিরা আউস, অমন ধান বোনে কিন্তু পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে অল্প পরিমাণ কৃষি জমি থাকার কারণে, এলাকার সব মুনিশ-কামিনরা কাজ পায় না। কাজের আশা নিয়ে মুনিশ-কামিনরা জমিদারের বাড়িতে প্রতিনিয়ত ধর্না দিতে হয়। জমিদাররা সুযোগ পেয়ে পাঁচ টাকার কাজ, পাঁচ সিকায় সারতে চায়। অন্যদিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তাদের দাদন নেওয়া থাকে, সেই দাদন শোধ হয় সিকি দামে, এক মাসের পর কাজ শেষ, দানাপানিও শেষ হয়ে যায়। তাই তারা জমিদারদের শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী উৎসবের পর গ্রামের সবাই সমাজ সংসারকে পিছনে ফেলে পূর্বদিকে নিশানা করে নাবাল দেশে পরিযায়ী ভূমি শ্রমিক হিসাবে কাজে চলে যায়। পশ্চিমরাঢ়ের প্রতিটি সড়কের ধারে একই দৃশ্য, কাতারে কাতারে মানুষ নাবালে চলেছে।

> ...বাঁশপাহাড়ী বাস্ট্যান্ডে এ গাছের ও গাছের তলায় সংসার পেতে বসেছে প্রায় জনা তিরিশেক মানুষ। মেয়া-মদ্দ কাচ্চা-বাচ্চা। বোঁচকা-বুঁচকি। এনামেলের তোবড়ানো হাঁড়ি-কুড়ি। ছেঁড়াছোঁড়া তালাই-ক্যাঁথা। হাস-মুরগি-ছাগল। নাবালে চলেছে পশ্চিম রাঢ়ের মানুষ।[৩২]

শুধু মুনিশ-কামিন নয়, এই দুর্দিনে ওঝা, গুনিন, কামার, কুমোর, ছুতোর, কারিগরের দল পশ্চিমরাঢ়দেশ ছেড়ে কাজের উদ্দেশ্য নাবাল দেশে যায়। একসময় পুরো গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায়। এ বছর পশ্চিমরাঢ় এলাকায় খরার প্রকোপটা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি, আষাঢ় মাস অবধি এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। এমন সময় তারা খবর পেল বর্ধমান আর হুগলীর দিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। অতএব বর্ধমান আর হুগলীর দিকে চাষের কাজ শুরু হয়েছে। একথা শুনে আমঝরণা গ্রামের লোকজনদের সাজো সাজো রব হয়ে ওঠে।

আমঝরণা গ্রামের পুরো লোক দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রবল বৃষ্টির কথা শুনে সুখেনের স্ত্রী রূপীও নাবালে যেতে চায়। তাই সুখেনের কাপড়ের সঙ্গে নিজের শাড়ি ক্ষারে চুবিয়েছে, কিন্তু সুখেন রূপীকে নাবালে নিয়ে যতে চায় না। সুখেন রূপীর কাছে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে-

> সুখেন মুড়া মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়। মেয়া জাতটাই এ রকম। শালা, মেয়া যদি বলে, বুঝবো নাই, তো দুনিয়ার কারুর সাধ্যি নাই উহাকে বুঝ্ দেয়।[৩৩]

প্রতিবছর সুখেন রূপীকে ছেড়ে নাবালে কাজে যায়, রূপীর ডিহি-ডুংরি রুখা দেশে একা থাকতে ভালো লাগে না। প্রতি মুহূর্তে আষাঢ় মাসে রূপীর চোখে ভেসে উঠে নাবালের ছক কাটা সবুজ দেশ। সবার সঙ্গে চলে যেতে চায় নাবালে অর্থাৎ নিচু জমির দেশে। হুগলী কিংবা বর্ধমানের কোনো এক গ্রামে ডেরা বাঁধতে চায়। নাবাল দেশে সুজলা আকাশ, সুফলা মাটি, ক্যানেলের অফুরন্ত জল সব মিলিয়ে কৃষিকাজের এক উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। প্রতিবছর নাবাল দেশে চাষের কাজে প্রচুর মুনিশ-কামিনের প্রয়োজন হয়। নাবাল দেশের বাবুদের শক্তপোক্ত পশ্চিমরাঢ়ের মুনিশ প্রয়োজন হয়। এই সুযোগে পশ্চিমরাঢ়ের পরিযায়ী ভূমি শ্রমিকরা দলে দলে এসে বাবুদের বাড়ির গাং দেওয়ালীতে ঠাঁই নিত। বাড়ির গাং দেওয়ালী বলতে গোয়ালের সঙ্গে লাগোয়া ছিটে-বাঁশের দেওয়াল। সবাই এক সঙ্গে বসবাস করে, ঝাঁটি কাঠের আগুনে ভাত রান্না করে, খড়ের আগুন কিংবা বোয়ান্ গাছের পাতা পুড়িয়ে মশা তাড়ায়। এভাবে তাদের আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস কেটে যায়। নাবালের দেশে বাবুদের জমিতে ধানের চারা রোপনের সময় হঠাৎ করে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে, ফেলে আসা কুঁড়ে ঘরটি চোখের সামনে মুহূর্তে ভেসে ওঠে। অবশেষে তারা নাবালের দেশকে সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে ভাদ্র মাসের শেষের দিকে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী মানুষরা অনুর্বর পোড়া মাক্ড়া পাথরের দেশে ফিরে আসে। নাবালের দেশে মুনিশ-কামিনদেরকে দুঃখ কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। গল্পের মাধ্যমে লেখক পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকট ও তাদের নাবাল দেশে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক দুঃখ দারিদ্রর বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

ভগীরথ মিশ্রের 'খাঁচার পাখি' নামক ছোটগল্পে পঞ্চু আর্থিক সংকটের কারণে পাখি শিকার করে সংসার চালায়। আশ্বিন কার্তিক মাসে গ্রামে কাজ নেই, খেতের বাছাবাছি কাজ শেষ হয়েছে। পঞ্চু নিজের মনকে প্রবোধ দেয় সকাল হলে কাজের খোঁজে বেরোবে কিন্তু সে কাজে বেশি মজুরি পাওয়া যায় না। বাবুরা পাঁচ টাকার বেশি মজুরি দিতে চায় না, আবার সেই পাঁচ টাকা দিয়ে তিন জনের সংসার ঠিক মতো চলে না। প্রত্যেক দিন আধ পেটা খেয়ে হাড় ভাঙানি পরিশ্রম পঞ্চুর পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পঞ্চুর বউ পঞ্চুকে ডাহুক পাখি শিকার করতে বারণ করে, তাই মাঝে মাঝে পঞ্চুর আড়ালে তার পোষমানা ডাহুকটিকে শাসায়। একদিন পঞ্চুর বউ ডাহুক পাখিটিকে ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল, যাতে পঞ্চুর শিকারের

ফাঁদ থেকে বনের পাখি গুলো বাঁচে। এখন পঞ্চু মাঝে মাঝে তার ছেলে চৈতনকে শিকারে নিয়ে যায়। পাখি ধরার আদব কায়দা ছেলেকে শিখিয়ে দিতে চায়। পঞ্চুর বউয়ের তাতে আপত্তি ছিল, ফাঁদ পেতে ডাহুক পাখি ধরা মহাপাপের কাজটা ছেলেকে শিখিয়ে দিতে নিষেধ করেছে। সে সাথী হারা ডাহুকের করুণ আর্তনাদ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। আবার সে পাড়ার মুরুব্বিদের কাছে গল্প শুনেছে, ডাহুকের অভিশাপ নাকি লেগে যায়-

> ডাহুকের শাপান্তি নাকি ভীষণ ফলে যায়। যতই ভাবে, ততই ভয়ে সিঁটিয়ে যায় পঞ্চুর বউ। রাগে- ঘেন্নায় গা রিরি করে ওঠে পঞ্চুর ওপর। তেতো গলায় গজগজিয়ে ওঠে, 'জগতের মরদ খাট্যে খাতেছে, আর উনি ঢ্যাম্‌নাকে দিয়ে পাইখ ধরতিছেন! মহাপাপ আর কারে কয়![৩৪]

পঞ্চু খাঁচা আর ফাঁদ খানা দাওয়ায় নামিয়ে ডাহুক দুটোকে নিয়ে বিক্রির জন্য গ্রামের দিকে বেরিয়েছে। পাখি দুটিকে বিক্রি করে দোকানে কিছু সওদা-পাতি কিনে বাড়ি ফিরতে তার একটু দেরি হবে। এমন এক সন্ধ্যায় পুকুর ঘাটে কুসুমের সঙ্গে পঞ্চুর বউয়ের দেখা হয়। কুসুম মেজকর্তা দুয়ারী ঘোষের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। পঞ্চুর সংসারে আর্থিক অনটনের খবর জানতে পেরে, সেই সুযোগে মেজকর্তা কুসুমের মাধ্যমে পঞ্চুর বউকে আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিল। পঞ্চুর বউ মেজকর্তার কু-প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ঘুমে আছন্ন অবস্থায় পঞ্চুর বউ স্বপ্নে দেখতে পায় এক বিশাল জন্তু হা প্রসারিত করে তাকে গিলে ফেলে, আর সেখানে চারিদিকে মণিমুক্তা খচিত আশনে মেজকর্তা বসে তাকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছে-

> পঞ্চুর বউকে দেখে মেজবাবু বলল, 'এই দেখ, পঞ্চার বউ, এ সবই তোর। আর তুই শুধু মোর।'[৩৫]

পঞ্চু রাতে ঘুমের মধ্যে বউয়ের মুখে মেজবাবুর নাম শুনে সন্দেহবশত পরের দিন মেজবাবুর কাছে অভিযোগ জানায়, গরিবের পরিবারটির প্রতি নজর পড়ছে কেন? উত্তরে মেজবাবু জানিয়েছে এই বিদ্যাটা নাকি পঞ্চুর কাছে শিখেছে। পঞ্চু তো খাঁচার পাখি দিয়ে বনের পাখি শিকার করে, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে পঞ্চু তার শিক্ষাগুরু। লেখক সেই সব মেজবাবুদের শিকারের ফাঁদে আটকে পড়া পঞ্চুদের জীবনের বাস্তবতার কাহিনি বলেছেন। সমাজের মেজবাবুরা অর্থের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে শিকারের ফাঁদে ফেলে দেয়। বর্তমানে কমবেশি সারা বিশ্বজুড়েই মেজবাবুদের চোখ রাঙানি দেখা যায়। মেজবাবুদের প্রতাপ সর্বত্র এবং তাদের ক্ষমতাও অপরিসীম লেখক সেই সত্যকে গল্পে নির্মাণ করেছেন।

ভগীরথ মিশ্র তাঁর ছোটগল্পে জীবনের রূপ চিত্রনে পটভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী প্রান্তবর্গীয় মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য নানারকম পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধরনের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ করে গ্রামকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটেই ব্যবহার করেছেন। এমনই একটি তাঁর ছোটগল্পের নাম হল 'কুয়েল'। ছোটগল্পটির পটভূমি পশ্চিমরাঢ়

অঞ্চল নয়। সুন্দরবনের ঘোর বনজঙ্গলকে ঘিরে 'কুয়েল' গল্পের সৃষ্টি, কুয়েল একটি অদ্ভুত পেশা, - শিকারীরা জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার সময় একজন হরবোলাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে হনুমানের ডাক নকল করতে পারে। নকল ডাকের ফাঁদে পড়ে হরিণের দল ক্যাওড়া পাতার লোভে ছুটে আসে। শিকারীরা ঐ সুযোগকে কাজে লাগায়। ঐ হরবোলাকে ব্যক্তিকে সুন্দরবনে 'কুয়েল' বলা হয়। 'কুয়েল' গল্পে কৈলাস সর্দার মুণ্ডা সম্প্রদায় এবং হরবোলা পেশার সঙ্গে যুক্ত। সুন্দরবনের লোক কৈলাস সর্দারকে অপয়া বলে বিশ্বাস করত। এমন নাস্তিক মানুষ দলে থাকলে বনে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেই মানুষটি সংসারের চরম আর্থিক সংকটের কারণে একটি শিকারী দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়েছিল। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে শিকারী দল পথ হারিয়ে খাদ্য ও জলের অভাবে প্রায় তাদের একেবারে মারা যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় কৈলাস হনুমানের স্বরকে হুবুহু নকল করে বনে শিকাররত অন্য শিকারী দলের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল। অনেক দূরে 'কুয়েল'র ডাক শোনা যাচ্ছিল, সেদিকে কৈলাস কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। সুন্দরবনে শিকাররত অন্য শিকারী দলের হনুমানের স্বর শুনতে শুনতে একসময় কৈলাস সর্দার নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে, ধীরে ধীরে তার কপালের শিরা গুলো ফুলে ওঠে। দুটি হাতের তালু দিয়ে ভেলা বানিয়ে মুখের উপর ভেলাখানি থাপনা করে। আবার সে আচমকা ডাকতে শুরু করে। গলায় বিচিত্র স্বর ফুটিয়ে কখনও দ্রুত, কখনও বা বিলম্বিত এক নাগাড়ে ডাকতে থাকে। শিকারী দলের লোকেরা কৈলাস সর্দারের হুবুহু হনুমানের স্বর শুনে অবাক হয়েছিল। সেই দিন শিকারী দলের লোকজন কৈলাস সর্দারের আসল পরিচয় জানতে পারল। একটু পরে অন্য প্রান্ত থেকে পালটা ডাক শোনা যায়, মুহূর্তে কৈলাস সর্দার জানায় এরপর আর ভয় নেই, আবার প্রবল শক্তিতে গলা টেনে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বের করতে শুরু করে। কিন্তু একসময় গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে, ঘামে ভিজে যায়, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়তে থাকে, একবার শরীরে তার প্রবল খিঁচুনি মেরে জমিতে আছড়ে পড়ে। অবশেষে যখন শিকারী দল এসে পৌঁছাল তখন, কৈলাস সর্দারের মৃতদেহ জমির উপর পড়ে রয়েছে, ছাতিম গাছের চারিদিকে রক্তে ভিজে রয়েছে। 'কুয়েল' ডাকলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে জেনেও কৈলাস ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়নি। নিজের পরিবারের থেকেও দলের মানুষকে বেশি ভালোবাসত, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। কৈলাস সর্দার উদারতা ও মহত্ত্বের জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিল। কৈলাস সর্দারের মতো 'কুয়েল' সারা সুন্দর বনে ছিল না। কৈলাস কুয়েল হয়ে শহুরে সাহেব শিকারীদের সঙ্গে প্রায় পুরো জীবনটায় কেটে দিয়েছিল। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত রোগজীর্ণ শরীরে বাড়ি ফিরেছিল। কৈলাস অর্থনৈতিক সংকটের কারণে জঙ্গলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে। অভাবী সংসারের গ্রাসে চিরদিনের মতো তলিয়ে গেল। এইভাবে আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে কোনরকমে

দিন কাটলেও আদিবাসী মানুষেরা বহু ক্ষেত্রে আপন জীবনদর্শনের মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আলোচ্য গল্পটিতে সেই দৃষ্টান্ত বহন করে।

লোকবিশ্বাস বা লোককাহিনি মানুষের মুখের কথা নির্ভর হয়। আদি মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে বা মুক্তি পেতে বেশ কিছু ধারণার জন্ম দিয়েছিল। সভ্যতার এই আদিপর্ব থেকে লোকবিশ্বাস বা লোককাহিনির উদ্ভব হয়। লোকবিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ দিকগুলি হল আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, ব্রত, বিবাহ উৎসব, মেলা, লোক চিকিৎসা, লোক বিজ্ঞান, মন্ত্র ও টোটকা ইত্যাদি। এগুলি লিখিত আকারে কিছু পাওয়া যায় না। লোক মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় প্রচলিত। প্রকৃতির বিরূপতা থেকে মুক্তি পেতে আদি মানব সমাজ বিভিন্ন রকমের আচার অনুষ্ঠান পালন করত। এখান থেকে তাদের লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে রয়েছে কিছু যাদু নির্ভর লোকবিশ্বাস, কিছু কৃষি বিষয়ক লোকবিশ্বাস। ভগীরথ মিশ্রের এমন অনেক গল্প আছে, যেখানে লোকবিশ্বাস বা লোককাহিনি গল্পের ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে সেই গল্পগুলি বিশ্লেষণ করা হল-

'ফসল কাটার গান' ছোটগল্পে নিশিকান্ত পালের জমিতে জোর কদমে চাষের কাজ চলছে। সুরধনীর দল প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও নিরলসভাবে চারা তুলছে। সবুজ জমিন জল কাদার উপর উবু হয়ে তারা বসেছে, শুধুমাত্র কালো কালো মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে অঝোরে ঝর্‌ঝর্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রবল জোরে ঝড়ো হাওয়া বইছে। ঝড় থামার কোন লক্ষণ নেই। চাষ জমির চারিদিকে ঝড়িয়া পোকারা কাতারে কাতারে উড়ছে। কামিনদের বিশ্বাস আরো কয়েকদিন ঝড় বৃষ্টি হবে। এভাবেই তাদের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের কাহিনি বংশ পরম্পরায় লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে-

> ঝোড়িয়া-পোকা উড়ছে কাতারে কাতারে। তার মানে আরও বৃষ্টি হবেক।[৩৬]

'নাবাল' ছোটগল্পে সুখেন মুড়ার স্ত্রী রূপী অন্তঃসত্ত্বা থাকার সময় তার শাশুড়ি মতিহারী তাকে নাবাল যেতে নিষেধ করেছিল-

> 'হঁ' বউ, ইবারটা যাইস্‌ নাই। পর্‌থম্‌ পুয়াতী তুই। বংশের পর্‌থম্‌ ছেইলা তুয়ার পেটে।'[৩৭]

রূপী তার শাশুড়ি মতিহারীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল। শাশুড়ি জানায়, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদেরকে অনেক নিয়ম পালন করতে হয়। অন্তঃসত্ত্বা মানে তুমি বসুমতি, তুমি জন্ম দেবে দেবশিশুর, তোমার সামান্য একটুখানি ভুলের জন্য বিরাট একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। গর্ভে সদ্য নবজাতক শিশুটি তোমার খাদ্য থেকে খাদ্য পাবে, মন থেকে মন পাবে, স্বভাব থেকে স্বভাব পাবে। অতএব তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে, বাসি পচা খেলে শিশুটি পেটের রোগ নিয়ে জন্মাবে, পেটে খিদে নিয়ে থাকলে শিশুর পেটে চিরজনমের মতো খিদে বাসা বাঁধবে। রাগ, রোষ মনে পুষতে নেই, ভয়, ডরের থানে যেতে নেই, খাল-বিল পার হতে নেই,

একা জঙ্গলে যেতে নেই, একা ডুংরিতে উঠতে নেই, রাতের বেলায় পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখতে নেই, ঠাকুর দেবতার সুন্দর মুখখান হৃদয়ে স্থান দিতে হবে, সবসময় হাসি খুশিতে থাকতে হবে। এইসব নিয়মগুলো ঠিকভাবে পালন করলে দেবশিশু জন্ম গ্রহণ করবে। এরপর একদিন নবজাতক শিশুটি পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে। এর জন্য আঁতুড় ঘরটিকে দেবতার ফটো, আমের ডাল লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। শিশুটি জন্মের পর চোখ খুলে যেন শুভ বস্তুগুলোকে দেখতে পায়। কারণ প্রথম নজরে শিশুটি যা দেখবে সেটা তার চোখে আজীবন স্থায়ী থাকবে। রূপী শাশুড়ির সব কথাগুলো নীরবে শুনে। সুখেনের মা নাবালে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রূপীর উপর নানারকম নিষেধ আরোপ করার পরেও, রূপী সুখেনের সঙ্গে নাবাল-এ যেতে চায়। রূপী সুখেনের সঙ্গে নাবালে যাওয়ার যুক্তিগুলি হল- অন্তঃসত্ত্বা থাকার কারণে সে নাবাল যেতে চাইছে। নবজাতক শিশুটি গর্ভে ধীরে ধীরে বাড়ছে, তাই এই ভুখা দেশে থাকতে চাইছে না। এক পেট খিদে নিয়ে শিশুটি জন্ম নিলে, শিশুর পেটে চিরজনমের মতো খিদে বাসা বাঁধবে। রূপী শিশুটিকে নাবালের দেশে সুজলা সুফলা ভরা শস্য ক্ষেত দেখাতে চায়। জন্মের পর তাকে যেন রোদে সেঁকা ডিহি- ডুংরি, জোড় বাঁধের শুকনা পাঁকে অজস্র ফাঁকের মতো অশুভের প্রতীক দেখতে না হয়। এই সব লোকবিশ্বাস তাদের বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

'বনসাই পাল ও পুজো/৯২' ছোটগল্পে পাগল মুর্মু'র নতুন বউ খণ্ডকোষের জলায় সুষনি শাক তুলতে গিয়ে শ্যাওলায় পা জড়িয়ে পড়েছে। পাগল মুর্মু ছেলে বেলা থেকে শুনে আসছে, খণ্ডকোষের জলায় জীয়ন্ত শেকল আছে। আচমকা পায়ে জড়িয়ে পড়ে। ডুবিয়ে নিয়ে যায় গভীর জলায়। রক্ত চুষার পর জলের উপরে ভাসিয়ে দেয়। পাগল মুর্মু'র বউ সুশনি শাক ধরে প্রাণপণে ডাঙ্গায় উঠে আসতে চায়। এই লোকবিশ্বাস তাদের বংশ পরম্পরায় চলে।

মিথ বা পুরাণ গল্প অতীত কালের কাহিনি। দেবতা বা দেবতা সুলভ মানুষের কর্মজীবন বর্ণিত হয়। গল্পের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে থাকে। পৃথিবী সৃষ্টির অপরূপ লীলা রহস্য লুকিয়ে থাকে। পুরাণ কাহিনি হল সৃষ্টি বিষয়ক কাহিনি, প্রত্যেক পুরাণে কমবেশি ধর্মীয় প্রভাব থাকে। ভগীরথ মিশ্রের কিছু গল্পে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহ ও মিথ বা পুরাণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর, সূর্যদেবতা, মনসা, শীতলা, গোরক্ষনাথ, কল্যাণেশ্বরী প্রভৃতি দেব-দেবীকে ঘিরে মোটামুটিভাবে বাংলার পুরাণ কাহিনি গড়ে উঠেছে।

'চিকনবাবু' ছোটগল্পে হিরন্ময় পৌরাণিক কাহিনি শুনিয়ে ধনকুড়ার, কাস্তেমারি, চালকিগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের চোখের সামনে জোতদারের আসল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌরাণিক গল্পটি হল, সমুদ্রের নীচে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। ঘোল বানানোর প্রক্রিয়ায় মাখন আকারে সম্পদগুলো উপরে ওঠে আসবে। দেবতারা রাজী হয়, মন্দর পর্বত ঘোল ঘোরাবার মুঠনি আর বাসুকি নাগ হল মুঠনি ঘোরাবার রশি, কিন্তু কারো পক্ষে একাজ

করা সম্ভব হল না। দেবতারা দানব রাজাকে একথা জানিয়েছিল। দানবরাজ এক শর্তে রাজী হয়, সমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক ভাগ তাকে দিতে হবে। শুরু হল সমুদ্র মন্থন প্রক্রিয়া, দেবতারা খুব চালাক বাসুকি নাগের লেজের দিকে অবস্থান করল যাতে সাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস সহ্য করতে না হয় আর মুখের দিকে দানবরা ছিল। একে একে উঠতে লাগল মহালক্ষ্মী, ঐরাবত, পারিজাত ফুলের গাছ, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী নামে সুন্দরী অপ্সরার দল, সব ইন্দ্রের ঘরে পাচার হয়ে যায়। দানবরা এতেও ক্ষুদ্ধ নয়, অমৃতের অর্ধেক অংশ ভাগ পেলে তারা খুশি ছিল। অবশেষে মোহিনীর রূপ ধরে স্বয়ং নারায়ণ অমৃতের ভাঁড় নিয়ে উঠল। নারায়ণের নির্দেশে দেবতা ও দানবরা দুই সারিতে বসল। নারায়ণ খুশিতে নাচতে নাচতে দেবতার দিক থেকে অমৃত বিতরণ করতে শুরু করে। যখন দানবরা নারায়ণের এ চালাকি বুঝতে পারল তখন অমৃত শেষ হয়ে গিয়েছে। দানবরা পুনরায় নিজের ভাগের অমৃত চাইলে, ইন্দ্র তাদেরকে বজ্রের মাধ্যমে হত্যা করে। হিরণ্ময় হঠাৎ গল্প থামিয়ে সভায় জমায়েত লোকজনদেরকে জিজ্ঞাসা করে।

> ...'কী বুঝ? দেবতাগুলান ত বড়ই ঢ্যামনা বটে!
>
> 'ঢ্যামনা বলে ঢ্যামনা!' হিরণ্ময় বলে, 'কিষ্টো ঠাকুরকে দিয়েও নাই বুঝো সেটা? অটাও কি কম ঢ্যামনা? গোপিনীদের ঘরে ঘরে ননী-মাখম চুরি করা থিক্যে পরের বউ ফুসলানো অবধি কুন কাজটা বাকি ছিল উয়ার!'[৩৮]

আপাত দৃষ্টিতে ধনকুড়ার আদিবাসীরা মূর্খ হলেও 'রামায়ণ', 'মহাভারত', পুরাণের অনেক গল্প জানত। হিরণ্ময়ের পুরাণের কাহিনি তির্যক ভাবে বলার ভঙ্গিমায় একটা আলাদা মাত্রা নিয়ে আসে। হিরণ্ময় চোখ নাচিয়ে যোগ করে ওরা তাও সত্য যুগের দেবতা ছিল, আর এই কলিযুগের দেবতারা তো নির্ঘাত ঢ্যামনা হবে। প্রথমে হিরণ্ময় পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে দেবতাদের ভাবমূর্তি ভাঙার গল্প দিয়ে শুরু করেছিল। অবশেষে ধনকুড়ার দাশু রায়ের ভাবমূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়। এভাবে হিরণ্ময় পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে ধনকুড়ার খেড়িয়াপাড়ার আদিবাসীদের শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতে সফল হয়েছিল। 'বাঘের ডাক' ছোটগল্পে যে চেতনার সূচনা হয়েছিল 'চিকনবাবু' ছোটগল্পে সেই চেতনার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, ভগীরথ, 'আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা ছোটগল্প, শারদীয়া ১৪১২, পৃ-২১৫।

২. মিশ্র, ভগীরথ, 'আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা', *কোরক* সাহিত্য পত্রিকা ছোটগল্প, শারদীয়া ১৪১২, পৃষ্ঠা-২১৫-২১৬।

৩. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯০।

৪. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০ টি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-৮০।

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।

৮. সেন, অভিজিৎ,*পঞ্চাশটি গল্প,* সুপ্রকাশ, নদীয়া ৭৪১২৪৭, পৃষ্ঠা- ৭৫।

৯. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০ টি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪।

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৫।

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৯।

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২১।

১৪. মিশ্র, ভগীরথ, *নির্বাচিত গল্প,* অনুষ্টুপ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩০।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

১৯. মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৪৭৩।

২০. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-২১৭।

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬।

২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২১।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২২-২২৩।

২৬. মিশ্র, ভগীরথ, *আমার একান্নটি গল্প,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৪৯।

২৭. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৮৪।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৫।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৯।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯০।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯০।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭।
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৭।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৮।
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৯।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮৪।
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১২।
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৮।

সপ্তম অধ্যায়:
নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

নলিনী বেরা ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সুবর্ণরেখার নদীর তীরবর্তী সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ বাছুরখোঁয়াড় গ্রামের এক সাধারণ চাষি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি তার জন্মভূমি ভূপ্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

> সুবর্ণরেখার দক্ষিণতটবর্তী নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা তথা তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ, বিশেষত যে জায়গায় জন্মেছি, তার ভূগোল ভূপ্রকৃতি মানুষজন গাছপালা সব কেমন স্বতন্ত্র, অদ্ভূতুড়ে। মধ্যবর্তিনী বহমান সুবর্ণরেখা তাকে প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আজ বলে নয় সেই আদিকাল, ইতিহাসের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই। বেশিরভাগ সময়টাই আমরা ছিলাম উৎকলের মধ্যে। এই সেদিনও মাটির দাওয়ায় হেরিকেন জ্বেলে ইংরাজি পড়তে শুনেছি, 'There is a frog.' দেয়ার ইজ এ ফ্রগো, 'সেঠিরে গুট্যে ব্যাঙো'। এখনও বারিপদার মুরুডা থেকে প্রকাশদা (আমার জামাইবাবু) এলে বেভুলে বলে ফেলেন, 'নলিনী, ঝাড়া যিব-অ', অর্থাৎ 'বড় বাইরে' সারতে জলের দিকে যাব কী না জানতে চান। বেশিদিন আগের কথাও নয়, ইংরেজ আমলে, নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুরকে উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় কী না- এই মর্মে প্রস্তাব প্রায় পাশ হয়ে যাচ্ছিল,...[১]

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক মানচিত্রে এই অঞ্চলটির একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। একদিকে উড়িষ্যা, অন্যদিকে ঝাড়খন্ড রাজ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের উত্তর পশ্চিমের ভূপ্রকৃতি কঙ্করাকীর্ণ আর পূর্ব দক্ষিণের ভূমি চর-পলিবিধৌত। উত্তর পশ্চিমের আরণ্যক সংস্কৃতি ও পূর্ব-দক্ষিণের আর্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরার সাহিত্য জগৎ আলাদা। সে অঞ্চলের ভাষাও বাংলা নয়, হাফ বাংলা হাফ ওড়িয়া। সেই ভাষাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণরস সঞ্চার করলেন।

> জন্মাবধি যে ভাষা শিখলাম, যে ভাষায় কাঁদলাম, হাসলাম, কথা বললাম, বড় হয়ে স্কুলে গিয়ে জানলাম- সে ভাষা 'বাংলা' নয়। যে মাটিতে জন্মেছি তার জাত সার্বিক বাঙলার 'দোআঁশ' না হলেও 'দো-আঁসলা'। এমন কী বলা যেতে পারে 'তে-আঁসলা'ও। কিছুটা বাংলা, কিঞ্চিৎ ওড়িয়া আর কথঞ্চিৎ ঠেঁট হিন্দি বা। তাই শুদ্ধ বাংলার নাগাল পেতেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর! আমাদের 'ট্যাঁসা' যে বাংলায় নীলকণ্ঠ, 'ঢেপ্‌চু' ফিঙে আর 'ক্যারকেটা' যে দোয়েল– তা তো এই সেদিন জানলাম![২]

তাঁর সাহিত্যের জগৎ একটি নিদির্ষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমিগুলি কংসাবতী, শিলাবতী, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর, টটক-কুমারী, রাঢ়-কাঁকর, ডুলুং সুবর্ণরেখা, নদীবিধৌত, ঝারিখণ্ডের আসনবনি কুড়চিবনি, জামবনি শালবনি, কেঁদবনি, বনকাটি,

মুড়াকাটি, আমডিহা, বাঘমারি, ভালুকমারা, ল্যাকড়াগুড়ি, বাঘুয়াশোল, টিকরপাড়া, রণজিৎপুর লবকেশপুর হাতিবাঁধা, গোপীবল্লভপুর, রোহিণী, কুলটিকরি ইত্যাদি গ্রাম্য নামের অনুসঙ্গে তৈরি হয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলে হিঙ্চা হিড়িমিচা ঘলঘসি আঁটারি চরচু ডকা কুচলা ধ আসন শাল পিয়াশাল কেঁদ্ ভাদু ভুড়ুরু করণ কইম বাদাম বাদভেলা কদম গুটিমন দধিয়া কুড়চি গোনালি জাড়া জারুল চাঁড়াশ পাকুড় কষাফল ইত্যাদির আধিক্য চোখে পড়ে। সাহিত্যে তিনি যে এলাকাটি বেছে নিয়েছেন সেই এলাকার ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর জমি, খাল, বিল, গাছপালা, লতা-পাতা, পশু-পাখি, ফুল-ফল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে সেই বনজঙ্গলকে কেন্দ্র করে একাধিক আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের বসবাস, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আদিমতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। একেবারে বাল্যকৈশোরের ক্রীড়াভূমি, এই অঞ্চলের অশিক্ষিত অবহেলিত দরিদ্র সাঁওতাল-লোধাভুঁইয়া-শবর-ভূমিজ অধ্যুষিত মানুষজনদের বৈচিত্র্য ভরা সংস্কৃতিকে বর্ণনা করতে প্রায়শই মোহিত হোন। তাই তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রগুলি একান্তই বাস্তব হয়। শহুরে শিক্ষিত আধুনিক মানুষের কাছে উক্ত অঞ্চলের মানুষজনের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগে। অদ্ভুত লাগে তাদের নামগুলিও যেমন- রাইবু, চামটু, গড়গড়িয়া সামাই, সোমবারি, ঢালো, খেকরে, কুলাই, ছোটরাই, পিথো, কাঁদুরা, পিলচু, পিতাম, গুরা, বড়কাই, সুনি, ভুসকি, ধনু, গুরুভা, ভুটুং, মোনা, পরভা, বাল্কা, পিঁদাড়ি, মিতিএঞা ও ভট্টা প্রভৃতি। এছাড়াও শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে আছে তুকতাক নলচলা বাণমারা তেলপোড়া ভূত-প্রেত ওঝা-গুণিন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক সোহারাব হোসেন(১৯৬৬-২০১৮) বলেছেন-

> ঐ সব অঞ্চলের বহুবিচিত্র মানুষজন, তাদের সরল ও জটিল মন-মহব্বত, এলাকার ভূগোল ও প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা, কিংবদন্তী, ইতিহাস, বিশ্বাস-আচার-প্রথা, কথনরীতি আর সর্বোপরি জঙ্গল মহাল মহাকাব্যিক বিস্তারে ও গভীরতায় কখনও, কখনও নির্মেদ ঝরঝরে পেটানো অবয়বে নলিনী বেরা তাঁর উপন্যাসে তুলে এনেছেন। বিভিন্ন উপন্যাসে এই একই অঞ্চল ও তার মানুষজন উঠে এলেও কখনও ঔপন্যাসিক-সন্দর্ভে কোনও পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বরং উপন্যাসে-উপন্যাসে ঐ এলাকা পৃথক হয়ে ধরা দেয়।[৩]

তাঁর রচিত সাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না'র কথা। অতি শৈশবকাল থেকে জন্মভূমির মাটির সঙ্গে তাঁর একটা নাড়ির সম্পর্ক ছিল। সেই মাটির ভিজে সোঁদা রুক্ষ গন্ধ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে আশৈশব প্রাণের নিবিড়তা, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান, ব্যথা-বেদনা, ঈর্ষা-দ্বেষ সব কিছু কমবেশি করে প্রতিনিয়ত তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। এই প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়রা বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ তথা ভারতবর্ষে বসবাস করেও, এদেশের সবরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই তারা প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়। এইসব সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভুঁইয়া, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতির প্রতি

মমত্ববোধ দ্বারা প্রতিনিয়ত তাড়িত, তাই তাঁর শিল্পী সত্তার সম্পৃক্তের মাধ্যমে বারবার তাদের কাছে ফিরে গেছেন। অতএব তিনি সুবর্ণরেখা তীরবর্তী পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লোকায়ত ভূগোল, লোকায়ত লোক, লোকায়ত প্রতিবেশ, লোকায়ত ভাষা, লোকায়ত কথকতা, অজস্র লোকায়ত অর্থাৎ দেশজ শব্দের ব্যবহার, লোকায়ত উৎসব, লোকায়ত মেজাজ ব্যক্ত করেছেন। যা তাকে আলাদাভাবে আয়ত্ত করতে হয়নি, পরিশীলিতও করতে হয়নি। কখনও এই রীতিটি বড় প্রাচীন বলে মনে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতার শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি। এছাড়া নিগূঢ় সাংকেতিকতা যা অবশ্য অনেক সময় রহস্যময়তায় ডুবিয়ে দিয়ে জ্ঞান নয়, আমাদের বোধের কাছে আবেদন করে। উত্তম পুরুষে ব্যক্ত লেখক নিজে সেখানকার একটি চরিত্র, যা গল্পকে আশ্চর্যজনকভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোনও জাতির জীবন সম্পূর্ণ নয়। হোক না সে আদিবাসী জীবন অথবা উন্নত নাগরিক জীবন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনকে বাস্তব সম্মতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই সঙ্গতভাবে আদিবাসী সংস্কৃতি ছাড়া আদিবাসী জীবন একান্তভাবে অপূর্ণ।

নলিনী বেরা গল্প-উপন্যাস রচনার আগে, দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতাল, শবর, লোধা প্রভৃতি সঙ্গে একটা আত্মীক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

> রাস্তাঘাটে যত্রতত্র সাঁওতাল-মেজদির সঙ্গে দেখা হলে আমি দু'হাত তুলে হাঁক ছাড়ি, "মেজদি, ও মেজদি! কোথায় যাচ্ছ গো? আমাদের ঘরে যাবে না?" সাঁওতাল-মেজদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। কাঁকালের ঝুড়ি কী হাতের দা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে ছুটে আসতেন, জড়িয়ে ধরে আদর করে বলতেন, "না সুরুভাই, এখন কাজে যাচ্ছি, সাঁঝকে আসব।"[৪]

এইসব কারণে তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পগুলিতে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এক সময় ব্রিটিশ সরকার শবর জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' জাতি বলে ঘোষণা করেছিল। এই অপবাদ থেকে আজও তারা বের হতে পারেনি। এরফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা আজও বিপর্যস্ত। তাঁর ছোটগল্পে সেইসব জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব দিকটা তুলে ধরেছেন। নিম্নে ছোটগল্পগুলিতে সেই সব দিক বিশ্লেষণ করা হল-

'কুসুমতলা' ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল ও লোধা সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত। গল্পে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে কুসুমফলের শাঁস খাওয়া এবং অবশেষে কুসুমফলের বীজ থেকে তেল বের করার পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার আদিলগ্নে মানব গোষ্ঠীর বংশধররা এভাবে তৈল শস্য জাতীয় কিংবা বিভিন্ন ফলের বীজ থেকে তেল বের করত। আর আলোচ্য গল্পে সাঁওতালরাও কুসুমফলের বীজ থেকে তেল বের করে, যা তাদের আদিমতার পরিচয় বহন করে।

> কতদিন দেখেছি- আমাদের গ্রামের গুরাসাঁওতালের বউ খেক্‌রে মাঈ মাটির 'ত্যালানে' কুসুমবীজের গুঁড়ো জলে ফুটিয়ে পায়রার পালক দিয়ে জলের উপর ভেসে থাকা তেল ছাঁকছে।

পায়রার পালক ভাসমান তেলের উপর বুলিয়ে হাত দিয়ে নিঙড়ে নিলেই ফোঁটা ফোঁটা তেল। কুসুমতেলকে খেক্‌রে মাঈরা বলে 'বারু সুনুম'।[৫]

আলোচ্য ছোটগল্পে আদিম জনজাতি লোধাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবনে অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিকটবর্তী বনজঙ্গলের (কাঠ, ফল, মূল, পাতা ও মধুর) উপর তাদেরকে নির্ভর করতে হয়। ব্রিটিশ সরকার শাসনের পূর্বে জঙ্গলে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আসার পর তাদের জঙ্গলে অবাধ প্রবেশাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তাই পুলিশ প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে তাদের জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয়। গল্পে উল্লিখিত তপোবন জঙ্গল থেকে চার-আটটা শালরলা কেউবা মাথায়, কেউবা কাঁধে করে দুলকি চালে হাটের দিকে বিক্রির উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছে। হাটে কাঠ বিক্রি পর নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে -

তপোবন জঙ্গলমহালের ভিতর থেকে রাতভিত লোধামানুষজন যখন চার-চার আটটা শালরলা কাঁধে আমাদের গ্রাম পেরিয়ে গ্রামের মাথায় মন্মথদের কুসুমতলায় এসে পড়ে, ঝুরিকাঠের বোঝামাথায় দুলকিচালে হেঁটে আসে লোধা বউড়ি-ঝিউড়িরা, 'নদীপারের' কাঠচোরেরা চোরা-পথে দুরু দুরু বক্ষে দশঝাল কি বিশঝাল গোরুর গাড়ি হাঁকিয়ে যখন এসে পড়ে মন্মথদের কুসুমতলায়, যখন কুসুমতলার উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে কোনো পথিক মনে মনে জরিপ করে দেখে নেয়- নদীজল নদীবালি মাড়িয়ে এখনও আরও কতদূর তাকে যেতে হবে, তখন, ঠিক তখনই তাদের মনে হবে, হবেই– কুসুমতলায় একটুক্ষণ বসি, বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিই।[৬]

লোধারা বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, নদী নালা, খালের পাশে ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করে। তারা ঘর করে ঠিকই কিন্তু সেই ঘর আর খুঁজে পায় না। ভূমিহীন লোধারা সারাজীবন বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, বন থেকে বেরোলে দিন মজুর হিসেবে অন্যর ক্ষেতে ধান কাটে। এদিকে বনে অবাধ প্রবেশের দরজাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। অনাদিকাল থেকে অরণ্যবাসীদের জঙ্গলে থাকা এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারের যে অধিকার ছিল, ফরেস্ট গার্ডদের অত্যাচারে সেটাও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ফরেস্ট গার্ডরা তাদের ঝুপড়িগুলি গুড়িয়ে দেয়, আদালতে চালান করে দেয়, লোধা মেয়েরা প্রতিনিয়ত বাবুদের যৌন লালসায় শিকার হয়। চাহিদা বলতে যাদের শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড়, বেচেঁ থাকার জন্য দু'মুঠো ভাত। আদিকাল থেকে যারা ঠিকমতো ঘর বাঁধতে শেখেনি তাদেরকে ধরিয়ে দিল বিধিনিষেধের ফরমান। তারা বুঝতে পারল না তাদের ভাগে কী এল, কী এল না! বুঝতে পারল না কেন তাদের রক্তের ভেতরে ছুটে চলা এই অরণ্য প্রবেশ নিষিদ্ধ! ডাল কাটা, পাতা তোলার পারমিট কাকে বলে! একদিন ব্যবসায়ীদের হাতে জঙ্গল নিলাম হয়ে যায়।

লেখক নিজে 'ঝাঁটার কাঠি' ছোটগল্পের কথক। সুনি সাঁওতাল গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র, সুখজুড়ি কী ডাঙাসাহি'তে তার বাড়ি। দেহের গঠন খুবই সুন্দর এমনকি অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহোর গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিও তার সঙ্গে তুলনায় অযোগ্য। গল্প কথকের সঙ্গে তার

ঠাকুরদা বা আদরের দাদা সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিবছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সুনির বাবা(ধনু কাকা) মা সবাই মিলে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে কথকের বাড়িতে ধান মাড়াইয়ের কাজ করে। ধান মাড়াইয়ের পর অবশিষ্ট ধানকে পত্‌লি বলা হত। দড়িতে বাঁধা দলবদ্ধ গরুগুলোকে চালনা করতে বা থামাতে 'হে-ই হ্যা-ট্‌ হ্যা-ট্‌' 'হিঁ-ই-হ' করে সারারাত ধরে 'পতলি মাড়া' চলত। আর এই সুযোগে পরিশ্রমকে সামান্য পরিমাণে লাঘব করা, কিংবা কাজের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য এক-দু কলি গানও করত।

> "গাডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম নরং,
> ধীরি মাগাড় রে, দাঃক দ বদন রে নালম বড়ে।"[৭]

বঙ্গানুবাদ

> ওরে বদন, নদীধারে বাঁশি আর বাজাস না
> বদন রে পাথর-চাপা জল আর ঘোলাস না।

যৌথ কর্মের আন্তরিক প্রেরণা এবং হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির দ্বারা কর্মসংগীতের সৃষ্টি হয়। কর্মসংগীত দু'টি লক্ষ্য সাধন করে। যৌথভাবে কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ অপরটি কাজের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করে কাজের গতি বজায় রাখা। কৃষিকাজ, ছাদ-পিটাই ইত্যাদি কাজের সূত্রে কর্মসংগীতের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য ছোটগল্পে সুনি সাঁওতালের মুখে এরকম কর্মসংগীত শোনা যায়। প্রতিবছর সরস্বতী পূজার সময় সুনি একা পাড়ার প্রাথমিক স্কুলঘর প্রথমে ঝাঁটা দিয়ে মাটির দেওয়ালকে পরিষ্কার করে। এরপর বিলের কেঁচো মাটি জলে গুলে ন্যাতা বুলিয়ে আলপনা দেয়। ছোটগল্পটিতে এক সাঁওতাল পরিবারের আর্থিক সংকটের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে।

'দু'কান কাটা' গল্পটিতে ঝাড়গ্রাম তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লোধা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। সরকারি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের লোধাদের আর্থ-সামাজিক ও তাদের জীবন-জীবিকার পরিবর্তনের প্রয়াস ও প্রভাবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লোধদের গ্রামজীবনের উন্নয়ন ও জনসাধারণের সচেতনতার নানা সরকারি প্রকল্পের কথা উল্লেখিত। যেমন- সাক্ষরতা প্রকল্প, ঘরে ঘরে শৌচাগার প্রকল্প, জন্মনিয়ন্ত্রিত কর্মসূচি, টীকাকরণ কর্মসূচি, মদ্যপান দূরীকরণ, মুরগির পুলেসার রোগের অনুসন্ধান, গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, হ্যাচারি, বাবুইঘাসের দড়ি ও শালপাতার থালা তৈরি, ফুড প্রসেসিং, প্যাডি প্রসেসিং, প্রজাতি উন্নয়ন প্রকল্প তথা ছাগ প্রতিপালন প্রকল্প-

> "নিরক্ষর থাকব না, নিরক্ষরতা রাখব না" "প্রতি ঘরে শৌচাগার গড়ে তুলব" "পরিবারের কেউ মদের শিকার হব না" "সমস্ত শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা মায়ের টীকাকরণ নিশ্চিত করব" "ছোট পরিবার সুখের হয় দুয়ের বেশি সন্তান নয়"। তাছাড়া আছে – 'মুরগির পুলেরাস রোগের অনুসন্ধান' 'গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ' 'হ্যাচারি' বাবুই ঘাসের দড়ি তৈরি' শালপাতার থালা

তৈরি', 'ফুড প্রসেসিং' 'প্যাডি প্রসেসিং' আর প্রজাতি উন্নয়ন প্রকল্পে 'ছাগ প্রতিপালন প্রকল্প...।[৮]

ব্লক গ্রামউন্নয়ন আধিকারিক তমোনাশ চ্যাটার্জি নির্দিষ্ট দিনে সরকার কর্তৃক সাপোর্ট প্রাইসে পাবলিকের কাছ থেকে ছাগল কিনে আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লোধা পাড়ায় ছাগল বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আদিবাসী লোধারা এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষ। গল্পে লেখক এভাবে লোধা জনজাতিদের প্রতি সরকারি আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রামউন্নয়ন আধিকারিক অনুষ্ঠান করে লোধাদেরকে ছাগল বিতরণ করেছে। প্রাণীবীমার জন্য প্রতিটি ছাগলের একটি কানে মাকড়ি পরিয়ে লোধাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ছাগল প্রতিপালনের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন- বাদামখোল, ছোলাভাঙা, ঝোলাগুড়, গমের ভূষি আরও নানাবিধ উপকরণ এবং সবার শেষে কৃমির ওষুধও দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও লোধাদের পক্ষে ছাগল প্রতিপালন করা সম্ভব হয়নি। লেখক লোধাদের ছাগল নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি একেবারে বাস্তব ও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ ছাগলকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে, কেউবা আবার ছাগলের পিছনের দু'পা দু'হাতে ধরে ঘাড়ে তুলে হাঁটছে। খালি গা, ন্যাঙটো, কেবলমাত্র কোমরের ঘুনসিতে ঘুঙুর কী জালের কাঁঠি বাঁধা লোধা বাচ্চারা কেউ কেউ বোকা পাঁঠার পিঠের উপরে বসে লাগামের মতো করে ছাগলের চুরুক দাড়ি ধরে আছে-

> শুনে-টুনে ছাগল নিয়ে লোধারা লোধাপাড়ায় যে যার কুম্বার দিকে হাঁটতে লাগল। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। কেউ পিছনের দু'পা সামনের দু'পা দু'হাতে ধরে ঘাড়ে তুলে হাঁটছে। খালি গা, ন্যাঙটো, কেবলমাত্র কোমরের ঘুনসিতে ঘুঙুর কী জালের কাঁঠি – বাঁধা লোধাবাচ্চারা কেউ কেউ বোকাপাঁঠার পিঠের উপর উঠে বসে আছে। যেন ঘোড়ায় চড়েছে, লাগামের মতো হাতে ধরা আছে তার চুরুক দাড়ি।[৯]

কিছু দিন পর ব্লকের গ্রামউন্নয়ন আধিকারিক তমোনাশ চ্যাটার্জি ছাগল প্রতিপালনের পরিস্থিতি জানতে গিয়ে দেখলেন, যত সংখ্যক ছাগল বিতরণ করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক ছাগল রয়েছে। অবশিষ্ট ছাগলগুলিরও কানে সরকারি ছাপ নেই, যে কানে মাকড়ি ছিল, সে কানটা কাটা। আবার সরকারি পক্ষ থেকে প্রত্যেক লোধাকে ছাগল বিতরণ করা হয় এবং দু'কানে মাকড়ি পরানো হয়। আবার সরকারি গ্রামউন্নয়ন আধিকারিক ব্যর্থ হয়। সরকারি আধিকারিকদের তদন্তে দেখা যায় ছাগলের সংখ্যা কম তো বটেই, অবশিষ্ট যে ছাগলগুলো আছে তাদের দু'কানই কাটা ছিল।

আলোচ্য ছোটগল্পে লোধারা অশিক্ষিত এবং দারিদ্রর সীমার নীচে বাস করে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিয়ে ছাগল প্রদান করলেও তারা প্রতিপালন করতে পারেনি।

লোধারা সহজে নতুন কোনো বৃত্তিকে গ্রহণ করতে চায় না। তাছাড়া লোধাদের ঐ ছোট ঘরগুলিতে ছাগল প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। ছাগল প্রতিপালনের জন্য খোলামেলা উঁচু জায়গায় ঘর করতে হবে। একটি ছাগলের জন্য কম করে ১০-১২ বর্গফুট জয়গা দরকার। লোধাদের অধিকাংশ ঘরগুলিতে সেই পরিমাণ জায়গা নেই। গল্পটিতে লোধা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

'খোরপোষ' ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র সনাতন টুডু ওরফে সুনা। গল্পের নায়কও সনাতন টুডু, জমিদারের বাড়িতে ভাতুয়া খাটে। জমিদারের বাড়িতে দু'মুঠো ভাত ও একটা কাপড়ের বিনিময়ে সারাবছর খাটে। জমিদারের সঙ্গে সনাতনের শোষক-শোষিতের মধ্যেও এক আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ধনী চাষি বনাম ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষির মতো নির্মম কঠিন সম্পর্ক নয়। সনাতনের নীরবতা তার শক্তি, জমিদারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য তার প্রাণ। কোনোদিন জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। গোয়াল কাড়া, গোবর গোয়াল থেকে নিয়ে খতনায় ফেলা – খলা খামার ঝাঁট দেওয়া, ধান রোঁয়া, ধান নিড়ানো, ধান কাটা জমিতে লাঙ্গল দেওয়া সব কিছুই একা কাজ করেছে। সনাতন কর্তব্য কর্ম আঁধারে আলোর বাতি কমিয়ে নীরবে পান্তা ভাত খাওয়া, দারুণ খরায় শক্ত মাটিতে লাঙল চালানো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। এছাড়াও বাঁধনা পরব উৎসবে গোহালঘরে তেলের প্রদীপ জ্বালানো, পইড়ান তুলা, গরু খাঁটাল, অমাবস্যা রাতে মাদল বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে গান করা, আনন্দের সহিত করেছে। কিন্তু যা করেছে তা এক অসাধারণ প্রতিবাদ।

একসময় সনাতনের বয়স হয়েছে। আগের মতো এখন আর কাজ করতে পারে না। এইসব কারণের জন্য সে জমিদার বাড়িতে কাজের ইস্তফা দিয়েছে, তবুও নিজেকে একজন কর্মবীর হিসাবে গর্ব করে। জমিদারের বাড়িতে তার সেই নিভু নিভু হারিক্যান, ভাত খাওয়ার গামলা, খাবার বসার জায়গা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। একদিন সনাতনের পায়ের তলায় পচা খিল ঢুকে যায়। এরপর থেকে সনাতন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। একদিন কথক শয্যাশায়ী অন্ধকার আলোছায়ায় তাকে দেখে মায়া হয়, সে সনাতনকে বলে 'বাকি জীবনটার জন্য আমাদের বাড়িতে খোরপোষ দাবি করতে। একথা কথা বলার পর তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছিল, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, এতদিন তোমাদের পাল পোষ করে এসেছি, আজকে তোমরা আমাকে খোরপোষের লোভ দেখাচ্ছ!

> বলামাত্র কেমন যেন হয়ে গেল সে, তার ঠোঁট দুটো থরথর করে নড়ে উঠলো, চোখের কোণ বেয়ে দু-ফোঁটা জলও বুঝিবা গড়িয়ে পড়লো, বিড় বিড় করে যেন বলল, এতদিন তুমাদের পালপোষ করে এসেছি, আজ তুমরা আমাকে খরপুষের লোভ দেখাচ্ছ- বলছো কী, তুমাদের কাছে খরপুষের ল্যাওড়া দাবি তুলতে? হ্যাঁ, দাবীদার?[১০]

সনাতনের মুখে এধরণের বাক্য ছোটগল্পটিতে প্রতিক্রিয়াও মনে হতে পারে, আবার সেই মানবিক সম্পর্কও যা শোষিতের লড়াইকে দমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে করমশাই সেই 'ভুঙ-চুঙ সারেঙা'র মানে করেছেন ভুল-চুক সেরে নাও।

'খোরপোষ' ছোটগল্পটি মানবিক আবেদনে ভরপুর। সনাতনের করুণ পরিণতির জন্য গ্রামের অজ্ঞতাকেই দায়ী করা হয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের অসহায়তা চিকিৎসার অভাবে শুয়ে শুয়ে নীরবে মৃত্যুবরণ করা আমাদেরকে কাঁদায়। একই সঙ্গে আমাদের মানবিক বোধকে জাগ্রত করে।

বিশ শতকের তিন চার দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসী মানুষদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে শুরু করে। বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় অসহায়, লাঞ্ছিত ও দুঃখ জর্জরিত আদিবাসীদের আনাগোনা গল্পের ধারাকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। গল্পকারদের একাধিক গল্পে আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত প্রাচীন সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থান ও সহজ সরল গ্রাম্য সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। কখনো আবার টাঁড় বাংলার কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা কিংবা শাল মহুয়ার সবুজ স্নিগ্ধ মাদকতায় পরিপূর্ণ তাদের জীবনালেখ্যর পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল অন্তর্গত বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলা ও সুবর্ণরেখা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের প্রকৃতি, জীবনদর্শন, লোকবিশ্বাস, ভাষা সম্পর্কে নলিনী বেরার গভীর জীবনবোধ থেকে গল্পগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলিতে এইসব আঞ্চলিক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তেমনই আঞ্চলিকতার আর একটি বিশেষ উপাদান হল লোকবিশ্বাস যা গল্পে পাওয়া যায়। নলিনী বেরা তাঁর ছোটগল্পে যখনই কোনো অঞ্চল বিশেষকে নিবিড়ভাবে ধরতে চেয়েছেন তখনই সেখানকার মানুষের লোকবিশ্বাসকে সামনে থেকে দেখেছেন। অঞ্চল ভেদে আলাদা আলাদা লোকবিশ্বাস মানুষ ধারণ ও প্রতিপালন করে আসছে। এই লোকবিশ্বাসের মূলে তাদের শুভবোধ রয়েছে।

বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে লোকবিশ্বাস পৃথিবীর প্রচীনতম গ্রন্থ বেদের সময় থেকে চলে আসছে। বহু চর্চিত লোকবিশ্বাসগুলি মানুষের মানসিক গঠনের মূলে আছে। লোকবিশ্বাস কোনো একক মানুষের বিশ্বাস নয়। লোকবিশ্বাস শুধু নিরক্ষর মানুষের মধ্যে থাকবে এমন নয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মধ্যেও থাকে। লোকবিশ্বাসে যুক্তির বন্ধনকে অস্বীকার করা

হয়। মানুষ দৈনিক জীবনাচরণে, আনন্দ-বেদনায়, উৎসবে কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে থাকে। নলিনী বেরার গল্পে ব্যবহৃত লোকবিশ্বাস পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল পরিসরে নিহিত।

আদিবাসীদের চরিত্র নিয়ে রচিত বেশিরভাগ ছোটগল্পগুলি তাদের সাংস্কৃতিক ও চিরাচরিত প্রাচীন সামাজিক পরিকাঠামোকেন্দ্রিক। নলিনী বেরার ছোটগল্পে আরণ্যক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রাম সংগঠক এবং গ্রাম সভার প্রধান হিসেবে মাঝি বা মোড়ল প্রধান। মাঝি বা মোড়লের হাতে সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। এছাড়া মাঝির সহযোগী হিসেবে জগমাঝি, গোডেৎ, পারাণিক ও গ্রামের অন্যান্য সদস্য থাকে। নলিনী বেরা তাঁর ছোটগল্পে পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'টি.আই.প্যারেড' নামক ছোটগল্পে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'মাঘসিম', 'ভেজাবিঁধা', 'জমসিম বোঙা', 'কিঁসাড় বোঙা', 'বিরবোঙা', 'গোঁসাই এরা', 'মারাং বুরু', ও 'মঁড়েক তুরুইক' প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মাঝি আর জগমাঝি সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। তাদের উপস্থিতিতে মাঘ মাসে সাকরাতে(সংক্রান্তি)'র সময় তীর চালানো অনুষ্ঠান সূচিত হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস' নামক ছোটগল্পে গ্রামের মোড়ল হিসেবে ঝড়ু সাঁওতালকে পাওয়া যায়। ঝড়ু সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রামের মোড়ল, সে প্রতারক ভন্ড সাধু সুন্দরলালের পরিচয় গোপন করেছে। অভিজিৎ সেনের 'জোহাঙ্গী' নামক ছোটগল্পে রেংটা সোরেন তার কাকিমা জোহাঙ্গীকে ডাইনি সন্দেহে টাঙ্গির কোপ মেরেছে। জোহাঙ্গীর ডাইনি ব্যাপারকে নিয়ে রেংটা গ্রামের মাঝির কাছে গিয়েছিল। মাঝি তাকে পঞ্চায়েতে যেতে নির্দেশ দেয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য অনিন্দ্য ও অনিমেষ গ্রামের পুরো ব্যাপারটা জানত। অনিমেষ জোহাঙ্গীকে বাঁচাতে পারত। মাঝির সমাজের মাথা হলেও অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। যে সমাজকে অন্ধকুসংস্কার থেকে মুক্ত করবে সে নিজে অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত। শুধু তাই নয়, সে ক্ষমতা লোভী ছিল। গ্রামের মাঝি মাহান সোরেন জোহাঙ্গীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত কিন্তু সে নিজের মাঝি পদ হারানোর ভয়ে প্রতিবাদ করেনি। অতএব মাহান সোরেন সাঁওতাল সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) তাঁর 'বীজ' নামক ছোটগল্পে মাঝি সাঁওতাল সমাজকে ঠকানোর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গমিয়া একজন সাঁওতাল কৃষক। সারাবছর তাদেরকে চাষের উপর নির্ভর করতে হয়। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে বি.ডি.ও অফিস থেকে ঘোষণা করা হয়, এবছর সব চাষিকে বিনামূল্য উচ্চফলনশীল ধানের বীজ দেওয়া হবে। গমিয়া ও গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক বি.ডি.ও অফিস থেকে ধানের বীজ নেওয়ার অপরাধে, গ্রামের মাঝি সামারুবুড়া তাদেরকে নিয়ে সভা করে এবং বাকি লোকজনদেরকে ধান বীজ নিতে নিষেধ করে। বিদেশী ধান বীজ ব্যবহার

করলে মাটি কলুষিত হবে। সর্বোপরি এই ধান বীজ যে ব্যবহার করবে তাকে সমাজে একঘরে করে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীরা চাষের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, সবাই বীজ ধান পাবে এক শর্তে দশ সের বীজ ধান নিলে চাষের ধান উঠলে বাড়তি পাঁচ সের ধান ফেরত দিতে হবে। এটা আমি সুদ হিসেবে নিচ্ছি না, এটা আমার প্রাপ্য। প্রথম দিকে সহজ সরল সাঁওতালরা সামারুবুড়ার সুদখোর মহাজনি ব্যবসা ধরতে পারেনি। গ্রামবাসীরা সামারুবুড়ার ফাঁদে পা দিয়ে গমিয়াকে গ্রামে একঘরে করে দিয়েছিল। আসলে সামারুবুড়া যে প্রকৃত সুদখোর ও লোভী তা তারা শেষ পর্যন্ত বুঝত পারে এবং সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করেছিল। রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) তাঁর 'রেবেকা সোরেন' নামক ছোটগল্পে কর্ণপুর কলিয়ারির শ্রমিক মাধো সোরেনের মেয়ে রূপবতী ম্যাক সাহেবের প্রেমে পড়ে। গ্রামের মাঝি চুন্দু বুড়া সভা ডাকে এবং মাধো সোরেনের মেয়ে রূপবতীর অসামাজিক কাজের জন্য তাকে গ্রামে একঘরে করা হয়। 'ঝুমরা বিবির মেলা' ছোটগল্পে একই ঘটনা দেখা যায়, ময়নাগড় কোলিয়ারিতে সাঁওতাল ও মুসলমানরা পাশাপাশি বসবাস করত। কলিয়ারির সাঁওতাল শ্রমিক বুধন কিস্কুর এক মুসলমান মেয়ে ঝুমরা বিবির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুধন কিস্কুর এই অসামাজিক কাজের জন্য সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাসের ফলে অনেক নিরাপরাধী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি সমাজের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আলোচ্য গল্পগুলি তার বাস্তব উদাহারণ।

নলিনী বেরার ছোটগল্পে সাঁওতাল সমাজের বিবাহ সংক্রান্ত আচার-আচরণের ছবি স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সাঁওতালদের সমাজ বহির্ভূত বিবাহ, একই গোত্রে বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বরপণ এগুলি কোন কিছুই দেখা যায় না। তাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে যেমন- দুয়ার বাপলা, টুঙকি দিপিল বাপলা ইত্যাদি। নলিনী বেরার তাঁর 'ঝাঁটার কাঠি' ছোটগল্পে 'সিঁদুর বাপলা' নামক এক প্রকার বিবাহ রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

'চিড়কিন্‌ডাঙা' ছোটগল্পটির মূলে সাঁওতালদের অদ্ভুত এক লোকবিশ্বাস আছে। এই লোকবিশ্বাসের সঙ্গে রোমান্স রয়েছে। চিড়কিন্ শদটির অর্থ মেয়ে ভূত। সনাতন মুর্মু চিড়কিন্ ডাঙার গুণিন গুরা মুর্মু তার ছেলে পুন্নাডিহিতে মকাই- এর খেতে পাহারা দিতে গিয়ে চিড়কিন্ কে সাঙা করেছিল। আবার অন্য এক গুণিনের পুত্র মানকাও বারিবদা না আমজুড়া থেকে এক চিড়কিন্‌কে ধরে এনেছে। শ্রীহরি দঁড়পাট চিড়কিন্‌কে বাড়ির ঝি বানিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষ থেকে চিড়্কিন হওয়া এবং গুণিনের ক্রিয়াকলাপে অসীম শক্তি নিয়ে মানবসমাজে ফিরে আসা ও সংসার করার কথা গল্পে বিবৃত হয়েছে। চিড়কিন্ সম্পর্কে লেখকের ধারণা নিম্নরূপ

কুমারী মেয়ে পেটে বাচ্চা থাকা কালীন অবস্থায় আত্মহত্যা করলে গায়ের লোক কুমারী মেয়েকে নদীর বালিতে কবর দিত। গ্রামের লোকের বিশ্বাস সে মরল ঠিকই কিন্তু তার কামনা বাসনা আজও মরেনি। তাই মাঝ রাতে অবিবাহিত যুবককে দেখলে ছুঁকছুঁক করে। চিড়্কিন ভূত সুন্দরী মেয়ের রূপ ধারণ করে তার অতৃপ্ত কামনাবাসনাকে পূর্ণ করতে চায়। চিড়কিন্ ভূত দিনের বেলায় বিড়ালের রূপ ধারণ করে, রাতের অন্ধকারে চিড়িক চিড়িক আলো জ্বেলে নদীর তীরবর্তী এলাকায় ঘুরে বেড়ায়।

> হয়ত কুমারী পা পেটের ছা নিয়ে মরল বিষ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে লজ্জায়, তাকে এই নদীবালিতেই চুপিসারে পুঁতে দিয়ে গেল গাঁয়ের লোক, মরল সে ঠিকই, তার কামনা-বাসনা কিন্তু মরল না, রাত-বিরাত আদড়া যুবক দেখলে তাই সে ছুঁক ছুঁক করে, চিড়কিন্ভূত হয়ে সুন্দরীর ভেক ধরে হাত বাড়ায়-"আয়!"[১১]

সনাতন মুর্মু'র পুন্নাডিহিতে মকাইয়ের খেত আছে। মকাই ভাদ্র মাসে পাকে। সনাতন মুর্মু'র ছেলে গুরা মুর্মু বিয়ে হয়নি। গুরা মুর্মু মকাই খেতকে কাক, শিয়াল ও শুয়োরের উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মাচায় বসে টিন বাজিয়ে পাহারা দিত। ভাদ্র মাসের প্রত্যকদিন রাত্রিবেলায় খাবার সঙ্গে করে মকাই খেতে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ত। আলোর জন্য হাতে পাকানো খড়ের বেণীতে আগুনের 'জুমড়া' নিয়ে যায়। গভীর রাতে দূরে কুমারডুবি জলার ধারে, বুড়বুড়ি ঝরনার দিকে চিড়িক চিড়িক করে দুটো আলো জ্বলছিল। গুণিনের ছেলে হওয়ার কারণে সে মুহূর্তে চিনে ফেলে তারা 'চিড়কিন্' ভূত। গুরা গুণিন বুঝতে পারে যে নিশুতি রাতে চিড়কিন্ ভূতরা নদীবালি ছেড়ে চরে খেতে বেরিয়েছে। শেষরাতে সবুজ খর্খরে মকাইগাছের ফাঁকে-ফোকরে চিড়িক্ চিড়িক্ আলো জ্বলছে নিভছে। চিড়কিন্ ভূতই সুন্দরী মেয়ের রূপ ধারণ করে ক্রমে ক্রমে মাচার টোঙের কাছে চলে এসেছে। সেই সুযোগে গুরা মুর্মু টোঙে রাখা মন্ত্রপূত কাঁচি দিয়ে যুবতীর এক গোছা চুল কেটে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ চিড়কিন্ ভূত তার কাছে বাঁধা পড়ে যায়। গুরার বাড়ির লোক তা জানতে পারেনি। প্রথম কয়েকদিন মকাই খেতের টোঙে দু'জনার সংসার বেশ ভালো চলছিল। কিন্তু খেতের মকাই খেয়ে গুরা মুর্মু'র সংসার বেশিদিন চলেনি। অবশেষে একদিন গুরা বাড়িতে খাবার খেতে এসে তার মাকে জানায়-

> "মা! এখন ভাত খেলেও রাতকে আমার বেজাঁয় 'ভোখ' পায়, পটম্ করে চাট্টি ভাত বেঁধে দাও!"[১২]

সন্দেহবশত গুরার মা ভাত নিয়ে মকাই খেতে যায়। সে দেখল গুরার জন্য এনে দেওয়া গরম ভাত চিড়্কিন খায়। গুরার মা চিড়কিন্ ভূতের কাছে এ রহস্য জানতে চাইলে সে জানায় তার ছেলে তাকে বশ করেছে।

> মুখপুড়ী তো হামলে পড়ে ছেলের ভাত খাচ্ছে গসা গসা! “কে তুই? আমার ছেলেকে বশ করলি কী করে?” ভাত খেতে খেতেই চোখ না তুলে চিড়কিন্ বলল, “খালি আমাকে দুষছিস, তুক করে তোর বেটাই তো আমাকে-”[১৩]

এ কথা শুনার পর গুরার মা বিয়ে দিয়ে তাদের দু’জনকে বাড়ি নিয়ে যায়। চিড়কিন্ শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পথে গুরাকে জানায় কোনভাবে যদি তাকে বাড়িতে ঝাঁটা স্পর্শ করানো হয় তাহলে সে আবার চিড়কিন ভূত হয়ে খালপাড়-নদীতে পালিয়ে যাবে।

> অ্যাই শুনো, তোমাকে বলেই বলছি তোমাদের ঘরেই তো যাচ্ছি, তবে যদি কোনোদিন আমার গায়ে ‘বাড়ুন’ ছোঁয়াও-। ‘বাড়ুন’ তার মানে ঝাঁটা, সনার বেটা গুরা জানতে চেয়েছিল, “তা কী? স্বইচ্ছায় না হোক বেভুলেও যদি-?” চিড়কিন্‌বউ ভারি মনমরা হয়ে বলেছিল, “তা হলেও আমাকে আর পাবে না, ফের চিড়কিন্ হয়ে নিমেষে হাওয়া, বিঁড়োলবাও হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই খালপাড়- নদীধার-”[১৪]

লেখক মুচকুন্দদার সঙ্গে এই বিষয় আলোচনার পর চিড়কিন্‌ডাঙা গ্রাম থেকে জল নিতে আসা আদিবাসী সাঁওতাল মেয়েদেরকে ‘চিড়কিন্’ বলে সন্দেহ করে। মুচকুন্দ লেখককে পরামর্শ দেয় যে ঝাঁটা হাতে করে ঐ সব বাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা করতে। লেখকের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, তা জানালে মুচকুন্দ বড় গুণিন বালকার কাছে অন্য উপায় জানার পরামর্শ দিয়েছিল।

> “না মুচকুন্দদা, সেসব আমার দ্বারা হবে না, মুড়োঝাঁটা নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়ে –বউয়েদের পিছু পিছু ঘোরা-”
> মুচকুন্দদা বলল, “বেশ, তবে চ জানগুরু বাল্‌কার কাছে- সে যদি একটা কিছু উপায়ান্তর বলতে পারে।”[১৫]

মুচকুন্দের কথায় লেখক বালকা গুণিনের বাড়িতে যায়। বালকা গুণিনের বাড়িতে সুন্দরী বৌ থাকতেও আর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে যাকে বালকা গুণিন মন্ত্রের সাহায্যে বশ করে রেখেছে। সে বাড়ির নানারকম কাজ করে। লেখককে ‘গড়ম্’ সম্বোধন করে বসতে দেয়। সেদিন বালকা গুণিন লেখকের সামনে চিড়্কিন ভূত চেনার উপায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে- চিড়কিন্ ভূতকে ধরা খুবই কঠিন ব্যাপার, ধরার সরঞ্জাম হিসাবে লাগবে একটা ছুরি, গন্ডাকতক শালপাতা, আমলকী পাতা, উইমাটি, কাজললতা, এক টিপ সিঁন্দুর পোটলা, একটা কাঠের পিঁড়া ও একটা মৃত মানুষের মাথার খুলি ইত্যাদি। যে রাতে মৃত অন্তসত্ত্বা মেয়েকে নদীর বালিতে কবর দেওয়া হয়, সেই রাতে উল্লিখিত জিনিসপত্র নিয়ে শ্মশানে যেতে হবে। মন্তর পড়ে মড়ার খুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাকতে হবে আয়, আয়। সে আসার জন্য ছটফট করবে, এসে খেতে চাইবে- খেতে দিতে হবে- মিষ্টান্ন হিসেবে উইমাটি আর অন্ন হিসেবে আমলকী পাতা। চিড়কিন্ ভূত খাওয়ার পর পিঁড়াটা এগিয়ে বসতে বলতে হবে। পিঁড়াতে বসার সঙ্গে সঙ্গে পোঁটলা খুলে তিন টিপ সিঁদুর তার মাথায় ঘঁষে দিতে হবে।

“যে রাতে নদীবালিতে মড়াকে পোঁতা হবে, সেই রাতেই মড়ার খুলি আর ওইসব ‘দব্ব’ নিয়ে একা একাই যেতে হবে শ্মশানে। মন্তর পড়ে মড়ার খুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাকতে হবে– আয় আয়! আসার জন্যে সে তো ছটফট করছে! এসেই কিন্তুক খেতে চাইবে- খেঁতে দেঁ! তখন দিতে হবে উইমাটি আর আমলকীর পাতা, পাতাই অন্ন আর উইমেকা মিষ্টান্ন। খেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে আসতে চাইলে পিঁড়াটা এগিয়ে ধরে বলতে হবে– এই পিঁড়াটায় বস-অ! যেই না বসা অমনি পোঁটলা খুলে পটাপট্ তিন টিপ্ সিঁদুর– আটকা পড়ে যাবে না চিড়কিন্ ভূত? হঁ হঁ, যাকে বলে ‘সিদুরবাপলা’।” বলেই হো হো করে হেসে উঠল বাল্কা। ‘সিদুর বাপলা’ তার মানে তো সিঁদুর ঘষে বিবাহ![১৬]

এই বিদ্যা লেখকের ভালো লাগে নি। কারণ, লেখকের পক্ষে একাজ করা অসম্ভব। অতএব শেষ পর্যন্ত ঝাঁটা দিয়ে পরীক্ষা করার পদ্ধতিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমে শ্রীহরি দাঁড়পাটের ঝি চিকনি যে অসীম শক্তিতে কাজ করে তাকে পরীক্ষা করতে প্রস্তুতি নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। এরপর সনা গুণিনের ছেলের বউকে পরীক্ষা করতেও ব্যর্থ হন, কারণ- সনা গুণিনের ছেলের বউ বিড়ালের মতো এ-আল সে-আলের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনো গড়ানে নামে আবার কখনো চড়াইয়ে ওঠে, গরাম-থান-সোলপার-নির্মলদের বাঁশতল, কচড়াতল পেরিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে যায় কার সাধ্য তাকে ধরতে পারবে। মানকার সেই লম্বা ঢ্যাঙা মেয়েটাকে দেখে লেখক প্রতিদিন তার ঝাঁটা মুড়ো দিয়ে পরীক্ষা করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। লেখকের হঠাৎ মনে পড়ে যায় বালকা গুণিনের কথা, প্রথমে ধরে বেঁধে বিয়ে করতে হবে তারপর নিজের খুশি মতো সাঙা করে নিতে হবে। অবশেষে মেয়েটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার ছায়া পরছে কি না। ঝাঁটা মারার সুযোগ পেয়েও, ঝাঁটা মারতে পারেনি। এমন সাদা-কালো বড় বড় চোখ তো চিড়কিন্’র হয়, তাহলে তো ঝাঁটা ঠেকালে মুহূর্তে হারিয়ে যাবে। জল আনতে যেতে আসতে আর কখনো তার সঙ্গে দেখা হবে না।

‘চিড়কিন্ডাঙা’ ছোটগল্পটিতে অদ্ভুত এক রোমান্টিক সত্তায় পাঠকের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। লেখক যাকে দীর্ঘদিন ধরে ‘চিড়ুকিন ভূত’ বলে মনে করেছেন। আজ সেই ভূতের মানবী সত্তাকে তাঁর চিন্তা চেতনায় স্থান করে নিয়েছে। তাই তিনি গুণিনের পরামর্শ অনুযায়ী ‘চিড়ুকিন ভূত’কে যাচাই করার পথ থেকে বিরত রয়েছেন। মুহুর্তের মধ্যে ‘চিড়ুকিন ভূত’কে হারাবার ভয়ে, তিনি যাচাই করতে চাননি। এভাবে গল্পে কমবেশি লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, যা পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে একান্ত বাস্তব বলে মনে হয়।

‘মোরগ ডাকের অপেক্ষায়’ ছোটগল্পটিতে আদিবাসী সাঁওতালদের ডাইনি বিশ্বাস প্রসঙ্গ রয়েছে। জাদুবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভৌতিক বিদ্যার নাম ডাইনিবিদ্যা। ‘ডাইনিবিদ্যা’

সম্পর্কে গল্পে একটা মিথের পরিচয় পাওয়া যায়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনা, ভাষা, গঠন সব নিয়ে পুরনো গল্পের এক নতুন রূপ। এখনও সাঁওতালদের ডাইনি নামক কুসংস্কার সমাজ থেকে মুছে যায় নি। আজও জানগুর'র নির্দেশে বহু সাঁওতাল পরিবারকে ডাইনি নামক অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করে গ্রাম ছাড়া, কুপিয়ে খুন কিংবা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা শোনা যায়। প্রতিদিন খবর কাগজ দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গল্পটি ডাইনি বিদ্যার আদি কাহিনি, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নিয়ে রচিত। ডাঙ্গারসাই গ্রামের মাথায় শালগাছের তলায় আদিবাসী সাঁওতালদের সভা বসেছে। মঙ্গল সরেনের স্ত্রী সোমবারিকে ডাইনি সাব্যস্ত করা হয়েছে। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধন মাঝি পেশায় 'ভাতুয়া'। গ্রামের জমিদারের বাড়িতে সামান্য পরিমাণ বেতন ও খাওয়ার বিনিময়ে যে ব্যক্তি সারা বছর কাজ করে, তাকে ঐ জমিদার বাড়ির ভাতুয়া বলা হয়। বুধন মাঝি চরিত্রটি যেমন অসাধারণ তেমনই জীবন্ত। জানগুর'র নির্দেশে সোমবারিকে ডাইনি সাব্যস্ত করেছিল। সোমবারি সেই ডাইনি অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করতে চায়। অবশেষে বুধন মাঝি'র চেষ্টায় সে বেঁচে যায়। এ কাজ বোধহয় সমাজের বুধনরাই পারে। আর বুধনদেরকে একমাত্র লেখকই খুঁজে বার করতে পারেন। ডাইনি নামক কুসংস্কারে পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারার সংবাদের আড়াল থেকে লেখক চরম সত্যকে খুঁজে বের করেন। হোক তা ব্যতিক্রম, হোক তা কোমল, হোক তা রুক্ষতা কর্কশতা তবে জ্বলন্ত ডাইনি সমস্যা থেকে পৃথক। গল্পের পরিণতি অশ্রুতে ঝলমল করে-

> কোনো কথা নেই, ভয়ের কোন চিহ্ন নেই, দুজনেই হাপুস নয়নে অঝোরঝর কাঁদল, কিছুক্ষণ তো কাঁন্দুক! চাঁদ উঠল, চাঁদ ঢলেও পড়ল। পুবের জঙ্গল ছায়াচ্ছন্ন করে পশ্চিমের জঙ্গলে খানিকটা উজ্জ্বল হল। 'বনপার্টির' জঙ্গলে আলো পড়ল। দুজনেই গাছ থেকে নেমে পাশাপাশি বসল। নীরবতা, নীরবতা আচমকা স্তব্ধতা ভেঙে সোমবারি বলল, "দে আমার কোৎবেল!" 'বনপার্টি' র জঙ্গলে দিকে চোখ রেখে বুধন হেসে উঠল। হাত ধরাধরি করে 'বনপার্টি'-র জঙ্গলে ঢুকে পড়ার 'ডিসিশন' তাদের সামনে সরু সুতোয় দুলতে লাগল- হয় এসপার নয় উসপার! আপাতত হাতে কিছুটা সময় থাকল, বনমোরগ কী খরমোরগ এখনও ডাকে নাই।[১৭]

একদিন নিশ্চয় মোরগ দুটি ডাকবে। বুধন ও সোমবারি পৃথিবীতে নতুন করে সুখের সংসার পাতবে। তারা বনে নতুন করে জীবন যাপনের অধিকার পাবে। এভাবে আলোচ্য ছোটগল্পে ডাইনি নামক কুসংস্কার থেকে মুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাইনি' নামক ছোটগল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে- গল্পে এক অনাথ বালিকা। ঘটনাচক্রে সবাই তাকে ডাইনি মনে করতে শুরু করে। তার ছোট ছোট দুটি চোখ, চোখের তারা খয়রি। সেই চোখের তীক্ষ্ণ বিড়ালিনীর মতো দৃষ্টিকে সবাই ভয় পায়। তাছাড়া একের পর এক এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে কারণে লোকে সুরধনীর কুদৃষ্টির উপর আরো গভীরভাবে বিশ্বাস করতে

শুরু করে। একদিন হারু সরকারের ছেলের পেটের অসুখ করে, সাবিত্রীর শিশু মারা যায় এই ভয়ে সুরধনী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বোলপুর চলে আসে। সে নিজেও আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বোলপুরে থাকার সময় এক বয়লারে কয়লা ঠেলা যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে জাতিতে ডোম, সুরধনীকে বিয়ে করে। কিন্তু অদৃষ্ট সুরধনীর পিছন ছাড়ে না, অবশেষে হঠাৎ একদিন রক্ত বমি করতে করতে তার স্বামী মারা যায়। আবার সে সব হারিয়ে ছাটিফাটার মাঠের ধারে সাহাদের আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। একদিন এক যুবতী তার শিশু সন্তানকে নিয়ে পথ ভুলে সেখানে হাজির হয়। শিশুটি তৃষ্ণার্ত ও ঘর্মাক্ত অবস্থায় মারা যায়। এরপর আমবাগানে আসা বাউরীদের ছেলেটাও মারা গেলে সে দায়ও আবার সুরধনীর ওপর পড়ে। আবার সে নিজেকে ডাইনি ভেবে লজ্জায় অপমানে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এইভাবে দ্বন্দ্বময়তার মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে অপরাধে ঘৃণায় সুরধনী এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালিয়ে যায়। অবশেষে বাউরীদের ছেলেটার মৃত্যুর পর সে পালাতে গিয়ে ছাতিফাটার মাঠে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে একটা কাঁটা গাছে বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এভাবে তার নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা দগ্ধ জীবনের অবসান ঘটে। মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কিভাবে মানবজীবনকে তিল তিল করে দগ্ধ করে গল্পের পটভূমিতে তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সেই সঙ্গে আছে মানুষকে ডাইনি বলে দূরে সরিয়ে রাখার মতো অমানবিক প্রথা।

লোকবিশ্বাসের আর একটি উপাদান হল জাদুবিদ্যা। জাদুবিদ্যার কথা ভাবলে আমাদের মনের মধ্যে রহস্যময় স্বপ্নের তৈরি হয়। একজন মানুষ কিভাবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে! ভাবতে অবাক লাগে। লোকসাহিত্যে 'ম্যাজিক' এর ভাবনা প্রাসঙ্গিক। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ম্যাজিকের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। আসলে এক কথায় বলতে গেলে লোকবিশ্বাসের একটি অন্যতম ভাবনায় হল জাদুবিদ্যা। জাদুর দ্বারা অলৌকিক কিছু ঘটানো সম্ভব। সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ জাদুবিদ্যার ভাবনায় বিশ্বাসী। অলৌকিক অতিবাস্তব অসম্ভব যাবতীয় ঘটনার বৈচিত্র্যময়তায় মানুষকে মুগ্ধ করতে চায়। আর সেই জাদুবিদ্যার ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় আমাদের মানবসমাজ।

জাদুবাস্তবতাবাদ বা 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' একটি সুপরিচিত শব্দ। জাদুবাস্তবতাবাদের সূচনা হয় লাতিন আমেরিকায়। এক সময় পাশ্চাত্য সাহিত্যে জগতে বাস্তবতাবাদ বা রিয়ালিজম (Realism) এবং রোমান্টিকতাবাদ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, ফরাসি শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আঁদ্রে ব্রেতঁ তার পরাবাস্তবতা (Surrealism) প্রয়োগে পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছিল। কালের স্রোতে সেই পরাবাস্তবতা বর্তমানে জাদুবাস্তবতাবাদ। একজন সাহিত্যিক তার লিখনশৈলীর মধ্য দিয়ে বাস্তব এবং কল্পনার মিশেলে গড়ে তোলেন তার নিজস্ব ভাব জগৎ। এই সৃষ্টিশীল ভাবনা থেকে জাদুবাস্তবতাবাদী লেখকরাও

পৃথক নন। জাদুবাস্তবতাবাদীদের লেখায় এমন এক আবহময় পরিবেশ গড়ে তোলে যা বাস্তব জগতে অস্বাভাবিক বা কিছুটা ভীতিময় পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম জাদুবাস্তবতাবাদের প্রয়োগ করেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে। এরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে জাদুবিদ্যা ও ডাইনি প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী সময় থেকে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কথাসাহিত্যে জাদুবাস্তবতাবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নলিনী বেরা তার লোককথার আখ্যানে রচিত গল্পগুলিতে জাদুবাস্তবতাবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'ঘবা, তিহা-র ছোটগল্পে 'ম্যাজিক' বা জাদুবিদ্যার প্রভাব দেখা যায়। একটি অচেনা পাখির 'টি-উ-ল- টু-টু' ডাকে আচ্ছন্ন থেকে অপর একজন মানুষের যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজকর্ম হল 'ঘবা তিহা'র গল্প'। গল্পটি দুই খন্ডে বিভক্ত। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বেশ্বর সাঁপুই যার চিন্তাভাবনায় মিশে রয়েছে একটি অচেনা-অদেখা পাখির 'টি-উ-ল-টু-টু' ডাক। এই ডাকের মাধ্যমেই তার ছেলের সঙ্গে কথাবার্তাও চলে। আবার ঐ ডাকে আচ্ছন্ন থেকে জোড়াবাঁধের কামিন রতনমণি মুর্মুকে ধর্ষণ করেছে। এগুলি সবই 'টি-উ-ল-টু-টু' ডাকের অলৌকিক ঘটনা।

গল্পের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আমডহরার একটি হাতির দল মেদিনীপুর পেরিয়ে কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং' এর পাশ দিয়ে হুগলি বর্ধমানের দিকে হেঁটে চলেছে। বিশ্বেশ্বর সাঁপুই কৈলাশ বসু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই হাতির দল থেকে দলছুট একটা হাতি তার তক্তাপোশের উপরে ওঠে দাঁড়াল। এমন সব অলৌকিক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। আবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রাবণ সোরেন আমডহরার শালডুংরিতে বাঘ চরায়। বাঘ মাংসাশী প্রাণিকে সে শাকাহারী প্রাণীতে পরিণত করেছে। রাবণ সোরেন নাকি বাঘকে মুথা ঘাস খাওয়ায়। এছাড়াও যে সময় আমডহরাতে হাতির পাল বেরিয়েছিল, তখন রাবণ সোরেন কয়েক শত হাতিকে ল্যাজুড়ে টেনে গোহাল ঘরে বেঁধে রেখেছিল আর তাই দিয়ে চাষ করে। এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনায় জাদুবাস্তবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অনেক প্রাচীন। আদিম মানুষ প্রথমে গুহায় বসবাস করত, পশু শিকার করত আর অবসর সময়ে সেই পশুর ছবিই গুহার গায়ে আঁকত, এখান থেকেই অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতির যাত্রাপথ শুরু হয়েছে। চিত্রের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের জন্য গড়ে ওঠা সংস্কৃতি পরবর্তীকালে সৌন্দর্যবর্ধক কারুকার্য হিসাবে পরিণত হয়। ঘরের শোভাবর্ধক কারুকার্য হিসেবে ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে অঙ্কন করার রীতি প্রচলন আছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজও এর প্রচলন দেখা যায়। নলিনী বেরার ছোটগল্পে অঙ্কন বা লিখন কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

‘কহবর লেখা’ ছোটগল্পটি ঝাড়গ্রাম জেলার একেবারে শেষ সীমানায় বসবাস করা আদিবাসীদের আর্থ- সামাজিক সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত। অঞ্চলটা ঘন বনজঙ্গলে ঘেরা রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে মানুষের বসতি রয়েছে, জঙ্গলের কাঠ, পাতা, মহুল ও বাবুইদড়ি বারিপদা-ময়ুরঞ্জের হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই ধারে মাহত, তাঁতি, সাঁওতাল, কুম্হার ও কামারদের সারিবদ্ধভাবে মাটির বাড়ি দেখা যায়। প্রত্যেকটি মাটির বাড়ির দেওয়ালে বিলের কেঁচো মাটি দিয়ে ন্যাতা বুলিয়ে মেয়েদের হাতের কাজের কারুকার্য দেখা যায়।

> ফিরতি-পথে বনের ভিতর সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে মস্ত চাঁদ উঠত, চন্দ্রালোকিত বনের সুঁড়িপথের দু’ধারে অতঃপর মাহত-তাঁতি-সাঁওতাল-কুম্হার-কাম্হারদের গ্রাম, তাদের মাটির বাড়ির ‘ছুঁচ্’ দেওয়া, অর্থাৎ সাদা বিলমাটির ন্যাতা বুলানো দেয়ালে সাওতাল-মাহত ‘বিটিচানা’দের হাতের কতরকম কাজ, ফুল-পাখি-লতা-পাতা- তার ‘কহবর লেখা’র থেকেও যে সরেস সরেস আঁকাজোকা সব![১৮]

‘খোরপোষ’ একটি অসাধারণ ছোটগল্প আবার একই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি উপাদানের ভান্ডার বলা যায়। গোটা গল্প জুড়ে কমবেশি শিল্প কর্ম আছে, যা সনাতনের মা ঢালোবুড়ি করত। ঢালোবুড়ি কোনো পালা-পরবের আগে বিলের কেঁচো মাটি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ‘মাটিকাম’ করে দিত। চুনকামের জায়গায় মাটিকাম। যে মাটি দিয়ে দেওয়াল যত বেশি সাফ করা যায়, সেই মাটি সন্ধানে দূরের বিলজমিন, তপোবনের জঙ্গল, সীতানালা খালধার এমনকি তিলকমাটি হুড়িতে যেতেও তার আপত্তি ছিল না। কখনও সাদা ছুঁচমাটির সঙ্গে হলদে তিলকমাটি ও লাল রঙের গিরিমাটিও নিয়ে আসত– আর তাই দিয়ে মাটিকাম করা দেওয়ালের উপর নানারকমের লতাপাতা, ফুল, পাখি আঁকতে বসত। ঢালোবুড়ি’র আঁকার কাজ শেষ হলে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করত-

> কাহার ল্যাখেন দিখাঁইছে বল্ দেখিন্ বাবুরা?[১৯]

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে বলত সোনার মতো, ঢালোবুড়ি এতে খুব খুশি হত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানবজীবনে মিথ বা পুরা কাহিনি অপরিহার্য একটি উপাদান। পুরাণ সৃষ্টির আগে থেকে পুরাকাহিনি বা মিথ জনজীবনে ছিল। পুরাণের কাহিনি ও পুরাকাহিনি দুটি আলাদা বিষয়। বাংলা পুরাকাহিনি প্রচলিত ভাষায় রচিত এবং লোকসাহিত্যের অংশ অন্যদিকে সংস্কৃত পুরাণ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। পুরাণ লিখিত, মিথ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য মিথের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিবার কৌতূহল লইয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানব একদিন যে সকল অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছিল, ইংরেজিতে তাহাদিগে myth বলে– বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ অথবা পুরাকাহিনী বলিয়া অনুবাদ করা যায়।[২০]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিথের সংজ্ঞাও বদলে গেছে। পুরাকাহিনি যতই অলৌকিক অবিশ্বাস্য ও প্রাচীন হোক না কেন আদিম মানুষ ও লোকসমাজের কাছে মিথের কাহিনির সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল। অলৌকিক চরিত্র, পূর্বপুরুষ, প্রাণী নিয়ে তৈরি কাহিনি এবং তাদের অলৌকিক আচরণে মিথে ঠাঁই পায়। মিথের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। দেব-দেবীর উদ্ভব, দেব-দেবী ও দানবের লড়াই, দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি একাধিক বিষয় নিয়ে মিথ তৈরি হয়। প্রাচীন মানুষ মিথের গল্প চরিত্রকে সঙ্গত মনে করলেও আজকের দিনে অনেক সময় এগুলিকে উদ্ভট আজগুবি বলে ভাবা হয়। যেভাবে লোকবিশ্বাস সংস্কারকে ভাবা হয় তবে মানুষ আজও এসবকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি। মিথকে 'প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান' বলা হয়।

পুরাকাহিনি বা মিথ বাংলা কথাসাহিত্যে এসেছে অনেক পরে এসেছে। প্রথমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে মিথকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্করের সময় থেকে সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী হয়ে একেবারে একালের অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, কিন্নর রায় প্রমুখের কথাসাহিত্যে মিথের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নলিনী বেরা তাঁর ছোটগল্পে লোককথার আখ্যানে মিথকে ব্যবহার করেছেন। ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে মিথের জগৎ সহজে এসেছে-

> এভাবেই জেগে উঠেছিল আমাদের 'বৈশাখী পাল', এক লপ্তে প্রায় একশ পঁচিশ বিঘার চর, আর সে চরকে ভোগ-দখলের অজুহাতে 'কালিন্দী' 'চরকাসেমের' মতোই একদিন তুমুল যুদ্ধ বেধেছিল জমিদার আর 'জন-মানুষদের'। যুদ্ধ হতাহতদের শবদেহকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল আখ্যান, পালাগান, "-বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে...' যা এখন 'মিথ্', পুরাণ আর ইতিহাসের মাখামাখি, একাকার একাকার![২১]

মানুষের মনে ইহজীবনের চাওয়া পাওয়া নিয়ে নানারকম বিশ্বাস রয়েছে। সে অনুযায়ী তাদের জীবনে নানা লৌকিক দেব-দেবীর সমাবেশ ঘটে। সেই দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের একটা চাওয়া পাওয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সম্পর্কের আধারে মানুষ ইহজগতের চাহিদা মেটাবার জন্য নানা ধরনের প্রার্থনা করে, কখনো কখনো সেই প্রার্থনা পূরণের বদলে মানুষ দেব-দেবীকে কিছু দিতে চায়। প্রার্থনা করার এই রীতিকেই মানত করা বলা হয়। আদিবাসী সমাজে মানত করার রীতি প্রচলিত আছে।

'ব্যাং-কৌমুদী' গল্পে সাঁওতালদের মিথের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের শুরুতে দেখা যায় কথকের ছোটপিসি মানসিক ভারসাম্যহীন। গ্রামে একা-একা গান করে বেড়ায়। গান করতে এক সময় হারিয়ে যায়। সে বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী এলাকায়

অনেক খোঁজার পরও পাওয়া যায়নি। কথকের মেজো কাকা বোনের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় খুব দুঃখিত। অবশেষে কথক ও তার ছোটকাকা বিজয়চন্দ্রের উপর ছোটপিসিকে খুঁজে আনার দায়িত্ব পড়ল। অন্যদিকে কথকের মেজোকাকা পাড়ার নামজাদা গুণিন বাল্‌কা সাঁওতালের কাছে তেল দেখাতে যায়। গুণিনের নির্দেশ অনুযায়ী ছোটপিসিকে নদীর পশ্চিম দিক করে খুঁজতে হবে। কথক তার ছোটকাকার সঙ্গে নদীপথে হাঁটতে হাঁটতে অদূরে কাঁটাশিমূলের আড়ালে এক অচেনা গ্রামে ঢুকে পড়ে। অবশ্য পরে জানতে পারে, সেই গ্রামের নাম 'ধারাগোল'। গ্রামের এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। জাতিতে সে সাঁওতাল, মাথায় সাদা চুল, খাটের উপর বসে লম্বা লাঠি নিয়ে 'খলা'য় শুকোতে দেওয়া ধান পাহারা দেয়। মাঝে মাঝে খড়ের চাল কিংবা পার্শ্ববর্তী ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে 'কাবা-বনি' 'চড়ৈ-চটি' এসে ধান খেতে চাইলে লাঠি ঠুকে 'হু-ডু-র্-র্-র্-হে-ট্-হে-ট্' মুখে শব্দ করে তাড়িয়ে দেয়। ছোটকাকা সেই বৃদ্ধের কাছে ছোটপিসির চেহেরার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলতে পারেনি। বৃদ্ধ সাঁওতাল তাদেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। বৃদ্ধ জানায় দু'তিন মাস পর মাথা ঠান্ডা হলে সে বাড়ি ফিরে আসবে। সে বাড়ি ফিরে আসলে 'দলদলি শ্যাওলা'র প্রয়োজন হবে। বৃদ্ধকে 'দলদলি শ্যাওলা'র প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করলে জানায়, 'দলদলি শ্যাওলা' মাথার খুলি খুলে ঘিলু সরিয়ে তার মধ্যে পুরে দিতে হবে। বৃদ্ধের আশ্চর্যজনক কথা শুনে লেখক হেসে ফেলায়, সঙ্গে সঙ্গে কথককে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করে।

> হাসলি যে গড়ম?[২২]

সাঁওতালি ভাষায় 'গড়ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ঠাকুরদা। লেখক গল্পে 'গড়ম' শব্দটি সম্বোধন অর্থে ব্যবহার করেছেন। গড়ম তোমার জানা নেই, ঠাকুরবাবা সাঁওতালদের জন্য সবকিছু করেছিল! সেগুলি বৃদ্ধ এক এক করে গল্পের আকারে বলে, আগে ধান গাছে চাল ফলত শুধু ধান গাছ থেকে তুলে এনে সিদ্ধ করলে ভাত! বনঝাড়ের কাপাস গাছ থেকে সরাসরি নানা রঙের কাপড় জন্মাত, পছন্দ অনুযায়ী তুলে আনলেই হল। মাথার উকুন বাছতে আর মা-মাসিকে সাধতে হত না, মাথা কুট কুট করলে মাথার খুলিটা খুলে হাতে নিয়ে নিজের খুশি মতো উকুন বাছতে পারত। এবার সে গড়মকে সিরিয়াস ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল-

> কী গড়ম, তাহলে মাথার খুলি খুলে ঘিলু বের করে তার 'জায়গা' দলদলি শ্যাঁওলা ভরা যায় কি যায় নাই?[২৩]

কথক বৃদ্ধের ভাবগতি দেখে মনে হয়, বৃদ্ধ লোকটা মানুষ নন। এই জনহীন খাঁ খাঁ গ্রামে তিনি যেন এক অশরীরী আত্মা। লেখকের সেখানে থাকতে খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। তার ছোটকাকাকে বলে ছোটপিসিকে আর খুজঁতে হবে না। এইসময় হঠাৎ এক ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোক বৃদ্ধের কাছে দেশলাই চায়। বৃদ্ধের মুখ থেকে শোনা যায় লোকটার নাম ঝড়ু। সে নাকি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। বৃদ্ধ ঝড়ুকে খেপির কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারেনি। ঝড়ু

নামে লোকটি শালপাতার চুরুট খেতে খেতে অন্য এক গল্প শুরু করে দিয়েছিল। গল্পের মমার্থ হল, কাল সন্ধ্যার সময় কুলাই টুডুর বোন কাঁদরী মেঘপাতাল ছোঁয়ার বায়না করছিল। সে মেঘপাতাল থেকে তারাফুল পেড়ে মাথায় গুঁজবে। বাস্তবে তা সম্ভব নয়, একথা বলতে বলতে বৃদ্ধ হাত উঁচিয়ে ঝড়ুকে থামিয়ে দেয়। এরপর বৃদ্ধ গল্প শুরু করে, একসময় মেঘপাতাল হাতের নাগালে ছিল। সবাই স্পর্শ করতে পারত। কুলাই টুডুর বোন কাঁদরী সে ঠিক কথায় বলছে। ঝড়ু অবাক হয়ে বৃদ্ধকে আবার জিজ্ঞাসা করে হাত দিয়ে আকাশ ছোঁয়া যেত? ঠাকুরবাবা মেঘপাতাল'কে আমাদের মাথার উপরে নামিয়ে রাখত। ঠাকুরবাবা নিজের খুশি মতো পৃথিবীতে আসত, মানুষের অভাব অভিযোগে পাশে থাকত। আমরাও নিজের খুশি মতো মেঘপাতাল বাবুর বাগান থেকে ফুল তুলতে পারতাম। মাথায় তারাফুল গুঁজতে পারতাম। আহা কি আনন্দের সময় ছিল-

> "ছিল রে, ছিল একালের হাতের নাগালেই ছিল, ইচ্ছা করলে মেঘপাতালটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়াও যেত। এখন দেখছি পাগল হলেই মাথাটা ঠিক হয়ে যায়, পাগল ঠিক কথায় বলেছে রে।" আমরা তো আমরা, গ্রামবাসী ঝড়ু সাঁওতালও হাঁ হয়ে আছেন, বলে কী বুড়োটা! হাত দিয়ে আকাশ ছোঁয়া যেত! এত কাছে! "ঠাকুরবাবা এই আমাদের মাথার উপর এক-দেড় হাত উঁচুতেই মেঘপাতালটাকে নামিয়ে রাখত, তাতে করে তারও যেমন সুবিধা-সুবিস্তা, আমাদেরও। পৃথিবীতে যখন খুশি ঠাকুরবাবা নামতে পারত খড়ম পায়ে খটাখট। আমরাও- "তুলব ফুল গাঁথব মালা বাবুর বাগানে"- যখন খুশি তারাফুল পুট করে ছিঁড়ে কানে গুঁজছি মাথায় পরছি, কী আহ্লাদ তাই না গড়ম?[২৪]

সাঁওতাল বৃদ্ধ জানায় 'ঠাকুরবাবা' মানে 'সিঞ চাঁদো', মাঝে মধ্যে তিনি মেঘপাতাল থেকে নেমে তাদের খোঁজ খবর নিত। তাই সব সময় সাঁওতালরা ঘরবাড়িকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত, ঘরের দেওয়ালে নানারকম লতা-পাতা, পশু-পাখির ছবি আঁকা থাকত। বিশেষ করে 'সঁকড়ি' পাতা (এঁটো পাতা) দেখলে 'সিঞ চাঁদো' রেগে গিয়ে অভিশাপ দিত। গল্প বলতে অনেকটা সময় বিলম্বিত হয়ে যাওয়ায়, বৃদ্ধ আবার শালপাতার চুরুট ধরিয়ে বলতে শুরু করে, জানলি গড়ম এরকম বেশ ভালো চলছিল। শুধুমাত্র দোষ হল আমাদের সমাজের মেয়ে মানুষদের, কোন একদিন রাতের বেলায় শালপাতায় ভাত খাওয়ার পর 'সঁকড়ি' পাতা বাড়ির সামনে ফেলে দিয়েছিল। সেই পাতা বাতাসে উড়তে উড়তে মেঘপাতালের গায়ে ঠেকল, তাই 'সিঞ চাঁদো' রেগে গিয়ে মেঘপাতাল'কে সরিয়ে নিয়ে যায়। কুলাই টুডুর বোন 'কাঁদরী', এখন হাজার বার হাত বাড়িয়েও কী মেঘপাতাল'কে ছুঁতে পারবে? সবই তো কপালের দোষ! এখানেই গল্পের মমার্থ শেষ হয়। এরপর ঝড়ু জানায় গভীর রাতে কেউ একজন ছেলে না মেয়ে গান গাইতে গাইতে পার হয়ে যায়, চিনতে পারেনি কারণ, সেই সময় তার ঘুম আসছিল, ঘুমে প্রায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। একথা শোনার পর কথক ও তার ছোটকাকা বিজয়চন্দ্র সেখান থেকে চলে যেতে চাইছিল, ঝড়ু তাদেরকে আবার বলে বসবেন না তো! তখন সে জানায় মাথাটা খুলে

একপাশে রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এভাবে গল্পে সাঁওতালদের মিথের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে আজও তারা মিথের ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

‘ঝাঁটার কাঠি’ ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের শিকার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ‘শিকার’ পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে এক উৎসব বলে পরিচিত। পূর্বে সব আদিবাসীরা ফাল্গুন- জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত শিকারে বের হত। স্বাধীনতার লাভের পর বনজঙ্গল উজাড় হওয়ার ফলে তারা শিকারে বের হয় না। তাদের শিকার সংস্কৃতিরও শেষ অবস্থা, কোনোরকম প্রথাটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। গল্পে লোধা-সাঁওতালরা আড়কাঠি, তারের ফাঁস, সাতনলা, কাঁড়-কাঁড়বাঁশ, দিয়ে কয়ের-কপতি, ট্যাঁসা-ক্যারকেটা, গোবরা চড়ৈ, ঢ্যাপচু, সিমফুচি, প্রভৃতি পাখি ধরে। এছড়াও নারদা-নিঘুই-তপোবন-ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে শিকারে গিয়ে তারা গোঈ-গোধি, ভাম-খটাস, মেটে খরগোশ, বর্‌হা-ঝিঁকর ধরে। একই সাথে ঝাঁপড়ি ভূত, ধন-কুঁদরা ভুত ও চিড়কিন্’কেও ধরে নিয়ে আসে।

‘পাহাড়ের নিচে মানুষ’ ছোটগল্পে উল্লিখিত কুসুমগাঁয়ের জমিদার লায়া কুলাই টুডু। মংলু কুলাই টুডুর বাড়িতে মুনিশ হিসেবে কাজ করে। জমিদারের চাষের কাজ বেশিরভাগ অংশটা মংলু একা করে, যেমন- মোষের পিঠে করে ধানচারা গুলোকে এক জায়গা ঠেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া, কোদালে কুপিয়ে আলের মাটি সরিয়ে দেওয়া, আবার কখনো চাষের জন্য জমির আল কেটে অন্য জমির জল নিয়ে আসা ইত্যাদি। এ বছর কুলাই টুডু মংলুকে কানাসইয়ের ‘পাহাড় পূজা’য় নিয়ে যাবে। গত বছর মংলু বৈশাখ মাসে অযোধ্যা পাহাড়ে ‘দিশম সেঁদরা’য় গিয়েছিল। এখনও সে ‘দিশম সেঁদরা’র নাগরার ‘টিলিং-ডু-বু-ল্ ডু-বু-ল্’ ‘টিলিং-ডু-বু-ল্ ডু-বু-ল্’ ‘টিলিং-ডু-বু-ল্ ডু-বু-ল্’ আওয়াজ ভুলতে পারেনি।

চাকুলিয়া ও বেলপাহাড়ির মাঝমাঝি জায়গায় কানাসই পাহাড়ের অবস্থান। বাসে করে যেতে হবে। মংলু মনে মনে ভাবে কানাসই পাহাড় নাকি অযোধ্যা পাহাড় থেকে বড়। গ্রামের ধান বোনা ‘রোহিন’ উৎসব শেষ হয়েছে। অন্যদিকে সাঁওতালদের ‘এরক্ সিম’ উৎসব শেষ হয়েছে। পূর্বের কথা অনুযায়ী দলনেতা কুলাই টুডু কুসুম গাঁয়ের কিছু লোকজন ও মংলুকে নিয়ে কানাসই পাহাড়ে ‘পাহাড় পূজা’ দেখার উদ্দেশ্য রওনা হয়। কুলাই টুডু দলে সবার আগে রয়েছে, পায়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া টায়ারের চটি, কাঁধে তেলতেলে বাঁশের লাঠি ও লাঠির ডগায় একটা বড়সড় পুঁটলি বাঁধা রয়েছে। এছাড়াও দলের সবার হাতে ছাতা, লাঠি ও পোঁটলা পুঁটলি রয়েছে। শাল মহুলের বনে আচ্ছাদিত, বিশাল দুর্গম পাহাড়ি পথকে অতিক্রম করে অবশেষে তারা ঝাড়গ্রামে পৌঁচাল। ঝাড়গ্রাম থেকে বেলপাহাড়ি ৪০ কি.মি, বেলপাহাড়ি আর চাকুলিয়ার মাঝখানে কানাইসর পাহাড়। ট্রেকারে যেতে যেতেই কুলাই টুডু মংলুকে কানাসই পাহাড়ের অলৌকিক গল্প শোনায়-

লায়া কুলাই টুডু হাত তুলে দেখাল– "ওই সবচেয়ে উঁচাটাই কানাইসর। দ্যাখ, দেখে জনম সাথক কর রে কাডা হপন মংলু।"[২৫]

কুলাই টুডু'র কথা মতো মংলু ট্রেকার থেকে নেমে কানাইসর পাহাড়ের চূড়াকে প্রণাম করে। পাহাড়ের চূড়ায় নানারঙের কাপড় বাঁধা রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী মানুষের সমাগম হয়েছে। প্রচুর লোকের ভিড়, সব বয়সের লোক দেখা যায়, সবার একটাই উদ্দেশ্য ঠাকুর দেখা। আবার কেউ এসেছে 'মান্‌সিক' প্যাঁঠার বলি দিতে।

ঠাকুর-দেখা লোকের ভিড় চলেছে স্রোতের মতো। কচিকাঁচা থেকে বুড়োবুড়ি কে নেই? তবে প্রায় বেশিরভাগটাই আদিবাসী, মংলুদের মতো 'সান্তাল'। ভুঁইয়া ভূমিজ মাহালী মুণ্ডা হো আর উথলু বিরহড়রা।[২৬]

কানাসই পাহাড়ের উপরে একটা ছোট কুঁয়ো আছে। সারা বছর জল থাকে, কোনোদিন জল শুকায় না। এমনকি ঠাকুর দেখতে আসা সমস্ত লোক ঘটিতে, বালতিতে জল তুলেও শেষ করতে পারে না। আগত পূণ্যার্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস কুঁয়োর জল ঔষধের মতো কাজ করে। কলাই টুডু'র দলবলও কুঁয়োর সামনে হাজির হয়, পাশে একটা বড় মন্দির আছে, আগে ঐ মন্দিরে কানাইসরের পূজা হত। চারিদিকে ঘন বন জঙ্গলে ঘেরা রয়েছে। মংলুরা গাছের তলায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় আগত পূণ্যার্থীদের কাছ থেকে জানতে পারে, পূজা এখন পাহাড়ের নিচে হয়। প্রথমদিকে পাহাড়ের উপরে সূর্য ডোবার পূর্বেই পূজা হত। পূজা শেষ হওয়ার পর সবাইকে পাহাড়ের নিচে নেমে আসতে হয়। একবার 'লায়া'(পুরোহিত) সঠিক সময়ে পূজা শেষ করে দুর্ভাগ্যবশত বলির খড়গটা সেখান থেকে আনতে ভুলে গিয়েছিল। পাহাড়ের নিচে এসে তার মনে পড়ে, তখন সূর্য প্রায় ডুবে গেছে, আকাশে তারা ফুটেছে, 'লায়া' পুনরায় পূজার থানে বলির খড়গ আনতে গিয়েছিল। সে দেখল ততক্ষণে দেবতারা দুটো বাঘ মেরে খেতে বসেছে। 'লায়া'কে দেখে তারা দু'জনে রেগে খড়গটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দেবতারা 'লায়া'কে নির্দেশ দেয় আজ থেকে পাহাড়ের নিচে পূজা হবে। সেদিন থেকে পাহাড়ের নিচে দেহুরি থানে পূজা হয়।

এ গল্প শোনার পর মংলু ভয়ে কাঁপছিল, এখনও পূজা শেষ হতে অনেক বাকি রয়েছে। পুজোর শেষে আবার 'দিশম সেঁদরা', ফিরতে অনেক রাত হবে। তাই মংলু কুলাই টুডুকে বাড়ি ফেরার কথা স্মরণ করে দিয়েছিল। কুলাই টুডু মংলুকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে এক এক করে মারাং বুরু, মঁড়েকো তুরুইকো, জাহের এরা, গোঁসাই এরা, বির বোঙা, বাঘুৎ বোঙা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্যর কথা স্মরণ করে দেয়। অবশেষে মংলুর হাত ধরে পাহাড়ের নিচে আসে। পাহাড়ের নিচে মেলা জমে উঠেছে। সাঁওতালি নাচের আসর হাঁড়িয়া মদের গন্ধে ম ম করছে। সবাই ফুর্তি করে দং লাগড়ে, ঝিকা, পাতা মাদলের 'হেতাং দাঃ দিং হেতাং দাঃ – হেতাং হেতাং দাঃ তালে কোমর দুলিয়ে সবাই নাচছে। মংলুরও নেশা করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু

পূজার আগে নয়। দেহুরি থানে পূজা হয়ে যাওয়ার পর তারা পাহাড়ের পূর্ব দিকে একটা চাতালের উপর আশ্রয় নিয়েছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়, ধামসা মাদলের আওয়াজ ও গানে সদ্য বলি হতে যাওয়া পশু-পক্ষীর ডাক চাপা পড়ে গিয়েছিল। লায়া ও মংলুর কোনো 'মান্‌সিক' ছিল না। তারা শুধু পাহাড় পূজার মেলা দেখতে এসেছিল। চাতালের উপরেও আরেকটি চাতাল আছে এখন মানুষজন সেখানে ভিড় জমিয়েছে। উপরের চাতালে একটা ফুটো রয়েছে, মন্তর কিছু নেই, 'কানাইসর ভগবান' আমাদের পূজা লও, বলে আমলকি আর ফুল চাতালের ফুটোয় ফেলতে হবে। এরপর তলায় হাত পেতে বসে থাকতে হবে। মংলু প্রথম আমলকি আর ফুল নিয়ে চাতালের ফুটোয় ছুঁড়ে দেয়। ছোঁড়া মাত্রই ফুল আর আমলকি মংলুর হাতে এসে পড়ল। কানাইসর পাহাড়ের লায়া মংলুকে জানায় তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কুলাই টুডু ফুল আমলকি ছুঁড়ে মারল, কিন্তু তার হাতে কিছুই পড়ল না। লায়া জানায় তোমার ফুল-আমলকি দেবতা নেয়নি, মনস্কামনাও পূর্ণ হবে না। মংলুর হাত ধরে সুঁড়িপথে নামার সময় কুলাই টুডু বিড়বিড় করে বলে -

> যাকগে, ই বচ্ছর হল না হল না, আসছে বচ্ছর আবার আসব।[২৭]

এবছর কুলাই টুডু'র মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, তাই পরের বছর কাঙ্ক্ষিত মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আসা রাখে। কুলাই টুডু মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ার কারণে প্রচুর নেশা করে। সবাই পাহাড়ের দেবতার কাছে মনস্কামনা পূর্ণের জন্য মানত করে। সবার চাওয়া-পাওয়া একে অপরের থেকে আলাদা, কেউ দেবতার কাছে মাঠ ভর্তি ধান চায়, কেউ পুকুর ভর্তি মাছ চায়, কেউ বনে শিকার চায়, কেউ গাছে বেশি পরিমাণে ফল চায় ইত্যাদি।

> পাহাড় দ্যাব্‌তার কাছে লোকে কত কী মানত করে। খেতে বেশি বেশি করে ধান দে পাহাড় দ্যাব্‌তা। জলে মাছ দে। বনে শিকার দে- বরা খেড়িয়া ঝিঁকর গোঁই গোধি। গাছে গাছে ফল দে- ভেলা বাদভেলা কেঁদু ভুড়রু বেল কোৎবেল কুসুম কুল বৈঁচি আম জাম। আর, রোগবালাই রাখিস না। খোঁড়াকে সোজা কর। কানাকে চোখ দে। পেট ও বুকের সব ব্যারাম ভালো করে দে।[২৮]

কুলাই টুডু আর মংলু কানাসই পাহাড় দেবতার কাছে কি চেয়েছিল তা জানা যায়নি। সবাই পাহাড় দেবতার কাছে চাওয়ার জন্য আসে। আবার কেউ পাওয়ার পর মানত দিতে আসে। কেউবা মেলায় দুই পয়সা রোজগার করতে আসে। কুলাই টুডু মেলায় গিয়ে বিশেষ কিছু কেনা কাটা করেনি, তার স্ত্রীর জন্য একখানা সাঁওতালি শাড়ী আর মংলু মায়ের জন্য পাথরের জামবাটি ও নিজে একটা বাদ্যযন্ত্র কেঁদরি কিনেছিল। জঙ্গলের শিকারে কেউ যায় নি, পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত সবাই মিলে নাচতে লাগল। মংলুর মাদলের 'হেতাং, হেতাং দাঃ দাতাং দাতিং' তালে কিংবা কখনো আড়বাঁশি, গোটা আসরটাকে মাতিয়ে তুলেছিল। নাচতে নাচতে এক সময় কানাসই পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবে যায়, আকাশে তারা দেখা যায়, ঠাকুর দেখতে

আসা সমস্ত লোকজন পাহাড় থেকে নেমে যায়। সবাই আর নয়, আর নয়! আসছে বছর আবার হবে! বলতে লাগল। আলোচ্য গল্পে একই সঙ্গে সাঁওতালদের মিথ ও নাচ-গানের সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়।

আদিবাসীদের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার–প্রথার মাধ্যমে সামাজিক গঠন স্পষ্ট বোঝা যায়। সমাজের বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্রণের মাধ্যমে সেই সম্প্রদায়ের মানস গঠনও সুস্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হয়। আলোচ্য বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসীদের বিশ্বাস-সংস্কার–প্রথার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে অন্ধ বিশ্বাসের ভাগটা বেশি রয়েছে। অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষরা যুক্তি-বুদ্ধির তোয়াক্কা করেনা, আধা ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাসে মগ্ন থাকে।

বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাধুনিক জীবনযাত্রার কোলাহলকে দূরে সরিয়ে নলিনী বেরা আপন চেনা জগতকে নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। গল্প পাঠের প্রতি মুহূর্তে পাঠক নতুন এক ভারতবর্ষের সন্ধান পায়। নলিনী বেরার জন্মভূমির পরতে পরতে যুক্ত হয়ে আছে আঞ্চলিক পালাপার্বণ, ভৌগলিক ব্যাপ্তি, মানুষদের জীবনাচণের সংলাপ যা ছোটগল্পের শাখায় শাখায় বিস্তৃত হয়ে ছোটগল্পকে বাংলা সাহিত্যে এক মহীরূহ আকার দান করেছে। আদিবাসীদের দারিদ্রময় জীবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কল্পনার মায়াজাল। প্রকৃতির অতি তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে যে কত মোহময়ী হয়ে ওঠা যায়, তিনি তা শিল্পী সত্তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আমাদের বিশাল ভারতবর্ষে আদিবাসী মানুষজনদের মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে দেশের কথনশৈলী পূর্ণ হয়না। নলিনী বেরা আদিবাসীদের সেই কথনশৈলীকে বেছে নিয়েছেন। তিনি কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। একটা বিরাট সাহিত্যের ক্যানভাসে গ্রামীণ জনজীবনকে চিত্রিত করেছেন। এখানেই তিনি অনন্য।

তথ্যসূত্র;

১. বেরা, নলিনী,*‘উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি’,* দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-৮২।

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

৩. *কোরক,* তাপস ভৌমিক, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫, দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা- ৭০০০৫৯, পৃষ্ঠা-২৫৬।

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩।

৫. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটিগল্প,* দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা- ৩১।
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১।
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।
৮. বেরা, নলিনী,*পঞ্চাশটিগল্প,* ২০১১ করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন কলকাতা- ৭০০০৯, পৃষ্ঠা-১৮৬।
৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৯।
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫১।
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৫।
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৭।
১৩.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৭।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৮।
১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯।
১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০০।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩২।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২০।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৩।
২০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোক-সাহিত্য* , (প্রথম খন্ড : আলোচনা), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-৬০৯।
২১. বেরা, নলিনী, *'উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি',* দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-১০।
২২. বেরা, নলিনী, *পঞ্চাশটিগল্প,* ২০১১ করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন কলকাতা- ৭০০০৯, পৃষ্ঠা-১৩৫।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১৩৫।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১৪৯।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -১৫০।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩।

অষ্টম অধ্যায়:
পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক

রাঢ় প্রাচীন দেশ, সভ্যতার আদিভূমি। প্রাচীন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি তার প্রমাণ দেয়। ব্রিটিশ শাসনকালে দীর্ঘ প্রশাসনিক উত্থান-পতনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা স্বাধীন ভারতবর্ষের পূর্বাংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়- প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি। বর্ধমান বিভাগের বেশির ভাগ জেলাগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে রাঢ় বাংলা। রাঢ় অঞ্চলের বিশাল সীমানা- সমগ্র বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা, পূর্বে বাঁকুড়া ও হুগলীর (আরামবাগ) এবং পশ্চিমে পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাঢ়ের বৃহৎ ভূখন্ডকে দু'ভাগে চিহ্নিত করা যায়- পূর্বরাঢ় ও পশ্চিমরাঢ়। পশ্চিম রাঢ় বলতে রাঢ়ের পশ্চিমাংশকে বোঝায়। অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার সমগ্র অংশ, বর্ধমান জেলার আসনসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম। এই পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে নানা জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করে। যেমন- সাঁওতাল, কোল, কোড়া, মাহালি, মুণ্ডা, শবর, ভূমিজ, কর্মকার, কুম্ভকার, মাহাতো, বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, করগা, ও খয়রা প্রভৃতি জনজাতি। এখানকার মানুষরা প্রকৃতিগতভাবে স্বভাব-সরল, সৎ ও পরিশ্রমী হয়। সংস্কৃতিতে তাদের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। জীবনযাপনের জন্য তাদেরকে সারা বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। আবেগ-উল্লাসে তারা স্বতস্ফূর্ততায় আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে তোলে। অরণ্য সংলগ্ন কুঁড়ে ঘরগুলিতে কিংবা শিলাবতী-কংসাবতী-কুমারী-দ্বারকেশ্বর-তারাফেণী-ভৈরববাঁকী-দুয়ারসিনীর কিনারে কিনারে লোকসংগীতের করুণ সুর শোনা যায়। এছাড়া উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের আসরে ছড়া-গান-কথকতা-ধাঁধা-প্রবাদ-উপকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা-উপধারা শোনা যায়। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সাহিত্যিকরা সেই সব লোকসংস্কৃতির অপার ভাণ্ডারকে তাদের রচনায় তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়(১৯০১-১৯৭৬), রমাপদ চৌধুরী(১৯২২-২০১৮), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখায় আদিবাসীদের সমাজজীবন ও তাদের সংগ্রামের কথা বারবার এসেছে। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক আছেন। তারা বাংলা সাহিত্যিকদের মতো স্বনামখ্যাত নন। ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজের সময় অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সাঁওতাল সাহিত্যিকরা তাদের রচনায়

শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, মূল্যবোধ কিংবা নীতিবোধ বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। সাঁওতালি সাহিত্যকে মোট তিনটি পর্যায় রয়েছে-

প্রথম পর্যায়:

১৮৮০ সাল নাগাদ প্রথম মিশনারিদের নেতৃত্বে বাংলা হরফে সাঁওতালি সাহিত্য রচিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়:

১৯৩০ সালে সাঁওতালি সাহিত্যে দ্বিতীয় পর্যায় সূচনা হয়। রঘুনাথ মুর্মু (১৯০৫-১৯৮২) তাঁর পৌরাণিক আখ্যান রচনার মধ্যে দিয়ে এক সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষার বিস্তার তাঁর প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়:

এই পর্যায়ের সাঁওতালি সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণি মানুষের অবস্থা ও তাদের আর্থিক বঞ্চনায় মূল বিষয় ছিল। সাহিত্যে একধরনের ডিপ্লোমাধারী শিক্ষিত বেকার যুবকদের দেখতে পাওয়া যায়। তারা জীবন-জীবিকার সন্ধানে দালালদের হাত ধরে পার্শ্ববর্তী ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল।

সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে রঘুনাথ মুর্মু (১৯০৫-১৯৮২)'র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখার জগতে এসেছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ টিসকো (TISCO) কোলিয়ারি কিংবা রৌরকেল্লা স্টিল প্লান্টের শ্রমিক ছিল। তারা কাব্য ও গদ্য দুই ধরনের সাহিত্য রচনা করেছিল। এছাড়াও একদল শিক্ষক যুক্ত ছিল, চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁরা পূর্ণ সময়ের জন্য সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিল। তাদের সাঁওতাল সংগঠন (Santal Writer's Association)- এ সাহিত্যের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা হত। এরফলে সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি করে সাহিত্যে সঞ্চারিত হত। প্রায় প্রত্যেক ছোটগল্পে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময়কে তাঁরা পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাঁওতাল শ্রমিকদের সঙ্গে জমিদারের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রাধান্য পায়। আবার অনেক সময় তাঁরা কোনো বিশিষ্ট সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কিংবা সমাজের দরিদ্রতাকে দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়কে নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন। আখ্যানগুলিতে নায়ক চরিত্র নির্মাণে স্বাধীনতা সংগ্রামী কিংবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের জীবনকাহিনির প্রভাব দেখা যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আলাদা ঝাড়খন্ড রাজ্যের আন্দোলনে যুক্ত জয়পাল সিং এর মতো রাজনৈতিক নেতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রঘুনাথ মুর্মুর রচনা সাঁওতালি সাহিত্যেকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আজও তাঁর রচিত নাটকগুলি গ্রামে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৮০ দশকের আখ্যানে লেখকরা দাবি করে, তাদের উপর 'বোঙ্গা' ভর করেছে। তাই তাঁরা লেখার কাজে হাত দিয়েছে। সারনা ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা গুলিয়া হাঁসদা এমনই মন্তব্য করেছিলেন। ভরের মধ্যে দিয়ে তিনি দাবি করেন, বোঙ্গারা তাঁকে পূজা-অর্চনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছে। সাঁওতালি সমাজে যে বোঙ্গাদের অস্তিত্ব আছে তা যেন কোনোমতে ক্ষুণ্ণ না হয়। গুলিয়া হাঁসদা ডাইনি অপবাদে শাস্তি দেওয়ার প্রথাকে সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমানে সাঁওতাল সাহিত্যিকরা শ্রেণিশোষণ, বঞ্চনা ও ঠিকাদারদের অত্যাচারের কথায় বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক সময় তাঁরা যাত্রাপালার নাটকীয় আঙ্গিকে প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

নিম্নে কয়েকজন সাঁওতালি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

সাধুরাম চাঁদ মুর্মু (১৮৯৭-১৯৫৫):

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদা নিকটবর্তী কামারবাঁদি গ্রামে সাধুরামচাঁদ মুর্মু **১৮৯৭** সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি **১৯০৮** সালে গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করে মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ভীমপুর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এই স্কুলে পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজ শেখানো হত। সাধুরামচাঁদ মুর্মু মিশনারিদের স্কুলে পড়ার সুবাদে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি শিক্ষা শিখেছিলেন। অন্যদিকে পড়াশুনাতেও তিনি মেধাবী ছিলেন, দু বছরে মিডল বাংলা পাশ করেন। বাড়ির আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে মাঝপথে তাঁকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

সাধুরামচাঁদ মুর্মুর সময়ে ইংরেজ শাসন চলছিল। সে সময় সাঁওতালদের উপর নানারকম অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতন চলত। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐক্য একে একে সব ভেঙে পড়েছে। অন্যদিকে খেরওয়ালদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারও চলছিল। **১৯২৭** সালের এক ধর্মীয় জনসভায় খেরওয়ালদের উপর কয়েকটি বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল- সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল ও ভীল সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রত্যেকে 'রায়' পদবী ব্যবহার করবে। অমার্জিত পূজার্চনা এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা নৃত্য পরিবেশন করতে পারবে না। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সাঁওতালদেরকে হেনস্তা করা হত। দোকান থেকে কোন জিনিস ক্রয় করলে তা হাতে দেওয়া হত না। অস্পৃশ্যতার ভয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। অন্যদিকে তাদের সমাজে মানুষেরা কুসংস্কার, অনাচারে জর্জরিত হয়ে বিপথে চালিত হচ্ছিল। মদ খেয়ে

জমি ও পরিবারকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল। এরকম এক পরিবেশে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় প্রতিবাদী কলমে একের পর এক ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন অজস্র গান ও কবিতা। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি সমগ্র সাঁওতাল সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

সাঁওতাল সমাজে এরকম এক অবক্ষয়ের সময়ে তিনি 'সারি ধরম' ধর্মের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। অশিক্ষিত সাঁওতালদের কাছে তখন ধর্মের বাণী শোনানোর জন্য গান ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এই জন্য তিনি *সারিধরম সেরেঞ পুঁথি* গানের বই লিখে সাঁওতালদেরকে আদি ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন- 'দেবন তিঙ্গুন আদিবাসী বীর'(এসো জাগি আদিবাসী বীর)। এই গানের মাধ্যমে তিনি বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশা ও বাংলাদেশের সমস্ত সাঁওতালদেরকে স্বজাতীয় মনোভাবে আবদ্ধ করেছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির বিকাশ করতে চেয়েছিলেন। সাধুরামচাঁদ মুর্মু বহু আগে বুঝতে পেরেছিলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য সাঁওতালি ভাষায় স্বতন্ত্র লিপি 'মঁজ দাঁদের আঁক' তৈরি করেন। পরবর্তীকালে সেই বর্ণমালাতে তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

সাধুরাম মুর্মু তাঁর আর্থিক অনটনের কারণে, জীবিতকালে রচনাগুলিকে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। দীর্ঘদিন ধরে পাণ্ডুলিপিগুলি অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে সাধুরামচাঁদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি এবং মারাংবুরু প্রেসের কর্ণাধার ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের যৌথ প্রচেষ্টায় তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলিকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

১. *সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি* (সারি ধর্ম গানের পুস্তক) তিনটি খন্ডে প্রকাশিত হয়- প্রথম খন্ড (১৯৬৯), দ্বিতীয় খন্ড (১৯৭২), তৃতীয় খন্ড (১৯৯৪)।

২. *অল দহ অনড়হেঁ* (১৯৭৪), লিখে রাখা কবিতা।

৩. *লিটৌ গডেৎ* (১৯৭৯), সাঁওতাল জাতির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

৪. *সংসার ফেঁদ* (১৯৮২), নাটক।

৫. *ঈশ্বরড়* (১৯৮৫), সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

সাঁওতালি সাহিত্যে সাধুরামচাঁদ মুর্মু'র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কবি ও সমাজ সংস্কারক সাধুরামচাঁদ মুর্মু ১৯৫৫ সালে মারা যান।

মঙ্গল চন্দ্র সরেন (১৮৯৯-১৯৯২):

বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদার কাছে ঢুয়াপাহাড়ী গ্রামে মঙ্গল চন্দ্র সরেন (১৮৯৯) জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় ইংরেজদের শাসন অন্যদিকে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। এমন এক সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে শিলদার টোল থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। টোলে পড়ার সুবাদে ছোটবেলাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কারণ সংস্কৃত ভাষাতে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পড়ানো হত। মহাভারত পড়ার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও ইতিহাস ভাবনার উদয় হয়েছিল। এরকম চিন্তা ভাবনা থেকে তাঁর স্বজাতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্ম নিয়েছিল। অবসর সময়ে তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। টোলে পড়াকালীন হিন্দু পুরাণ পড়ে তাঁর মধ্যে সৃষ্টি কর্তা ও ধর্ম ভাবনার উদয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করেন। নিজ গ্রামে 'ধরম আখড়া' তৈরি করে কীর্তনের আয়োজন করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে প্রথম মেছুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর জেলার বিনপুর আদিবাসী সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি ধর্ম-সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার কাজে খুব উৎসাহী ছিলেন। সাঁওতাল সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মঙ্গল চন্দ্র সরেন সাঁওতালদের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে বিশেষ পরিচিতি রেখে যান। মঙ্গল চন্দ্র সরেন-এর কাব্য গ্রন্থগুলি হল-

১. *সারি সারজম* (সত্য শাল) ১৯২৭ সালে লেখেন প্রকাশকাল জানা যায়নি।

২. *কারাম বিনতী* প্রকাশকাল জানা যায়নি, (কারাম-স্তোত্র), কারাম উৎসব উপলক্ষে পঠিত যা বহুকাল ধরে সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত।

৩. *জমসিম বিনতী* (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), জমসিম পুরাণ, প্রচলিত পুরাণ কাহিনীর সংগ্রহ মূলক গ্রন্থ।

৪. *বাহা সেরেঞ* প্রকাশকাল জানা যায় নি, ধর্মীয় গানের সংকলন।

৫. *দানগী-সীতারাম* (১৯৫০ মতান্তরে ১৯৫৭) নাটক।

৬. *মান-মাতাল* প্রকাশকাল জানা যায় নি, নাটক।

৭. *সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি* (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) বাংলা ভাষায় লেখা এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ।

৮. *সাঁতভূমের ইতিহাস,* প্রকাশকাল জানা যায়নি।

৯. *মারাং বুরুর মাহাত্ম্য,* প্রকাশকাল জানা যায়নি।

১০. *ভোটোঃ উপৌল বাহা,* প্রকাশকাল জানা যায়নি।

১১. *ছিতৌ,* প্রকাশকাল জানা যায় নি। গানের সংকলন।

১২. *সারি ধরম সারিল* (সত্য ধর্মের মাহাত্ম্য) পুরাণাশ্রিত নাটক, প্রকাশকাল জানা যায়নি।

মঙ্গল চন্দ্র সরেন ১৯৪০-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময় তিনি রাজনৈতিক জীবন কাটিয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে বহু কাজ করেছিলেন। ১৯৯০ সালে (মতান্তরে ১৯৯১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে আদিবাসী গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বরে মঙ্গল চন্দ্র সরেন মারা যান।

সারদা প্রসাদ কিস্কু (১৯২৯-১৯৯৬):

পুরুলিয়া জেলা বান্দোয়ান থানার ভালুবাসা গ্রামে সারদা প্রসাদ কিস্কু (১৯২৯, ২রা ফেব্রুয়ারি) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন, সামাজিক উন্নয়নের প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। অবশ্য তিনি জয়ী হতে পারেননি। সারদা প্রসাদ কিস্কু অগ্রজ কবি সাধুরামচাঁদ মুর্মুকে তাঁর গুরু হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাধুরামচাঁদ মুর্মু'র *সারি ধরম সেরেঞ পুথি* পড়ার পর সারদা প্রসাদ কিস্কু সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চা করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৫৭-৫৮ সাল নাগাদ তিনি *খেরওয়াল আড়াং* (সম্পাদক ভবতোষ সরেন), *হড়সম্বাদ* (সম্পাদক ড. ডমন সাহু),

তেতরে (সম্পাদক মহাদেব হাঁসদা) নামক সাঁওতালি সাহিত্য পত্রিকায় 'টটকো মলং' ও 'পাতাং সুরাই' ছদ্মনামে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। শিশুদের উপযোগী বহু ছড়াও তিনি রচনা করেন। সারদা প্রসাদ কিস্কু তাঁর ছোটগল্পে সহজ সরল গ্রামীণ জীবনের কথাকে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে নিটোল হাসির আভাস ফল্গুধারার মতো বয়ে গেছে।

আশির দশকে তিনি সাঁওতাল সমাজে ডাইনি নামক কুসংস্কারকে দূর করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর এই ডাইনি বিরোধী আন্দোলন সমাজে এক নতুনমাত্রা এনে দিয়েছিল। তাঁর মতে, ডাইনি একটি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। এভাবেই তিনি সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সমাজ সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সারদা প্রসাদ কিস্কু'র উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *ভুরকৌঃ ইপিল* (১৯৫৩), কবিতা ও গান সংকলন।

২. *কুহুবৌউ* (১৯৬০), গানের সংকলন।

৩. *গাম গঁদার* (১৯৬৭), কবিতা ও গান সংকলন।

৪. *লাহা হররে* (১৯৮৫), কবিতা ও গান সংকলন।

৫. *সলম লটম* (১৯৮৮), গল্প সংকলন।

৬. *জুডৌসি অনল মালা* (১৯৯৪), প্রবন্ধ সংকলন।

৭. *বিদৌঃ বেড়া* (১৯৯৭), কবিতা ও গান সংকলন।

৮. *সঙ্গীতিকা* (১৯৯৮), গানের সংকলন।

সারদা প্রসাদ কিস্কু তাঁর সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ও আদিবাসী সংগঠনগুলি পুরস্কার/মানপত্র দিয়েছিল-

১. ১৯৭৩-৭৪ সালে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

২. ১৯৬৩ সালে আবোয়াঃ গাঁওতা থেকে মানপত্র দেওয়া হয়।

৩. ১৯৭৩ সালে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়।

৪. ১৯৮১ সালে মহারাজ নগর আদিবাসী ক্লাব, সেনেড়া, থেকে মানপত্র দেওয়া হয়।

৫. ১৯৮২ সালে বিক্রমশীলা হিন্দি বিদ্যাপীঠ থেকে ‘কবিরত্ন’ উপাধি দেওয়া হয়।

৬. ১৯৮৬-৮৭ সালে বিহার সরকার রাজভাষা বিভাগ থেকে ‘জনজাতীয়’ পুরস্কার দেওয়া হয়।

৭. ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন হিসেবে তাম্রপত্র স্মারক দেওয়া হয়।

৮. ১৯৮৯ সালে সারা ভারত সাঁওতালি লেখক সংঘ পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়।

৯. সানতালি রাইটার্স রিসেপসন কমিটি পক্ষ থেকে ‘হিহিড়ি পিপিড়ি’ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১০. সান্থালি সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘গুরু গমকে’ সম্মান দেওয়া হয়।

প্রকৃতির কবি, দুঃখের কবি, প্রতিবাদী কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু ১৯৯৬ সালের ১৮ই মার্চ মারা যান।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (১৯৩০-২০১৪):

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভীমপুর গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (১৯৩০, ১৪ জুন) জন্ম গ্রহণ করেন। ভীমপুরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তীকালে হুগলীর শ্রীরামপুর কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে শিক্ষতার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ভীমপুর সান্তাল হাই স্কুল এবং চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর শিক্ষা সংঘে কিছু দিন শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯৭৯ তিনি সালে নিউ দিল্লীর Indian Institute of Mass

Communication-এ সাংবাদিকতার চাকরি করেন। নিউ দিল্লীর সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম (T.D.C.C)-এ নিয়োগ করে। তিনি সরকারি সংস্থার মাধ্যমে আদিবাসী উন্নয়নের বহু কর্মসূচী রূপায়িত করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে'র অপর পরিচয় হল ঐতিহাসিক হিসেবে। ভারতীয় ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)-এর দুই নায়ক সিদু মুর্মু ও কানহু মুর্মু'র বীরত্বের কাহিনি দীর্ঘকাল ধরে অজ্ঞাত ছিল। তিনি প্রথম তাঁর *সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থের মাধ্যমে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালিকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৭৬)

২. *সানতালি মেনকাথা আর ভেনতা কাথা* (১৯৮২), সাঁওতালি প্রবাদ প্রবচন বাগ্‌ধারা।

৩. *কুদুম* (১৯৮২), সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত হেঁয়ালীর সংগ্রহমূলক গ্রন্থ।

৪. *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* দুই খন্ডে প্রকাশিত (১৯৮৭)

৫. *বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব (১৯৯২)*

৬. *কারাম বিনতী* (১৯৯৩), কারাম পুরাণ।

৭. *ভান্ডান বিনতী* (১৯৯৪), শ্রাদ্ধ পুরাণ।

৮. *পছিমবাংলা আর আবোরেন আগিল বিরৌদালিক* (১৯৯৫) পশ্চিমবঙ্গ ও আমাদের পূর্বপুরুষ।

৯. *গণ আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ* (১৯৯৬)

১০. *সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৯৯)

১১. *বাহা পরব আর হড় সমাজ* (২০০২), বাহা উৎসব ও সাঁওতাল সমাজ।

১২. *বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী* (২০০৩)

১৩. *হড় সমাজরে বঙ্গাবুরুকো* (২০০৩), সাঁওতাল সমাজের দেবদেবী।

১৪. *আদিবাসী সমাজ ও পালা পার্বণ* প্রকাশকাল জানা যায়নি।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন-

১. ১৯৮৬ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁর রণতরী সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মান দেওয়া হয়।

২. ১৯৮৮ সালে বাংলার কবি, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবি মহলের পক্ষ থেকে শিরোপা দেওয়া হয়।

৩. ১৯৯২ সালে বাংলার দলিত সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে 'বীরসা মুণ্ডা' পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪. ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন সম্মান দেওয়া হয়।

৫. ১৯৯৩ সালে অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে শিরোপা দেওয়া হয়।

৬. ২০০৮ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D. Lit. সম্মান দেওয়া হয়।

৭. ২০০৯ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D. Lit. সম্মান দেওয়া হয়।

৭. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আদিবাসী গবেষক হিসেবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বহু সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নয়নের এক নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। এই মহান ব্যক্তি ২০১৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মারা যান।

গোমস্তা প্রসাদ সরেন (১৯৪৩-২০২৩):

পুরুলিয়া জেলার উদলবনি গ্রামে গোমস্তা প্রসাদ সরেন (১৯৪৩,২ জুন) জন্ম গ্রহণ করেন। শিরিষগোড়া সিনিয়ার বেসিক নামে এক হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর্থিক অনটনের কারণে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছিল। এরপর তাঁর শিক্ষকতা কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথম তিনি ১৯৬১ সালে মধুপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পর সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করতে শুরু করেন। এই চর্চার অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তী সময়ে সাঁওতালি সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মায়। তিনি প্রথম *হড় সম্বাদ* পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন। এছাড়াও *তেতরে, সিলি* ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় তাঁর রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ষাট দশকে তাঁর ধারালো লেখনীর মাধ্যমে সাঁওতাল জাতির প্রতি শোষণ, শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। সাঁওতালি সাহিত্য বিকাশের পাশাপাশি তিনি সমাজ-সংস্কৃতি উন্নয়ন মূলক একাধিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। গোমস্তা প্রসাদ সরেন এর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *আখড়া থুতি* (১৯৭৫) আখড়া কথা, স্বরচিত গানের সংকলন।

২. *কাঁহিস আড়াং* (প্রকাশকাল জানা যায়নি), ব্যথাতুর ধ্বনি, কাব্যগ্রন্থ।

৩. *মার্শাল ডাহার* (প্রকাশকাল জানা যায়নি), কাব্যগ্রন্থ।

৪. *জেরেৎ দেওহা* (১৯৭৯), জ্বলন্ত প্রদীপ।

৫. *ঝাড়খণ্ডীরা বিক্ষুব্দ্ধ কেন?* (১৯৮০), প্রবন্ধ সংকলন।

৬. *তিরে মেড়হেৎ সাকাম জিউয়ি রাড়েচ* (প্রকাশকাল জানা যায়নি), হাতে বিবাহের চিহ্নসূচক বালা- হৃদয়ের শান্তি, গল্প সংকলন।

৭. *কারাম বিনতী* (প্রকাশকাল জানা যায়নি), কারাম পুরাণ।

৮. *আগড়ুম বাগড়ুম* (১৯৯১), আবোল তাবোল, প্রবন্ধ সংকলন।

৯. *উন্নয়ন? না, বঞ্চনা?* (২০০১)

১০. *আজলৌতিয়ৌ* (২০০২), গ্রহীতা।

সাঁওতালি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পান—

১. ১৯৯০ সালে 'অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন'র পক্ষ থেকে Award of Honour সম্মান দেওয়া হয়।

২. ১৯৯৫ সালে পুরুলিয়ার 'মানভূম দলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি'-র পক্ষ থেকে সমাজ সেবার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৩. ১৯৯৫ সালে ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৪. ১৯৯৬ সালে বাঁকুড়া জেলার 'খাতড়া আদিবাসী কালচার‍্যাল এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, 'হিউম্যান রিসার্চ ব্যুরো' এর পক্ষ থেকে সাম্মানিক শিরোপা দেওয়া হয়।

৫. ২০০০ সালে 'অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি ভাষা মোর্চা'র পক্ষ থেকে সাম্মানিক শিরোপা দেওয়া হয়।

৬. ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৭. ২০০৬ সালে ASECA-এর পক্ষ থেকে সম্মানসূচক শিরোপা দেওয়া হয়।

গোমস্তা প্রসাদ সরেন সাঁওতালি সাহিত্যে কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। তিনি মূলত ষাট দশক থেকে সাঁওতালি সাহিত্যে লেখালেখি শুরু করেছিলেন কিন্তু লেখক হিসেবে সত্তর দশকে পূর্ণ পরিচয় পান। এই মহান ব্যক্তি ২০২৩ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে মারা যান।

গোমস্তা প্রসাদ সরেনের সাথে সাক্ষাৎকার

তারিখ: ১৫.২.২০২৩, বুধবার।

স্থান: খেরওয়ালডি। সময়: বেলা ২.৪০ মিনিট।

বিন্দেশ্বর: নমস্কার!

আমার গবেষণার বিষয় হল- 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। আপনি একজন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের সম্মানীয় লেখক। আপনার কোন্ কোন্ লেখায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে?

গোমস্তা প্রসাদ: নমস্কার!

রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। যেখানে রাঢ়ের সামাজিক সাংস্কৃতির পরিচয় আজও বহমান। আমার *আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, ঝাড়খন্ড কেন চাই?, ঝাড়খণ্ডীরা বিক্ষুব্ধ কেন?, ঝাড়খণ্ডের আওয়াজ ধ্বনিত হল রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে, বাঁচার দুরন্ত সংরাম-ঝড়খন্ড আন্দোলন, উন্নয়ন প্রকল্পগুলি শুধু সাইনবোর্ডেই শোভা পায়, প্রসঙ্গত ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সেচমন্ত্রীর বান্দোয়ান সফর, কেন মধ্যবর্তী নির্বাচন?, আদিবাসীদেরই তো ভগবান, জনগণের কাছে আবেদন ঠগীরা যত ফন্দিই করুক-আর যেন ভুলবেন না, উন্নয়ন? না বঞ্চনা?, আদিবাসীরা হিন্দু নয়, আগড়ম-বাগড়ম, বান্দোয়ান থেকে বলছি, অবহেলিত শবর জাতি ও এক মুক্তি সংগ্রামের কথা, সাঁওতাল ও সাঁওতালি ভাষা সম্পর্কে, ফিরে দেখা, হাবিজাবি, অছিলায় নিধন যজ্ঞ, অলচিকি বাতিল-বাংলা রোমান লিপি দাবীর-প্রতিবাদ ও SARBHATUG* প্রবন্ধ সংকলন প্রভৃতি গ্রন্থে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবন খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমার বেশিরভাগ বইয়েই তো পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের উপরে লেখা।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার কাহিনি বলবেন!

গোমস্তা প্রসাদ: আদিবাসী সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ডাইনি নামক অন্ধবিশ্বাস, নানারকম কুসংস্কার, শোষণ ও বঞ্চনা দেখে আমি প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার পিছনে কে বা কারা কিভাবে সাহায্য করেছিল?

গোমস্তা প্রসাদ: সারদা প্রসাদ কিস্কু লেখক হয়ে ওঠার পিছনে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রথম লেখা— কবিতা না গল্প দিয়ে?

গোমস্তা প্রসাদ: আমি প্রথম কবিতা আর প্রবন্ধ দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: সাহিত্যে চর্চায় কে আপনাকে প্রভাবিত করেছিল?

গোমস্তা প্রসাদ: সাহিত্যে চর্চায় আমাকে কেউ প্রভাবিত করে নি। আদিবাসী সমাজ জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি দেখে আমাকে একসময় কলম ধরতে হয়েছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে বলবেন!

গোমস্তা প্রসাদ: ১৯৬১ সালে মধুপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলাম, এরপর শিরীষগোড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলে চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি।

বিন্দেশ্বর: আপনি স্কুলে কতদিন চাকরি করেছেন?

গোমস্তা প্রসাদ: আমি প্রাথমিক স্কুলে (১৯৬১-২০০৩) ৪২ বছর চাকরি করেছি।

বিন্দেশ্বর: লেখক জীবনের বাইরে আপনার সমাজসেবী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে আলাদা পরিচয় আছে- তা আপনার জীবনে কিভাবে কাজ করে?

গোমস্তা প্রসাদ: আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি তখন থেকেই কমবেশি সমাজ সংস্কারক হিসেবে কাজ করেছি। বিশেষ করে সারদা প্রসাদ কিস্কুর অনুপ্রেণায় আমার সমাজ সংস্কারের কাজের প্রথম হাত খড়ি হয়। প্রথমে গানের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিজেদের অধিকার ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলাম।

বিন্দেশ্বর: সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আপনি কলম ধরেছিলেনন!

গোমস্তা প্রসাদ: হ্যাঁ, সাঁওতাল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আমি কলম ধরেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে তো সংখ্যা গরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের বাস। তাদের জন্য আপনার ভাবনাটি যদি বিবৃত করেন!

গোমস্তা প্রসাদ: পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনা কাল থেকে বিবর্তনবাদ ধারায় যে মানব কুল সৃষ্টি হয়েছে- তারা হল আদিম জাতি। পরবর্তীতে আদি মানব(আদিম জাতি) খেরওয়াল, আদিবাসী, পাহাড়িয়া, বনবাসী, জঙ্গলী, অসভ্য, বর্বর, দানব, বানর ও রাক্ষস নামে অভিহিত হয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়রা বনে বাস করেও তারা বনবাসী নয়। অবশ্য আদিবাসীরা প্রথম বন কেটে মানুষ বসবাসের উপযোগী জায়গা তৈরি করেছিল। সাঁওতালরা ভারতের মূলবাসী, পরে বহিরাগতরা এদের

সঙ্গে মিশেছে। আমরা ইতিহাসে পড়েছি আর্য আগমনের কথা, আর্য-অনার্যের লড়াইয়ের কথা। অনার্যরাই হল ভারতের মূলবাসী। এরা প্রকৃতিকে পূজা করত, ধর্মের নাম 'সারিধরম' ছিল। সাঁওতালি পুরাণ মতে আদি মানব প্রথম হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে বসবাস করে। তাদের সঙ্গীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে 'হারতা', 'সাসাংবেডা', 'জারপি দেশে', 'আইরেদেশে', 'কঁয়ডা', 'চায় দেশে', ও 'চাম্পা দেশে বসবাস করতে শুরু করে। এই আদি মানবরা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে তাদেরকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। পরে অবশ্য তারা সমস্তরকম বাধা বিঘ্নকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

'আদিবাসীরা হিন্দু নয়' নামে এক প্রতিবেদক প্রতিবেদনের প্রচার পত্র বিলি করে। প্রচার পত্র পড়ে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন- 'তাহলে আপনারা কী?' 'আমরা হড়'। প্রতিবেদক জানায়, 'সাঁওতালী ভাষায়' হড় শব্দের অর্থ মানুষ। 'হড়' ধর্ম মানে মানব ধর্ম। তথাকথিত সমাজের সভ্য মানুষরা আদিবাসীদেরকে নীচ অসভ্য বর্বর বলে মানুষকে হত্যা করেছে। এর নজির সারা বিশ্বে জুড়ে দেখা যায়। বর্তমানে আদিবাসী সাঁওতালরা নিজেদের সংস্কৃতি থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সংস্কৃতি হারানো মানেই একটা জাতির মৃত্যু। আমরা জানি সংস্কৃতি জাতির পরিচয়। সংস্কৃতি ধ্বংস হলে একটি জাতির অবলুপ্তি অনিবার্য। বর্তমানে সাঁওতালদের সংস্কৃতির দুটি ভাগ রয়েছে- ১. গ্রাম্য সংস্কৃতি ২. শহুরে সংস্কৃতি। গ্রামেই হল তাদের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

বিন্দেশ্বর: সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে কার সাহিত্য আপনাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল?

গোমস্তা প্রসাদ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সারদা প্রসাদ কিস্কু, ডমন সাহু ও ডমন হাঁসদা প্রভৃতি লেখকদের লেখা আমাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার সমসাময়িক ও উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?

গোমস্তা প্রসাদ: আমার সমসাময়িক ভবতোষ সরেন, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ও আমার উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে মহাদেব হাঁসদা ও অরুণ কুমার সরেন এর লেখা ভালো লাগে।

বিন্দেশ্বর: যে লেখাটা এখনও না লেখার জন্য আপনাকে কষ্ট দেয়- সেরকম যদি কিছু থাকে তাহলে সংক্ষিপ্ত আকারে বলবেন!

গোমস্তা প্রসাদ: *জুমিদ আড়াং, হয় জিউয়ি হাসা হড়মঃ* বই দুটি লিখতে পারিনি বলে ব্যক্তিগতভাবে খুব দুঃখ অনুভব করি।

বিন্দেশ্বর: আপনার পুরস্কার পেতে কেমন লাগে?

গোমস্তা প্রসাদ: পুরস্কার পেতে আমি পছন্দ করি না। আমার বই পড়ে সমাজের মানুষ সচেতন হোক, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

গোমস্তা প্রসাদ: পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে, তা আমি পছন্দ করি না। পুরস্কারে আমি বিশ্বাসী নই।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

গোমস্তা প্রসাদ: এখন আমার কাছে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বলে কিছু নেই, সমাজের কাছ থেকে আমি অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি।

বিন্দেশ্বর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। নমস্কার!

গোমস্তা প্রসাদ: নমস্কার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত

সাঁওতাল সাহিত্যিক গোমস্তা প্রসাদ সরেন ও গবেষক বিন্দেশ্বর টুডু

স্থান: খেরওয়ালডি, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, (প.ব)

তারিখ: ১৫.২.২০২৩.

দূরবিন সরেন (১৯৪৪):

বীরভূম জেলার বাঁজপাড়া গ্রামে দূরবীন সরেন (১৯৪৪ ৩ই মে) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায় নি। ১৯৭১ সালে বি.এ পাশ করার পর তিনি আর্থিক সঙ্কটের কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। 'ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া' বিভাগে চাকরির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কলকাতায় থাকাকালীন ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ও দিলীপ সরেন এর মত প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সাহিত্যে চর্চার আসরে পরিচিত হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রতি একটা টান অনুভব করছিল। পরবর্তীকালে সেই অনুভবে তাঁকে সাহিত্যে রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। দূরবীন সরেন মূলত ছোটগল্প লেখক হলেও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে ক্ষতিকারক দিকগুলি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণার বিস্তৃত পটভূমিকায় সাঁওতালদের জীবন-জীবিকা, প্রেম-ভালোবাসা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ ছোটগল্পগুলিতে তাঁর প্রকাশভঙ্গির মধ্যে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। *পেড়াহড়, হড়সম্বাদ, যুগসিরিজল, পছিমবাংলা* ও *তেতরে* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন, ১৯৭১ সাল থেকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *আয়ুরিচ* (অগ্রগামী), ১৯৮৬ সাল থেকে ষাণ্মাসিক *সমাজ সুসৌর* (সমাজ সংস্কার), এবং ১৯৯৬ সাল থেকে *মার্শাল বাতি* (আলোক বাতি) নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দূরবীন সরেনের কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. *জুডৌসি কাহিনীমালা* (১৯৮১) শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প সংকলন।

২. *সাঁওতাল সংস্কৃতি,* প্রকাশকাল জানা যায়নি।

৩. *দিলগৌরিয়া সেরেঞ দুরৌং* (হৃদয়মথিত গান), প্রকাশকাল জানা যায়নি, গানের সংকলন।

৪. *সান্তালি পারসি দ অকা সেৎ* (সাঁওতালি ভাষা কোন পথে), প্রকাশসাল জানা যায়নি।

৫. *পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সাঁওতালী ভাষী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নির্দেশিকা পুস্তক প্রসঙ্গে* (১৯৮১)।

দূরবীন সরেন সাঁওতালি ভাষা সাহিত্য বিকাশের লক্ষ্যে তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করে সাঁওতাল সমাজকে এক নতুন আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় যেমন ভাষা-সাহিত্যে বিকাশ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে, ঠিক তেমনই তাঁর ছোটগল্প ও প্রবন্ধে সামাজিক সংস্কারের বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

মহাদেব হাঁসদা(১৯৫০)

পুরুলিয়া জেলা বান্দোয়ান থানার কায়রা গ্রামে মহাদেব হাঁসদা (১৯৫০,২০ জুন) জন্ম গ্রহণ করেন। মহাদেব হাঁসদা শিক্ষতার মধ্যে দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ছোটবেলা থেকে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা, সহজাত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য চর্চার পথকে অনেকটা প্রশস্ত করেছিল। অন্যতম সাঁওতালি সাহিত্যের পথ প্রদর্শক সারদা প্রসাদ কিস্কুর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথম সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। এছাড়া তিনি পরে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী, নিরঞ্জন হালদার, ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক ও ড. ডমন সাহু প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ পেয়েছিলেন। সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের উদ্দেশ্য দাঁড়িকাডোবা গ্রামে 'সুসৌর গাঁওতা' নামে এক সংস্থা গঠন করা হয়। মহাদেব হাঁসদা এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। সংস্থার উদ্যোগে ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের উদ্দেশ্য একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে *সুসৌর গাঁওতা* পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে *তেতরে* নাম রাখা হয় এবং ত্রৈমাসিক থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। মহাদেব হাঁসদা তাঁর মেধা ও মননশীল সম্পাদনার গুণে *তেতরে* পত্রিকা সাঁওতালি সাহিত্যের জগতে একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। এছাড়াও তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আদিবাসী সংবাদ' ও 'আদিবসী বার্তা' খবর কাগজে সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। মহাদেব হাঁসদা মূলত সম্পাদক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রেও রচনাশৈলীর এক নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বলিষ্ঠ গদ্যে ক্ষুরধার সম্পাদকীয় রচনা ছাড়াও কবিতা ও গল্প রচনাতেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বিষয় নির্বাচন, কাঠামো নির্মাণ ও ছন্দের উপযুক্ত ব্যবহারে সারদা প্রসাদ কিস্কুর প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তাঁর ছোটগল্পে বিষয় করে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। *হড় সম্বাদ, পছিমবাংলা, তেতরে, জিরিহিরি* ও *সিলি* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পাদনার কাজও করেছেন, যেমন- কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর *লাহাঃ হর রে* গল্পগ্রন্থ *সলম লটম* এবং জাগরণ সরেন (১৯৪২-১৯৮৪)'র *এভেন* (জাগরণ) কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। সাঁওতালি সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য বহু সম্মান পেয়েছেন।

১. **১৯৮৮** সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২. **১৯৯৩** সালে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সান্তালি অনৌলিয়া আর কারগিল বাইসি-র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৩. **১৯৯৫** সালে লেখক ও সম্পাদক রূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার (তফশিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ) থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আশির দশকে সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডাইনি বিরোধী আন্দোলনে মহাদেব হাঁসদা প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কারের মহান ব্রত নিয়ে সব সময় সারদা প্রসাদ কিস্কুর পাশে থাকতেন।

মহাদেব হাঁসদার সাথে সাক্ষাৎকার

তারিখ: ১৭.২.২০২৩।

স্থান: বান্দোয়ান। সময়: দুপুর ১২ টা ৩০।

বিন্দেশ্বর: নমস্কার!
আমার গবেষণার বিষয় হল- 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। আপনি একজন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের সম্মানীয় লেখক। আপনার কোন্ কোন্ লেখায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে?

মহাদেব: নমস্কার! আমার ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও গানের মাধ্যমে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন 'মাঝিয়া গজ তায়ম' (ডাইনি নামক অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গল্পটি লেখা হয়েছে)।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার পিছনে কে বা কারা কিভাবে সাহায্য করেছিল?

মহাদেব: আমাকে লেখক হয়ে ওঠার পিছনে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু ও গোমস্তা প্রসাদ সরেন দুজনে সাহায্য করেছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৬৫ সাল নাগাদ, আমি তখন নবম শ্রেণিতে পড়েছি। সেই অল্প বয়স থেকে আমি সাঁওতালদের বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করেছি, কবি, লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনেছি, যেমন সারদা প্রসাদ কিস্কু'র গান 'পারসি দেবন যতন হারায়' অর্থাৎ মাতৃভাষা চর্চা করতে হবে।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রথম লেখা- কবিতা না গল্প দিয়ে?

মহাদেব: আমি প্রথম কবিতা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। তৎকালীন বিহার থেকে প্রকাশিত *'হড় সম্বাদ'* পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে আমার প্রথম 'গিদৌরাওয়াগ কুকলি' (ছেলের প্রশ্ন) নামে একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করি।

বিন্দেশ্বর: সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চায় প্রথম কে আপনাকে প্রভাবিত করেছিল?

মহাদেব: সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চায় আমাকে প্রথম সারদা প্রসাদ কিস্কু ও গোমস্তা প্রসাদ সরেন প্রভাবিত করেছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে বলবেন!

মহাদেব: আমি দীর্ঘ ৩৮ বছর প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। এছাড়াও চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর ১০ বছর ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলে অতিথি শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেছি।

বিন্দেশ্বর: লেখক জীবনের বাইরে আপনার সমাজসেবী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে আলাদা পরিচয় আছে- তা আপনার জীবনে কিভাবে কাজ করে?

মহাদেব: আমি লেখালেখির পাশাপাশি নাচ গানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম। সাঁওতালি যাত্রা পালায় প্রথম দিকে পুরুষরা মেয়ের অভিনয় করত। আমার বন্ধু যদুনাথ টুডু কলকাতায় ‘কলকাতা খেরওয়াল অপেরা’ নামে একটা নাট্য সংস্থা গঠন করেন। তিনি প্রথম মেয়েদেরকে সাঁওতালি যাত্রা পালায় অভিনয় জগতে নিয়ে এসেছিলেন। আমি যদুনাথ টুডু’র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭৯ সাল নাগাদ ‘চাপা কিয়ৌ’ ক্লাবের উদ্যোগে মেয়েদেরকে যাত্রা পালার অভিনয় জগতে প্রথম নিয়ে এসেছিলাম। এর আগে বাংলা বিহার ও ওড়িশা কোথাও মেয়েদেরকে যাত্রা পালার অভিনয় জগতে আনত না। এ কাজের জন্য আমাকে একসময় নানারকম অপবাদ শুনতে হয়েছিল। তবুও আমরা গ্রামে গ্রামে সমাজ সচেতন মূলক একাঙ্ক নাটক প্রদর্শন করতে শুরু করি। রূপচাদ হেমব্রম এর ‘সুমি’ নামক ছোটগল্পের ডাইনি কুসংস্কারের প্লটকে নাটকে ব্যবহার করে সমাজের বহু মানুষকে কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন করতে পেরেছিলাম। এছাড়া নাটকের মাধ্যমে গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের ডাইরিয়া হলে কিভাবে নুন চিনির সরবত(O.R.S) খাওয়াতে হয়। এভাবে আমি একসময় নাটকের মাধ্যমে সমাজের অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষদেরকে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বিন্দেশ্বর: সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আপনি কলম ধরেছিলেন?

মহাদেব: হ্যাঁ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আমি প্রথম কলম ধরেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে তো সংখ্যাগরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের বাস। তাদের জন্য আপনার ভাবনাটি যদি বিবৃত করেন!

মহাদেব: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে শুধু সাঁওতালদের বসবাস সেটা নয়,তবে হ্যাঁ বলা যায় সাঁওতাল মুণ্ডা, হো, মাহলি, শবর, ও খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের

মানুষের বসবাসের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের তুলনায় সাঁওতালরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হিসেবে বসবাস করে। আমি একজন সাঁওতাল সম্প্রদায়, আমার মাতৃভাষা সাঁওতালি, তাই সাঁওতালদের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে বেশি লিখেছি। এছাড়াও আমি অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে লিখেছি কিন্তু সেগুলির সংখ্যা খুবই কম। যেমন- আদিবাসী বিরহড় সম্প্রদায়দের সমাজ জীবন নিয়ে লিখেছি। আদিবসীদের যে বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ নয়, বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে সংগঠিত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে উলগুলান ও ভূমিজ বিদ্রোহের উপরেও আমার লেখা আছে। সাঁওতালদের নিয়ে লেখা বেশি রয়েছে।

বিন্দেশ্বর: সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কার সাহিত্য আপনাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল?

মহাদেব: সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮-১৯৭১), বিমল মিত্র(১৯১২-১৯৯১) ও মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬)- এর লেখা আমাকে খুব ভালো লাগত। এছাড়াও সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আরো অনেকে রয়েছেন।

বিন্দেশ্বর: আপনার সমসাময়িক ও উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?

মহাদেব: আমার সমসাময়িক সাঁওতাল সাহিত্যিকরা হলেন- দূরবীন সরেন, রূপচাঁদ হেমব্রম, সারদা প্রসাদ কিস্কু, ও পরিমল হেমব্রম প্রভৃতি লেখকদের ছোটগল্পগুলি বস্তবধর্মী ও মননশীল হয়। উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকরা হলেন, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, মানিক চাঁদ হাঁসদা, সুব্রত বাস্কে, লক্ষীনারায়ণ হাঁসদা, গৌউর মুর্মু, বালীশ্বর সরেন ও শিবু সরেন প্রভৃতি লেখকদের ছোটগল্পগুলি আমার ভালো লাগে।

বিন্দেশ্বর: যে লেখাটা এখনও না লেখার জন্য আপনাকে কষ্ট দেয়- সেরকম যদি কিছু থাকে তাহলে বলবেন!

মহাদেব: সেটা তো আমার সব সময় থাকেই। গতানুগতিকভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমার গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবুও কিছু লেখা বাদ পড়ে যায় বলে মনে হয়। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আদিবাসীদের ভূমিকা, যেমন-

আদিবাসীদের ‘হুল’(ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস)- এর ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়েছে। সাঁওতাল ‘হুল’ দীর্ঘ আট মাস ধরে চলেছিল। আদিবাসী সাঁওতালদের ‘হুল’ (বিদ্রোহ)কে দমন করার উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকার ‘মার্শাল ল’ জারি করে, দীর্ঘ সময় ধরে এক নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। বিদ্রোহে সামিল হতে গিয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল মারা গেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক তিলকা মাঝির বীরত্বের কাহিনি আজও অজানায় রয়েছে। অর্থাৎ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আদিবাসী সাঁওতাল শহীদদের বীরত্বের কাহিনির বিবরণ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক কাগজে কিংবা সমাচারপত্রে সাঁওতাল বিদ্রোকে নানা নামে(যেমন- হাঙ্গামা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দস্যু, তস্কর) আখ্যা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সান্তাল পরগণা, ভাগলপুর, মানভূম ও বীরভূমের ‘ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার’, ‘জুডিশিয়াল প্রসেডিংস’ থেকে প্রতিনিয়ত নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। আমাদের এখনও অনেক তথ্য জানা বাকি রয়েছে। সেই সব বিষয় নিয়ে তো লেখা যেতেই পারে। সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু একেবারে নির্ভুল নয়। আমার কয়েকটা প্রবন্ধে সেই ভুল গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আজও বই আকারে লিখতে পারিনি। এগুলো আমাকে মাঝে মাঝে খুবই কষ্ট দেয়।

বিন্দেশ্বর: আপনার পুরস্কার পেতে কেমন লাগে?

মহাদেব: পুরস্কার পেতে আমার ভালো লাগে। সরকারি ও বেসরকারি অনেক পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার পাওয়া না পাওয়া আমার মনে দাগ কাটে না। বর্তমানে রাজনৈতিক স্বজন পোষণের কারণে যোগ্য সাহিত্যিকরাও পুরস্কার পান না। তাছাড়া আমি পুরস্কারের আশায় তো বই লিখি না।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

মহাদেব: পুরুলিয়া জেলার ‘সাহেদ মাডের’-এ ১১ বছর সেক্রেটারি, ও ‘অল ইণ্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স অ্যাসোশিয়েশন’-এ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপদেষ্টা হিসেবে একটানা ২৩ বছর ছিলাম। সাঁওতাল কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের দাবি নিয়ে রাজ্যে সরকারকে একাধিকবার লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছি। অবশেষে ১৯৮৯ সালে রাজ্যে সরকার ‘গুণীজন সম্বর্ধনা’ নামে

পুরস্কার দেওয়া শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে সাহিত্যে-শিল্প- সংস্কৃতির বিভাগ অনুযায়ী পুরস্কারের নাম আলাদা আলাদা রাখা হয় যেমন-

১. সাধুরামচাঁদ স্মৃতি পুরস্কার সাহিত্যের জন্য দেওয়া হয়।

২. পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি পুরস্কার চারুকারু শিল্পের জন্য দেওয়া হয়।

৩. লাল শুক্রা স্মৃতি পুরস্কার সঙ্গীতে দেওয়া হয়।

৩. সিধু-কানহু স্মৃতি পুরস্কার।

৪. বীরসা মুণ্ডা স্মৃতি পুরস্কার।

৫. জয়পাল সিং মুণ্ডা স্মৃতি পুরস্কার ক্রীড়াক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি অ্যাকাডেমি'র কাছে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু স্মৃতি পুরস্কার চালুর জন্য আমাদের দাবি ছিল। শেষ পর্যন্ত কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু স্মৃতি পুরস্কার চালু হলেও, তবে তা বর্তমানে অনিয়মিত। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন পুরস্কারগুলো যাতে নিয়মিতভাবে দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের উদ্দেশ্যই হল স্মৃতি রক্ষার্থে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরকে সম্মান দেওয়া। অনেক সময় রাজনৈতিক স্বজন পোষণের কারণে অযোগ্য ব্যক্তিরা পুরস্কার পায়। উপযুক্ত কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা পুরস্কারের সম্মান পেলে ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশি হব।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মহাদেব: আমার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বলতে কিছু নেই। সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকে আমি প্রচুর সম্মান পেয়েছি।

বিন্দেশ্বর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। নমস্কার!

মহাদেব: নমস্কার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত

সাঁওতাল সাহিত্যিক মহাদেব হাঁসদা ও গবেষক বিন্দেশ্বর টুডু

স্থান: বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, (প.ব)।

তারিখ: ১৭.২.২০২৩.

কলেন্দ্রনাথ মান্ডি (১৯৫৩):

পুরুলিয়া জেলা বান্দোয়ান থানার ভাঙ্গাডি গ্রামে কলেন্দ্রনাথ মান্ডি (১৯৫৩, ৪ঠা জুলাই) জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে ভারতীয় রেলের একাউন্টস বিভাগে চাকরির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু, গোমস্তা প্রসাদ সরেন ও মহাদেব হাঁসদা প্রমুখের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সাঁওতালি সাহিত্যে জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলিতে সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধে তাঁর স্বচ্ছন্দে যাতায়ত ছিল। কলেন্দ্রনাথ মান্ডির কাব্যগ্রন্থগুলি হল—

১. *আরসি* (১৯৯৪), গল্প সংকলন।

২. *সমাজ অকাম ইদিঞ* (২০০২), সমাজ কোথায় নিয়ে যাবে আমায় নাটক।

৩. *মিৎ থপে অনড়হেঁ* (২০০২), একগুচ্ছ কবিতা।

সাঁওতালি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন—

১. ১৯৯৩ সালে হড় আড়াং পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২. ২০০০ সালে দুর্গাপুরের ‘আঁকরি গাঁওতা’ পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৩. ২০০৩ সালে সাধনা পত্রিকা সাহিত্যে গোষ্ঠী, পুরুলিয়া থেকে বংশিধর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

কলেন্দ্রনাথ মান্ডি সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যে বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৮১ সাল থেকে *সিলি* নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সাঁওতালি পত্র-পত্রিকার জগতে *সিলি* পত্রিকা নতুন পথের দিশারী। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় যেমন ভাষা-সাহিত্যে বিকাশ মননশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে, তেমনই সামাজিক সংস্কারের বিষয়কেও তুলে ধরেন।

কলেন্দ্রনাথ মান্ডির সাথে সাক্ষাৎকার

তারিখ: ১৭.২.২০২৩

স্থান: বান্দোয়ান   সময়: বিকাল ৩ টা ১৩ মিনিট।

বিন্দেশ্বর: নমস্কার!

আমার গবেষণার বিষয় হল- ‘নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি’। আপনি একজন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের সম্মানীয় লেখক। আপনার কোন্ কোন্ লেখায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে?

কলেন্দ্রনাথ: নমস্কার! আমার জন্ম পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলেই! পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান থানায়। আমার *সিঁদুর সাকাম, বে-টওয়া, কুহড়ৌ, সেমসাইড, ঞাপাম-রুওয়ৌড়, লগনি, সাম্‌কাসাটি, শুলুক, রেঁগেচ্‌, কারিনাগিন, সাঁগাত্‌, মুলুঃ চাঁদো, বানাম সাড়ে গুহুড়*

গুঁহুড় গল্পগুলিতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের বাস্তব সমাজজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল প্রসঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা যদি বলেন!

কলেন্দ্রনাথ: পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাগুলো পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার কাহিনি বলবেন!

কলেন্দ্রনাথ: আদিবাসী সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ডাইনি নামক অন্ধবিশ্বাস দেখে আমি প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার পিছনে কে বা কারা কিভাবে সাহায্য করেছিল?

কলেন্দ্রনাথ: সারদা প্রসাদ কিস্কু, গোমস্তা প্রসাদ সরেন তাদের সান্নিধ্যে এসে আমার প্রথম লেখা শুরু হয়।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রথম লেখা- কবিতা না গল্প দিয়ে?

কলেন্দ্রনাথ: আমি প্রথম গল্প আর প্রবন্ধ দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চায় প্রথম কে আপনাকে প্রভাবিত করেছিল?

কলেন্দ্রনাথ: আমি সারদা প্রসাদ কিস্কু, নারায়ণ সরেন ও গোমস্তা প্রসাদ সরেন এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও আদিবাসী সমাজ জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি দেখেই আমাকে একসময় কলম ধরতে হয়েছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে বলবেন!

কলেন্দ্রনাথ: প্রথমে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেছি, পরে অবশ্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেলের অ্যাকাউন্ট বিভাগে দীর্ঘদিন চাকরি করেছি।

বিন্দেশ্বর: লেখক জীবনের বাইরে আপনার সমাজসেবী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে আলাদা পরিচয় আছে- তা আপনার জীবনে কিভাবে কাজ করে?

কলেন্দ্রনাথ: আমি যে সমাজ সংস্কারক কিনা তা বলতে পারব না। আদিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে বিশেষ করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়, লোধা, শবর প্রভৃতি জনজাতির দৈনন্দিন জীবনে নানারকম সমস্যা যেমন 'ডাইনি' নামক অন্ধবিশ্বাস। 'ডাইনি' আছে একথা আমি কোনো দিনই বলব না, এটা তাদের অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। এই সব সমস্যা সমাধানের পথই হল আমার ছোটগল্পের মূল বিষয়।

বিন্দেশ্বর: সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আপনি কলম ধরেছিলেনন!

কলেন্দ্রনাথ: হ্যাঁ, সাঁওতাল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আমি কলম ধরেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে তো সংখ্যা গরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের বাস। তাদের জন্য আপনার ভাবনাটি যদি বিবৃত করেন!

কলেন্দ্রনাথ: আমার বেশিরভাগ ছোটগল্পই পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলিতেও একই কথায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আমার সম্পাদিত *সিলি* পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ ছোটগল্প ও প্রবন্ধগুলি পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানারকম সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত।

বিন্দেশ্বর: সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কার সাহিত্য আপনাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল?

কলেন্দ্রনাথ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি লেখকদের লেখা আমাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার সমসাময়িক ও উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?

কলেন্দ্রনাথ: আমার সমসাময়িক সারদা প্রসাদ কিস্কু (খেরওয়াল বৌসিয়া), ঠাকুর প্রসাদ মুর্মু, গোউর মুর্মু, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, গোমস্তা প্রসাদ সরেন, মহাদেব হাঁসদা ও আমার উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে অরুণ কুমার সরেন এর লেখা খুব ভালো লাগে।

বিন্দেশ্বর: যে লেখাটা এখনও না লেখার জন্য আপনাকে কষ্ট দেয়— সেই রকম যদি কিছু থাকে তাহলে সংক্ষিপ্ত আকারে বলবেন!

কলেন্দ্রনাথ: সমাজের কিছু বাস্তব চিত্র এখনও আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমার লেখা একটি নাটক হল *সমাজ অকাম ইদিঞা* (বঙ্গানুবাদ সমাজ কোথায় নিয়ে যাও?)। নাটকটিতে আমার ব্যক্তিজীবনের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজের কিছু ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়েছে। গ্রামের মোড়লরা শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরকে ক্ষমতার দম্ভে সবসময় দমিয়ে রাখতে চায়। আমার জীবনেও এক সময় একই ঘটনা ঘটেছিল। একসময় 'ডাইনি' নামক অন্ধবিশ্বাস আমাকে কষ্ট দিয়েছিল। 'ডাইনি' নামক অন্ধবিশ্বাস যে আদিবাসী সমাজ থেকে একেবারে নির্মূল হয়ে

গেছে তা বলব না। প্রতিদিনের খবরের কাগজে তার প্রমাণ দেয়। এটা আমাকে খুব ব্যথিত করে।

বিন্দেশ্বর: আপনার পুরস্কার পেতে কেমন লাগে?

কলেন্দ্রনাথ: পুরস্কার ব্যাপারটা কি আর বলব! পুরস্কারের জন্য তো আমি লেখালেখি করি না। আগে অন্ধবিশ্বাসে নিমগ্ন সমাজকে টেনে তুলে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার মধ্যে যদি পুরস্কার পাওয়া যায় তো ভাল! তাছাড়া পুরস্কার পেতে কার না ভালো লাগে! আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনেক পুরস্কার পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হল জনসাধারণের কাছ থেকে আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছি।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

কলেন্দ্রনাথ: পশ্চিমবঙ্গে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে সে সম্পর্কে বললে একটু খারাপ জিনিস বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমরা সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে পুরুলিয়াতে একটা 'সাঁওতালি সাহিত্য পরিষদ' সংস্থা গঠন করেছিলাম। সেই সময়কার সাহিত্যিকদেরকে তাদের সাহিত্য কর্মের জন্য সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হত। ১৯৮৩ সালে বিহারের প্রখ্যাত সাঁওতাল সাহিত্যিক নারায়ণ সরেনকে সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, পুরস্কার! কিসের জন্য পুরস্কার? আমি সাঁওতাল সমাজ নিয়ে লিখেছি বলে পুরস্কার! আমার লেখা কি সাঁওতাল সমাজের লোক পড়ে? আবেগে তিনি মঞ্চে কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি পুরস্কারের জন্য কোনো দিন লিখিনি! পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২০০৪ সালে 'সাঁওতালি অ্যাকাডেমি' সংস্থা গঠিত হয়েছিল। প্রথম থেকে আমি তার সদস্য ছিলাম। সংস্থা থেকে সাঁওতাল সাহিত্যিকদেরকে পুরস্কার দেওয়া হত। তবে বেশ কয়েক বছর হল পুরস্কার দেওয়া আপাতত বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে লক্ষ্য করেছি লেখকরা পুরস্কারের জন্য লালায়িত। অনেকে আবার ২-৩টি করে পুরস্কার পেয়েছেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

বিন্দেশ্বর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। নমস্কার।

কলেন্দ্রনাথ: নমস্কার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত

সাঁওতাল সাহিত্যিক কলেন্দ্রনাথ মান্ডি ও গবেষক বিন্দেশ্বর টুডু

স্থান: বান্দোয়ান, পুরুলিয়া, (প.ব)

তারিখ: ১৫.২.২০২৩.

পরিমল হেমব্রম (১৯৫৭):

বাঁকুড়া জেলা সারেঙ্গা থানার শাঁকারিয়া গ্রামে পরিমল হেমব্রম (১৯৫৭, ১লা ফেব্রুয়ারি) জন্ম গ্রহণ করেন। পরিমল হেমব্রম এর কর্মজীবনে নানারকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যে, নাটক, ও সিনেমার প্রতি গভীর আসক্তি থাকার কারণে তাঁর কর্মজীবনে বারবার পরিবর্তন এসেছে। স্কুল জীবনে প্রথম সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজে এসে ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের অনুপ্রেরণায় সাঁওতালি ভাষায় লেখা শুরু করেন। গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদ সব শাখাতে তাঁর অবাধ যাতায়ত ছিল। পরিমল হেমব্রম তাঁর প্রথম সাঁওতালি কবিতা ‘ঝারনা গাডা’ *তেতরে* এবং প্রথম গল্প ‘বাহা’ *পছিমবাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও তাদের শোষণ বঞ্চনাকে গল্পের মূল বিষয় করেছেন। গল্পের কাহিনি বিন্যাসে তিনি সম্পুর্ণ আধুনিক। পরবর্তীকালে পরিমল হেমব্রম সাঁওতাল বিষয়ক বহু প্রবন্ধ সাঁওতালি ও বাংলায় লেখেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ও সাঁওতালি বহু বেতার নাটকের প্রযোজনা করেছেন। পরিমল হেমব্রম-এর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *আখড়া* (১৯৮৫), নাট্য সংকলন।
২. *সাঁওতালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়* (১৯৯৫)।
৩. *শতাব্দীর সাঁওতাল সম্প্রদায়* (২০০০)।
৪. *রেডিও গায়ান* (২০০০), বেতার নাটক।
৫. *ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (২০০১)।
৬. *জীয়ন* (২০০২), জীবন, নির্বাচিত সাঁওতালি কবিতা ও বাংলা অনুবাদ)।
৭. *সাঁওতাল লোককথা* (২০০২)।
৮. *সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে* (২০০৫)।

পরিমল হেমব্রম এর ছদ্মনামে লেখা গ্রন্থগুলি হল-

১. *রেঁগেচ* (১৯৮৬), (ক্ষুধা) গল্প সংকলন।
২. *বৌল্টৌ বাঁখেড়* (১৯৮৭), (আবোলতাবোল) গল্প সংকলন।
৩. *আকাল* (১৯৮৮), দুর্ভিক্ষ, বাংলা অনুবাদ সহ সাঁওতালি কবিতা সংকলন।
৪. *মানওয়া হো মানওয়া* (১৯৯৬), (হে মানব) কবিতা সংকলন।
৫. *অনড়হে ঋতম* (২০০৪), কবিতা সমগ্র।

পরিমল হেমব্রম তাঁর সাঁওতালি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৮ সালে *তেতরে’* পুরস্কার এবং ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সারদা প্রসাদ কিস্কু (খেরওয়াল বৌসয়ৌ) (১৯৫৯):

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বেলপাহাড়ী থানার বাঁশপাহড়ী গ্রামে সারদা প্রসাদ কিস্কু (খেরওয়াল বৌসয়ৌ) (১৯৫৯, ১১ই জানুয়ারি) জন্ম গ্রহণ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে তিনি বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি। প্রথমে তিনি ১৯৮৫ সালে টেলিফোন অপারেটিং-এর ট্রেনিং নিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৭ সাল নাগাদ তিনি ভারত সরকারের আয়কর বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। সাঁওতালি সাহিত্য চর্চায় নিজের নামের শেষে 'খেরওয়াল বৌসয়ৌ' শব্দ সংযোজন করে অগ্রজ কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু থেকে নিজেকে আলাদা করেন। 'খেরওয়াল বৌসয়ৌ' গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। কবিতার ক্ষেত্রে 'নিরুপমা মুর্মু' এবং রম্য রচনার ক্ষেত্রে 'ককরমেঁৎ' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ১৯৭৮ সালে হাইস্কুলের স্কুল-ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম কবিতা 'জানাম আয়ো' (জন্মদাত্রী) প্রকাশিত হয়। প্রথমে তিনি কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে গদ্যকেই বেছে নিয়েছিলেন। সাঁওতাল জনজীবন থেকে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে নিজের মননশীল ভাবনায় জারিত করে আধুনিকতায় প্রকাশ করেন। কর্মসূত্রে তিনি প্রতিনিয়ত বাঙালিদের সংস্পর্শে এসে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। অভিজ্ঞতার মূলে শহুরে সাঁওতালরা রয়েছে। এই পটভূমিকাকে সারদা প্রসাদ কিস্কু তাঁর ছোটগল্পে অতি বাস্তব সম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি কাব্যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোমান্টিক মনের পরিচয় দিলেও, গভীর সমাজ চেতনাও ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি, সংলাপ, পটভূমির বর্ণনায় পাঠকদেরকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। এখানেই তিনি অগ্রজদের থেকে স্বতন্ত্র।

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা ছাড়াও তিনি উপন্যাস ও নাটক লেখেন। *হড়সম্বাদ, তেতরে, সিলি* ও *পছিমবাংলা* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি সাঁওতালদের সমাজ সংস্কৃতির সঙ্কটকে প্রকাশ করেছেন। সারদা প্রসাদ কিস্কুর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *খিজলৌও* (১৯৮৩), নাটক।

২. *মঁড়েক তুরুইক* (১৯৯৩), পাঁচ-ছয়জন, গল্প সংকলন।

৩. *সাপাপ্* (১৯৯৮), গল্প সংকলন।

৪. *বরণীয় আদিবাসী চরিতমালা* (২০০২)।

৫. রামদাস টুডু'র *খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি* সাঁওতালি ধর্মগ্রন্থকে ২০০৪ সালে সারদা প্রসাদ কিস্কু ও সুকুমার শিকদার যুগ্মভাবে বাংলায় অনুবাদ করেন।

সাঁওতালি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন-

১. ১৯৮৬ সালে ঝাড়গ্রাম যুব কল্যাণ দপ্তর থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়।

২. ১৯৯১ সালে 'রুসিকা মাডওয়া' নামক উত্তরপাড়া সংস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৩. ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৪. ১৯৯৩ সালে বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে গল্পকার হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৫. ১৯৯৮ সালে সারা ভারত সাঁওতালি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে *সাপাপ্* গল্প গ্রন্থের জন্য শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৬. ২০০৫ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, পূর্ব মহম্মদপুরের 'অভিধা'র পক্ষ থেকে 'ঋষি বঙ্কিম' পুরস্কার দেওয়া হয়।

সারদা প্রসাদ কিস্কু সাঁওতালি সাহিত্যে নতুন দিশার পথ প্রদর্শক। তিনি ভাষা ও সাহিত্যে বিকাশে একজন নিরলস সাধক। ভাষা ও সাহিত্যে নানা বিতর্কের মাঝে উপযুক্ত যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে নিজের জায়গায় অটল রয়েছেন।

সারদা প্রসাদ কিস্কুর সাথে সাক্ষাৎকার

স্থান: আয়ো উমুল, হিহিড়ি পিপিড়ি কসাকেঁদ, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া, (প.ব)।

তারিখ: ১৭.২.২০২৩।   সময়: সকাল ১০.১১ মিনিট।

বিন্দেশ্বর: নমস্কার!

আমার গবেষণার বিষয় হল- 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি'। আপনি একজন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের সম্মানীয় লেখক। আপনার কোন্ কোন্ লেখায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে?

সারদা প্রসাদ: নমস্কার! আমার প্রত্যেকটি ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের দৈন্দিন সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে।

বিন্দেশ্বর: আপনার লেখক হয়ে ওঠার পিছনে কে বা কারা কিভাবে সাহায্য করেছিল?

সারদা প্রসাদ: আমার হাই স্কুলে সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষক মহাশয় শুভেন্দু দাস লেখক হওয়ার পিছনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রথম লেখা- কবিতা না ছোটগল্প দিয়ে?

সারদা প্রসাদ: আমি প্রথম কবিতা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চায় প্রথম কে আপনাকে প্রভাবিত করেছিল?

সারদা প্রসাদ: আমি সাঁওতালি সাহিত্যে চর্চায় সারদা প্রসাদ কিস্কু'র রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম।

বিন্দেশ্বর: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে বলবেন!

সারদা প্রসাদ: আমি দীর্ঘদিন ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে চাকরি করেছি।

বিন্দেশ্বর: লেখক জীবনের বাইরে আপনার সমাজসেবী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে আলাদা পরিচয় আছে- তা আপনার জীবনে কিভাবে কাজ করে?

সারদা প্রসাদ: হ্যাঁ, আমি লেখক জীবনের বাইরেও সমাজসেবী বা সমাজ সংস্কারক হিসেবেও কাজ করেছি। প্রতিনিয়ত আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আদিবাসী গ্রামগুলোতে গিয়ে আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করি। এছাড়াও সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত ডাইনি নামক কুসংস্কার ও ওঝা, গুনীনের ভন্ডামি সম্পর্কেও তাদেরকে সচেতন করেছি।

বিন্দেশ্বর: সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আপনি কলম ধরেছিলেনন?

সারদা প্রসাদ: হ্যাঁ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে আমি প্রথম কলম ধরেছিলাম।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে তো সংখ্যা গরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের বাস। তাদের জন্য আপনার ভাবনাটি যদি বিবৃত করেন!

সারদা প্রসাদ: হ্যাঁ, পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে সংখ্যা গরিষ্ঠ অনগ্রসর সাঁওতালদের বাস। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমানে গ্রামগুলোতে প্রবল রাজনৈতিক দাপটের কারণে তাদের সমাজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

বিন্দেশ্বর: সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কার সাহিত্য আপনাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল?

সারদা প্রসাদ: বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি আমাকে বেশি নাড়া দিয়েছিল।

বিন্দেশ্বর: আপনার সমসাময়িক ও উত্তরকালের সাঁওতাল সাহিত্যিকদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?

সারদা প্রসাদ: আমার সমসাময়িক সাঁওতাল সাহিত্যিকরা হলেন- রূপচাঁদ হেমব্রম, গোমস্তা প্রসাদ সরেন, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, মহাদেব হাঁসদা আর উত্তরকালের পরিমল হেমব্রম প্রভৃতি লেখকদের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি আমার বেশি ভালো লাগে।

বিন্দেশ্বর: যে লেখাটা এখনও না লেখার জন্য আপনাকে কষ্ট দেয়- সেই রকম যদি কিছু থাকে তাহলে সংক্ষিপ্ত আকারে বলবেন!

সারদা প্রসাদ: R.C ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি ছোটগল্প, আজও তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে পারিনি। এর জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখিত!

বিন্দেশ্বর: আপনার পুরস্কার পেতে কেমন লাগে?

সারদা প্রসাদ: পুরস্কার পেতে আমার ভালো লাগে। সরকারি ও বেসরকারির বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছি।

বিন্দেশ্বর: পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যে যে সব পুরস্কার চালু হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

সারদা প্রসাদ: আমি সবসময় সত্যি কথায় বিশ্বাসী। আমার লেখা গুলোতেও একই কথায় পুনরাবৃত্তি হয়। দুঃখের বিষয়! কি আর বলব, পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি সাহিত্যের পুরস্কার সম্পর্কে, রাজনৈতিক স্বজন পোষণের কারণে সাহিত্যের মান অনেকটা খাটো হয়ে গেছে। রাজনৈতিক মানদন্ড দিয়ে সাহিত্যেকে বিচার করা যায় না। পুরস্কার বিচারক মন্ডলীদের কাছে সাহিত্যের বিষয় বড় নয়, ‘অলচিকি’ লিপি’ই তাদের কাছে বড় কথা। এর ফলে উপযুক্ত ব্যক্তিরা পুরস্কার পায় না।

বিন্দেশ্বর: আপনার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

সারদা প্রসাদ: আমি পাঠক সমাজ থেকে প্রচুর মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। আমার কাছে অপ্রাপ্তি বলতে কিছু নেই।

বিন্দেশ্বর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। নমস্কার!

সারদা প্রসাদ: নমস্কার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিশেষ মুহূর্ত
সাঁওতাল সাহিত্যিক সারদা প্রসাদ কিস্কু ও গবেষক বিন্দেশ্বর টুডু
স্থান: আয়ো উমুল, হিহিড়ি পিপিড়ি কসাকেঁদ, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া, (প.ব)।
তারিখ: ১৭.২.২০২৩.

কালিপদ সরেন (১৯৫৭):

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা লালগড় থানার রঘুনাথপুর গ্রামে কালিপদ সরেন (১৯৫৭, ৯ই ডিসেম্বর) জন্ম গ্রহণ করেন। কালিপদ সরেন স্টেট ব্যাঙ্কের কাজের মধ্যে দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। কাপগাড়ী কলেজে পড়ার সময় থেকে তিনি সাহিত্যে চর্চা শুরু করেন। সাঁওতালি সাহিত্যে তিনি 'খেরওয়াল সরেন' ও 'বেঁজাঃ মারা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। সাহিত্যে চর্চার প্রথমিক পর্যায়ে গান, কবিতা ও গল্প লেখেন। পছিমবাংলা পত্রিকায় তাঁর প্রথম 'গুতি' (বাগাল) নামক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। আশির দশকে তিনি অশিক্ষার অন্ধকারে ঘুমন্ত স্বজাতিকে জাগানোর উদ্দেশ্য এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা আনার সংকল্পে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে তিনি মত পালটে যাত্রাপালা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাঁওতাল সমাজের পরিপার্শ্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে কেন্দ্র করে তিনি নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকের মূল বিষয় হল মানুষকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার অদম্য নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কালিপদ সরেন-এর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

১. *খেরওয়াল আড়াং* (১৯৮৯), খেরওয়াল বাণী, কবিতা সংকলন।

২. *খেরওয়াল ক দিশৌ কাতে* (১৯৯২), খেরওয়ালদের কথা ভেবে, গল্প সংকলন।

৩. *সেরেঞ আখড়ারে খেরওয়াল* (১৯৯৪), গানের আখড়ায় খেরওয়াল।

কালিপদ সরেন-এর নাটকগুলি হল-

১. *থারি দাকারে মেঁৎ দাঃ* (প্রকাশকাল জানা যায় নি), ভাতের থালায় চোখের জল।

২. *চেৎ রে চিকৌয়েনা* (২০০৩), কি সে এমন হল।

৩. *সাগুন মার্শাল* (১৯৮২)।

৪. *যাওগে দুলৌড় জিয়ৌড় তাঁহেন মা* (১৯৮৩)।

৫. *সাঁওতা উগৌড়রে হেঁদে বিঞ* (১৯৯০)।

৬. *দুলৌড় ডাহিরে গিদিক মাডরাঃ কান* (১৯৯১)।

৭. *জিউয়ি লঃ কান মেৎদাঃ জরঃ কান* (১৯৯৩)।

এছাড়াও তিনি বহু বেতার নাটক রচনা করেন। যেমন- 'বাহামৌই', 'রাজুদাদা', 'জিৎকার' ও 'অনৌলিয়া' ইত্যাদি। সাঁওতালি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন-

১. ১৯৯২ সালে গল্পকার হিসেবে A.I.S.W.A এর পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

২. ২০০১ সালে নাট্যকার হিসেবে বান্দোয়ান সিধু কানহু এথেলটিক ক্লাব থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

৩. ২০০৩ সালে আদিবাসী প্রেস ক্লাব থেকে সংবর্ধনাদেওয়া হয়।

৪. ২০০৪ সালে A.I.S.W.A এর পক্ষ থেকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

৫. ২০২২ সালে সাঁওতালি সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারত সরকার পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়।

কালিপদ সরেন তাঁর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকে সমাজকে এক নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন।

পশ্চিমরাঢ়ের কয়েজন আদিবাসী সাহিত্যিক ও তাদের রচনাবলীর তালিকা নীচে দেওয়া হল-

সাহিত্যিকের নাম	জন্মস্থান	সাহিত্যকর্ম	সম্পাদিত পত্রিকা	পুরস্কার/সম্মান
১. অমৃত হাঁসদা (১৯৪৫)	ঝাড়গ্রাম জেলা, বুড়িশোল গ্রাম।	১.*ধিরি চাটানী* (১৯৮৩) কবিতা সংকলন, ২.*দুলৌড় সাঁওতা* (১৯৯০), ৩. *দেন স্যে তিরিয়ো* বানাম (১৯৯০) কাব্যগ্রন্থ, ৪. *হারাতরা* (১৯৯১)কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি।		১. A.I.S.W.A-র পক্ষ থেকে ২০০০ সালে Award of Honour দেওয়া হয়।
২. চন্দ্রনাথ মুর্মু (১৯৪৬)	বাঁকুড়া জেলার রাঙ্গামাটি গ্রাম।	১. *সেরেঞ লাছা* (১৯৮২) গানের বই, ২. *বাবা তিলকা* (১৯৮৫) একাঙ্ক নাটক, ৩. *পাসে ধাসুরেন* (১৯৯৩) কাব্য গ্রন্থ ইত্যাদি।		১. ১৯৮৫ সালে পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতি অনুশীলন কেন্দ্র থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়। ২. ১৯৮৯ সালে ঝাড়খণ্ডের মিহিজাম

				সান্তাল সংস্কৃতি সোসাইটি থেকে সম্মানসূচক তাম্রফলক দেওয়া হয়।
৩. রামধন মুর্মু (১৯৪৯)	পুরুলিয়া জেলার বুরুডি গ্রামে।	১. *আয়নম* (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থ, ২. *মোদোরমুলি* (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থ, *আলাকজাড়ি* (১৯৯০) কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি।		১. *আলাকজাড়ি* কাব্যগ্রন্থের জন্য A.I.S.W.A-র পক্ষ থেকে 'Poet of the year 1990' নির্বাচিত করা হয়।
৪. যদুনাথ টুডু (১৯৪৯)	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দোবাটি গ্রাম।	১. *রিঁদি মৌই লদম বাবু* (১৯৭৯) পুরাণ গীতি নাট্য, ২.*নাবালক শিকৌরিয়ৌ* (১৯৮০) নাটোক, ৩. *ইংরেজীরেন সান্তাড়ী গুরু* (১৯৯২) সাঁওতালি ভাষায় ইংরেজী ব্যাকরণ, ৪. *ল-বীর* (২০০৫) নাটক।		
৫. জগন্নাথ সরেন (১৯৫০)	বাঁকুড়া জেলার মধুপুর গ্রামে।	১. *চাচো ডিডি* (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থ, ২. *গায়গম*		১. *দুলি চেতান* কাব্যগ্রন্থের জন্য A.I.S.W.A-র

		(১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থ,৩. *দুলি চেতান* (১৯৯৩) কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি।		পক্ষ থেকে 'Poet of the year 1993' নির্বাচিত করা হয়।
৬. রাবণ বাস্কে (১৯৫১)	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পড়াকানালী গ্রামে।	১. *সেরেঞ বিঁড়ৌ,* ২. *দং ও সহরায়* (২০০২) গানের সংকলন।	*রৌহি* নামক সাঁওতালি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা(২০০০-২০০৩ পর্যন্ত) সম্পাদনা করেন।	
৭. গৌরচন্দ্র মুর্মু (১৯৫৫)	বাঁকুড়া জেলার রাজাডালি গ্রামে।	১. *মার্শাল* (১৯৮০) গানের সংকলন, ২. *সিঁদুর* (১৯৮৬) একাঙ্ক নাটোক, ৩. *সিঁগৌড় আখড়া* (১৯৮৮) গল্প সংকলন, ৪. *বুরু আনচার* (১৯৮৮) নাটক, ৫. *বুডি* (১৯৮৯) নাটক, ৬. *বৌতি* (১৯৯০) নাটক, ৭. *গুতুল খাঃ* (১৯৯০) গানের সংকলন, ৮. *কাহনী থোপে* (১৯৯২) গল্প সংকলন, ৯. *ভাড়া অড়া রে মারাংগ*	১৯৯৩ সালে *সিবিল সাঁদেশ* নামক সাঁওতালি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। (ত্রৈমাসিক)	১. ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২. ২০০১ সালে A.I.S.W.A-র পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ গল্পকারের পুরস্কার দেওয়া হয়।

		(১৯৯৫) নাটক, ১০. *গায়ান সহৎ* (১৯৯৬) নাটক বিষয়ে আলোচনা, ১১. *বার ঠপ্ মেৎ দাঃ* (২০০১) গল্প সংকলন ইত্যাদি।		
৮. সোনা হেমব্রম (১৯৫৭)	বাঁকুড়া জেলার সামাডি গ্রামে।	১. *গালাং মালা* (১৯৮৫) গল্প সংকলন, ২. *আরশিরে এ্রেলঃ মে* (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থ,৩. *সাগুন ডালিচ* (২০০১) প্রবন্ধ সংকলন, ৪. *পিড়হি তায়ম পিড়হি* (২০০৫) ধর্ম বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ, ৫. *সৌল সাকওয়া* (২০০৫) সাঁওতাল বিদ্রোহের গান ইত্যাদি।	*নাওয়া ইপিল* নামক সাঁওতালি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। (দ্বিমাসিক)	
৯. তারাসিঞ বাসকে (১৯৬৮)	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে।	১. *জ্বালা* ১ম খন্ড ১৯৯৩, ২য় খন্ড ১৯৯৯, কাব্যগ্রন্থ ২. *আতুঃ মেরে টাটিঝারি* ১ম খন্ড ১৯৯৭, ২য় খন্ড প্রকাশকাল জানা যায় নি, কাব্যগ্রন্থ ৩. *মিৎ ধাও কয়গ মে* (১৯৯৮), ৪. *গেলবার আটাল* (১৯৯৯) প্রবন্ধ সংকলন, ৫. দুক *দুলৌড় তালা* (১৯৯৯)	১৯৯৯ সালে *জিউয়ি* নামক সাঁওতালি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।	

		৬. *মিৎ ডালিচ বাহা* (২০০১) ইত্যাদি।		
১০. আদিত্য কুমার মান্ডি(১৯৭৪)	বাঁকুড়া জেলার বারুঘুটু গ্রামে।	১. *ইপিল* (১৯৯৬) কাব্যগ্রন্থ, ২. *বানচাঃ ডাহার* (১৯৯৭) প্রবন্ধ সংকলন, ৩. *সরেস সিরজনরে জানাম আয়ো* (১৯৯৯) প্রবন্ধ সংকলন, ৪. *হুদিশ* (২০০১) প্রবন্ধ সংকলন, ৫. *আলে আতোরে* (২০০২) কাব্যগ্রন্থ, ৬. *মিৎ অনড়হিঁয়ৌ জিয়নরে* (২০০২) আত্মজীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ, ৭. *অকয় চেৎ ক মেন এদা* (২০০৩) (কবিতার সমালোচনা), ৮. *সিপাহী* (২০০৩) ইত্যাদি।		A.I.S.W.A-র পক্ষ থেকে 'Poet of the year ২০০০' নির্বাচিত করা হয়।
১১. দুর্গাদাস সরেন	বাঁকুড়া জেলার মধুপুর গ্রামে।	১. কিদিঞ টুডাং(১৯৯৬) কাব্যগ্রন্থ ২. সামানম কৌপি (কাব্যগ্রন্থ) ৩.বারুবৌডরা(২০০৪) কাব্যনাট্য ৪. মুলুঃ (কাব্যগ্রন্থ)		২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সাধুরামচাঁদ মুর্মু স্মৃতি পুরস্কার পান।

		৫. তিকিন বেড়া ভোররেন সাপারম (উপন্যাস) ৬. আরু ফেরাও (উপন্যাস) ৭. বির বাণ্টা বৌজাল (উপন্যাস) ৮. সাতসায় গোপীন (গীতিনাট্য) ৯. বঙ্গা দৌনহাও (কাব্যগ্রন্থ) ১০. নাহাঃ কাহনী (ছোটগল্প সংকলন)		

আদিবাসী সাঁওতালরা জগৎ সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। তাদের বংশ পরম্পরায় শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত আখ্যানসমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং লিখিত আকারে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তারা জীবন সংগ্রামের ক্রমবিবর্তনের বয়ানটি গড়ে তুলেছিল। খ্রিস্টান মিশনারি ও হিন্দুদের ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা এই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠে। সাঁওতালি লেখকরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীক সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে তাঁরা গল্পের বিষয় সংগ্রহ করত। তাদের সম্প্রদায়গত অবস্থান ও সামাজিক বিন্যাস প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তাঁরা গল্পের বিষয় প্রস্তুত করেছিলেন। গল্পে বিপ্লবীদের জীবনকে কেন্দ্র করে এক ভিন্ন ধরনের আখ্যান তৈরি করতে দেখা যায়। আপাত দৃষ্টিতে এই সব চরিত্রগুলিকে সমাজবিরোধী মনে করলেও সাঁওতালি গল্পে তাদেরকে গঠনমূলক কাজের ভূমিকায় দেখা যায়। একদিকে তাঁরা অতীতের গৌরবকে স্বীকার করেছে অন্যদিকে এক শিক্ষিত সাঁওতাল সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষা তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আদিবাসী সাহিত্যেকে তাঁরা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে সাঁওতালদেরকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় যেমন- কথাসাহিত্য সাঁওতাল বীরদের

স্মৃতিকথা ও হারিয়ে যাওয়া পৌরাণিক গৌরবকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এছাড়াও খ্রিস্টান চার্চের প্রভাব, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনকেও গুরুত্ব দেয়। সাঁওতালি লেখকরা আদিবাসী সত্তাকে নিছক মূলধারার উপাদান হিসেবে দেখেননি। আদিবাসী সত্তাকে এক সাংস্কৃতিক যুক্তি-তর্কের অবস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা দারিদ্র নিয়ে আলাদা করে কোনো বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাদের শ্রেণিগত ও জাতিগত সত্তার মধ্যে ন্যস্ত আছে। রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা ও কর্মদক্ষতার কথা স্বীকার করেন ঠিকই কিন্তু তারা কেন দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না তার সদুত্তর দেয় না। এমনকি শিক্ষার প্রসার ও সরকারি উন্নয়নও তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। সাঁওতালি সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে ঐতিহাসিক সত্য এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে প্রশ্ন করে। তাঁরা ভারতীয় মূলধারার ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্ন করতে চায় না। রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা তাদের দারিদ্র দূর করতে পারে না, তবে তাদের অধিকারের দাবিগুলোকে বৈধতা দেয়। সাঁওতালি সাহিত্যিকরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনিকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটকের মাধ্যমে জনমানসে এনে শুধুমাত্র স্ব-প্রতিনিধিত্ব নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণেও তাঁরা সমান পারদর্শী।

উপসংহার:

আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভ পত্র হল, 'নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা কাজে আমি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি তেমনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। আমার গবেষণায় মূলত দুটি বিষয় সমান্তরালভাবে এসেছে, প্রথমত পশ্চিমরাঢ়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে এই অঞ্চলের বসবাসকারী আদিবাসীদের সাধারণ পরিচয়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মিথ-বিশ্বাস-প্রথা-ট্যাবু প্রভৃতি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা। আদিবাসীদের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর নেমে আসা নানারকম অভিঘাত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা এবং তাদের প্রতি অনাদিবাসী উচ্চবর্গের মানসিকতার পরিচয়। দ্বিতীয়ত ছোটগল্পগুলিতে একটা বিস্তৃত সময়পর্বে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের দিকগুলি বাস্তবনিষ্ঠ নির্মাণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। বাংলা ছোটগল্পে বিস্তৃত ক্যানভাসে উপেক্ষিত আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও পালা-পার্বণকেই তুলে ধরা হয়নি। একই সঙ্গে তাদের উপর দীর্ঘদিনের আর্থিক শোষণ ও নির্যাতনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। চর্যাপদ কিংবা মধ্যযুগের সময় থেকে কমবেশি আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে ভারতে ইংরেজ শাসনকালে প্রথম আদিবাসী চিহ্নিতকরণের ও স্বরূপ সন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ছাড়াও সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে আদিবাসীদের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। আদিবাসীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ বা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর নিরিখে চিহ্নিতকরণ খুবই কঠিন কাজ ছিল। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণকে সামনে রেখে তাদের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাদের এই তালিকা আদমশুমারি জনগণনা অনুযায়ী পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। যেমন- ২০১১ সালের আদমশুমারি জনগণনাতে রাষ্ট্র ৭০৫টি জনগোষ্ঠীর আদিবাসীকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দিয়েছে। আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ইংরেজ শাসনকালে তাদের আর্থ-সামাজিকতার স্বনির্ভরশীলতা নষ্ট হয়েছিল। গবেষণা আলোচনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত আইন প্রয়োগের ফলে আদিবাসীদের জঙ্গলে জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন- আদিবাসীদের উপর 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট' আইন উঠে যাওয়ার পরেও লোধা ও শবররা সামাজিক ঘৃণা, অপবাদ থেকে মুক্তি পায়নি। আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে সেই সব ঘৃণার বা অপবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের

প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। গবেষণাকর্মে নির্বাচিত গল্পকাররা হলেন- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা ও পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাঁওতাল ছোটগল্পকার, সেই সময়ের জটিল আবর্তের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা মানবতার জয়গান শুনিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বিপরীতে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের পটভূমিতে গল্পকাররা নিজেদের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পের বিষয় বিশ্লেষণ ও পশ্চিমরাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাঁওতাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে জেনেছি এই অঞ্চলের মানুষগুলির উপর অনাচার, নানা অসংগতি, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, বেঁচে থাকার নানা সমস্যা, জীবন সংকট, মূল্যবোধের দোটানা ও প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, সমাজ-বন্ধনহীন যৌন জীবন, চিরকালীন প্রথা, আচার-আচরণ, সামাজ ও সাংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ছবি প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ। এইসব কথাশিল্পীদের কলমে তা মূর্ত হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিক গোত্রের মধ্যে জনগোষ্ঠীর সামাজ ও সংস্কৃতির পার্থক্যর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে দেখিয়েছেন। আদিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠী লড়াই একান্তই বাস্তব। আদিবাসীদের কৌম জীবন ভাঙনের পিছনে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর নিরন্তর আঘাতকে দায়ী করা যায়। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর বারবার আঘাত এসেছে। এতে তাদের অরণ্য নির্ভর গ্রাম্য জীবন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এই সামাজিক অভিঘাতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটা সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে গ্রাস করেছে। যেমন- কৃষি সভ্যতা অরণ্যকে গ্রাস করেছে। আবার কয়লা খনির আবিষ্কার, নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও নগরায়ণে কৃষিজমিকে নষ্ট করেছে। এরফলে অরণ্য নির্ভর ও কৃষিনির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নানারকম সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। তাই তারা আড়কাঠিরদের হাত ধরে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে কয়লাখনির শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক কিংবা রেল লাইনের শ্রমিক হয়ে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। যখন কয়লাখনি ও চা বাগান বন্ধ হয় তখন তারা চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে অনেকে তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আলোচ্য ছোটগল্প বিশ্লেষণের সময় এ প্রসঙ্গগুলো বারবার এসেছে। লেখকরা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সাহিত্যে কর্মের পাতায় পাতায় পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের সামাজিক নানা সমস্যার সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের বার্তা ঘোষণা করেছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির ইতিহাসের সঙ্গে সমাজজীবনের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত ও আলোকিত হয়েছে। একই সঙ্গে গণজাগরণের রহস্য অনুসন্ধানকারী প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে। যা আমার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণায়

পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন, সংস্কৃতির স্বরূপ ধরার প্রয়াস থাকলেও হয়তো অনেক কিছুই বাকি থেকে গেল। অন্য কোন গবেষক অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনালোকিত দিকগুলি আলোকপাত করবেন। এখানেই শেষ নয়, বহমান ধারায় এ ধরনের আরো অনেক ছোটগল্প ক্রমেই সংযোজিত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি আদিবাসী জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এরফলে গল্পকারদের কলমে প্রতিনিয়ত আরো নানাদিক উন্মোচিত হবে। এতে আরো নতুন করে ভবিষ্যতে গবেষণার সুযোগ থাকল। আমার এই গবেষণা কাজটি ভবিষ্যতে পাঠককে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে নানান প্রশ্নের সমাধানের সূত্র দিয়ে সন্দেহ নিরসন করবে এই প্রত্যাশা রাখি।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (১ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

২. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে, ২০১৫।

৩. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪।

৪. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

৫. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

৭. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৪র্থ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৭।

৮. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৫ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৭।

৯. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৬ষ্ঠ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

১০. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৭ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

১১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৮ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট, ২০১৬।

১২. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (৯ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ, ২০১৬।

১৩. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১০ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫।

১৪. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১১দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৪।

১৫. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১২দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৪।

১৬. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত),, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৩দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫।

১৭. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৪দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।

১৮. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৫দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই, ২০১৫।

১৯.গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৬শ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

২০. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৭দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন, ২০১৫।

২১. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (১৮দশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ, ২০১৭।

২২. গুপ্ত, অজয়(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* (একবিংশ খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৬।

২৩. ঘড়াই, অনিল, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে, ২০১৪।

২৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত), *'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (১ম খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ মে, ২০১৭।

২৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত), *'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৭।

২৬. ভট্টাচার্য, জগদীশ(সম্পাদিত),*'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ* (৩য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৬।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৫।

২৮. বেরা, নলিনী, *উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়রি, ২০১৯।

২৯. বেরা, নলিনী, *ফুলকুসুমা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭।

৩০. বেরা, নলিনী, *শবর চরিত,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭।

৩১. বেরা, নলিনী, *শ্রেষ্ঠগল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩।

৩২. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

৩৩. বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৫।

৩৪. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫।
৩৫. *বঙ্কিম রচনাবলী* ২ (প্রবন্ধ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৯।
৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষড়বিংশ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২২।
৩৭. মিশ্র, ভগীরথ, *প্রেমের গল্প,* অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।
৩৮. মিশ্র, ভগীরথ, *মিড ফিল্ডার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯।
৩৯. মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১০।
৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৪০১।
৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৪।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৪০২।
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৪র্থ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৌষ, ১৪২২।
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৫ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৪০৩।
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৪০৩।
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৭ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪।
৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৮ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, পৌষ, ১৪০৪।
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (৯ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, পৌষ, ১৪০৪।
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা, মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *বিভূতি রচনাবলী* (১০ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০৪।
৫০. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ মাঘ, ১৪২৪।

৫১. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ বৈশাখ, ১৪২৩।

৫২. মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২য় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪।

৫৩. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৪২৫।

৫৪. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪২২।

৫৫. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মাঘ, ১৪২২।

৫৬. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৪র্থ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬।

৫৭. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৫ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, মাঘ, ১৪২৪।

৫৮. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত),*তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪২৫।

৫৯. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৭ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৪২৫।

৬০. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৮ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪২৩।

৬১. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (৯ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৪২৫।

৬২. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১০ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৪২৪।

৬৩. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১১দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা অষ্টম মুদ্রণ, পৌষ, ১৪২৪।

৬৪. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১২দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, পৌষ, ১৪২৫।

৬৫. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৩দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪২৫।

৬৬. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৪দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৪২৫।

৬৭. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৫দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৪।

৬৮. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৬শ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫।

৬৯. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৭দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, নবম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৩।

৭০. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (১৮দশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র, ১৪২৪।

৭১. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (ঊনবিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৩।

৭২. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (বিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৩।

৭৩. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (একবিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬।

৭৪. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বাবিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র, ১৪২৫।

৭৫. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (ত্রয়োবিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৩।

৭৬. মিত্র, শ্রীগজেন্দ্রকুমার ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (চতুর্বিংশ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৩।

৭৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *গল্প সমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (১ম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪২৩।

৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস ও অন্যান্যরা(সম্পাদিত), *গল্প সমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* (২য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দশম মুদ্রণ, চৈত্র, ১৪২২।

৭৯. ভাদুড়ী, সতীনাথ, সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা(১ম খন্ড), বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা আগস্ট, ২০১০।

৮০. ঘোষ, সুবোধ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. সুর, অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন,* সাহিত্যলোক, ৩য় সংস্করণ ২০০১।

২. সুর, অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতি,* জ্যোৎস্নালোক, ১৯৯১।

৩. সুর, অতুল, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস,* জিজ্ঞাসা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২।

৪. সুর, অতুল, *বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ,* বেস্টবুক, ১ম সংস্করণ ১৯৯২।

৫. সেন, অঞ্জন ও সিংহ, উদয়নারায়ণ (সম্পাদিত), *মিথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।

৬. মজুমদার, অভিজিৎ, *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব,* দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬।

৭. সেন, অভিজিৎ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* দে'জ পাবলিশিং ২য় সংস্করণ, ২০১৬ কলকাতা।

৮. দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব,* ইন্দাস, কলকাতা, ২০১৪।

৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার(সম্পাদিত), *'কল্লোল গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা।

১০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার(সম্পাদিত), *'কল্লোল গল্পসমগ্র* (৩য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর,* দে'জ পাবলিশিং ২০১৬, কলকাতা।

১২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *বাংলা কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ২০১৬, কলকাতা।

১৩. মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, *তারাশঙ্কর: সময় ও সমাজ,* পাণ্ডুলিপি, ২য় সংস্করণ, ২০০৫।

১৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৫।

১৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্যে প্রথম খন্ড আলোচনা,* ক্যালকাটা বুক হাউস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২।

১৬. চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী, *বাংলা ছোটগল্প রীতি- প্রকরণ ও প্রবণতা,* রত্নাবলী, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪।

১৭. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার(সম্পাদিত), *গল্পচর্চা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮।

১৮. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৯. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার(সম্পাদিত),*পঞ্চাশের দশকের কথাকার,* পুস্তক বিপণি, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৮।

২০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ও রায়, জ্যোতিপ্রসাদ(সম্পাদিত), *ছোটগল্প: বিকাশ পরিণতি ও উপলব্ধি,* বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪।

২১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিৎকুমার(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর স্মরক গ্রন্থ,* মিত্র ও ঘোষ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ১৪০৬।

২২. মণ্ডল, উৎপল ও মজুমদার, কামনা(সম্পাদিত), *মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২।

২৩. দাশ, উদয়চাঁদ,*আখ্যানের সম্প্রসারণ : উনিশ শতক বিশ শতক,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

২৪. সিং, কঙ্কর, *আমি শূদ্র আমি মন্ত্রহীন,* র‍্যাডিক্যাল, ১ম সংস্করণ, ২০০১।

২৫. চৌধুরী, কমল, *ডাইনি,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, ২০০৩।

২৬. ইসলাম, কাবেদুল, *প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতি গোষ্ঠী,* উত্তরণ, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৪।

২৭. চট্টোপাধ্যায়, কুণাল, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

২৮. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯।

২৯. সেন, ক্ষিতিমোহন, *জাতিভেদ,* গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, ১৯৯৭।

৩০. হালদার, গোপাল, *বাঙালা সাহিত্যের রূপরেখা* (১ম খন্ড), অরুণা প্রকাশনী, বঙ্গাব্দ, ১৪০৪।

৩১. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮০।

৩২. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বাংলা কথসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা,* পুস্তক বিপণি, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯১।

৩৩. সরেন, গোমস্তা প্রসাদ, *অবহেলিত শবর জাতি ও এক মুক্তি সংগ্রামীর কথা,* আশুতোষ অফসেট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পুরুলিয়া, ২০১৫।

৩৪. সরেন, গোমস্তা প্রসাদ, *আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি,* আশুতোষ অফসেট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পুরুলিয়া, ২০১৫।

৩৫. সরেন, গোমস্তা প্রসাদ, *কেন এই মধ্যবর্তী নির্বাচন?,* আশুতোষ অফসেট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পুরুলিয়া, ২০১৫।

৩৬. গুহরায়, গৌতম(সম্পাদিত), *ভাষা সংবেদন ও নির্মাণ,* বইওয়ালা, বঙ্গাব্দ ১৪১৪।

৩৭. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ(সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৮. রায়, গৌরমোহন, *তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা,* সাহিত্যশ্রী, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪।

৩৯. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৫।
৪০. মণ্ডল, চিত্ত ও রায়মণ্ডল, প্রথমা(সম্পাদিত), *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।
৪১. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, *হিন্দুর আচার- অনুষ্ঠান,* প্যাপিরাস, ১ম সংস্করণ, ২০০১।
৪২. ভট্টাচার্য, চিন্ময়, *কথাসাহিত্যে গ্রাম-বাংলা,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
৪৩. ঘোষাল, ছন্দা, *আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচনা ও শৈলী,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
৪৪. মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬।
৪৫. সেনমজুমদার, জহর, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭।
৪৬. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, *কল্লোলের কাল,* দে'জ পাবলশিং, কলকাতা, ২০১৮।
৪৭. নায়ক, জীবেশ, *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০।
৪৮. রায়, জ্যোতিপ্রসাদ, *রাঢ়ের গল্পবিশ্ব ও তারাশংকর,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮।
৪৯. রায় চৌধুরী, ঝুমা, *বাংলা ছোটগল্প: উৎস ও বিবর্তন,* পূর্বাশা, কলকাতা, ২০১০।
৫০. সরেন, ডাবলু, *সাঁওতালি নাটকের কথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১৯।
৫১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *আখ্যানের বহুস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫।
৫২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *ছোটগল্পের প্রতিবেদন,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১।
৫৩. ঘোষ, তপোব্রত, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ,* দে'জ পাবলিশিং, ৭ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮।
৫৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ(সম্পাদিত), *কল্লোল গল্পসমগ্র* (৪), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪১৮।
৫৫. মুখোপাধ্যায়, তরুণ(সম্পাদিত), *কল্লোল গল্পসমগ্র* (৩), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০১০।
৫৬. রায়, তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।
৫৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আমার সাহিত্য-জীবন,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২০।
৫৮. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., কলকাতা, ১৪০১।
৫৯. জানা, ত্রিলোচন, *তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রান্তিক সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫।

৬০. মণ্ডল, দীনবন্ধু, *সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন,* আশাদীপ, কলকাতা, জুলাই ২০১৫।

৬১. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ,*(২য় খন্ড), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৪২।

৬২. ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৯।

৬৩. চক্রবর্তী, দীপেন্দু, 'তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাফল্য', *তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য,* উজ্জ্বলকুমার মজুমদার(সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।

৬৪. দেববর্মা, দেবল, *রাঢ় বাংলার ইতিবৃত্ত,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮।

৬৫. মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস্, *বীরভূমের রাঙামাটি ও তারাশঙ্কর,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১২।

৬৬. রায়, দেবেশ(সম্পাদিত), *দলিত,* সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।

৬৭. রায়, দেবেশ, *তারাশঙ্কর: নিরন্তর দেশ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

৬৮. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *কুদুম* (সাঁওতালী হেঁয়ালি), বাস্কে পাবলিকেশন, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ২০১৭।

৬৯. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *হড় সমাজরে বঙ্গাবুরুকো,* বাস্কে পাবলিকেশন, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ২০১৩.

৭০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বিজয়ন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৩।

৭১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *হড় রড় বায়ান-আরি* (সাঁওতালী ব্যাকরণ), বাস্কে পাবলিকেশন, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ২০১৮।

৭২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (১ম খন্ড), সুবর্ণরেখা, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩।

৭৩. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে,* ১ম সংস্করণ কলকাতা, ১৯৯৯।

৭৪.আচার্য, নন্দদুলাল, *রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি,* পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১ম সংস্করণ কলকাতা, ২০০৩।

৭৫. চট্টোপাধ্যায়, নরনারায়ণ, *ঝুমুর,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯।

৭৬. সরেন, নায়কে মঙ্গলচন্দ্র, *বাহা সেরেঞ,* বাস্কে পাবলিকেশন, ১৮/১ শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ২০১৩।

৭৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪১২।

৭৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *ছোটগল্পের সীমারেখা,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৭৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশ ভবন, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

৮০. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

৮১. হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ২০১৭।

৮২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল, *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ২০১৭।

৮৩. মণ্ডল, পুলকেশ, ও মিত্র, জয়া(সম্পাদিত), *সেই নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা,* প্যাপিরাস, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১২।

৮৪. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পুস্তক বিপণি, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২।

৮৫. মাহাত, পশুপতিপ্রসাদ, 'সিং বোঙ্গা' *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* (বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত), অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটাস, কলকাতা, ২০০৭।

৮৬. সরকার, পার্থ(অনুবাদ), *ভারতের সংবিধান* (সুভাষ সি কাশ্যপ), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৭।

৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *অন্তর্বয়ন: কথাসাহিত্য,* একুশে, কলকাতা, ১৯৯০।

৮৮. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন(সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য,* সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩।

৮৯. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন, 'সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস : চৈতালী ঘূর্ণী', প্রবন্ধ সংকলন, *অবভাস,* চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৭।

৯০. ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি* (১ম খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭।

৯১. মাইতি, প্রদ্যোতকুমার, *মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি,* পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ ২০০১।

৯২. মাইতি, প্রভাতাংশু, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা,* শ্রীধর প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০১।

৯৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৯।

৯৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩।

৯৫. চক্রবর্তী, বসাক, *ভারতের অর্থনীতি পরিচয়,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, আগস্ট, ২০০২।

৯৬. ঘোষ, বিজিত, *বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা,* পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০।
৯৭. ঘোষ, বিনয়,*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* প্রকাশ ভবন, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৮।
৯৮. মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার, *সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯।
৯৯. দত্ত, বীরেন্দ্র, *কথাশিল্প : স্বাদে সত্যে,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬।
১০০. দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা কথা সাহিত্যের একাল* (১৯৪৫-১৯৯৮), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২।
১০১. সান্যাল, ভবানীগোপাল(সম্পাদিত), 'বঙ্গদেশের কৃষক', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী : বিবিধ প্রবন্ধ,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৯৫।
১০২. চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, *গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।
১০৩. চৌধুরী, ভূদেব, *ছোটগল্পের কথা,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।
১০৪. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৯।
১০৫. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা,* বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০৭।
১০৬. দেবী, মহাশ্বেতা(সম্পাদিত),*শবর লোকগান ও লোককথা,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯।
১০৭. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯।
১০৮. মজুমদার, মানস, *লোকসাহিত্য পাঠ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।
১০৯. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, বর্ধমান।
১১০. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, *রাঢ়ের গ্রামদেবতা,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০।
১১১. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ১ম সংস্করণ, ২০০৮।
১১২. গুপ্ত, রঞ্জন, *রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ* (বীরভূম ১৭৮০-১৮৭১), সুবর্ণরেখা প্রথম সংস্করণ, ২০০১।
১১৩. রায়, রথীন্দ্রনাথ, *ছোটগল্পের কথা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬।
১১৪. পাল, রবিন, *ছোটগল্পের বিন্দুবিশ্ব,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩।
১১৫. পাল, রবিন, *বাংলা ছোটগল্প: কৃতি ও রীতি,* ব্রহ্মাপুর প্রকাশন, বঙ্গাব্দ ১৪০৯।
১১৬. মুর্মু, রামেশ্বর, *জাহের বঁগা সান্তাড় ক,* আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, নিউ আলিপুর, ২০১৬।

১১৭. শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

১১৮. চৌধুরী, শম্পা(সম্পাদিত), *স্বাধীনতার আগে ও পরে,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৮।

১১৯. দত্ত, শিপ্রা, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন,* অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৯।

১২০. চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ, *লোকায়ত পশ্চিমরাঢ়,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৭।

১২১. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬।

১২২. সেন, শুচিব্রত, *'পূর্বভারতে আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

১২৩. ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার, *বাঙালি জাতি পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৬।

১২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ২০১৮-২০১৯।

১২৫. ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার, *গৌড় কাহিনী,* ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২।

১২৬. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ(সম্পাদিত) *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন* (১ম খন্ড), রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।

১২৭. গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার ড. সমরেশ(সম্পাদিত) *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন* (২য় খন্ড), রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।

১২৮. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, *শিল্পসাহিত্য দেশ কাল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১।

১২৯. সামাদী, সফিকুন্নবী, *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : জীবনের শিল্পীত সত্য,* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪।

১৩০. মল্লিক, সমরেন্দ্র, *'তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য'* প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১।

১৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিৎ, *তারাশঙ্কর ও সমকালীন সাহিত্য সমাজ,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪০৫।

১৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'গণদেবতা পঞ্চগ্রাম : কালের মন্দিরা ও ব্যক্তির ছন্দ', *তারাশঙ্কর অন্বেষা,* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রমা প্রকাশনী, ১৯৮৭।

১৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, ২০২১।

১৩৪. ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, *শিল্পতত্ব পরিচয়,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।

১৩৫. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট* (১ম খন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।

১৩৬. ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, *ছোটগল্পের পর্ব-পর্বান্তর,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১০।

১৩৭. সরকার, সুজিত,*আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ভাষা সমীক্ষা,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।

১৩৮. সেন, সুজিত(সম্পাদিত), *জাতিপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* নবপত্র প্রকাশন, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩।

১৩৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ,* রূপা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩।

১৪০. চক্রবর্তী, সুনীল, *লোকায়ত বাংলা,* কল্যাণী প্রকাশন, ১৯৬৯।

১৪১. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (১ম খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ১৯৯৫।

১৪২. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (২য় খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

১৪৩. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৩য় খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯।

১৪৪. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৪র্থ খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০১।

১৪৫. সামন্ত, সুবল(সম্পাদিত), *বাংলা গল্প ও গল্পকার* (৫ম খন্ড), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৩।

১৪৬. ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা. লি., ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০।

১৪৭. দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা কথা সাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ* (১৯২৩-১৯৪৭), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯।

১৪৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, *বাঙালির ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।

১৪৯. রায়, সুভাষ(সম্পাদিত), *মানভূমের লোকনৃত্য,* রাঢ় প্রকাশন, সিউড়ী, বীরভূম ৭৩১১০১, বইমেলা, ২০১৯।

১৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, *জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি,* ২য় সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।

১৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, *বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান,* করুণা, কলকাতা, ২০০৫।

১৫২. চক্রবর্তী, সুমিতা, *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪।

১৫৩. মিদ্দে, সুরঞ্জন(সম্পাদিত), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮।

১৫৪. ভৌমিক, সুহৃদকুমার, 'আদিবাসী সমাজের লোকশিল্প' *বঙ্গসংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য* মনফকিরা, সহজিয়া, কলকাতা, জানু: ২০০৯।

১৫৫. ভৌমিক, সুহৃদকুমার, *খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি,* মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৮।

১৫৬. হোসেন, সোহারাব, *বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮।

১৫৭. সিকদার, সৌরভ, *ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা,* অনন্যা, ঢাকা, ২০০২।

১৫৮. ভট্টাচার্য, সৌরীন(অনুবাদ), *মানব অধিকার প্রশ্ন ও উত্তর* (লিয়া লেভিন) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৬।

১৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ(১ম ও ২য় খন্ড) সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।

১৬০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯।

১৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

১৬২. Fulchand Mandi, Raban Baskey, Mid' *Gel Hor Kahni Salak' Mid Sai Mid Kahni,* Paschim Banga Santali Academy (Govt. of West Bengal), 2022. (Olchiki Version)

১৬৩. Kosambi, D.D. *Myth and Reality,* Studies In the Formation of Indian Culture, First Printed 1962.

১৬৪. Paschim Bangla Santali Academy, *MID SAI MID KAHANI,* Under Tribal Development Department, Govt. of West Bengal. (Olchiki Version)

বাংলা পত্র-পত্রিকাপঞ্জি:

১. *অভিযাত্রী ফেরী,* 'লোকউৎসব সংখ্যা' অচিন্ত্য বিশ্বাস(সম্পাদক), 'পূর্বাদ্রি' ২/৩ পাটুলী, কলকাতা-৭০০০৯৪, বর্ষ ৬, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০১৪।

২. *অমৃতলোক,* সমীরণ মজুমদার(সম্পাদক), মেদিনীপুর, ৩১ বছর ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬।

৩. *অশোকনগর*(বিভূতিভূষণ সংখ্যা), অভিষেক চক্রবর্তী, রুদ্রদীপ চন্দ(সম্পাদক), ৫০৮/৮, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২২২, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বইমেলা ১৪২১।

৪. *আত্মবিকাশ*(তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী(সম্পাদক), ১নং পল্লীশ্রী কলোনী, ই.পি-৬৫, কলকাতা-৭০০০৪৮, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর'১৬- ডিসেম্বর'১৬।

৫. *আত্মবিকাশ*(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী(সম্পাদক), ১নং পল্লীশ্রী কলোনী, ই.পি-৬৫, কলকাতা-৭০০০৪৮, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর'১৮-ফেব্রুয়ারি'১৯।

৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* অভিরূপ সরকার, 'কাজ নেই, তাই পশ্চিমবঙ্গে এত অনাহার, অর্ধাহার', ৩.৫.২০০৭।

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, 'কত চাষি আত্মঘাতী জানতে চায় কেন্দ্র', ৭.১১.২০০৭।

৮. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* পার্থসারথি সেনগুপ্ত, ‘চাষে সেচের স্বার্থে এবার জমি চাই ২৫০০০ একর’, ২২.৬.২০০৭।

৯. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভূমিপুত্রদের ঘরের ছেলেমেয়েকে দলে টানাটা আজ সহজ কাজ’, ২.৪.২০০৬।

১০. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* সুজাউদ্দিন, ‘মৃত্যুর মিছিল জলঙ্গি মনে করাচ্ছে আমলাশোলকে’, ২৬.২.২০০৫।

১১. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* সুমন ঘোষ, ‘খাবারের খোঁজে বছরে আট মাসই ঘরছাড়া’ ২৮.৬.২০০৪।

১২. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* সুমন ঘোষ, ‘জিন্দালদের চেক পেয়ে আত্মহারা চাষিরা’ ১.৯.২০০৭।

১৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, স্বাতী ভট্টাচার্য, ‘উন্নয়ন বনাম রাজনীতি : সেটাই পঞ্চায়েতের অসুখ’, স্বাতী ভট্টাচার্য, ৫.৭.২০০৭।

১৪. *আরাত্রিক,* দুর্গাদাস মিদ্যা(সম্পাদক), ২৪/৬৬, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৮, দ্বাবিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২০।

১৫. *উত্তরাধিকার*(সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা : এক), অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক(সম্পাদিত), ১৯৯৬।

১৬. *এবং প্রান্তিক,* আশিস রায়(সম্পাদক) চণ্ডিবেরিয়া, কেষ্টপুর, কলকাতা-৭০০১০২, ৯ম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২২।

১৭. *এবং মুশায়েরা* (গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা) সুবল সামন্ত(সম্পাদক), নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

১৮. *কৃত্তিবাস* (কবিতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), কৌষিকী দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা (সম্পাদক মণ্ডলী), প্রতিভাস, কলকাতা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৭।

১৯. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* ‘মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা’, তাপস ভৌমিক(সম্পাদক), দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৯, শারদ সংখ্যা ২০১৬।

২০. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* ‘বাংলা গদ্যচর্চা’, তাপস ভৌমিক(সম্পাদক), দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৯, বইমেলা ২০১৯।

২১. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* তাপস ভৌমিক(সম্পাদক), দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইহাটি, কলকাতা-৭০০০৫৯, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫।

২২. *গল্প সরণি*(প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা), অমর দে(সম্পাদক), হোলি অ্যাপার্টমেন্ট, তৃতীয় তল, 8 যশোর রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮, একবিংশতিতম বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৩/২০১৭।

২৩. *গল্প সরণি*(মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), অমর দে(সম্পাদক), হোলি অ্যাপার্টমেন্ট, তৃতীয় তল, ৪ যশোর রোড, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন, ১৪১৮।

২৪. *তবু একলব্য*(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা), দীপঙ্কর মল্লিক(সম্পাদক), দিয়া পাবলিকেশন, ১২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি—মার্চ ২০১৭।

২৫. *তবু একলব্য*(মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), দীপঙ্কর মল্লিক(সম্পাদক), দিয়া পাবলিকেশন, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই—সেপ্টেম্বর ২০১৮।

২৬. *তীব্র কুঠার,*(ছোটগল্প ও ছোটগল্প বিষয়ক বিমল কর বিশেষ সংখ্যা), বীরেন শাসমল(সম্পাদক), ফ্ল্যাট নং বি/ ৭, ক্লাস্টার ১৪ পূর্বাচল হাউসিং এস্টেট সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৭, বইমেলা, ২০০৩।

২৭. *পরিকথা* (বিংশ শতাব্দীর সমাজবিবর্তন: বাংলা উপন্যাস), দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), সাউথ গড়িয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৬১৩, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে, ২০০০।

২৮. *পশ্চিমবঙ্গ*(তেভাগা সংখ্যা), দিব্যজ্যোতি মজুমদার(সম্পাদক), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

২৯. *পূর্ব,* রণজিৎ অধিকারী(সম্পাদক) ফ্ল্যাট ১এ ফার্স্ট ফ্লোর, ৩৮/৯ ভুবনমোহন রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০৮, ১৭ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০২১।

৩০. *প্রতিদিন,* কমল ভট্টাচার্য, 'ছাব্বিশ বছর কেটে গেলেও রাজ্যে বর্গাদার নথিভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা এখনও পূরণ হয়নি' ১৩.১.২০০৫।

৩১. *বর্তমান,* পবিত্রকুমার ঘোষ, 'রাজ্যেপালের প্রশ্ন, এ রাজ্যে গ্রামে এত গরিব কেন?', ২৯.৩.২০০৬।

৩২. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* ড. জ্যোস্না চট্টোপাধ্যায়(সম্পাদক), বাংলা বিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৫০, ষড়বিংশতিতম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০১২।

৩৩. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* মিহির চৌধুরী কামিল্যা(সম্পাদক), পাবলিকেশন ইউনিট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, নবম সংকলন, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৩৪. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা(সম্পাদক), বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২, ২৩তম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২১।

৩৫. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* শেখর সমাদ্দার(সম্পাদক), বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২, ২১তম সংখ্যা, মার্চ, ২০১৮।

৩৬. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা,* শেখর সমাদ্দার(সম্পাদক), বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২, ২২তম সংখ্যা, অক্টবর, ২০১৮।

৩৭. *বারণরেখা* (আদিবাসী/লোকসংস্কৃতি ভারতের ভিতর ও বাহির), অরূপ বসু, প্রফুল্লকুমার দে(সম্পাদক), ১২/২, সরশুনা মেইন রোড কলকাতা- ৭০০০৬১, ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৭।

৩৮. বৈশাখী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল (সম্পাদক), ৩৭/১, আগরওয়াল গার্ডেন রোড, কলকাত-৭০০০৩৪, ২০১৪-২০১৫।

৩৯. *শিলীন্ধ্র,* 'গল্প ও গল্প বিষয়ক' কমল মুখোপাধ্যায়(সম্পাদক), ৩, টি, এন, চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৯০, শারদীয় ১৪০৬।

৪০. *শুভশ্রী*(ছোটগল্পকার: স্মরণে বিস্মরণে সংখ্যা), শান্তনু সরকার(সম্পাদক), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫০ বর্ষ ২০১১-২০১২।

৪১. *সংকেত*(ছোটগল্প আলোচনা সংখ্যা), প্রবীর রায়চৌধুরী(সম্পাদক) প্রতাপপুর, হুগলী, ঊনবিংশ বর্ষ, বইমেলা ২০০৩।

৪২. *সংবর্তক,* বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা, সৌরভ রঞ্জন ঘোষ(সম্পাদক), বি-বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, কলকাতা-৭০০০৯৪, ষোড়শ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা: জানুয়ারি, ২০২০।

৪৩. *সংশপ্তক,* 'লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ বিশেষ সংখ্যা' ড. উত্তম দাস(সম্পাদক), সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০২১।

৪৪. *সমকালের জিয়ন কাঠি*(মাহাশ্বেতাদেবী বিশেষ সংখ্যা), নাজিবুল ইসলাম মন্ডল(সম্পাদক), সমকালের জিয়ন কাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, মায়াহাউড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা, ২০১৫।

৪৫. *সৃজন*(ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা), লক্ষ্মণ কর্মকার(সম্পাদক), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ষষ্ঠ বিংশতি বর্ষ, তয় সংখ্যা, জুন-আগস্ট, ২০১৯।

৪৬. *সৃজন*(ছোটগল্প বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা), লক্ষ্মণ কর্মকা(সম্পাদক), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, বিংশতি বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৩।

৪৭. *সৃজন*(বিষয়: নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা), লক্ষ্মণ কর্মকার(সম্পাদক), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, vol. 27: November 2019.

৪৮. *স্বদেশচর্চা লোক* (গোষ্ঠী সমাজ সম্প্রদায় ২), প্রণব সরকার(সম্পাদক), বিবেকানন্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৫০, বইমেলা সংখ্যা, ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৯।

ইংরেজি পত্র-পত্রিকাপঞ্জি:

Gazetteers and Journal;

1. 'A Bankura Village; Some Aspects of Socio-Caltural life', *West Bengal District Gazetteers, Bankura,* Edited by A.K Banerjee, Calcutta, 1968.
2. *A conspectus of Development works in Bankura*-D.M, Bankura, 1980.
3. *Bengal District Gazetteers, Bankura* : complied by L. S. S. O'mally, Govt of W.B, Calcutta, 1908.

4. *Bengal District Gazetteers, Birbhum*: complied by L. S. S. O'mally, Govt of W.B, Calcutta, 1st Re-print: Oct, 1996.
5. *Bengal District Gazetteers, Manbhum* : Edited by H. Coupland, Calcutta, 1911.
6. *Bengal District Gazetteers, Midnapore* : complied by L. S. S. O'mally, Govt of W.B, Calcutta, 1911.
7. Das, Amal Kr. 'Special problems in Trible Transformation : Industrialisation as a Means of such Transformation', *West Bengal Tribes* (Socio Economic and Cultural Life), Edited by A.K. Das, R.N. Saha, R. Gupta, S.M Chakraborty, Special Series No. 35, Cultural Research Institute, Govt. of W.B, First Published, 1991.
8. *Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal*, A.K. Das, Calcutta, 1966.

সাঁওতালি পত্র-পত্রিকাপঞ্জি:

১. *সিলি* (দ্বিমাসিক), কলেন্দ্রনাথ মান্ডি(সম্পাদক), শিরীষগোড়া, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া ৭২৩১২৯, ৪২ বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, ২০২২।

২. *দিসৌ* (ত্রৈমাসিক), যদুমণি বেশরা(সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি অ্যাকাদেমি, সিদু-কানহু ভবন, বিধান নগর, কলকাতা, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৪।

বৈদ্যুতিন তথ্যসূত্র:

১. https://en.wikipedia.org/wiki/Rarh_region. 5.4.2023, 7.16 P.M

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Rarh_region#History. 5.4.2023, 7.30

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Chota_Nagpur_Plateau. 5.4.2023, 7.50 P.M

৪.https://en.wikipedia.org/wiki/Subarnarekha_River. 6.4.2023, 8.50 P.M

৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Austroasiatic_languages. 6.4.2023, 9.30 P.M

৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Austroasiatic_language. 6.4.2023, 9.39 P.M

৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migrations. 6.4.2023, 9.50 P.M

৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Indo-Aryan_languages. 7.4.2023, 8.30 A.M

৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Sabar_people. 7.4.2023, 8.35 A.M

১০. https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Tribes_Act. 7.4.2023, 9.45 A.M

১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Musabani. 7.4.2023, 9.47 A.M

১২. https://www.rediff.com/news/1999/oct/16dilip.htm 8.4.2023, 6.30 P.M

১৩.https://web.archive.org/web/20121103140144/http://www.hindu.com/2008/02/27/stories/2008022757810300.htm 8.4.2023, 8.30 P.M

১৪.https://web.archive.org/web/20100613141740/http://www.telegraphindia.com/1060427/asp/jharkhand/story_6148102.asp 10.4.2023, 8.30 A.M

১৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Sadhu_Ramchand_Murmu 11.4.2023, 6.30 P.M

১৬. https://en.wikipedia.org/wiki/Raghunath_Murmu 15.4.2023, 11.30 P.M

১৭.https://www.youthkiawaaz.com/2021/06/naike-mangal-chandra-sorenturku-lumam/1.5.2023, 10.30 A.M

১৮. https://en.wikipedia.org/wiki/Sarada_Prasad_Kisku 1.5.2023, 11.19 A.M

১৯.http://libnet.vidyasagar.ac.in/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Baskey%20Publication%20%2C%20 7.5.2023, 9.30 A.M

২০. https://en.wikipedia.org/wiki/Gomasta_Prasad_Soren 7.5.2023, 9.45 A.M